بسم الله الرحمن الرحيم

# সীরাহ

## শেষ খণ্ড

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

# সীরাহ

## শেষ খণ্ড

সম্পাদক ▪ জিম তানভীর

প্রথম প্রকাশ ▪ জুমাদা আল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি,
ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব ▪ রেইনড্রপস

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ▪ ৩৫০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
rdmedia2014@gmail.com

শারঈ সম্পাদনা: শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবন জাকির

ISBN: 978-984-34-4160-7

# ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

স্কুলজীবনে যে বিষয়গুলো একেবারেই উপভোগ করিনি, সেগুলোর মধ্যে আছে বাংলা এবং ইসলাম শিক্ষা। কখনই এই সাবজেক্টগুলোতে আগ্রহ পাইনি। পড়তে হবে, তাই পড়তাম। না তেমন কিছু শিখেছি, না উপভোগ করেছি। গল্পের বই পড়তে অবশ্য ভালোই লাগতো। আর ইসলাম শিক্ষা বই পড়ে যতো না ইসলাম শিখেছি, তার থেকে বেশি শিখেছি পরিবার আর চারপাশের কালচার থেকে। অবশ্য শিখেছি না বলে 'জেনেছি' বলাই ভালো, কারণ সিরিয়াসলি ইসলাম পালন করা শুরু করেছি অনেক পরে।

ইসলাম মানুষকে বদলে দেয়। এই পরিবর্তনটা অন্যরকম, বিশ্বাসে-আদর্শে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, অনুভূতি আর মানসিকতায়। পুরো পৃথিবীটা অন্যরকম লাগে। যে ছেলেটা হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্য পড়তো, ইসলাম গ্রহণের পর সে দেখবে অর্থহীনতাকে হেয়াঁলিপনার আবরণ দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া এই লোকটা আসলে কিছুই করেনি। যে মেয়েটা জাফর ইকবালের ফ্যান ছিল, সে আবিষ্কার করবে লোকটা কতো সূক্ষ্মভাবে ইসলাম আর মুসলিমদের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ আর বিরক্তির আবরণ তৈরি করে যত্নের সাথে। কিংবা কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখাগুলো পড়ে, তার কাছে মনে হবে কথাগুলো সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কিছু কথা হচ্ছে জাদুর মতো। কথাটার মানে কী? কথাটার একটা মানে হল, কিছু মানুষ খুব সুন্দর করে, গুছিয়ে, মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো মিথ্যে বলে। এতোটাই সুন্দর, গোছানো আর মায়াকাড়া -- যে মিথ্যাকে আর মিথ্যা মনে হয় না, সত্য বলে পাঠক বা শ্রোতা বিশ্বাস করতে থাকে।

বাংলা সাহিত্য বলে সেকুলাররা যে ধারার প্রচলন করেছে, সেই ধারাটাকে আমার একটা জাদুর মতো মনে হয়। সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা। আকর্ষণীয়, কিন্তু ফাঁপা। চকচকে, কিন্তু অন্তঃসারশূণ্য। পড়ে একটা 'ফিল গুড' হয়, কিছু শব্দ আর লেখার ধরণও শেখা যায় বটে, কিন্তু এই সাহিত্য আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

অন্ধকারে, অর্থহীনতা, পথভ্রষ্টতায়।

বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে? সবাই সমস্বরে একটাই উত্তর দেয়, রসাতলে! জাতি হিসেবে আমরা এ বিষয়ে একমত। ক্ষমতার আসনে বসে থাকা লোকটি এ কথা স্বীকার

না করলেও, সে আরো বেশি করে জানে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই অবনমন চলছে তো চলছেই। বাংলাদেশ ঠিক কবে ভালো ছিল -- এ কথা কেউ মনে করতে পারে না। কেন এমন হল? অনেক কারণ আছে, সেসব নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসি নি। তবে এর পেছনে একটা কারণ আছে, সেটা হলো প্রচলিত সাহিত্যের ধারা আমাদের কিছুই দিতে পারে নি। যা কিছু দিয়েছে তার পুরোটাই গারবেজ -- দেশপ্রেমের নামে উন্মাদনা, ভালোবাসার নামে নোংরামি আর মানবতার নামে ফাঁকাবুলি।

বই একটা জাতিকে বদলে দিতে না পারলেও বদলে দেবার একটা হাতিয়ার বটে। সেকুলার লাইন থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পর বই পড়ার অভ্যাস থাকা মানুষরা একটা শূণ্যতা অনুভব করে। কারণ সেকুলার সাহিত্য পড়তে ভালো লাগে না, আর ইসলামী বইগুলোর বেশিরভাগের মান ভালো না, নিরস। এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই।

আমার নিজেরও। ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি তার সিংহভাগ ইংরেজি বই বা লেকচার থেকে। বাংলা ভাষাভাষীদের মেজরিটি মুসলিম হওয়া সত্তেও সেকুলারদের একচ্ছত্র রাজত্ব দুঃখজনক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অসাধারণ বক্তা। তাঁর একটি কথায় মানুষ মুসলিম হয়েছে, এক বৈঠকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। মরুভূমি থেকে উঠে আসা ধুলোমলিন বেদুইন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মুহূর্তের মাঝে বুঝে ফেলতো বিন্দুমাত্র অসুবিধা ছাড়াই। আর আমরা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকছি দুর্বোধ্য ভাষায়, যেখানে যত্নের ছাপ নেই, সৌন্দর্যের ছটা নেই। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

এই মেনে-নিতে-না-পারা থেকেই রেইনড্রপসের জন্ম। যে বাংলা আর ইসলামশিক্ষাকে উপভোগ করতাম না, সে দুটোর মাঝে ইসলাম হয়ে গেলো আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, আর বাংলা হলো সেই প্রিয়কে ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার! ঠিক করলাম, আলিমরা যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলোই বলবো, কিন্তু, গুছিয়ে বলবো, সুন্দর করে বলবো -- যেন মানুষ বুঝতে পারে, ভালোবাসতে পারে। ইসলামের সাথে সাধারণ মানুষের মাঝে ভাষার কাঠিন্য আর অস্পষ্টতার যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে -- সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে না পারি, কয়েকটা ইট হলেও খুলে নেওয়া চাই।

আলহামদুলিল্লাহ, এই লেখাটি যখন লিখছি, তখন আরো অনেকে এগিয়ে এসেছেন। আশা করা যায়, একটা শক্তিশালী সত্য ন্যারেটিভ তৈরি হবে মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে। মিথ্যার দেওয়াল টোকা দিলেই ভেঙে যায়। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের আলো থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে শব্দের জারিজুরি দিয়ে। ইনশা আল্লাহ এভাবে আর বেশিদিন নয়।

সীরাতের দ্বিতীয় খণ্ডই শেষ খণ্ড। এই সীরাতের কাজ করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে -- আরো কতো কথাই তো বলার ছিল! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাই এমন। যতো জানবো, ততো ভালোবাসবো, আর যতো ভালোবাসবো, ততো বেশি জানতে ইচ্ছা করবে! কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তো আছেই।

দ্বিতীয় খণ্ড বের করতে অনেক দেরি হয়েছে কাঙ্ক্ষিত সময় থেকে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের জীবনকথাকে তুলে ধরার তৌফিক্ব দিয়েছেন। যারা যারা এই বইয়ের সাথে জড়িত, আল্লাহ্ যেন তাদের প্রত্যেককে কবুল করে নেন। এই বইয়ে যা কিছু ভুল তা আমাদের পক্ষ থেকে, আর কিছু সঠিক তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের ওপর।

জিম তানভীর
২৯ জুমাদা আল আওয়াল, ১৪৩৯।

# সূচিপত্র

# মদীনায় নতুন শত্রু

বদর যুদ্ধের পর মুনাফিকদের সাথে আরও একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হলো ইহুদি। মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ইহুদিরা একটা স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ ছিল।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের এই বিরোধ জাতিগত বিদ্বেষঘটিত কিছু নয়। এই বিরোধ 'আরব বনাম ইহুদি' বিরোধও নয়, বরং এই বিরোধ বিশ্বাসের বিরোধ, এই বিরোধ আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত বিরোধ। মুসলিম উম্মাহর একটা বড় অংশ শুরুতে জাতিগতভাবে ইহুদিই ছিল। মুসলিমরা একটি বিশ্বাসভিত্তিক জাতি। আরব, বাঙালি, ভারতীয়, আফ্রিকান বা ইউরোপিয়ান, জাতিপরিচয় (Ethnicity) যা-ই হোক -- যে কেউই মুসলিম হতে পারে, শুধু তাদের ঈমানের কালিমায় বিশ্বাস এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। ইহুদি ধর্মের (Judaism) অনুসারী হতে হলে ইহুদি জাতিরও সদস্য অর্থাৎ জাতিগতভাবেও ইহুদি (Ethnically Jewish) হতে হবে। আগে এমনটা ছিল না। একটা সময় ইহুদিধর্মও ছিল একটি বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম। ইহুদি জাতি না হয়েও একজন মানুষ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু এখন সেরকম নেই। এখন তারা তাদের ধর্মকে নিজস্ব জাতিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাই কেউ চাইলেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না, বরং তাকে জন্মগতভাবে ইহুদি জাতির হতে হবে।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে (Ethnic superioirity) মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। বংশ, গোত্র, জাতিপরিচয় বা রক্তের কারণে কারো ওপর মিছে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়, কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাকওয়ায়। নিছক বিরুদ্ধাচারিতা করাও উদ্দেশ্য নয়। তবে কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই ব্যক্ত করা জরুরি; তা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ বা ভাবধারার (Political Correctness) সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক। প্রচলিত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করা যাবে না

মদীনার সনদ ছিল মদীনার মুসলিম, অমুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী একটি সাংবিধানিক দলিল বা আইনি চুক্তিপত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতেন আর শুরু থেকে সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করে আসছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না। তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা বা ঘৃণাও পোষণ করতেন না। সত্যি বলতে, আহলে কিতাব হিসেবে মুশরিকদের চাইতে তাদেরকে বরং মুসলিমদের আপন

ভাবা হতো। অথচ তারাই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পা ফেলার প্রথম দিন থেকেই ইহুদিরা মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। পুরো ব্যাপারটি তারা সহজভাবে মানতে পারেনি। মদীনার দুই শীর্ষস্থানীয় ইহুদি নেতা-- হুয়াই ইবন আখতাব আর আবু ইয়াসির ইবন আখতাবের কথোপকথনে তাদের এ বিদ্বেষ সম্পর্কে আঁচ করা যায়। এ দু'জন ব্যক্তি ছিল যথাক্রমে রাসূলুল্লাহর স্ত্রী সাফিয়ার ﵂ বাবা ও চাচা। তাঁর মুখেই ঘটনাটি শোনা যাক।

'আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার সবচেয়ে আদরের, তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু আমর ইবন আউফদের গ্রাম কুবায় এলেন, আমার বাবা ও চাচা সকাল সকালই তাঁর কাছে চলে গেলেন। ফিরে এলেন সেই সূর্যাস্তের সময়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। কোনোরকমে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরলেন। সবসময়ের মতো সেদিনও আমি তাঁদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম। কিন্তু ওয়াল্লাহি! কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না! শুনতে পেলাম চাচা আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন,

- আচ্ছা, এই কি সেই রাসূল? (যার কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখিত আছে?)
- আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনিই সেই।
- আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? তাঁর বর্ণনা ও চরিত্র দেখে?
- হ্যাঁ, সেসব দেখেই তো বলছি।
- তাহলে, আপনি তাঁর সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে চান?
- আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে থাকবো, তাঁর শত্রু হয়ে থাকবো।'

সাফিয়ার (﵂) বাবা হুয়াই ইবন আখতাব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মাদই ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। কিন্তু জেনেশুনেও তাঁর অনুসারী না হয়ে সে শত্রুতার পথ বেছে নেয়। এর কারণ ছিল আরবদের প্রতি ইহুদিদের প্রচণ্ড হিংসা আর তীব্র বিদ্বেষ। তাদের আশা ছিল, শেষ রাসূল হবেন ইহুদি জাতির মধ্য থেকে। আরবদের মধ্য থেকে শেষ রাসূল এসেছেন, এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। এ ঘটনাই তাদের মধ্যে হিংসার জন্ম দেয়। আর এই হিংসা থেকে জন্ম নেয় কুফরি। এমন ভয়ঙ্কর সে কুফরি যে, তারা খোদ রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে। এটাই হলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের কুফরি; সত্য জেনেও তা অস্বীকার করা। কিছু মানুষ মনে করে ইসলাম সত্য নয়। তাদের কাছে এটা একটা বানোয়াট ধর্ম। তাই তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা খুব ভালো করেই জানে ইসলাম হচ্ছে সত্য দ্বীন। তা সত্ত্বেও তারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে। হুয়াই ইবন আখতাব ছিল তেমনই এক কাফির।

# ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম

## মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা

ইবনে ইসহাক বলেন, শাস ইবন ক্বাইস নামের এক বুড়ো ইহুদি ছিল। সে ছিল এক ইসলামবিদ্বেষী। তার অন্তর জুড়ে ছিল কুফরি। মুসলিমদের সে খুব বেশি ঘৃণা করতো। ইসলাম গ্রহণের আগে আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরকে ঘৃণা করতো। সে দেখলো রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের পর গোত্র দুটি বন্ধু হয়ে গেছে। তারা মিলেমিশে আছে; একসাথে এক মজলিসে বসে কথা বলছে। এই দৃশ্য তার সহ্য হলো না। সে বলে উঠলো,

*'এই জমিনে আজ আওস আর খাযরাজ এক হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন এই দেশে আমাদের কোনো জায়গা নেই। আমরা ইহুদিরা এই মদীনায় ততদিনই টিকে থাকবো, যতদিন আরবরা বিভক্ত থাকবে। আর যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন আমাদের বিপদ!'*

সে আওস খাযরাজের জমায়েতে বসে থাকা এক ইহুদি যুবককে ডেকে বললো, 'আওস-খাযরাজের কাছে যাও! স্মরণ করিয়ে দাও তাদের অতীত জীবনের হানাহানি, বু'আস আর অন্য সব যুদ্ধের কাহিনী! অতীতের চেতনা আর উসকানিমূলক কবিতাগুলো আবৃত্তি করে করে ক্ষেপিয়ে তোলো!'

কবিতা ছিল সেই যুগের মিডিয়া। সেই তরুণ সাফল্যের সাথেই কাজটি করলো। সে দুই দলের জাহিলিয়াতি যুগের ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলা আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তরুণও কবিতা আবৃত্তি চালিয়ে যেতে থাকে। পরিবেশ ক্রমেই আরও উত্তপ্ত হয়। এক সময় দুই দলের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। সবাই বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, একে অপরকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে থাকে। এমনকি যুদ্ধ করার স্থানও ঠিক করে ফেলে! যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কিছু অপ্রীতিকর শব্দ, কিছু জাহিলিয়াতি চেতনার বাণী--ব্যস এটুকুই। শান্তিময় পরিবেশকে নষ্ট করে অশান্ত আর অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। মুসলিমদের তাই শব্দচয়নের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা, শয়তান অসতর্ক কথাকে কেন্দ্র করে বিভেদ তৈরি করে।

> **"(হে নবী) আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা ইসরা, ১৭: ৫৩)**

আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধের কথা রাসূলুল্লাহর ﷺ কানে পৌঁছলে তিনি ছুটে

এলেন। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,

> *'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা কি আবার সেই জাহিলিয়াতের জীবনের ফেলে আসা শত্রুতাকে ফিরিয়ে আনতে চাও? অথচ আমি এখন তোমাদের মাঝে আছি! আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমান আর ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন। তোমরা কি ভুলে গেছ আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা যে অনুগ্রহের কারণে আজ তোমরা জাহিলিয়াত ও কুফরি থেকে মুক্তি পেয়েছ? যে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বীজ বপন করেছে?'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথা শুনে তারা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সবকিছু ভুলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করা আরম্ভ করল। একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। অথচ কিছুক্ষণ আগেও তারা যুদ্ধে লড়তে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

> "(হে নবী!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তাআলাই তার ওপর সাক্ষী। আপনি (আরও) বলুন, হে আহলে কিতাবরা, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো? (এভাবেই) তোমরা (আল্লাহর) পথকে বাঁকা করতে চাও অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই তো সাক্ষী; আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই সব (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (আগে) যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো), ঈমান আনার পরও এরা তোমাদের কাফির বানিয়ে দেবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৮-১০০)

আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে বলছেন, আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করার ফলাফল খুবই ভয়াবহ। এর পরিণতি কুফর। ইহুদিরা খুব ভালো করেই জানতো মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন সত্য নবী। তাদের কিতাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের কথা লেখা আছে। কিন্তু তবু তারা মুসলিমদের হিংসা করে। কারণ, আল্লাহ ইহুদিদের কাছে রাসূলুল্লাহকে প্রেরণ না করে আরবদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এটা তারা মানতে পারে না। তাই তারা চায় মুসলিমরা কুফরি করুক। তাদেরকে অনুসরণ করলে একটাই গন্তব্য, কুফরি। পেছনে ফেরার আর কোনো পথ নেই।

> "আর তোমরা কীভাবে কুফরি করো, যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তা ছাড়া (এ আয়াতে বাহক স্বয়ং) আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সোজা

পথে পরিচালিত হবে। হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ কোরো না।

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নিআমতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতঃপর (দুশ-দুশমনের শক্রতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তসীমায়, অতঃপর সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত। তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেও না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১০১-১০৫)

## দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-তামাশা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইহুদিদের আরও একটি অপকর্ম উল্লেখ করেন। সেটি হলো ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা (Blashphemy)। তারা রাসূলুল্লাহকে নিয়ে, মুসলিমদের নিয়ে এবং ইসলাম ও আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলত। এমন একটি ঘটনা ঘটে আবু বকর ও এক ইহুদি পণ্ডিত ফিনহাসের মাঝে। তাদের কথোপকথনের পর একটি আয়াত নাযিল হয়। ঘটনাটি ছিল এমন, আবু বকর সিদ্দিক ﵁ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন ফিনহাস টিটকিরি মেরে বলল, 'শোনো, তোমার রব তো গরিব। আমরা হলাম ধনী। যদি তোমাদের রব ধনীই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে দান-খয়রাত করতে বলেন কেন? এটিই প্রমাণ করে যে, তিনি অভাবী আর আমরা ধনী, আমাদেরকেই তাঁর প্রয়োজন।'

এই কথা শুনে আবু বকরের ﵁ মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হলো। তিনি ফিনহাসের মুখে ঘুষি মেরে বসলেন। ফিনহাসও কম যায় না। সে দৌড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে

আবু বকরের ﵁ নামে নালিশ করে দিলো। রাসূলুল্লাহ আবু বকরের ﵁ কাছে এই বিষয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। আবু বকর ﵁ রাসূলুল্লাহকে সব খুলে বললেন। ফিনহাস কী কটূক্তি করেছে তাও জানালেন। কিন্তু ফিনহাস একবাক্যে কটূক্তি করার কথা অস্বীকার করলো! তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

> "আল্লাহ তাআলা সেই (ইহুদি) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিল (হ্যাঁ), আল্লাহ তাআলা অবশ্যই গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী; তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসেবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরও লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো। এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তাঁর নিজ বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮১-১৮২)

ইহুদিরা নিয়মিত মুসলিমদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো, উপহাস করতো। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

> "অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। এ অবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮৬)

ইহুদিদের কাছ থেকে এমন আচরণ পাওয়াই স্বাভাবিক। তারা মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলবে, পত্র-পত্রিকায় ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করবে, মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে মিথ্যার বেসাতি সাজাবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের বলছেন যদি মুসলিমরা ধৈর্যশীল আর তাক্বওয়াবান হয়, তাহলে তাদের এসব মিথ্যাচার ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ সত্য টিকে থাকে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।

## রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বেয়াদবি

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অসম্মান করে কথা বলতো। একবার তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ফাজলামি করে বললো, 'আসসামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ'। কথাটি শুনতে 'আসসালামু আলাইকা' এর মতোই লাগে, কিন্তু তারা আসলে সালাম এর লামকে বাদ দিয়ে সালামের বদলে বললো সাম। যার অর্থ দাঁড়ায়, 'তোমার মৃত্যু হোক'। আইশা ﵂ এ কথা শুনে খুবই ক্ষেপে গেলেন। 'আসসামু আলাইকুম, বানরের

দল, শুকরের দল...' এই বলে তিনি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এভাবে বোলো না আইশা, আল্লাহ তাআলা নোংরা ভাষা পছন্দ করেন না।' তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

> "তুমি কি তাদের লক্ষ করো না, যাদের (আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কোনো) গোপন কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে অভিবাদন জানান না। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি সেজন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!" (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮: ৮)

ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, 'আচ্ছা, আমরা যে এত আজেবাজে কথা বলি এজন্যে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল নন।' আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হলো জাহান্নামের আগুন।

## ইহুদিরা ছিল মুনাফিক্বদের আধ্যাত্মিক গুরু

> "(মুনাফিক্বদের অবস্থা হচ্ছে) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করেছিলাম মাত্র!" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৪)

এখানে শয়তান বলতে বোঝানো হচ্ছে ইহুদিদেরকে। তাদের সাথেই মুনাফিক্বরা দেখা করতো।

> "যাদের কাছে হিদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের মন্দ কাজগুলো (ভালো লেবাস দিয়ে) শোভনীয় করে রাখে এবং তাদের জন্যে নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে। এটা এ জন্যেই (হয়েছে) যে, (মানুষের জন্যে) আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না -- এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তাআলা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ২৫-২৬)

*'কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের কথামতো চলবো'* -- এ কথাটি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের বলা কথা। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন যে, কাফির হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়ার দরকার নেই বা তাদের সাথে পুরোপুরি একমত হবার দরকার নেই। কিছু ব্যাপারে একমত হওয়াই কাফির হবার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। মুসলিমদের এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান হওয়া জরুরি।

> "(হে নবী) আপনি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন (ইহুদি জাতি); এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন; তারা যে কাজ করছে তা সত্যিই এক (জঘন্য) অপরাধের কাজ। তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে (নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, অতএব তাদের জন্যে (রয়েছে) এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮: ১৪-১৬)

## ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা

মদীনায় ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের আরেকটি কৌশল ছিল মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা। যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম মুসলিম হলেন, তারা তাঁকে মিথ্যুক, বিশ্বাসঘাতক বলে অপবাদ দিতে শুরু করে। শুধু যে আবদুল্লাহ ইবন সালামের মতো ইহুদিদের সাথে তারা এমন আচরণ করতো তা নয়, আরবদের সাথেও এমনটাই করতো।

মদীনার সনদ অনুসারে মুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক ও রাসূলুল্লাহর প্রতি অনুগত থাকার কথা থাকলেও ইহুদিরা কখনো সে কথার ধার ধারেনি। প্রথম দিন থেকেই তাদের পন্থা ছিল শত্রুতা আর ঝগড়া-বিবাদ। ইহুদিদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম মুসলিম ও ইহুদিদের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বদর যুদ্ধের পর তাদের কর্মকাণ্ড সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বনু কায়নুকাকে বলেন, 'ইহুদিদের বলছি, তোমরা সতর্ক হও! নয়তো আল্লাহ কুরাইশদের মতো করে তোমাদের শাস্তি দিবেন। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। তোমরা ঠিকই জানতে পারবে যে, আমি ওয়াহীপ্রাপ্ত একজন রাসূল। তোমরা তোমাদের কিতাবেই তার প্রমাণ পাবে এবং আল্লাহর সাথে তোমরা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ তাতেও এর প্রমাণ পাবে।'

প্রত্যুত্তরে শ্লেষভরে তারা বললো, 'মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো আমরা তোমাদের সাথে আছি? ভ্রান্তির মধ্যে থেকো না। যাদের তুমি হারিয়েছ, তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে

তেমন জ্ঞান নেই, তাই তুমি তাদের হারাতে পেরেছ। আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসলেই টের পাবে সত্যিকারের যোদ্ধা কাকে বলে!' এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বদরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন,

"(হে নবী) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে সেসব (বিদ্রোহী) কাফিরদের আপনি বলে দিন, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) কাছে জড়ো করা হবে;(আর জাহান্নাম) তা তো হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান! সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিল, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিল; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিল আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটা ছিল (অবিশ্বাসী) কাফিরদের, (এ সম্মুখসমরে) তারা তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাঁকে সাহায্য (ও বিজয়) দান করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২-১৩)

বদর যুদ্ধে সত্যের জয় হয়েছিল। যেকোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্য বদর একটি শিক্ষা। মুসলিমরা যে সত্যের ওপর আছে--বদর তার প্রমাণ। এ যুদ্ধের সময় ইহুদিরা চোখের সামনে দেখেছিল, কীভাবে আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু তবু তারা শত্রুতায় অটল থাকলো; ইসলামের সত্যতা উপলব্ধির সুযোগ পেয়েও তারা কাজে লাগালো না।

## বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান

ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা মদীনা সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। ক্রমাগত হুমকি-ধামকি, প্রকাশ্য শত্রুতা আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা। মুসলিমদের সাথে তাদের বিরোধ হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে একটি ঘটনা ঘটে:

বদর যুদ্ধের পর। একদিন এক মুসলিম মহিলা বাজারে গেলেন। মদীনায় অলংকারের ব্যবসা ছিল ইহুদিদের হাতে। সেই মুসলিম মহিলা অলংকার কেনা বা বেচার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। বাজারে এক দোকানের পাশে মেঝেতে বসলেন, ইহুদি দোকান মালিকের হাতে অলংকার দিলেন। সেখানে আরও কিছু ইহুদি লোক ছিল। তারা তাঁর মুখের পর্দা সরানোর জন্য পটাতে চাইলো। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। এর মধ্যে দোকানের মালিক চুপিচুপি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাপড়ের নিচ দিকটা পেরেক দিয়ে মাটির সাথে গেঁথে দিলো। মহিলা এসব খেয়াল করেননি। যখনই উঠে দাঁড়াতে গেলেন, পেরেকের টান খেয়ে তাঁর শরীর থেকে কাপড় সরে গেল। তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। একজন মুসলিম নারীকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে বাজারেরই এক মুসলিম পুরুষ প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তিনি ইহুদি

দোকানদারকে আক্রমণ করে মেরে ফেললেন। আর তার পরপরই ইহুদি মাস্তানগুলোও মুসলিম লোকটার ওপর চড়াও হলো। তাঁকে মারতে মারতে তারা মেরেই ফেললো। এর জের ধরে নিহত মুসলিম ব্যক্তির গোত্রের সাথে বনু কায়নুকার মারামারি বেঁধে গেল।

এই সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে প্রেরণ করা হলে তিনি মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে সেনাদল প্রস্তুত করে অভিযানে নামলেন। ঘটনাটি দ্বিতীয় হিজরী বছরের শাওয়াল মাসে। মদীনার অস্থায়ী গভর্নর ছিলেন আবু লুবাবাহ ইবন আল-মুনযির ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুর্গ আক্রমণ করে অবরোধ করলেন। তাদের জানিয়ে দিলেন, তাদের সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।

১৫ দিনের জন্য তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হলো। আর এই ইহুদিরা, যারা কিনা দু'দিন আগেও নিজেদের যুদ্ধ দক্ষতা নিয়ে আস্ফালন করছিল, তারা তখন দুর্গের মধ্যে ভয়ে কেঁপে অস্থির! উপায় না দেখে তারা আত্মসমর্পণ করতেও রাজি হয়ে গেল; কোনো প্রতিরোধ গড়লো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল মুনযির ইবন কুদামাহকে আদেশ দিলেন বনু কায়নুকার ইহুদিদের বেঁধে রাখতে।

ইহুদিদের বন্ধু, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই খুব কষ্ট পাচ্ছিল। ইহুদিদের এই করুণ পরাজয়ের দৃশ্য তাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। সে আল মুনযিরকে আদেশের স্বরেই বললো,

- ওদের ছেড়ে দাও!

- কী! ছেড়ে দেবো মানে? আল্লাহর রাসূল আদেশ করেছেন এদের বেঁধে রাখতে আর তুমি বলছো এদের ছেড়ে দিতে? যে এদেরকে বাঁধন খুলে দেবে, আমি তাকে হত্যা করবো।

আল মুনযিরের কড়া জবাব পেয়ে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বুঝতে পারলো এই মদীনা আর তার মদীনা নয়। এই মদীনা এখন আল্লাহর রাসূলের মদীনা, এখানে তার কথা চলে না। বাধ্য হয়ে সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেল। ইহুদিদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। বললো, 'আমার মিত্রদের প্রতি একটু সদয় হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাড়া দিলেন না। ইবন উবাই দ্বিতীয়বার একই কথা বললো, 'আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হোন, আপনার দোহাই লাগে!' রাসূলুল্লাহ পেছনে ফিরলেন, কিন্তু এবারও কোনো সাড়া দিলেন না। ইবন উবাই মরিয়া হয়ে উঠলো, সে রাসূলুল্লাহর ﷺ পকেটে আর বর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উপেক্ষা করতে না পারেন।

'ছাড়ো আমাকে!' রাসূলুল্লাহকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন। তিনি বললেন, 'তোমার ওপর অভিশাপ পড়ুক! আমাকে যেতে দাও!'

ইবনে উবাই তার হাতের মুষ্টি আরও শক্ত করে বললো, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হবেন না, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়ব না। তাদের মাঝে ৭০০ জন যোদ্ধা আমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, আর আপনি তাদের সবাইকে এক সকালে মেরে সাফ করতে চান? আমি তো আমার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত বোধ করছি!'

'ঠিক আছে, তবে তারা তোমারই থাকবে।' ইবন উবাইয়ের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন; হত্যা করলেন না। তবে মদীনা থেকে বের করার আদেশ দিলেন।

বনু ক্বায়নুক্বার লোকজন এ যাত্রায় জানে বেঁচে গেল। মদীনা থেকে বের হয়ে শামের (সিরিয়া) দিকে যাত্রা করল। যাত্রার তদারকিতে ছিলেন উবাদা ইবন সামিত ﷺ। মদীনা থেকে বেরোবার আগে তাদের কাছে থেকে যুদ্ধের গনিমত হিসেবে টাকা নেয়া হয়। এই টাকা মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

## বনু কায়নুকার অভিযান থেকে শিক্ষা

**প্রথমত, বিচক্ষণতা।** রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন উবাইর সাথে সরাসরি শত্রুতা এড়িয়ে গেছেন। বরং ধৈর্যের সাথে তাকে সামাল দিয়েছেন। নম্রতা দেখানোর কারণে সম্ভাবনা ছিল যে, সে সত্যিকারের মুসলিম হবে আর মদীনায় ঐক্য ফিরে আসবে, যদিও সেটা হয়নি। তবে সংঘাত এড়িয়ে লাভ হয়েছে এই যে, তার মুনাফিক্বী ধীরে ধীরে আপনিই প্রকাশ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে বেশিরভাগ লোকই তার আসল উদ্দেশ্য ধরতে পেরে তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

**দ্বিতীয়ত, মুসলিম নারীর সম্মান।** আল্লাহর রাসূল ﷺ পুরো একটি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন শুধু একজন মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষার্থে। মুসলিম নারীর অধিকার ও ইজ্জত রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রাসূলুল্লাহর ﷺ এই একটি সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়। আজকে মুসলিম বিশ্বে কত বোন কেঁদে চলেছেন, অথচ সাড়া দেওয়ার কেউ নেই। যেন দুনিয়া থেকে পুরুষ মানুষ উঠে গেছে। অথচ কথা ছিল, মুসলিম পুরুষ মাত্রই তার বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহও ﷺ আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন। পরবর্তী যমানার খলিফারাও সেই সুন্নাতেরই অনুসরণ করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মু'তাসিমের সময়ে এক মহিলাকে রোমান এক সৈনিক লাঞ্ছিত করেছিল। আল-মু'তাসিম সেই বোনের আর্তিতে সাড়া দিয়ে তৎকালীন সুপারপাওয়ার রোমানদের বিরুদ্ধে পুরো একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন।

**তৃতীয়ত, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা।** এ প্রসঙ্গে উবাদা ইবন সামিতের ﷺ ঘটনা উল্লেখ্য। রাসূলুল্লাহর সাহাবি উবাদা ইবন সামিত জাহিলিয়াতের সময় ইহুদিদের বন্ধু ছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি নিজ থেকে গিয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার আনুগত্য তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর মু'মিনদের প্রতি। আমি ঐসব

কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। যত যাই হোক, তাদেরকে আমি আর সমর্থন করবো না।' আবদুল্লাহ ইবন উবাই ঠিক সেই মুহূর্তে এসে উবাদাকে বললো, 'তুমি কী করে পারলে এই লোকগুলোকে ভুলে যেতে? এরা কি তোমাকে অমুক-অমুক সময়ে সাহায্য করেনি?' জবাবে উবাদা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

*'সেই দিন আর নেই আবদুল্লাহ, আমার অন্তর বদলে গেছে। ইসলাম আগের সকল বন্ধুত্বকে মুছে দিয়েছে। তুমি আজকে এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরে আছো, যা আগামীকাল ভুল হিসেবে জানবে।'*

বনু কায়নুকাকে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। তারা উবাদাকে তাদের অতীত জীবনের বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করে যেন তাদের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তিনি তাদের বলেন, 'না, একটা ঘণ্টাও বাড়ানো হবে না। যেদিন থেকে তোমরা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, সেদিন থেকে তোমরা আর আমার বন্ধু নও।'

ইবনে উবাই আর উবাদা -- দুটি মানুষ, দু'জনেই জাহিলিয়াতে ইহুদিদের বন্ধু ছিলেন, দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম পেয়ে উবাদা বদলে যান। আর ইবন উবাই যা ছিলো তাই রয়ে যায়। ইসলাম কিছু মানুষকে আপন করে, কিছু মানুষকে করে পর। জাহিলিয়াতে ইহুদিরা উবাদার বন্ধু হলেও ইসলাম গ্রহণের পর তারা উবাদার শত্রুতে পরিণত হয়। ইসলাম বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও মিত্রতার নতুন সংজ্ঞা শেখায়। এ ঘটনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

> "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদি-খ্রিস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (কখনো) এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তাআলা কখনো জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। অতপর যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের সাথে এই বলে মিলিত হচ্ছে যে, 'আমাদের আশংকা হচ্ছে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে।' পরে হয়তো আল্লাহ তাআলা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন কিংবা তার কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (তা দেখে এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিল, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৫১, ৫২)

দ্বিতীয় আয়াতে ইবন উবাইয়ের কথা বলা হয়েছে। সে আশঙ্কা করছিল, যদি তার মিত্র ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তাহলে সে বিপদে পড়বে। সে ধরেই নিয়েছিল ইহুদিদের সাথে থাকলেই সে নিরাপদে থাকবে। মুনাফিকরা সাধারণত কাফিরদের কাছেই আশ্রয় ও নিরাপত্তা খোঁজে, এটাই তাদের স্বভাব। আয়াতের বাকি অংশে

আল্লাহ্ বলেন তিনি মু'মিনদের বিজয় দেবেন। এর ফলে মু'মিনরা মুনাফিক্বদের প্রভু এবং প্রকৃত কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করবে।

> "(তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি ছিল সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ্ তাআলার নামে বড় বড় শপথ করতো (যে), তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে? (এই আচরণের ফলে) তাদের কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়ে গেল, অতপর তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে মানুষ, তোমরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মুরতাদ হয়ে) ফিরে আসে, (তাতে আল্লাহ্ তাআলার কোনো ক্ষতি নেই) তবে আল্লাহ তাআলা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না। (মূলত) এ (সাহসটুকু) হচ্ছে আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫: ৫৩, ৫৪)

মিডিয়া বা কাফিররা কী বলছে বিজয়ী দল কখনো তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ আযযা ওয়া জালকে সন্তুষ্ট রাখবে ততক্ষণ তা-ই যথেষ্ট।

## কথার যুদ্ধ, মিডিয়ার যুদ্ধ

মদীনায় কিছু লোক মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এরা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলতো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতো। এই লোকগুলো কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের সরাসরি শত্রু থেকেও ভয়ঙ্কর; এদেরকে রাসূলুল্লাহ ছেড়ে দেননি। শাইখ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল' কিতাবে এ প্রসঙ্গে বলেন:

*"মুহারাবাহ, অর্থাৎ, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দুই প্রকারে হতে পারে: অস্ত্রের যুদ্ধ এবং কথার যুদ্ধ। কথা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে পারে অস্ত্রের যুদ্ধ থেকেও ভয়ংকর। আমরা দেখেছি, যারা মুখের কথা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যা করেছেন, কিন্তু যারা কেবল অস্ত্র দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়েছে, তাদের কাউকে কাউকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর এই আইনটিকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।*

*কথা ও কাজ -- দুভাবেই ফিতনা বা অশান্তি ছড়াতে পারে। কিন্তু কথার ফিতনা, কাজের ফিতনা থেকেও বহুগুণ বেশি ভয়ংকর। আবার অন্যদিকে কথার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয়, তা কাজের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ থেকে অনেক গুণে বেশি। এটা*

*প্রমাণিত যে, আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে কথা দিয়ে যুদ্ধ করা অধিকতর নিকৃষ্ট অপরাধ। দ্বীনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যত প্রচেষ্টা আছে, সেগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে কার্যকরী।"*[1]

মদীনায় এরকম বেশ কিছু লোককে শায়েস্তা করা হয়, যারা আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আজেবাজে বকতো। একাধিক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো কা'ব ইবন আশরাফের ঘটনা।

## কা'ব ইবন আশরাফ: কাফির মিডিয়ার মুখপাত্র

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল কা'ব ইবন আল-আশরাফের গুপ্তহত্যা। কা'ব ছিল জাতিগতভাবে আরব। বনু নাযিরের এক ইহুদি মহিলাকে বিয়ে করে সে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। তার ধনদৌলতের কমতি ছিল না। একাধারে সে ভালো কবি আর বাকপটু। আরবরা তাকে বেশ সম্মান করতো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেইনে সে ছিল সবচেয়ে সরব। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ তৈরিতে তার ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ে শোকাহত কবি কা'ব ইবন আশরাফ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিল কবিতার ভাষা। সে বলে বেড়াতে থাকে, মহান কুরাইশদের এভাবে পরাজিত হওয়ার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো ছিল। কবিতার মাধ্যমে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলতো। মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সাথে সময় কাটাতো, তাদের দুঃখের সঙ্গী হতো, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো। মক্কায় বসেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সে বহু কবিতা লেখে। তার কবিতায় আরও এমন সব কথা থাকতো যা সহ্য করার মতো নয়। নাম উল্লেখ করে সে সাহাবিদের স্ত্রী ও তাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে নোংরা কবিতা লেখা শুরু করে।

মুসলিমদের কাছে নারীদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাদের একান্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। কা'ব ইবন আশরাফের মিডিয়া যুদ্ধের মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ প্রথমে বেছে নিলেন এই কাজের যোগ্য সাহাবি কবি হাসসান ইবন সাবিতকে ؓ। তিনি ছিলেন মুসলিমদের মাঝে সেরা কবি। হাসসান ইবন সাবিত এমন সব কবিতা লিখলেন যে মক্কার লোকেরা একে একে সবাই কা'ব ইবন আশরাফকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিল। তৎকালীন আরবে কবিতাই ছিল মিডিয়া। একটি তীক্ষ্ণ, সাহিত্যরসময় কবিতা মুহূর্তের মাঝে পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়তো; অনেকটা যেভাবে আজকাল কোনো একটি লেখা বা ছবি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়। কবিতা যেমন কাউকে সম্মান এনে দিত, তেমনি এই কবিতাই ছিল কারো ইজ্জতহানি করার মোক্ষম অস্ত্র।

---

[1] আস-সারিম আল মাসলুল ১/৩৯২ (শামেলা সংস্করণ)

আজকের দিনের মিডিয়াও সেরকম। মিডিয়া মানুষকে যা বলে তা-ই মানুষ বিশ্বাস করে। মিডিয়া চাইলে যে কাউকে হিরো বানাতে পারে, আবার যে কাউকে বানাতে পারে সন্ত্রাসী। আন্তর্জাতিক মিডিয়া গোটা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা প্রভাবিত করতে পারে, জনমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কা'ব ইবন আল-আশরাফও ঠিক একই কাজ করছিল, সে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি মিডিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সামরিক যুদ্ধের প্রভাবক হিসেবে কাজ করছিল।

মক্কা থেকে বিতাড়িত কা'ব মদীনায় ফিরে আসতে বাধ্য হলো। ফলে সে আবার মুসলিমদের হাতের নাগালের ভেতর চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষতি করেছে যে পাপিষ্ঠ, সেই কা'ব ইবন আল-আশরাফের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে এমন কে আছে?' এগিয়ে এলেন আনসারী সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ؓ।

- আল্লাহর রাসূল, আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি?

- হ্যাঁ, চাই।

- তাহলে আমাকে কিছু (মিথ্যা) কথা বলার অনুমতি দিন।

- ঠিক আছে, অনুমতি দেওয়া হলো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ একা একাই কাবের কাছে গেলেন। বললেন, 'দেখো, কষ্টের কথা আর তোমাকে কী বলবো, এই মুহাম্মাদ লোকটা আমাদের কাছে সাদাকা (দান) চায় অথচ আমাদের নিজেদের পেটেই ঠিকমতো দানাপানি পড়ে না। তোমার কাছে এসেছি কিছু ঋণের জন্য।' মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা এসব কথা বলে কা'ব ইবন আশরাফের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

কাব বললো, 'সবে তো শুরু। আল্লাহর কসম, ঐ লোক তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে!'

- 'হুম, তার শেষ আমি দেখে ছাড়বো। তবে যেহেতু তাকে মেনে চলছি, এখনই তার সঙ্গত্যাগ করা মনে হয় ঠিক হবে না। সে যাই হোক, আমি তোমার কাছে কিছু খাবার ধার চাই। এই ধরো, দু-এক ওয়াসাক হলেই চলবে।'

- ঠিক আছে, কিছু একটা বন্ধক রাখো আমার কাছে।

- কী চাও তুমি?

- তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখো।

- কী যে বলো তুমি! এটা কী করে হয়! তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ!

- আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখো।

- না না, সেটাই বা কীভাবে করি! এটা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। লোকে আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করবে। সামান্য কিছু খাবারের জন্য আমরা আমাদের সন্তানকে বন্ধক

দিয়েছি! তারচেয়ে বরং তোমার কাছে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখি।

- আচ্ছা ঠিক আছে, তা-ই করো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ﷺ অস্ত্র আনতে চলে গেলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায়, আরেকজন সাহাবি, কাবের দুধ ভাই আবু নাইলাও কাবের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, 'এই এক লোক মুহাম্মাদ! তার কারণে আজ আমাদের যত দুর্ভোগ! আরবরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে। আমাদের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবার-পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।'

কাব বললো, 'আল-আশরাফের ছেলে আমি। পরিস্থিতি যে এই পর্যায়ে গড়াবে তা কি আমি তোমাদের বলিনি?'

রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলে আবু নাইলা কাবের কাছে বিশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনিও কাবের সাথে কিছু অস্ত্রের বিনিময়ে খাবার কেনার চুক্তি করলেন। সেইসাথে আরও কিছু বন্ধুকে নিয়ে আসতে চাইলেন। বললেন যে তারাও অস্ত্র বন্ধক রেখে কিছু খাবার নিতে চায়। কা'ব রাজি হলো।

সেদিনের মতো তিনি চলে গেলেন। ফিরে এল পাঁচ জনের একটি দল। দিনটি ছিল ৩য় হিজরী, ১৪ রবিউল আউয়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁরদেরকে বাকী আল-গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাদের মিশন সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

আবু নাইলা কাবের বাসায় এসে তাকে ডাক দিলেন। কা'ব তখন মাত্র বিয়ে করেছে। তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রাতের অন্ধকারে আবু নাইলার ডাক শুনে ভয় পেয়ে গেল। স্বামীকে বললো, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

কাব বললো, 'আমার ভাই আবু নাইলা আমাকে ডাকছে।'

- তুমি যেও না! আমি এই ডাকে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি!

- আরে চিন্তা কোরো না, ও আমার ভাই আবু নাইলা! যার পৌরুষ আছে, সে বর্শার লড়াইয়ে সাড়া দিতেও ভয় করে না।

নতুন স্ত্রীর কাছে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করে কা'ব নিচে নেমে এল। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, 'এক কাজ করি, চলো আজুজ ঘাঁটির দিকে যাই।' কা'ব রাজি হলো। তারা তাকে তার দুর্গ থেকে সরিয়ে দূরে নিতে চাচ্ছিলেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে, আবু নাইলা অথবা মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা -- দুজনের একজন কাবের চুলে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ! তোমার শরীর থেকে কী সুন্দর ঘ্রাণ আসছে!' কা'ব বললো এই সুঘ্রাণ তার স্ত্রীর থেকে এসেছে।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমি কি তোমার এই সুঘ্রাণ নিতে পারি?'

'অবশ্যই পারো!' কা'ব বললো।

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা কাবের চুল ধরে সুঘ্রাণ নিলেন। দলের অন্য সদস্যদের তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, তিনি সংকেত দেওয়া মাত্র যেন তাঁরা একযোগে কাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা আবার গন্ধ শুঁকে দেখতে চাইলেন, কা'ব এবারও রাজি হলো। এইবার তিনি সুযোগমতো তার মাথা আঁকড়ে ধরলেন, অন্যদের ডেকে বললেন, 'আসো তোমরা!' বাকিরাও এগিয়ে এলেন আর তরবারি দিয়ে কাবকে কোপাতে লাগলেন। কিন্তু শরীরে বর্ম থাকায় হত্যা করতে পারলেন না। কা'ব চিৎকার করে উঠলো, সাথে সাথে দুর্গের আলো জ্বলে উঠলো। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ﷺ বুঝলেন সময় কম। একটা ছুরি বের করে কাবের তলপেটে সজোরে চালিয়ে দিলেন। কা'ব শেষ হয়ে গেল।

সবাই চলে এলেন। ধস্তাধস্তির সময় এলোপাতাড়ি তরবারি চালনার ফলে পাঁচ জনের একজন আহত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাঁকে কোলে করে মদীনায় নিয়ে আসতে হয়। মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছেই তাঁরা দেখা পেলেন রাসূলুল্লাহর। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশনের সাফল্য দেখে খুশিতে বললেন, 'এই মুখগুলো উজ্জ্বল হোক!' আর তাঁরাও বললেন, 'আপনার চেহারাও উজ্জ্বল হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে এসে আহত সাহাবির ক্ষতস্থানে হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগের মতো সুস্থ হয়ে গেলেন।[2]

## কা'ব ইবন আল-আশরাফের হত্যা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

১) সাহাবিদের নিবেদিত আত্মা। রাসূলুল্লাহর ﷺ যেকোনো আদেশ সাহাবিরা খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার দায়িত্ব নেওয়ার পর মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা দুশ্চিন্তায় তিন দিন কিছু খেতে পারেননি। এই খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ পৌঁছলে তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা, কী হয়েছে তোমার?' তিনি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো আপনাকে কথা দিয়েছি, কিন্তু জানি না সে কথা রাখতে পারবো কিনা।'

মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন এমনটা নয়। বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ দেওয়া মিশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। চিন্তায়, উদ্বেগে তিন দিনের জন্য তার খাওয়া-দাওয়াই বন্ধ হয়ে যায়। এটাই বলে দেয়, সাহাবিরা তাদের কাজের ব্যাপারে কতটা নিবেদিত ছিলেন। তারা

---

[2] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৩৮, ২৩৯; অধ্যায় বন্ধক, হাদীস ৩; অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ৮৪। কিতাবুল সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ১৪৬। সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ২৯২।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো আদেশকে হালকাভাবে নিতেন না। যদি কথা দিতেন, তবে সেটা করেই ছাড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শান্ত ও নির্ভার করতে বললেন, 'তুমি তোমার সাধ্যের সর্বোচ্চটা করো, ফলাফল আল্লাহর হাতে।' অর্থাৎ তুমি সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দাও, তাহলেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তোমার আমলকে কবুল করবেন। তোমার কাজের পরিণতির জন্য তুমি দায়ী থাকবে না, দায়ী থাকবে কেবল সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছো কিনা সে ব্যাপারে। এরপর ফলাফল যা হওয়ার সেটাই হবে।

ভালো কাজে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। যাই করি না কেন, যেনতেনভাবে না করে তা সুন্দর ও সুচারুরূপে করা চাই। এবং একই সাথে দরকার নিজেদের করা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। কথা না রাখা মুনাফিক্বের লক্ষণ।

**২) ঘটনার প্রতিক্রিয়া।** আবু দাউদের একটি বর্ণনা[3] অনুসারে, এই ঘটনার পর ইহুদি এবং মুশরিকরা খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বলে, 'গতকাল রাতে আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কা'বকে কেন হত্যা করা হয়েছে সে কথা উল্লেখ করেন। এরপর তাদের সাথে কৃত চুক্তি নবায়ন করেন বা তাদেরকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে নিয়ে আসতে বলেন যেখানে তারা এই ধরনের কাজ দ্বিতীয়বার না করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

**৩) হত্যার কারণ।** কাবকে কেন এবং কোন পন্থায় হত্যা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে শাইখ ইবন তাইমিয়্যার বিখ্যাত কিতাব আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিম আর-রাসূল। সেখানে আল-ওয়াকীদির একটি বর্ণনা এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে,

*'পরদিন সকালে ইহুদিরা মুশরিকদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, আমাদের নেতাকে গত রাতে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি সে কোনো অপরাধ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, যদি সে অন্যদের মতো চুপ থাকতো, তাহলে তাকে হত্যা করা হতো না। কিন্তু সে আমাদের কষ্ট দিয়েছে, তার কবিতার মাধ্যমে আমাদের ব্যঙ্গ করেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একই রকম কাজ করে, তাহলে তরবারি দিয়েই আমরা তার সাথে বোঝাপড়া করবো।'*[4]

অর্থাৎ, ইহুদি ও মুশরিকদের অভিযোগ ছিল, কেন রাতের আঁধারে হামলা চালিয়ে অতর্কিতে কা'বকে হত্যা করা হয়েছে। তারা এই হত্যাকাণ্ডকে চুক্তিবিরোধী এবং বিচারবহির্ভূত হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাইছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের বলেন, কা'বের মতো অনেকেই আছে যাদের অন্তরে ইসলামবিদ্বেষ আছে। কিন্তু কেবল

---

[3] আবু দাউদ, অধ্যায় কর, খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে, হাদীস ৭৩।

[4] আস-সারিম আল-মাসলুল, পৃষ্ঠা ১৫২

কা'বকেই হত্যা করা হয়েছে কারণ সে কথার মাধ্যমে মুসলিমদের কষ্ট দিয়েছে এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছে।

কেন কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, সে আলোচনায় শাইখ ইবন তাইমিয়্যা মন্তব্য করেন,

*'কা'বকে হত্যা করা হয়েছে তার কবিতার জন্য, যা সে মক্কায় যাওয়ার আগেই লিখেছিল... কা'ব যা (অপকর্ম) করেছে সেগুলো করেছে জবান দিয়ে। কাফিরদের মৃত্যুতে তার রচিত শোকগাঁথা, (মুসলিমদের সাথে) যুদ্ধে (কুরাইশদের) উৎসাহ দেওয়া, তার অভিশাপবাণী, মানহানিকর কথাবার্তা, দ্বীন ইসলামকে ছোট করা এবং কাফিরদের দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়া -- সবকিছুই সে করেছে জবান দ্বারা। সে মুসলিমদের সাথে শারীরিকভাবে যুদ্ধ করেনি, বরং সে মুসলিমদের ক্ষতি করেছে তার জবান দিয়ে। এটা তাদের জন্য প্রমাণ, যারা (কা'বকে কেন হত্যা করা হয়েছে) এই বিষয়ে তর্ক করে। আর এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কবিতা এবং সম্মানহানির মাধ্যমে কষ্ট দেবে, তার জান-মালের কোনো নিরাপত্তা থাকে না।'*[5]

৪) সামরিক অপারেশনে ধোঁকা দেওয়ার বৈধতা। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার কাছে মনে হয়েছিল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শত্রুর আস্থাভাজন হতে পারলে এই অপারেশনটি সফলভাবে করা যাবে। তাই তিনি মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সেটার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ যদি তার এ মিশন সফল করার জন্য কুফরি করার অনুমতি পান, তাহলে একজন মুসলিম এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ন্যূনপক্ষে কুফরি থেকে ছোট কাজ করার অনুমতি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শত্রুবাহিনীর মধ্যে একজন মুসলিমকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে আলিমরা বলেছেন যে, সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়বে এবং বসে পড়তে না পারলে আঙুলের ইশারায় নামায পড়বে। সেটাও সম্ভব না হলে চোখের ইশারায় নামায পড়বে। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ নবীজি ﷺ সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। সাধারণ অবস্থায় এটা ভয়াবহ কুফরি। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে সেটা অনুমোদিত ছিল। অর্থাৎ, সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

৫) ইহুদিদের সাথে শত্রুতা জাতিগত কারণে নয়। ধর্মবিশ্বাসে কা'ব ইহুদি হলেও জাতিগতভাবে ছিল আরব। এটিই প্রমাণ করে, ইহুদিদের প্রতি মুসলিমদের যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তা জাতিগত কারণে নয়। হিটলারের আদর্শ ছিল জাতীয়তাকেন্দ্রিক। সে ভাবতো, ইহুদি জাতি থেকে জার্মান জাতি উত্তম। আমরা সেরকমটা মনে করি না। জাতিপরিচয় নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের আপত্তি মনমানসিকতা নিয়ে। ইহুদিরা তাদের হীন মনমানসিকতার জন্যই মুহাম্মাদ ﷺ

---

[5] আস সারিম আল মাসলুল, ১/৮৪ (শামেলা সংস্করণ)।

এবং মুসলিমদের নামে কটূক্তি করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ধোঁকা দেয়। তাদের পরিচয় নয়, বরং তাদের কাজই তাদেরকে মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

৬) সব যুদ্ধ ময়দানে হয় না। অনেক সময় গুপ্তহত্যার মাধ্যমে আল্লাহর দুশমনদের অনেক বেশি ক্ষতি করা সম্ভব। কা'ব ইবন আল-আশরাফের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তাকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, ইসলামবিদ্বেষীদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডার জবাব কেবল মিডিয়া দিয়েই দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসসান ইবন সাবিতকে দিয়ে যেমন কা'ব ইবন আশরাফকে মিডিয়ার ময়দানে মোকাবেলা করেছেন, তেমনি তিনি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহকে পাঠিয়েছেন তাকে হত্যা করার জন্য। আল্লাহর রাসূলকে গালি দেওয়া কুফরি, আর এই কাজের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

# বদর এবং উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক কর্মকাণ্ড

## ১) গাযওয়াহ আল কুদর

বদর যুদ্ধের মাত্র সাত দিন পরেই এই অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে যে, বনু সালিম গোত্র মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আকস্মিকভাবে তাদেরকে আগেভাগে আক্রমণ করে বসেন। এ অভিযানে তেমন কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বনু সালিম গোত্র পাঁচশো উট রেখে পালিয়ে যায়। উটগুলো মুসলিমদের মাঝে গনিমত হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের ভাগে দুটো করে উট পড়ে।

## ২) গাযওয়াহ আস-সাউয়ীক

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার লজ্জা মোচন করতে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের কাছে যায়। বনু নাযির গোত্রের প্রধান সাল্লাম ইবন মিশকামের বাসাতেই মেহমান হিসেবে ওঠে। মদীনার উপকণ্ঠে কীভাবে আকস্মিক আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়। ইহুদিদের কাছ থেকে কুরাইশরা অনেক মূল্যবান তথ্য লাভ করে। আবু সুফিয়ান ঠিক করলো, আকস্মিক আক্রমণ করে মুসলিমদের ভড়কে দেবে। সে কিছু সৈন্য নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উরাইদ নামের এক স্থানে অতর্কিতে আক্রমণ করে দুইজন মুসলিমকে হত্যা করে। এরপর একটা খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইশো সৈন্য নিয়ে তাদের তাড়া করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার সৈন্যসমেত পালিয়ে যায়। পালাবার সময় নিজেদের খাবার ফেলে চলে যায়। তবে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

## ৩) গাযওয়াহ যি আমর

রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিভাগ এবারও খবর পেয়ে যায় সালাবা এবং মুহারিব -- এ

দুটি গোত্র মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তিনি সাড়ে চারশো মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে গোত্র দুটোর দিকে অগ্রসর হন। পথে হুবার নামে শত্রুপক্ষের এক লোককে গ্রেফতার করা হলো। তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলে সে মুসলিম হয়ে যায়। ওদিকে রাসূলুল্লাহর সেনাবাহিনী আসছে খবর পেয়ে গোত্র দুটো আশেপাশের পাহাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়দেরকে দাপট দেখানো আর বেদুইনদের সন্ত্রস্ত করে রাখা।

এ অভিযানে একটি মজার ঘটনা ঘটে, একটি মু'জিযা। যখন মুসলিমরা সেখানে পৌঁছালো, তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাপড় ভিজে চুপসে একাকার। তিনি বর্ম খুলে গায়ের কাপড় একটা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে কাপড় শুকানোর অপেক্ষায় গাছের নিচেই শুয়ে পড়লেন। কখন যেন চোখ লেগে গেল। এমন সময় শত্রুপক্ষের মুহারিব গোত্রপ্রধান দাসুর ইবন আল-হারিস চুপিচুপি সেখানে চলে এল, হাতে খোলা তরবারি! রাসূলুল্লাহর ওপর দাঁড়িয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে মুহাম্মাদ! কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অকস্মাৎ আক্রমণে একটুও না ভড়কে আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ আমায় রক্ষা করবেন ।' আর এ কথা বলার সাথে সাথে দাসুরের হাত থেকে তার তরবারি পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিটি কুড়িয়ে নিয়ে দাসুরের সামনে দাঁড়ালেন, 'দাসুর! তোমাকে এখন কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?'

মুহূর্তের মাঝে দৃশ্যপট বদলে গেল। দাসুর ভড়কে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে থাকে, আল্লাহর রাসূলও তাকে মাফ করে দিলেন। দাসুর এরপর মুসলিম হয়ে যায়। এই কাহিনী গিয়ে তার গোত্রকে শোনায়, 'জানো কী হয়েছে? এক ইয়া লম্বা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো আর আমার বুকে ধাক্কা দিল।'

এই লম্বা লোকটি ছিলেন আসলে জিবরীল। ঘটনাটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মু'জিযা। দাসুর তার গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিলে অনেকেই মুসলিম হয়ে যায়।

### ৪) সারিয়াহ আল কারদাহ

ক্রমাগত সামরিক অভিযানের মুখে কুরাইশরা আর্থিক সংকটে পড়ে যায়। এছাড়া মক্কা থেকে সিরিয়াগামী যে বাণিজ্যপথ ছিল তাও হুমকির মুখে। হন্যে হয়ে কুরাইশরা ভিন্ন একটি পথে তাদের ব্যবসায়িক পণ্য বহনের চিন্তা করে। নজদ হয়ে এরপর সিরিয়া প্রবেশের একটি পথ বেছে নেওয়া হয়, যদিও সেটাও ছিল বেশ খরচসাপেক্ষ। তাদের এই নতুন পথে হানা দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদ ইবন হারিসের নেতৃত্বে একশো মুসলিম বিশিষ্ট সারিয়া প্রেরণ করেন। তাঁরা সফলভাবে কুরাইশ কাফেলা আক্রমণ করেন। কাফেলার প্রহরীরা পালিয়ে যায় আর মুসলিমরা কাফেলা দখল করে নেয়।

## সামরিক অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য

#১ এই অভিযানগুলো মুসলিমদের জন্য নিছক সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না। বরং অন্যান্য ইবাদতগুলোর মতোই জিহাদ করাও একটি ইবাদত। আবার যখন জিহাদ করা ফরয হয়, তখন এর প্রশিক্ষণ নেওয়াও ফরয। এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর ইবাদতও করছিলেন।

#২ এই যুদ্ধগুলো চলাকালীন সময়ে সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতে পারতেন। তাঁর সাথে ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাফেরা করতে করতে রাসূলুল্লাহর ﷺ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কতরকম পরিচয় যে সাহাবিদের সামনে ফুটে উঠতো তার ইয়ত্তা নেই। ফলে সাহাবিরা অনেক কিছু শিখতেও পারতেন। এভাবেই আমরা বহু সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

#৩ এই অভিযানগুলো মুসলিমদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকতে শেখায়। দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হলে আনুগত্য, নিয়ম মেনে চলা, আত্মত্যাগের মতো গুণ থাকা চাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দীর্ঘ সময় থাকতে থাকতে সাহাবিরা এই কঠিন গুণগুলো আত্মস্থ করতে শিখেছিলেন। উম্মাহর সক্রিয় অংশ হিসাবে কীভাবে বাস করা যায় তার জন্য এটি ছিল একটি শিক্ষা। এই শিক্ষা খুব জরুরি। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, এটি সামষ্টিক ধর্ম। ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই সমষ্টিগতভাবে পালন করা হয় যেমন সালাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি।

#৪ এই অভিযানগুলোতে শত্রুরা পালিয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রুর ঘাঁটিতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন। এই অবস্থানকে আধুনিক যুগের 'সামরিক মহড়া'র সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে মুসলিম সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সতর্ক করে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

## সাহাবিদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করেন। যেমন তিনি উমারের رضي الله عنه মেয়ে হাফসাকে رضي الله عنها বিয়ে করেন। হাফসার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর উমার رضي الله عنه গেলেন উসমানের رضي الله عنه কাছে, নিজেই মেয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। উসমান ফিরিয়ে দিলে এরপর গেলেন আবু বকরের رضي الله عنه কাছে, আবু বকর কিছুই বললেন না। এর কিছুদিন পর আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই প্রস্তাব পাঠিয়ে হাফসাকে বিয়ে করে নেন। হাফসা এভাবে হয়ে গেলেন উম্মুল মু'মিনীনদের একজন।[6] এখানে দেখার মতো বিষয়, সাহাবিদের উদারচেতা আচরণ।

---

[6] আন-নাসাঈ, অধ্যায় বিবাহ, হাদীস ৫৩।

যোগ্য পাত্র পেলে তাঁরা নিজেরাই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনোরকম অহম বোধ বা অযথা সংকোচ কাজ করতো না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মেয়ে ফাতিমার ﷺ বিয়ে দেন আলীর ﷺ সাথে। আলী তখন যুবক, হাতে তাঁর অর্থকড়ি নেই বললেই চলে। এদিকে ফাতিমার ﷺ বিয়ের বয়স। আলী তাঁকে বিয়ে করতে চান, রাসূলুল্লাহর কাছেও আসেন। কিন্তু লজ্জায় বিয়ের কথা তুলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিজ থেকেই জানতে চাইলেন আলী কি ফাতিমাকে বিয়ে করতে চান কিনা। আলী বললেন,

- হ্যাঁ চাই, কিন্তু মোহরানা আদায় করার মতো কিছুই আমার নেই।
- তোমরা একটা বর্ম আছে না? ওতেই চলবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন।

আলী সেই বর্ম দিয়েই মোহরানা আদায় করলেন। বিয়ে হয়ে গেল আলী আর ফাতিমার। মদীনার নেতার মেয়ের বিয়ের মোহর হলো সামান্য একটি বর্ম। রাসূলুল্লাহ নিজে যেমন অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, তেমনি নিজ পরিবারকেও সাদামাটা জীবনে উৎসাহ দেন। আলী আর ফাতিমার সংসার ছিল সাদাসিধে সংসার। বিলাসিতা তাঁদের জীবনে কখনোই ছিল না।

# উহুদের যুদ্ধ

## প্রেক্ষাপট

### ১) ধর্মীয় বিরোধ

কুরাইশের লোকজন দ্বীন ইসলামের অগ্রগতি মেনে নিতে পারছিল না।

> "নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে যে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তাআলার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; (এদের জন্য তুমি ভেবো না)। এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরও ব্যয় করবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা) টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরি করেছে আখিরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩৬)

কাফিররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে তাদের সম্পদ খরচ করবে। ইমাম আশ-শাওকানি এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, 'এই কাফিররা রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধ করে, সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে, তার জন্য যত লাগে অর্থ খরচ করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা।'[7] বর্তমানকালেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহর দুশমনরা ব্যয় করছে লক্ষ লক্ষ ডলার, যেন আল্লাহর আউলিয়াদের হত্যা করতে পারে, তাদের পাকড়াও করতে পারে, ইসলামের সুনাম মিটিয়ে দিতে পারে। এ যুগের কাফিররাও কুরাইশদের চেয়ে ব্যতিক্রম নয়।

### ২) প্রতিশোধ

কুরাইশরা চাচ্ছিল বদর যুদ্ধের গ্লানি মুছে যাক। বদরে পরাজয় তাদের অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দেয়, তাই তারা প্রতিশোধের পথ খুঁজছিল।

### ৩) অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ

কুরাইশদের ওপর ক্রমাগত সামরিক হামলা তাদেরকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। কুরাইশরা ছিল আরব গোত্রগুলোর চোখে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের ব্যবহারের জন্য সিরিয়া ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক পথ বেদুইনরা উন্মুক্ত রেখেছিল। কিন্তু মুসলিমদের উত্থানের সাথে পরিস্থিতি ইতিমধ্যে অনেকটাই বদলে গেছে। কুরাইশরা ছিল কাবা ঘরের অভিভাবক। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর দ্বীনকে তারা পরিত্যাগ করেছে, তাই আল্লাহ তাদের

---

[7] তাফসির ফাতহুল কাদির, ৩/১৭৮।

জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে দিলেন। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথ অনিরাপদ হওয়ার কারণে মক্কা থেকে ইয়েমেন গিয়ে ব্যবসা করার ওপরও প্রভাব পড়ে। কারণ কুরাইশরা সিরিয়া থেকে কাঁচামাল কিনে তা ইয়েমেনে বিক্রি করতো, আবার ইয়েমেন থেকে কিনে সিরিয়াতে বিক্রি করতো। একটা বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়ার ফলে, সেই পথের ব্যবসা তো বটেই, অন্য পথের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কুরাইশদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ কেবল ময়দানের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং একই সাথে তা ছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ। কুরাইশদের শঙ্কা সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার একটি কথাতেই পরিষ্কার বোঝা যায়,

*'মুহাম্মাদ আর তার দলবল আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। বুঝতে পারছি না এখন কী করবো। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তারা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর সাথেও শান্তিচুক্তি বা মিত্রতা করে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সেখান থেকে হুমকি আসছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? কোথায় যাব? আমাদের ব্যবসা গ্রীষ্মে সিরিয়াগামী কাফেলা আর শীতে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়াগামী কাফেলার ওপর নির্ভরশীল। যদি সেই ব্যবসা বন্ধ করে নিজের দেশে বসে থাকি তাহলে জমানো মূলধন ভেঙে খেতে হবে। আর দেখতে দেখতেই সেটা শেষ হয়ে যাবে।'*

৪) রাজনৈতিক আধিপত্য পুনরুদ্ধার

আরব উপদ্বীপের সবাই কুরাইশদের সমীহের চোখে দেখত। কিন্তু মুসলিমদের উত্থান তাদের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। তাই আরেকটি যুদ্ধে মুসলিমদের হারানোর মাধ্যমে তারা এই আধিপত্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে পড়ে।

## কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

সময়টি ছিল হিজরী ৩য় বছর, শাওয়াল মাস। কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। তিন হাজার সৈন্যবিশিষ্ট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। এই বাহিনীতে পুরুষদের সাথে নারী, দাস, এমনকি প্রতিবেশী গোত্রগুলোও অংশ নেয়। আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইকরিমা ইবন আবু জাহলের মতো কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনেকেই তাদের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে আসে। নারীদের মূল ভূমিকা ছিল পুরুষদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা, বদরে পরাজয়ের তিক্ত ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে রাখা। এই যুদ্ধের অর্থায়ন করা হয় বদরের সময় আবু সুফিয়ানের হাতে রক্ষিত সেই বিশাল কাফেলার মালামাল বিক্রি করে। সেই কাফেলাকে কেন্দ্র করেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বলা হয়ে থাকে, এই কাফেলায় মক্কার প্রত্যেক পরিবার কিছু না কিছু বিনিয়োগ করেছিল।

রাসূলুল্লাহর গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সদা সক্রিয়। এবার আল-আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব رضي الله عنه মক্কায় বসে রাসূলুল্লাহর ﷺ হয়ে কাজ করছেন। তিনি নিয়মিত

রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কার তথ্য পাঠাতেন। মদীনায় চলে আসার জন্য তাঁর অন্তর অস্থির হয়ে ছিল। কিন্তু তিনি মক্কায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন, তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মক্কাতেই থাকতে বলেন। কুরাইশদের যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা রাসূলুল্লাহকে ﷺ মাত্র তিনদিনের মধ্যে বার্তা পাঠিয়ে জানাতে সক্ষম হন। সে সময়কার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে মাত্র তিনদিনে খবর দিতে পারাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। চিঠির ভাষ্য ছিল অনেকটা এমন,

*'কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে বিশাল সেনাবাহিনী জড়ো করেছে। আপনি আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের মোকাবেলা করুন। তাদের সেনাদলে আছে তিন হাজার সৈনিক, দু'শো ঘোড়া, বর্ম পরিহিত সাতশো যোদ্ধা এবং তিন হাজার উট। তারা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে।'*

চিঠিটি পড়ে শোনান উবাই ইবন কা'ব ؓ। তাঁকে খবরটি গোপন রাখার আদেশ করা হয়। আব্বাসের পাঠানো তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-হুবাব ইবন আল-মুনযিরকে কুরাইশ বাহিনীর মাঝে পাঠান। তিনিও মোটামুটি একই তথ্য নিয়ে ফিরে আসেন।

## রাসূলুল্লাহর ﷺ পাল্টা পরিকল্পনা

কুরাইশদের পরিকল্পনার কথা জানার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ মানুষের কাছে এসব খবর গোপন রাখেন। তিনি প্রথমে যান আনসারদের প্রধান সাদ ইবন রাবীর কাছে। কুরাইশদের মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁর মতামত জানতে চান। চলে যাওয়ার আগে সাদকে পুরো বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাবার পর, সাদ ইবন রাবীর স্ত্রী এসে জানতে চাইলো,

- আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলে গেলেন?
- সেটা তোমার না জানলেও চলবে, সাদ জবাব দিলেন।
- আমি কিন্তু সবই শুনে ফেলেছি!
- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

সাদ চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্ত্রীর সাথে খুব রাগ করলেন। রাসূলুল্লাহকে জানালেন যে তাঁর স্ত্রী তাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে, তিনি নিজে থেকে কিছু জানাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, বাদ দাও, তাকে ছেড়ে দাও।'

এখানে শিক্ষা হলো, গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব। গোপন কথা গোপনই থাকবে, কাউকে বলা যাবে না। নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও না। মুসলিমদের নিরাপত্তা

ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুতর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু সেসব সাহাবিদের সাথেই যোগাযোগ করতেন, যাদের বিষয়টি জানার প্রয়োজন আছে। এই নীতিটিকে বলা হয়ে 'দরকারের ভিত্তিতে জানা' (Need to know basis), শুধু সে-ই জানবে, যার জানা দরকার।

সা'দ ইবন রাবী তার স্ত্রীকে নিজ থেকে তাই কিছুই বলেননি। অথচ তিনি বলতে পারতেন, 'দেখেছো! আল্লাহর রাসূল ﷺ এসেছিলেন আমার কাছে পরামর্শের জন্য!' এমন নয় যে তাঁর স্ত্রীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বরং তাঁর স্ত্রীর জানার দরকার নেই বলেই তাকে কিছু বলেননি। বিশ্বাসই সবকিছু নয়, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই তথ্য আদান-প্রদান করা উচিত।

অনেকে মনে করে স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে সব কথা ভাগাভাগি করা উচিত, এ ধারণাটা ঠিক নয়। কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো কাছের মানুষদেরও বলতে হয় না। অনেক নারীর হয়তো কথাটা পছন্দ হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি আবেগী হয়। তাই তারা অনেকসময় পুরুষদের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে না। এর মানে এই নয় যে, এই ঘটনার ধুয়া তুলে পুরুষরা সবকিছুই স্ত্রীর কাছে গোপন রাখবে! যেগুলো জানার অধিকার একজন স্ত্রীর আছে, সেসব তাকে বলতে হবে। তবে বিশেষ করে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ সংক্রান্ত বা নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো গোপন রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের ডাকলেন, আলোচনা শুরু হলো। কীভাবে কী করা যায়। মূলত দুটি মত পাওয়া গেল।

এক পক্ষ বললো, আমাদের মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা উচিত। মদীনাকে আমরা দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করবো। এভাবে যুদ্ধ করলে নারী আর শিশুরাও ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়ার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ আর মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের প্রস্তাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রস্তাব করেছিলেন কৌশলগত কারণে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এই মতামত দিয়েছিল কেননা সে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে খুবই ভয় পাচ্ছিল।

অপরদিকে অধিকাংশের মতামত ছিল মদীনার বাইরে গিয়ে খোলা ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করা। মদীনার ভেতরে কাফিরবাহিনী ঢুকবে, ঢুকে মুসলিমদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করবে--তাদের মতে এটা খুবই লজ্জার বিষয়। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারাই মূলত এই মত দিচ্ছিল। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে তাদের কেবলই মনে হচ্ছিল যেন তারা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এবারের যুদ্ধে যেতে তারা উন্মুখ হয়ে ছিলেন! তাদের আশঙ্কা ছিল যে শত্রুরা হয়তো মদীনায় ঢোকার সাহসই করবে না। আর সেক্ষেত্রে যুদ্ধ যদি না হয় তাহলে তারা লড়বেন কার সাথে! তাদের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় মতটাই গ্রহণ করলেন।

সভা শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে গিয়ে বর্ম পরে ফিরে এলেন। সাহাবিদের তখন মনে হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ এত চাপাচাপি করা হয়নি। তখন তারা নিজেদের মধ্যেই তর্ক জুড়ে দিল, 'আল্লাহর রাসূল একটা মত দিলেন আর তোমরা ভিন্নমত দিচ্ছো! হামযা, তুমি যাও, এখনই গিয়ে তাঁকে বলো যে উনি যা ভালো মনে করবেন, আমরা সেটাই করতে রাজি আছি।'

হামযা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে সে কথা বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন 'যখন বর্ম পরে একজন নবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, তখন সে বর্ম খুলে ফেলা তাঁর জন্য সংগত নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে ফায়সালা করেন।' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাস্তবায়নের পালা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা যাবে না। যদি একজন রাসূল শুরা বা আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করবেন।

## নেতৃত্বের দুটো শিক্ষা

### ১) সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা

একজন নেতার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা উচিত নয়। তার যখন-তখন সিদ্ধান্ত বদল করা চলবে না। কারো কথা বা চাপাচাপিতে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীতে দোলাচলে পড়া কাম্য নয়। সে সকলের মতামত শুনবে, আলোচনা করবে এবং তারপর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটা যাবে না; সেটাই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে যদি কোনো নতুন তথ্য আসে, অথবা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। নতুবা আগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে কার্যকর থাকবে। নেতা যদি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তাহলে তার অধীনস্থরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা সৈনিকদের কাছে খুবই অপছন্দনীয় একটি বিষয়। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে এককেটা সিদ্ধান্তের ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নেতার জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যখনই কোনো নেতা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটা চূড়ান্ত হবে। লোকের কথায় চট করে তা পাল্টে ফেলা যাবে না।

### ২) মতপ্রদানের আবহ বিরাজ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে তাদের নিজস্ব মতামত দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতেন। ব্যাপারটা এমন হতো না যে, সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর সামনে নিজেদের মত দিতে ভয় পাচ্ছেন বা অস্বস্তি বোধ করছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন মিশুক প্রকৃতির, খোলা মনের মানুষ। যেসব বিষয়ে ওয়াহী নাযিল হয়নি, সেসব ব্যাপারে তিনি অন্যদের মত শুনতেন, ভালো মনে হলে গ্রহণ করতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন, যেহেতু তিনিই নেতা।

## ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা

উহুদ পাহাড়ের পাশে তাঁরা তাঁদের গন্তব্য স্থির করলেন। মদীনা থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত উহুদ একটি বিশাল পর্বত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যাত্রার সময় হিসেবে ইচ্ছে করেই বেছে নিলেন মধ্যরাত। এসময় ক্লান্ত কুরাইশ বাহিনীর ঘুমিয়ে থাকার কথা। মুসলিম সৈন্যবাহিনী যাত্রা শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কেউ কি এমন পথ দেখাতে পারবে যেটা দিয়ে গেলে শত্রুরা আমাদের গতিবিধি টের পাবে না?' আবু খাইতামা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এ কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁরা সাধারণের চলাচলের পথ ছেড়ে কৃষিজমির ওপর উঠলেন। রওনা হলেন মদীনার বাইরে উহুদ অভিমুখে।

পথিমধ্যে মিরবা ইবন ক্বাইযী নামের এক অন্ধ মুনাফিক্বের কৃষিজমি পড়ল। যখন তাঁরা খামারের কৃষিজমির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজমির ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়নি। মিরবা ক্ষেপে গেল, সে মুসলিম সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে কাদা ছুড়তে লাগলো। রাগে অন্ধ হয়ে বললো, 'তুমি যদি আল্লাহর রাসূলও হও, তাহলেও আমি তোমাকে আমার বাগানে প্রবেশ করার অনুমতি দেবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো পাত্তা দিলেন না। বাহিনী নিয়ে যেমন চলছিলেন চলতে লাগলেন। অন্ধ লোকটা এবার বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি পারতাম, তাহলে মুহাম্মাদ আমি শুধু তোমার মুখেই কাদা ছুঁড়ে মারতাম।' সাহাবিরা রেগে গেলেন, তাকে মেরে ফেলতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, এই অন্ধের অন্তর আর চোখ দুটোই অন্ধ', তাঁরা তাকে একা রেখে চলে গেলেন।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, ইসলামে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সামষ্টিক স্বার্থ প্রাধান্য পায়। উপরোক্ত ঘটনায় ক্ষতি হয়েছে একজনের, কিন্তু তার বিনিময়ে অন্য সকলে লাভবান হয়েছে। কাজেই, যখন প্রয়োজন হবে, তখন ব্যক্তির ওপর সমাজের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে।

## যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা: মুনাফিক্ব বনাম মু'মিন

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিল এক হাজার সেনা। তারা আশ-শাউত বাগানে পৌঁছার পর মাঝপথে এসে মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই হঠাৎ করেই তার তিনশো সেনা নিয়ে বেরিয়ে গেল। 'মুহাম্মাদ ছেলে-ছোকড়াদের কথা শুনে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এদের কথার কী কোনো দাম আছে! আর সে আমার মতামতকে দামই দিল না।' – এই খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে সে মদীনার পথ ধরলো।

ইবন উবাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা, তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন মু'মিন ও মুনাফিক্বদের পৃথক করে দিতে।

সাধারণ শান্তিময় পরিবেশে মু'মিন আর মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করা খুব কঠিন। যে কেউ মুনাফিক হতে পারে। হতে পারে মসজিদে বসে ইবাদত করা লোকটা একজন মুনাফিক। এমনকি একজন আলিম, হুজুর বা মুফতিও মুনাফিক হতে পারে। কিন্তু একটা জায়গায় মুনাফিকদের পরিচয় বের হয়ে যায়, তা হলো যুদ্ধের ময়দান।

> "তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তার ঈমানদার বান্দাদের সে অবস্থা ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতক্ষণ না তিনি সৎলোকদের অসৎ লোকদের থেকে আলাদা করে দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৭৯)

> "(উহুদের ময়দানে) দুদলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিল, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, এ (বিপর্যয়) দিয়ে আল্লাহ তাআলা (এ কথাটা) জেনে নিতে চান, কারা তাঁর ওপর (সঠিক অর্থে) ঈমান এনেছে। (এর মাধ্যমে) তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (এই চরম মুহূর্তে মুনাফিকী) করেছে। এ মুনাফিকদের যখন বলা হয়েছিল যে, (সবাই একসাথে) আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (অন্ততপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম আজ (সত্যিই) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। এ সময় তারা ঈমানের চাইতে কুফরিরই বেশি কাছাকাছি অবস্থান করছিল, এরা মুখে যা কিছু গোপন করে আল্লাহ তাআলা তা সম্যক অবগত আছেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬৬-১৬৭)

অর্থাৎ মুনাফিকদের পিছু হটার কারণ হলো জিহাদ। আরও দুটি গোত্র পিছু হটার উপক্রম করেছিল-- বনু সালিমা এবং বনু হারিসা গোত্র। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন।

> "(সেই নাজুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমাদের দুটো দল মনোবল হারাবার উপক্রম করলো, (তখন) আল্লাহ তাআলাই তাদের উভয় দলের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে) অভিভাবক ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২২)

এ দুই গোত্রের মনোবল হারিয়ে ফেলাটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। তাই আল্লাহ তাদের দৃঢ়পদ রাখলেন। তাদের মাঝে সংকল্প ফিরে এল। জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়। তারা এই আয়াতটাকে খুব পছন্দ করতেন, কারণ এখানে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছিলেন তাদের ওয়ালী।[৪]

---

[৪] সহীহ বুখারি, অধ্যায় কুরআনের তাফসীর, হাদীস ৮১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিছু ইহুদি তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিল। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'কাফিরদের কাছ থেকে আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ অল্পবয়সীদেরও সৈন্যদলে গ্রহণ করেননি, তাদের বেশ কয়েকজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। চোখের আন্দাজে বয়স দেখে কম মনে হলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কম বয়সী ছেলেপেলেরা তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখের আড়াল হয়ে ছিল যেন তিনি তাদের দেখতে না পান!

এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আছে। রাফী ইবন খাতীয নামে এক কমবয়সী ছেলে ছিল। তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সে বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ভালো তীর চালাতে পারি!' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ তাকে থাকার অনুমতি দিলেন। রাফীর কথা শুনে তার বন্ধু সামুরাহ তার পালক বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলো, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রাফাইকে অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেননি। অথচ কুস্তিতে তো আমি রাফীকে হারিয়ে দেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিযোগ শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা কুস্তি লড়ো!' সামুরা রাফীকে হারিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সামুরাহকেও বাহিনীতে নিয়ে নিলেন।

পুরো সীরাহ জুড়ে এমন কিছু উৎসাহী ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহাবিদের দেখা মেলে। ঘরে বসে থাকার সুযোগ পেলেও তাঁরা সেটা ছেড়ে ময়দানে নেমে এসেছেন ইসলামের জন্য কিছু করার আশায়। রাসূলুল্লাহও ﷺ তাদের উৎসাহের তারিফ করেছেন। বিশেষ দক্ষতা থাকায় কমবয়স্ক ছেলেদেরও তাঁর বাহিনীতে অংশ নিতে দিয়েছেন। তাঁরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

## সেনাদের উদ্দেশ্যে নবীজির ﷺ বক্তব্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূল সেনাবাহিনীকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন:

- আল মুহাজিরীন, তাদের পতাকা দেওয়া হয় মুসআব ইবন উমাইরকে ﵁।
- আল-আওস, তাদের পতাকা তুলে দেওয়া উসাইব ইবন খুযাইরের হাতে ﵁।
- এবং আল-খাযরাজ, আল-হুবাব ইবন মুনযির ﵁ তাদের হয়ে পতাকা বহন করেন।

যুদ্ধের আগে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একজন কমান্ডারের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে কমান্ডার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এমন তেজোদীপ্ত ঝাঁঝালো বক্তব্য দিয়েছেন যে সৈনিকরা প্রবল সাহসিকতায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হতে চেয়েছে। উহুদের প্রাক্কালেও এমন একটি ঘটনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি বক্তব্য রাখলেন,

*'ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে আমাকে যা আদেশ করেছেন, আমি তোমাদের তা-ই আদেশ করছি: আল্লাহর আনুগত্য করো। যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। তোমরা যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানো এবং ধৈর্য, দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সাথে নিজেদের প্রস্তুত করেছো, আজ তাদের জন্য পুরস্কার লুফে নেওয়ার সুযোগ! নিশ্চয়ই শত্রুর সাথে জিহাদ করা সহজ কাজ নয়, বরং কষ্টকরই বটে। খুব অল্প ক'জনই ধৈর্যের সাথে তা করতে পারে। তবে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁকে মেনে চলে। আর যারা তাঁকে মানে না, তাদের সাথে থাকে শয়তান। তাই ধৈর্যের সাথে জিহাদ করো আর খুঁজে ফেরো সেই প্রতিশ্রুতি (শাহাদাহ) যা আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন। আর আমি তোমাদের যা আদেশ করেছি, তোমরা তা অবশ্যই পালন করবে। কেননা, আমি তোমাদেরকে তা-ই করতে বলি, যা সঠিক। মনে রেখো, অনৈক্য, মতভেদ আর হতাশাই হলো দুর্বলতা আর শক্তিহীনতার কারণ। যারা এমন করে, আল্লাহ না তাদের ভালোবাসেন, আর না বিজয় দান করেন।'*

## যুদ্ধের আগের মুহূর্তগুলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালেন, যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। লক্ষ করলেন পেছনের দিক থেকে আক্রমণের একটি সম্ভাবনা আছে। সেখানে একটি ছোটখাটো পাহাড়। উহুদ পাহাড়ের ঠিক বরাবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে সেই আইনাইন পাহাড়ের ওপর অবস্থান নিতে বললেন। তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় দিকনির্দেশনা দিলেন, 'আমার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা এই পাহাড়েই অবস্থান করবে। যদি তোমরা দেখ শকুন এসে আমাদের মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে, তবু আমার ইশারা ছাড়া এক পা-ও নড়বে না। যদি দেখ শত্রুদের ওপর আমরা বিজয় লাভ করেছি, আর তাদেরকে পায়ের নিচে পিষে ফেলছি, তবুও আমার ইশারা ছাড়া তোমরা এখান থেকে সরবে না।'

দিনের আলোর মতো পরিষ্কার নির্দেশনা। যুদ্ধক্ষেত্রে জয় পরাজয় যা-ই হোক না কেন--তীরন্দাজরা তাদের অবস্থানেই থাকবে আর শত্রুপক্ষকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে দেখলে তীরবর্ষণ করবে। কেননা শত্রুরা অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পাশ থেকে কিংবা পেছন থেকে হামলা করে মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলে দিতে পারে।

## কুরাইশদের কূটচাল

যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশরা একটি কূট কৌশল অবলম্বন করলো। তারা মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলো। আবু সুফিয়ান আল-আনসারকে সংবাদ পাঠালো, 'দেখো, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমাদের বোঝাপড়া আমাদের ভাইদের সাথে। কাজেই তোমরা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

আনসাররা জবাব দিল,

*'এখন এ কথা বলছো! আরে, তোমরাই কি সেই কুরাইশ নও, যারা মাত্র কিছুদিন আগে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর আমাদেরকে চিঠি লিখে হুমকি দিয়েছিলে যে, যদি আমরা রাসূলুল্লাহকে তোমাদের হাতে তুলে না দিই, তাহলে তোমরা আমাদের হত্যা করবে, আমাদের মেয়েদেরকে দাসী বানাবে, আমাদের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেবে? আর এখন হঠাৎ বলছো আমাদের সাথে তোমাদের কোনো শত্রুতা নেই? এটা মিথ্যা, এসব তোমাদের ছলনা!'*

কুরাইশরা চেয়েছিল মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করতে, যাতে করে এক এক করে সবাইকে শেষ করতে পারে। আজকের দিনে কাফিররা যেমন করে বলে: মুসলিমদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, আমরা তো শুধু 'সন্ত্রাসী'দের দমন করছি। এটা আধুনিক সামরিক সংস্কৃতির একটি কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুর মধ্যে অনৈক্য তৈরি করা হয়। বলা যেতে পারে এটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের (Psychological Warfare) একটি অস্ত্র। কাফিররা এ কথা বলে উম্মাহর একটি অংশের কাছে বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন করে তাদের বন্ধু সাজতে চায় এবং যারা উম্মাহর পক্ষে লড়ছে তাদেরকে ভিলেন বানাতে চায়। বাস্তবতা হলো, প্রথমে তারা তথাকথিত 'সন্ত্রাসী'দের দমন করবে, আর এরপর বাদ বাকি উম্মাহর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। এরকম হওয়ার আগে মুসলিমদের এক হতে হবে।

কুরাইশরা আওস গোত্রের আবু আমরকে পাঠিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চালালো। সে আগে মদীনাতেই থাকতো। ইসলাম যখন মদীনায় আসে তখন সে মুসলিম হতে অস্বীকৃতি জানায় আর মদীনা ছেড়ে কুরাইশদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। আগে তার গোত্রের লোকেরা তাকে অনেক ভালবাসত, তাকে 'রাহিব' বা যাজক বলে ডাকতো। তাই কুরাইশদের সে বললো, 'আমি আমার লোকদের গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি করাবো।' আবু আমর খুব আত্মবিশ্বাসী। গোত্রের লোকজন তাকে অনেক ভালবাসতো, তার কথা মেনে নেবে-- এটাই তার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু ইসলাম যে মানুষের ভালো-লাগা, ভালোবাসা, আনুগত্য সবকিছু বদলে দিতে পারে সেটা আবু আমরের ধারণা ছিল না। তার গোত্রের কাছে এই বিদঘুটে প্রস্তাব নেওয়ামাত্র তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। সে কী বুঝলো কে জানে, বললো, 'নাহ, আমি চলে যাবার পর আমার লোকদের উপর শয়তান ভর করেছে।'

আসলে শয়তান না, আনসারদের অন্তরকে বদলে দিয়েছিল ইসলাম। এভাবে শত্রুদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ।

# শুরু হলো যুদ্ধ

মূল যুদ্ধের আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছিল আরবদের প্রথা। উহুদেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কুরাইশদের পতাকাবাহক তালহা ইবন উসমান মুসলিমদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'মুসলিমদের মধ্যে কে আছো আমার সাথে লড়বে? আসো, আসো, পারলে আমাকে দোজখে পাঠাও। নইলে নিজেই বেহেশতে জায়গা করে নাও!'

তার ঔদ্ধত্যভরা কথা শুনে আলী ﷺ শান্ত থাকতে পারলেন না। তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন। তরবারির এক কোপে তালহার শরীর থেকে তার পা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাকে সেভাবেই ফেলে রেখে চলে এলেন। তবে ভিন্ন বর্ণনায় এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আলী নয়, যুবায়ের ﷺ অংশ নিয়েছেন।

যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তরবারি হাতে নিয়ে সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

- কে আছে আমার হাত থেকে এই তরবারি নিতে চায়?

- আমি নেব! আমি! -- অনেক সাহাবি আগ্রহ দেখালেন।

- এই তরবারি নিতে চাইলে তার হক্ব আদায় করা চাই। কে আছে এই তরবারির হক্ব আদায়ের ক্ষমতা রাখে? রাসূলুল্লাহ শর্ত যোগ করলেন।

- কী এই তরবারির হক্ব? জানতে চাইলেন আবু দুজানা।

- এর হক্ব হচ্ছে এটা দিয়ে শত্রুকে এমনভাবে আঘাত হানবে হবে যেন এটা বেঁকে যায়!

শক্ত ধাতব তরবারি বাঁকিয়ে ফেলা যেনতেন কাজ নয়! সবাই যেন কিছুটা চুপসে গেল, কিন্তু এগিয়ে এলেন আবু দুজানা ﷺ, 'আমি এই তরবারির হক্ব আদায় করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'[9] রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারি আবু দুজানার হাতে তুলে দিলেন। আবু দুজানা তরবারি নিলেন, মাথায় বাঁধলেন একটি লাল পট্টি। আবু দুজানা যখনই যুদ্ধে যেতেন, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিতেন, এটা ছিল তাঁর যুদ্ধের সাজ। এরপর শত্রুদলের সামনে দাপটের সাথে হেঁটে বেড়াতেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে যেন শক্তি ঝরে পড়তো।

তাঁর এই বিশেষ হাঁটার ধরন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'এইভাবে দর্পভরে হাঁটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তবে এই পরিস্থিতির কথা ভিন্ন।', অর্থাৎ যুদ্ধের সময় শত্রুদের সামনে এভাবে হাঁটলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন। একজন মুসলিম কখনই দাম্ভিক হবে না, তার মাঝে নম্রতা আর বিনয় থাকবে। কিন্তু নম্রতা থাকা মানেই দুর্বলতা নয়। তাই শত্রুদের সামনে হাঁটাচলায় কোনো দুর্বলতা দেখানো যাবে না। রাসূলুল্লাহর হাঁটায় দৃঢ়তা ও শক্তির ছাপ প্রকাশ পেত। আলী ইবন আবি তালিবের ভাষায়, 'তিনি যখন হাঁটতেন, দেখে মনে হতো যেন পাহাড় বেয়ে নামছেন।'

---

[9] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১৮৩।
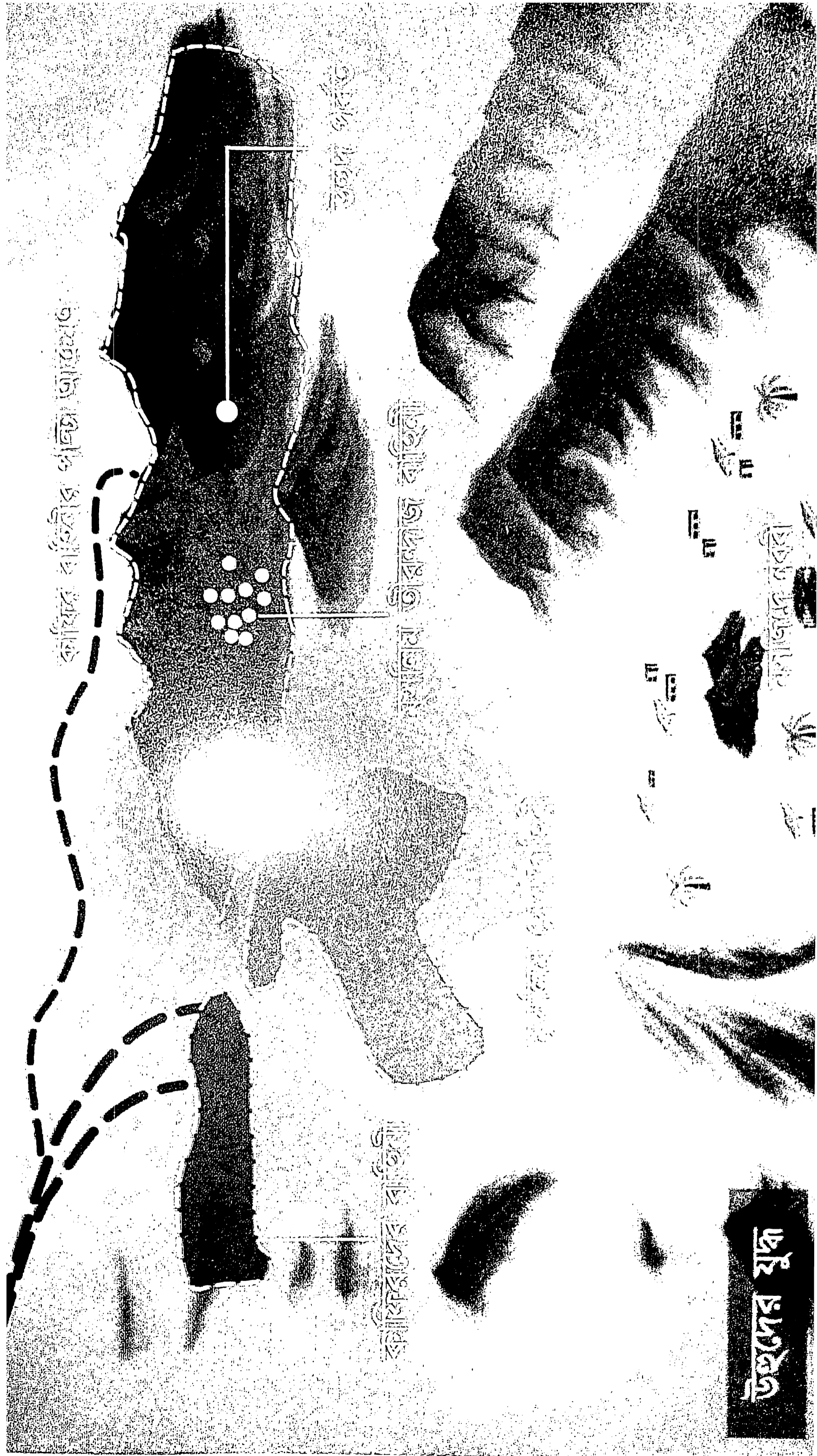
কাফির বাহিনীর পশ্চাৎ আক্রমণ
উহুদ পর্বত
মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী
কাফিরদের বাহিনী
মসজিদে নববী
উহুদের যুদ্ধ

# যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরাই ছিল এগিয়ে

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমদের আক্রমণের সামনে কুরাইশ বাহিনী দাঁড়াতেই পারেনি, বরং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিল। পড়িমড়ি করে তারা পালাতে থাকে, তাদের নারীদের পর্যন্ত পায়ের নূপুর দেখা যাচ্ছিলো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দকে দেখা গেল পালিয়ে পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিতে। কুরাইশদের বিপর্যয় এতটাই সাংঘাতিক ছিল যে তাদের নারীদের প্রতিরক্ষা দেওয়ার মতো কোনো পুরুষ অবশিষ্ট ছিল না। যে যেভাবে পেরেছে, নিজের জান নিয়ে পালিয়েছে।

তবু কুরাইশদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মরিয়া। সেদিন যে পরিবারের হাতে কুরাইশ বাহিনীর পতাকা ছিল তারা হলো বনু আব্দুদ দার। আবু সুফিয়ান তাদের আগেই বলে দিয়েছিল, 'দেখো, বদরের দিনেও তোমরা পতাকা বহন করেছ আর সেবার কী ঘটেছে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। যদি এই পতাকার মর্যাদা রাখতে না পারো, তবে এই দায়িত্ব ছেড়ে দাও।'

যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা মানে বিশাল কিছু! পতাকার জন্য সৈনিকরা লড়ে যায়, পতাকা তাদের সাহস যোগায়, পতাকা তাদের প্রেরণার উৎস। পতাকা সমুন্নত থাকার অর্থ যুদ্ধ এখনও জারি আছে, এখনও শেষ হয়ে যায়নি। যদি কোনো দলের পতাকা পড়ে যায়, তার প্রতীকি অর্থ দলটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধে বনু আব্দুদ দারের লোকেরা পতাকার সম্মান রক্ষার্থে বীরের মতো লড়ে যায়। একে একে সেই পরিবারের সাত জন লোক নিজের জান দিয়ে দেয়। প্রথমে একজন পতাকা ধরে, তাকে হত্যা করা হয়, এরপর দ্বিতীয় জন, তাকেও হত্যা করা হয়, এমনি করে সাত-সাত জন পতাকা ধরে রাখতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর তাদের এক আবিসিনিয়ান দাস পতাকা উঁচু করে ধরে। তার হাতে মারাত্মক আঘাত পাবার পরেও সে পতাকাটি কোনোরকমে তুলে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়, ঐ কঠিন মুহূর্তেও বলতে থাকে, 'আমি কি আমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছি?' তারপর পতাকা মাটিতে পড়ে যায়, আর তখনই কুরাইশরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে। কুরআনের পর্দায় উহুদের যুদ্ধের এই পর্যায়কে আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন,

> "আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাতে যুদ্ধের বর্ণনাকে ঠিক ধারাভাষ্যের ঢঙে বর্ণনা করা যায় না। কারণ ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা আকারে যুদ্ধের বর্ণনাগুলো এসেছে। উহুদের যুদ্ধে এমনই একটি ঘটনা হলো আবু দুজানার বীরত্ব।

উহুদের দিন যেন আবু দুজানার দিন! আবু দুজানা তরবারি নিয়ে সোজা মুশরিক বাহিনীর মাঝে ঢুকে গেলেন। তরবারি চালিয়ে তছনছ করে দিলেন শত্রুবাহিনীকে যতক্ষণ না তার তরবারি বেঁকে যায়। আয যুবাইর ইবন আউয়াম ﷺ সেদিনের 'হিরো' আবু দুজানার কাহিনী নিজ চোখে দেখলেন। তিনি বলেন,

*'আল্লাহর রাসূল যখন আমাকে তরবারি না দিয়ে আবু দুজানাকে দিলেন, আমি মনে মনে বেশ দুঃখ পেলাম। ভাবলাম, দেখে নেব আবু দুজানা কী এমন বীরত্ব দেখায়! কিন্তু উহুদের সেই দিনে আবু দুজানা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য! তাঁর সামনে যে-ই পড়ছে, সে-ই মারা পড়ছে। অপরদিকে কুরাইশদের মাঝেও ছিল তেমনি এক মুশরিক সৈনিক, সামনে যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করছে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেই মুশরিক যোদ্ধা আর আবু দুজানা -- দুজনেই দুজনের বেশ কাছাকাছি চলে এল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকলাম যেন তারা দুজন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, আর আল্লাহর ইচ্ছায় হলোও তা-ই! দুজন লড়াই শুরু করলো! দুজন একে অপরকে তরবারি দ্বারা আঘাত-পাল্টা আঘাত করছে। সেই মুশরিক আবু দুজানাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করতে গেলে আবু দুজানা ﷺ তৎক্ষণাৎ তাঁর ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু তরবারি আটকে গেল আবু দুজানার ঢালে, আর সেই সুযোগে আবু দুজানা তাকে তরবারি চালিয়ে হত্যা করলেন!'*

কাব ইবন মালিক ﷺ উহুদের একইরকম আরেকটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায়,

*'আমি এক মুশরিককে সেদিন দেখেছি সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলছিল, কোথায় আছিস ভেড়ার দল, জবাই হতে চাস বুঝি! এরপর দেখলাম আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা এক মুসলিম যোদ্ধা সেই মুশরিকের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে এগিয়ে এলেন। আমি মনে মনে দুজনের মধ্যে তুলনা করতে লাগলাম--সেই মুশরিক সৈনিক পোশাক, অস্ত্রসজ্জা সবদিক দিয়েই বেশি এগিয়ে। দুজন কখন মুখোমুখি হবে আমি সেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় ঠিকই তারা সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, আপাদমস্তক ঢাকা সেই মুসলিম যোদ্ধা তাঁর তরবারি দিয়ে মুশরিক যোদ্ধার কাঁধে এত জোরে আঘাত হানলেন যে, তরবারি তার শরীর চিরে পায়ের কাছে উরু পর্যন্ত চলে এল! এরপর সেই মুসলিম নিজের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন উপভোগ করলে কাব? আমি হচ্ছি আবু দুজানা!'*[10]

অর্থাৎ, তরবারির আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে তার পুরো দেহ ঘাড় থেকে উরু পর্যন্ত দুভাগ হয়ে যায়।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ, তাঁর চাচা হামযা ﷺ

---

[10] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩।

শহীদ হন। এই পর্যায়ে আরও শহীদ হন হানযালা ﷺ। উহুদের শহীদদের ঘটনায় এই দুজনের কাহিনী বর্ণনা করা হবে।

# হঠাৎ বিপর্যয়

মুসলিম বাহিনীর হামলায় কুরাইশরা বিপর্যস্ত হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যেতে থাকে। মুসলিম শিবিরে তখন বিজয়ের সুবাস। কিন্তু যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল কুরাইশরা আর প্রতিরোধ বা পাল্টা আক্রমণ গড়তে সক্ষম হবে না। আর সেটা ভেবেই একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন ক'জন সাহাবি।

সেই সাহাবিরা ছিলেন তীরন্দাজ বাহিনী। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়ের ওপর থাকতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তীরন্দাজ সাহাবিরা ﷺ দেখলেন মুসলিমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে, তখন তাঁদেরও ইচ্ছে হলো নিচে নেমে সবার সাথে এই কাজে যোগ দিতে। সম্ভবত যুদ্ধের উদ্দীপনায় তাঁরা আবেগী হয়ে পড়েছিলেন আর দায়িত্বকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আমীর আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ﷺ উত্তেজনায় গা ভাসাননি। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ ভুলে গেছো? তোমাদের কি মনে নেই যে তাঁর নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের নিচে যাওয়া ঠিক হবে না?' কিন্তু তাঁরা বললো, 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।' এই বলে পঞ্চাশ জনের মাঝে চল্লিশ জনই রাসূলুল্লাহর ﷺ স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে চলে যায়।

শত্রুদের ক্যাম্পে একজন তখনো যুদ্ধে অংশ নেন নেননি। তিনি হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। সেই যুদ্ধে তিনি ছিলেন কুরাইশদের অশ্ববাহিনীর প্রধান। মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া মাত্র, তিনি আর আবু জাহালের ছেলে ইকরিমা মুসলিম বাহিনীর দুর্বল অবস্থানটি লক্ষ করলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা এতটুকু দেরি করলেন না। তাঁরা তাঁদের একশো থেকে দেড়শো সৈন্যের অশ্ব বাহিনীকে আইনান পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে নিলেন আর আচমকাই মুসলিমদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসলেন। আচমকা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে। কুরাইশদের মূল সেনাদল এ দৃশ্য দেখে সাহস ফিরে পায়। তারা পালানো ফেলে এবার সামনের দিক থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা শুরু করে। দু'দিক থেকে হামলা আসায় মুসলিম বাহিনী তাল হারিয়ে ফেলে।

খালিদ ইবন ওয়ালিদ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে এমন দিক থেকে হামলা চালান যে মুসলিম বাহিনী কার্যত দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ছিল তাঁর বাম পাশে। এরা গনিমাহ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। আর ডান পাশে ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্যাম্প। আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম মুজাহিদদের সারি ভেঙে যায়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এটা ছিল একটা ছোটখাটো হত্যাযজ্ঞ। দিশেহারা হয়ে বন্ধু-শত্রুকে চিহ্নিত করতেও ভুল হয়ে যায়, নিজেরাই নিজের দলের লোককে মেরে ফেলে। এরকমই একটি আত্মঘাতী আক্রমণে মারা যান হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামানের ﷺ বাবা ইয়ামান ﷺ। ওদিকে মুশরিকরা

মুসলিম বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়ে সমানে হত্যা করতে থাকে।

কুরাইশদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করা। হামলার এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি চলে আসে। রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে তখন মাত্র নয়জন সাহাবি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তের একটি। তিনি কী করবেন এখন? নয়জন সাহাবিকে সাথে নিয়ে নিরাপদ দুরত্বে চলে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচাবেন? নাকি মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ডাক দেবেন? যদি তিনি নিজের জান বাঁচান, তাহলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ মুসলিমদের হত্যা করে শেষ করে ফেলবে। আর যদি তিনি ডাক দেন, তাহলে একটা প্রতিরোধ গড়ার সম্ভাবনা থাকলেও শত্রুরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর অবস্থান জেনে যাবে আর তাঁর ওপর হামলা চালাবে।

কী করবেন তিনি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও মুসলিমদের ময়দানে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি ডেকে উঠলেন, 'আল্লাহর বান্দারা! তোমরা এগিয়ে আসো!' আর যা হওয়ার তাই হলো, সেই ডাক শুনে ফেলে কুরাইশ বাহিনীও। কাফিরদের একটি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ অবস্থান আন্দাজ করে মুসলিমরা এগিয়ে আসার আগেই সেদিকে হামলা চালিয়ে বসলো ।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে এতটা অনিশ্চয়তাঘেরা, এতটা সংকটাচ্ছন্ন, এতটা বিপদগ্রস্ত মুহূর্ত আর কখনো আসেনি। তাইফের লোকেরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে তাড়া করেছিল, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। হিজরতের রাতে কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এতটা কাছাকাছি আর কখনো আসতে পারেনি। হিজরতের সময় সুরাকা ইবন মালিক রাসূলুল্লাহকে ﷺ বন্দী করতে চেয়েছিল। কিন্তু উহুদের ময়দানে কুরাইশরা মরিয়া হয়ে চাইছিল যেকোনো মূল্যে রাসূলুল্লাহকে ﷺ পুরোপুরি শেষ করে দিতে।

সেই প্রচেষ্টায় উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহর ﷺ গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারে। সেই ধাক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর ঠোঁট কেটে যায়। দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাতটিও হানে উতবা। এই আঘাতটি ছিল একটি তীরের আঘাত। রাসূলুল্লাহর ﷺ বর্মকে টার্গেট করে। এই আঘাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ দাঁত ভেঙে যায়। আর তৃতীয় আরেকটি আঘাত হানে ইবন কামিয়াহ। সে ঘোড়ায় চড়ে এসে তরবারি দিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে আঘাত করার চেষ্টা করে। তালহা তাঁর ঢাল দিয়ে সেই আঘাতকে রুখে দিতে চাইলেন, কিন্তু পুরোপুরি পারলেন না, রাসূলুল্লাহর ﷺ শিরস্ত্রাণে ইবন কামিয়ার তরবারি আঘাত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সাহাবিদের বাঁচানোর জন্য আহবান করেছিলেন, সেভাবে করে সাহাবিরা এবার নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে

এলেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচানোর জন্য। তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক ছত্রভঙ্গ মুসলিম শিবিরের কিছু অদম্য সাহাবিরা তখন কী করছিলেন।

## পাহাড়সম দৃঢ়তা!

কুরাইশদের অতর্কিত হামলায় মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা মুসআব ইবন উমায়েরকে ﷺ হত্যা করে । তারা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। মুসআবকে কাফিররা ঘিরে রেখেছে, আর মুসআব দেখলেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ কাফিররা ঘিরে রেখেছে। সংকটের সেই মুহূর্তে, বিপদের সেই ঘনঘটায়, মুসআব বলে উঠলেন,

'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তাঁর আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান, অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে কি পশ্চাদপসরণ করবে?'

এটাই তো ঈমান! মৃত্যুর আগ মুহূর্তে মুসআবের বলা এই কথাগুলো আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নাযিল করেছেন।

> "আর মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল! তাঁর আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৪৪)

মুসআব ইবন উমায়ের এই কথাগুলো বলার পর ইবন কামিয়াহ মুসআব ইবন উমায়েরকে হত্যা করে। মুসআব ছিলেন এই যুদ্ধের পতাকাবাহী। শত্রুরা তার ডান হাত কেটে ফেলে, তিনি বাম হাতে পতাকা জড়িয়ে ধরেন! শত্রুরা তার বাম হাতও কেটে ফেলে, এরপর দুই হাতের কাটা অংশ নিয়ে তিনি পতাকা জড়িয়ে ধরেন আর সেই অবস্থায় শহীদ হয়ে যান।

মুসআব ইবন উমায়েরের অবয়ব ছিল কিছুটা রাসূলুল্লাহর ﷺ মতো। মুসআবের মৃত্যুর পর হঠাৎ গুজব রটলো -- রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন! মুসলিমরা একটা বড় ধাক্কা খেল। কেন লড়ছেন তারা? কীসের জন্য লড়ছেন? কার জন্য লড়ছেন?

এই ধাক্কা সইতে না পেরে মুসলিমদের এক দল মনোবল হারিয়ে হাত থেকে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে মদীনার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ পালিয়ে উহুদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। কেউ ভাবলো যুদ্ধ করে কী হবে, তার চাইতে বরং আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে ফিরে যাই। সে একটা সন্ধি করে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক।

কিন্তু একদল মুসলিম ব্যতিক্রম। তাঁরা ছিলেন অপরাজেয়। তারা ছিলেন হার-না-মানা মানুষ। তাঁদের ছিল সামর্থ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর গুজবে তাঁরা এতটুকু দমলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন শহীদ হবার আশায়। এমনই একজন ছিলেন আনাস ইবন নযর ﷺ।

আনাস ইবন নযর অনেকদিন ধরেই বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি শুধু এতটুকুই বলেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আর একটা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেন তাহলে তিনি দেখবেন আমি কী করি!'[11] তিনি তাঁর কথা রাখলেন। উহুদের যুদ্ধে যখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, আজ তাঁর দিন! আজ তাঁর দেখানোর পালা! অস্ত্র রেখে পালিয়ে যাওয়া কিছু মুসলিমকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' তারা উত্তর দিল, 'মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়েছে।' তিনি বললেন, 'তোমরা জেনে রাখো, মুহাম্মাদ ﷺ যদি মারাও যান, তাঁর রবের মৃত্যু হয়নি। যে কারণে মুহাম্মাদ মারা গেছেন, তোমরাও সে কারণে মরে যাও!'

সাদ ইবন মুয়াজকে বললেন, 'সাদ! আমি তো উহুদের পাদদেশে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি!' এই বলে অদম্য আনাস ছুটে গেলেন ময়দানে। ঢুকে পড়লেন শত্রুদের মাঝে। দুর্দান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন প্রবল সাহসিকতার সাথে। তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করলেন, তরবারি চালিয়ে গেলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

যুদ্ধ শেষে একটি মৃতদেহ পড়ে ছিল ময়দানে। শরীরে ছিল আশিটি আঘাতের চিহ্ন, দেখে বোঝা যাচ্ছিল না এটা কার লাশ। এক মুসলিম নারী এলেন, লাশের শরীর দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না এত আঘাত পুরো দেহে। একটা আঙুল দেখে সনাক্ত করে বললেন, এটা তাঁর ভাই, আনাস ইবন নযরের লাশ। এই ছিলেন আনাস ইবন নযর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন,

> "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনোই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩)

এমন আরেক সাহাবি ছিলেন সাবিত ইবন দাহদাহ ﷺ। তিনি বলে উঠলেন, 'নবীজিকে ﷺ যদি হত্যা করা হয়েও থাকে, আল্লাহ তো জীবিত রয়েছেন! তিনি তো চিরঞ্জীব! কাজেই তোমরা দ্বীনের জন্য লড়ে যাও, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের বিজয় দেবেন!'

---

[11] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২২।

অপরাজেয় সাহাবিদের একজন ছিলেন আনসারী। তাঁর নাম আমরা জানি না। এক মুহাজির সাহাবির ভাষায়, 'আমরা এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাকে বললাম, তুমি কি জানো মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে? সে বললো, ঠিক আছে, যদি মুহাম্মাদকে হত্যা করে হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দ্বীন-প্রচারের মিশন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! সুতরাং তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও দ্বীনের জন্য। তাঁর মতো করেই মৃত্যুর স্বাদ নিই, ইসলামের জন্য লড়াই করে শহীদ হয়ে যাই।'

এই সাহাবিরা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছাকাছি যেতে সক্ষম হলেন। ইতিমধ্যে খবর এল, রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর খবরটি একটি গুজব। তখন মুসলিমরা আরও সাহস ফিরে পেলেন। মুসলিম বাহিনীর মাঝে শৃঙ্খলা ফিরে এল।

## রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে সাহসী সাহাবিরা

রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর যখন কাফিররা হামলা চালালো, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'যে আজ শত্রুদের রুখে দিতে পারবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে!' এই আহবান শুনে এগিয়ে গেলেন এক আনসার। শত্রুদের দিকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর এলেন আরও একজন আনসার, তিনিও শহীদ হলেন। এরপর আরও একজন, এভাবে সাত সাতজন আনসার সাহাবি রাসূলুল্লাহকে বাঁচাতে বীরের মতো লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

আল্লাহু আকবার! এ কারণেই তাঁরা "আনসার"। আনসার মানে সাহায্যকারী। আনসাররা তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করেছিলেন। এ মর্যাদাময় খেতাব তাঁরা কিনেছিলেন জান, মাল ও রক্তের বিনিময়ে। সাত-সাত জন আনসার যুবাপুরুষ এক এক করে রাসূলুল্লাহর ﷺ পায়ের কাছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচাতে এই ছিল তাঁদের আত্মত্যাগের নমুনা।

সাতজন সাহাবি শহীদ হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলেন আর মাত্র দু'জন -- তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ رضي الله عنه এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আঘাত করেছিল উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস। আর রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন তারই আপন ভাই সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه! তীরের পর তীর ছুঁড়তে থাকেন শত্রুদের লক্ষ্য করে। আলী ইবন আবি তালিব رضي الله عنه বলেন, 'আমি কখনো রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর বাবা-মা উভয়ের নামে শপথ করতে শুনিনি। একমাত্র সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে তিনি এমনটা বলেছিলেন। উহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল বলে ওঠেন, 'তীর ছোঁড়ো, সাদ! আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক!' সা'দ আল্লাহর রাসূলকে রক্ষা করেছিলেন আর সা'দকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন যা আবু বকর رضي الله عنه আর উমারও رضي الله عنه লাভ করেননি।

তালহা ইবন উবায়দুল্লার ﷺ। অসাধারণ বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তালহা তো জান্নাতের জন্য নিজেকে যোগ্য করে নিয়েছে!' তালহা সেদিন যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তা আর কোনো সাহাবি দেখাননি। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচাতে গিয়ে তরবারির আঘাতে তালহার কিছু আঙুল কাটা পড়ে। উহুদের সেই দিনে তালহা নিজের গায়ে অন্তত ৩৫টি আঘাত সয়ে নেন। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচানোর জন্য! তাঁর ডান হাত তীরের আঘাতে অবশ হয়ে যায় । তালহার সম্মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'যদি কেউ জমিনের বুকে কোনো জীবিত শহীদকে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে নেয়!'

আরেকজন বীরসেনা ছিলেন আনসারী সাহাবি আবু তালহা ﷺ। রাসূলুল্লাহর ﷺ একেবারে সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান আর সমানে তীর ছুঁড়তে থাকেন। নবীজি ﷺ নিজেকে আবু তালহার পেছনে আড়াল করে রাখেন। আবু তালহা একটি একটি করে তীর ছোঁড়েন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঁচু করে দেখেন সেই তীর কোথায় আঘাত হানে। আবু তালহা তখন বললেন,

*'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না! একটি তীরও আপনাকে আঘাত করতে পারবে না, আমার বুকচিরে তবেই আপনাকে স্পর্শ করবে। আমি হাজির আছি রাসূলুল্লাহ। শুধু আমাকে বলুন আপনার জন্য কী করতে হবে। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমন আমাকে আদেশ করুন!'*[12]

সেদিন রাসূলুল্লাহকে ﷺ রক্ষা করার জন্য তীর-ধনুক আর তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসেন এক মুসলিম নারী। নুসাইবাহ বিনতে কা'ব ﷺ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আবু দুজানা তাঁর পিঠকে ঢাল হিসেবে পেতে দেন।

আবু বকর এবং আবু উবাইদাও ﷺ সেদিন রাসূলুল্লাহকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করে যান। শেষপর্যন্ত ত্রিশজন সাহাবির একটি দল বেষ্টনীর মতো তৈরি করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে উহুদ পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হন। সেই দলে ছিলেন ক্বাতাদা, সাবিত, সাহল ইবন হুনাইফ, উমার ইবন আল খাত্তাব, আবদুর রাহমান ইবন আউফ, আয-যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম। আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হোন।

অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব অন্যদের সহযোগিতায় খালিদ ইবন ওয়ালিদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। মুসলিমরা পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নেন। পাহাড়ে চড়তে রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ﷺ তাঁকে বহন করে নিয়ে যান। আলী ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষতস্থানে পানি ঢেলে দেন, জখমগুলো পরিষ্কার করে দেন। কিন্তু পানি ঢালায় রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাচ্ছিল। তখন

---

[12] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ৩৭।

ফাতিমা এক টুকরো কয়লা নিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ছাইগুলো ক্ষতস্থানে ঢেলে দিলেন, ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর কয়লার উত্তাপে ক্ষতগুলো জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।

## যুদ্ধপরবর্তী বাকযুদ্ধ

যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ হলো। কুরাইশরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করতে সক্ষম হলেও মদীনা আক্রমণ করার মতো সামর্থ্য বা সাহস কোনোটাই তাদের ছিল না। তারা চেয়েছে এই ধরনের একটি হামলা চালিয়ে মুসলিমদের সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতি করতে। আর তাদের মূল বাহিনী যুদ্ধের প্রথমভাগে অনেকটাই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশরা তাই পাহাড়ে উঠে মুসলিমদের পিছু নেওয়ার সাহস পায়নি। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বাকি মুসলিমরা উহুদ পর্বতের ওপরে, আবু সুফিয়ান তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো,

'মুহাম্মাদ কি জীবিত?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সে এরপর জিজ্ঞেস করলো,

'আবু বকর বেঁচে আছে?'

এবারেও কেউ কোনো কথা বললো না।

'উমার বেঁচে আছে?'

কোনো সাড়া নেই। আবু সুফিয়ান জানতো আবু বকর আর উমার ﵄ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুই সহকারী। আবু সুফিয়ান খুশিতে আত্মহারা! সে তার লোকেদের বলতে লাগলো, 'সব কটা শেষ!'

উমার ﵁ আর সহ্য করতে পারলেন না, বলে উঠলেন, 'তুমি যাদের নাম নিয়েছো, তোমার জ্বালা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেই তিনজনই জীবিত আছেন।'

জবাবে আবু সুফিয়ান বলে, 'তোমাদের অনেকের মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। যদিও আমি এ কাজের আদেশ দেইনি। জেগে ওঠো হুবাল! তুমি জেগে ওঠো!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বলেন, 'তোমরা কি এ কথার জবাব দেবে না?'

'কী জবাব দেবো আমরা?' সাহাবিদের প্রশ্ন।

তিনি বললেন, 'বলো, আল্লাহ তারচেয়েও মহান এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ!'

আরবিতে এ কথাটির ছন্দ আবু সুফিয়ানের কথার সাথে মিলে যাচ্ছিলো। তখন আবু সুফিয়ান বলে ওঠে,

- আমাদের উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই!

- আল্লাহ্ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনো মাওলা নেই! -- মুসলিমরা জবাব দিল।

- বদরের প্রতিশোধ নিলাম আজ, এভাবেই যুদ্ধের বদলা হয়।

- না! সমান নয়! আমাদের নিহতরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতরা তো জাহান্নামে!

- সত্যি করে বলো তো উমার, মুহাম্মাদকে কি আমরা হত্যা করতে পেরেছি?

- নাহ! আল্লাহর কসম, তোমরা পারোনি! তিনি তোমাদের কথা ঠিকই শুনছেন।

- উমার, আমি তোমাকে ইবন কামিয়ার চাইতে বেশি বিশ্বাস করি।

এ কথা বলে কুরাইশরা পরের বছর আবার বদর প্রান্তে মুখোমুখি হবার চ্যালেঞ্জ জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দুই বাহিনী ফিরে গেল।

## কুরআনের চোখে উহুদের বিপর্যয়

> "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেইদিন, যেদিন দুদল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৫)

অর্থাৎ উহুদের দিনে মুসলিমদের পদস্খলনের কারণ হলো শয়তান। আল্লাহ্ উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক্বদের চেহারাও প্রকাশ করে দিলেন।

> "তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেকদল নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। তারা তাদের জাহেলী যুগের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে। (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে, এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে?
>
> (হে নবী, তাদের) বলুন, (এ ব্যাপারে আমারও কোনো ভূমিকা নেই) নিশ্চয়ই সব বিষয় আল্লাহর হাতে। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি (যুদ্ধের) এ কাজে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না।
>
> বলো, যদি তোমরা আজ ঘরের ভেতরও থাকতে, তবু নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল, তারা তাদের মরণের বিছানার দিকে বের হয়ে আসতো। আর এভাবেই মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ ঘটনার (মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা আছে

**তা পরিশুদ্ধ করেন। তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ জ্ঞাত।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)**

মুনাফিকরা বলে, যুদ্ধ করে বিপদ আর মৃত্যু ডেকে আনার কী দরকার? আল্লাহ আযযা ওয়া জাল জবাব দিয়েছেন, মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ জিহাদ নয়, তারা মারা গেছে কারণ তাদের মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। যদি তারা জিহাদে না গিয়ে ঘরের মধ্যেও বসে থাকতো, তবুও যাদের মারা যাওয়ার, তারা মারা যেতোই। অর্থাৎ মুসলিমদের মৃত্যুর জন্য জিহাদকে দায়ী করা ভুল। মৃত্যুর বিষয়টি আল্লাহর হাতে, আল্লাহ তাআলা যখন যার মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে ঠিক তখনই মারা যাবে। হোক সে ঘরের বাইরে থাকুক বা ভেতরে, মৃত্যুর সময়ের কোনো নড়চড় নেই। উহুদের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে উহুদের যুদ্ধকে দায়ী করা যাবে না।

> "... পরে যখন তোমরা সাহস ও (মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রাসূলের) নির্দেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য করলে, এমনকি, আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদেরকে সেই ভালোবাসার জিনিস (আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তাঁর কথা অমান্য করে (তাঁর দেখিয়ে দেওয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তখন দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয় পড়লো আর কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইতে থাকলো। আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তোমাদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

হার-জিত, সুখ-দুঃখ, দুঃসময়-সুসময় সবকিছু দিয়েই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি জয় দিয়ে মুসলিমদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। উহুদের দিনে পরীক্ষা করেন পরাজয়ের মাধ্যমে। ইবন ইসহাক সেই দিনের বর্ণনায় বলেন, 'উহুদের দিন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে কষ্ট ও পরীক্ষার একটি দিন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা কিছু মুসলিমকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। সেই দিন একটি পর্যায়ে শত্রুরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছাকাছি পৌঁছতেও সক্ষম হয়। তাদের ছুঁড়ে মারা পাথরের আঘাতে নবীজি ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দাঁত ভেঙে যায়, মুখে সজোরে আঘাত লাগে, ঠোঁট কেটে যায়।'

# উহুদের শহীদেরা

## হামযাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه

দু'জন নয়, চারজন নয়, উহুদের যুদ্ধে মাত্র একদিনে ৭০ জন মুসলিম শাহাদাহ লাভ

করেন। উহুদের যুদ্ধকে ঘিরে শাহাদাহ সম্পর্কিত অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়। উহুদ ছিল মুসলিম সমাজে শাহাদাতের সংস্কৃতির সূচনা। যিনি এ সংস্কৃতির বীজ রোপণ করে যান তিনি হলেন শহীদদের সর্দার, রাসূলুল্লাহর চাচা হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﵁। "মারা যাওয়া" বা "মৃত্যু" -- এ শব্দগুলো শহীদদের জন্য যথার্থ নয়, যদিও বোঝানোর জন্য এমনটি বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে একজন শহীদ কুরআনের দৃষ্টিতে কখনোই মৃত নন, শহীদরা জীবিত।

উহুদের দিনে হামযাহ তাঁর যোগ্যতার প্রতি সুবিচার করেছিলেন। প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে তিনি পতাকাবাহী গোত্র বনু আব্দুদ-দারের মুশরিকদের হত্যা করতে থাকেন। কিন্তু হামযাকে হত্যা করেছিল এমন এক ব্যক্তি, যাকে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ বলা চলে। তার নাম ওয়াহশী। সে ছিল এক আবিসিনিয়ান দাস। এই যুদ্ধে সে এসেছিল তার মুক্তির আশায়। কুরাইশদের জয়-পরাজয়ে তার কিছুই আসে যায় না। তার একটাই লক্ষ্য, হামযাকে হত্যা করা, আর তাহলেই সে মুক্তি পাবে। কাহিনীটা তার মুখেই শোনা যাক।

*'তখন আমি ছিলাম জুবাইর ইবন মুতইমের দাস। বদরের যুদ্ধে হামযা মুতইমের চাচা তুআইমাহ ইবন আদীকে হত্যা করে। কুরাইশদের উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকাল চলার সময় তুআইমার ভাতিজা জুবাইর আমাকে এসে বললো, শোনো ওয়াহশী, তুমি যদি আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হামযাকে হত্যা করো, তাহলে তোমাকে আমি মুক্ত করে দেবো।*

*আমি রাজি হলাম, বেরিয়ে পড়লাম যুদ্ধবাহিনীর সাথে। আমি আবিসিয়ান, তাই খুব ভালো বর্শা ছুঁড়তে পারতাম। বর্শা ছুঁড়েছি অথচ লক্ষ্যভেদ হয়নি-- এমন ঘটনা আমার সাথে কমই ঘটেছে। ময়দানে দু' দল লড়ছে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার লক্ষ্যকে। তুমুল লড়াইয়ের মাঝে দেখতে পেলাম হামযা! এক প্রকাণ্ড উটের মতো তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আমাদের লোকদের ওপর তাঁর তরবারি চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুই তাঁকে থামাতে পারছে না। ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমি একটু একটু করে তাঁর দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু সিবাআ আমার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে গেল। হামযা তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে সিবাআ, উম্ম আম্মারের ছেলে, ব্যাটা মেয়েদের খতনা করিস! তুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাস?' এই বলে হামযা এত জোরে সিবাআকে আঘাত করলেন যে মুহূর্তের মধ্যে সিবাআ অতীতের অংশ হয়ে গেল।*

*আমি আমার বর্শাটা খুব সাবধানে হামযার দিকে তাক করলাম, লক্ষ্য নিশ্চিত করে ছুঁড়ে মারলাম তাঁর দিকে। বর্শাটা ঠিক নাভীর নিচে দিয়ে ঢুকে দু'পায়ের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসলো। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মারা যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। এরপর বর্শা ছুটিয়ে আনতে মৃতদেহর কাছে গেলাম। বর্শাটা ছাড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। হামযাকে মারা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। মুক্তির আশাতেই আমি উনাকে হত্যা করি।'*

চাচা হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। এই মৃত্যুর খবর শুনে রাসূলুল্লাহ প্রচণ্ড কষ্ট পান। তিনি বললেন, 'কেউ কি আমার চাচার মৃতদেহ দেখেছে? তিনি এখন কোথায়?' এক সাহাবি বললেন তিনি দেখেছেন। সেই সাহাবিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচার মৃতদেহ দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ ইবন উতবার নির্দেশে হামযার ﷺ শরীর বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁর পেট কেটে কলিজা বের করে আনা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা হামযাকে সেরকম বিকৃত অবস্থাতে দেখেন। তাঁর জন্য এটা ছিল খুবই হৃদয় বিদারক ঘটনা। ওয়াহশীর বর্ণনায় ফেরা যাক,

*'আমি মক্কায় ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা বিজয়ের পর আমি তাইফে পালিয়ে গেলাম। যখন তাইফ থেকে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরিত হলো, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো, কই যাবো। একবার ভাবলাম সিরিয়া চলে যাই, আবার ভাবলাম ইয়েমেন বা অন্য কোনো দেশ। খুব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। তখন কেউ একজন আমাকে বললো, এসব চিন্তা ছাড়ো। আমি কসম করে বলছি, যে লোক মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করে আর ইসলামের সাক্ষ্য দেয়, তাদের তিনি হত্যা করেন না। এ কথা শুনে আমি সোজা মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে চলে গেলাম, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কালিমা পাঠ করে তাঁকে চমকে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,*

*- তুমি কি ওয়াহশী?*

*- জ্বী, আল্লাহর রাসূল।*

*- এখানে বসো। কীভাবে হামযাকে হত্যা করেছো সে কাহিনী আমাকে বলো।*

*আমি ঠিক সেভাবেই পুরো কাহিনীটি উনার কাছে বর্ণনা করলাম, যেভাবে আজ তোমাদের (উপস্থিত তাবেইনদের উদ্দেশ্যে) বলছি। আমি কাহিনী বলা থামতেই উনি বলে উঠলেন, ওয়াহশী, তুমি কি তোমার চেহারা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে পারো?'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহশীর চেহারা দেখতে চাচ্ছিলেন না। যতবার ওয়াহশীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, প্রতিবারই তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রিয় চাচা হামযার মৃত্যুর করুণ চিত্র।

*'এরপর থেকে আমি যতটা সম্ভব রাসূলুল্লাহকে ﷺ এড়িয়ে চলতাম। উনি যেখানে যেতেন, আমি সেখানে যেতাম না পাছে উনার চোখে পড়ে যাই। আর এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনাকে নিজের কাছেই তুলে নিলেন।'*

ওয়াহশী বদলে যান, সত্যিকারের একজন মুসলিম হন। পরবর্তী জীবনে জিহাদে যোগ দেন। ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

*'যে বর্শা দিয়ে আমি হামযাকে হত্যা করেছিলাম, সে বর্শা হাতে ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যখন দুই পক্ষ মিলিত হলো, আমি দেখতে পেলাম মুসাইলামা তরবারি হাতে দাঁড়ানো। আরেকজন মুসলিম যোদ্ধা তাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। আমি আমার বর্শার লক্ষ্যস্থল ঠিক করতে থাকলাম, যখন মনে হলো ঠিকমতো লক্ষ্যস্থির করছি, বর্শা ছুঁড়ে মারলাম, বর্শা সোজা মুসাইলামাকে আঘাত করলো। ওদিকে সেই মুসলিম সেনাও তার তরবারি দিয়ে মুসাইলামাকে আক্রমণ করলো। মুসাইলামা মারা গেল।'*

তরবারি দিয়ে আক্রমণ করা লোকটি হলেন উহুদ যুদ্ধের বীর, আবু দুজানা। ওয়াহশী বলতেন, 'যদি আমার আঘাতে সে মারা যেয়ে থাকে, তাহলে আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে মেরেছি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষকেও আমি মেরেছি।' শ্রেষ্ঠ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন হামযাকে, আর নিকৃষ্ট বলে বুঝিয়েছেন মুসাইলামাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহশীকে বলেছিলেন, 'আজ থেকে তুমি আল্লাহর পথে সেভাবে যুদ্ধ করো, যেভাবে তুমি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে।' ইসলামের বিষয়টি আসলে এমনই। কেউ যদি একটি গুনাহ করে থাকে, তাহলে একটি ভালো কাজের মাধ্যমে সেই গুনাহটি মোছার সুযোগ থাকে। ভাল কাজ খারাপ কাজগুলোকে মুছে ফেলে। আমাদের গুনাহগুলো মুছে ফেলার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। উমার ইবন খাত্তাব ؓ একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তর্ক করেন। তিনি বুঝতে পারলেন কাজটি ঠিক হয়নি। তিনি বলেন, 'এরপর থেকে আমি রোজা রাখা, সাদাকা দেওয়া এবং রাতে সালাত (কিয়ামুল লাইল) আদায় করতেই থাকলাম।' সাহাবিরা তাঁদের গুনাহর জন্য নেক আমল করতেন। খারাপ কাজ করা হয়ে গেলে তার পরিবর্তে ভালো কাজ করা পাপমোচন বা অনুশোচনার একটি অংশ।

## মুসআব ইবন উমাইর ؓ

মুসআব ইবন উমাইর কেমন ছিলেন সে বিষয়ে সবচাইতে চমৎকার মন্তব্যটি করেছেন খাব্বাব ؓ। তিনি বলেন,

*'কিছু লোক দুনিয়ার বুকে পুরস্কার পায় না, সব পুরস্কার জমা করে রাখে আখিরাতের জন্য। মুসআব ইবন উমাইর তেমনই একজন। উহুদের দিনে তিনি মারা যান, রেখে যান শুধু গায়ে জড়ানোর এক টুকরো চাদর। সে চাদর দিয়ে যখন আমরা তাঁর মাথা ঢাকতে যাই, তাঁর পা বের হয়ে আসে। আর যখন পা ঢাকতে যাই, মাথা বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁর মাথাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে পা দুটো যেন ইযকির ঘাস দিয়ে ঢেকে দিই।'*[13]

---

[13] তিরমিযী, অধ্যায় মানাকিব, হাদীস ৪২২৫ (আরবি রেফারেন্স)।

অথচ এই মুসআব ইবন উমাইর ছিলেন জাহেলিয়াতের যুগে একজন 'সেলিব্রেটি'! কী ছিল না তাঁর! বাবা-মায়ের চোখের মণি, তরুণীদের ঘুম হরণকারী, দামী পোশাক আর [illegible] সুগন্ধি ছাড়া যার চলতো না! অথচ ইসলাম মানুষটিকে আমূলে বদলে দিল। তিনি হয়ে গেলেন একেবারে সাদাসিধে। মৃত্যুর সময় তাঁর পুরো দেহ ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড়ও তাঁর পরনে ছিল না।

অন্যদিকে আবদুর রহমান ইবন আওফ ﵁ ছিলেন ধনী সাহাবিদের একজন। একদিন ইফতারের কথা, তাঁর সামনে কিছু খাবার আনা হলো। তিনি বললেন, 'মুসআব মারা গেছে, অথচ সে ছিল আমার চাইতে উত্তম, একটা ছোট্ট চাদর ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। হামযা মারা গেছে, অথচ সেও আমার চেয়ে উত্তম। তাঁরা মারা গেছে অথচ আমরা এখনও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ করে চলেছি।' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, আর কিছুই খেতে পারলেন না।[14]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসআব ইবন উমাইরের ﵁ মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কুরআনের একটি আয়াত পড়লেন,

> "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তনই করেনি।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩)

এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহর সাথে আমাদের একটি ওয়াদা আছে, কিছু মানুষ আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে সেই ওয়াদা পূর্ণ করেছে। যেমন মুস'আব ইব উমাইর ﵁। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরাই হলো শহীদ। তোমরা আসো, তাদের দেখে যাও। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যারাই তাদেরকে সালাম দেবে তাদেরকে তারা সালামের উত্তর প্রদান করবে।'

## সাদ ইবন আর-রাবী ﵁

সাদ ইবন আর-রাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের আগে পরামর্শ করছিলেন। সে কথা আগেই বর্ণনা করে হয়েছে। যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। বললেন, 'কে আমাকে সাদ ইবন রাবীর খবর দিতে পারবে? সে কি বেঁচে আছে না মারা গেছে? যদি তাঁকে জীবিত দেখতে পাও আমার সালাম পৌঁছে দিও।' একজন আনসারী সাহাবি, উবাই ইবন কাব, সাদের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সাদকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় খুঁজে পেলেন । তাঁকে পেয়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ

---

[14] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ৩৬।

ﷺ তোমার অবস্থা জানতে চেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। কী অবস্থা এখন তোমার?' সাদ ﷺ বললেন,

*'রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাম এবং তোমাকেও। রাসূলুল্লাহকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও, আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। আল্লাহ তাঁকে সকল নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পুরস্কৃত করুক। আর আনসারদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বলে দিও, সাদ ইবন রাবী তাদের বলেছে, তোমরা বেঁচে থাকতে যদি তোমাদের নবীর উপর একটা আঁচড়ও আসে, তবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার মতো কোনো অজুহাত তোমাদের থাকবে না। যতদিন তোমাদের চোখের পাতা নড়বে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা নবীকে রক্ষা করে যাবে।'*

মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও সাদ রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য শ্রেষ্ঠ বিনিময় কামনা করছেন। অথচ এই রাসূলুল্লাহকে বাঁচাতে গিয়েই আজ সাদ নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে। আজকের মুসলিমরা তো এতই স্বার্থপর, এতই কৃপণ মনের অধিকারী হয়ে গেছে যে তারা দ্বীন ইসলামের জন্য জান ও মাল বিলিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যখন বিপদ আসে, উল্টো ভাবতে থাকে যে ইসলামের জন্যই আজ তাদের এ দুর্দশা। প্রয়োজনে তারা তাদের দুনিয়ার নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি বজায় রাখার জন্য দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে দেয়।

একটু তুলনা করে দেখা যাক-- শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আশ্রয় দেওয়ার কারণে আনসারীদের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে আসে! তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের পরিবার-পরিজনকে কষ্ট সহ্য করতে হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতে হয়, পুরো আরব তাদের শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও সাদ ইবন আর-রাবী এতটুকু বিরক্ত নন। বরং তিনি নবীজির ﷺ পুরস্কারের জন্য দুআ করছেন। শুধু তাই নয়, সাদ তাঁর আনসারী ভাইবোনের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন এই বলে, তাদের মাঝে যতক্ষণ একবিন্দু প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন নবীজিকে রক্ষা করে যায়। তাদের জীবদ্দশায় যদি নবীজির গায়ে একটি কাঁটাও লাগে, তাহলেও তারা এর জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে, তাদের কোনো কৈফিয়ত শোনা হবে না। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহায্যকারী আনসাররা দ্বীন ইসলামকে এভাবেই বুঝতেন।

## আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ

উহুদ যুদ্ধের আগের কথা, আবদুল্লাহ ইবন জাহশ আর সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের দেখা হলো। আবদুল্লাহ ইবন জাহশ বললেন, 'আসো, আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে দুআ করি।' তাঁরা ঠিক করলেন, প্রথমে তাঁদের একজন দুআ করবেন, অপরজন বলবেন আমীন। এরপর অপরজন দুআ চাইবেন, তখন প্রথমজন বলবেন আমীন। প্রথমে সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস দুআ করলেন,

*'হে আল্লাহ! আমি যদি শত্রুর দেখা পাই, তাহলে আমার সাথে এমন এক শত্রুর সাক্ষাৎ করিয়ে দাও যে হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী। সে আমার সাথে লড়বে এবং আমি তার সাথে লড়বো। এরপর তুমি আমাকে তার ওপর লড়াইয়ে বিজয়ী করে দিও। আমি যেন তাকে হত্যা করে তার দেহ থেকে বর্ম ছিনিয়ে নিতে পারি।'*

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ বললেন, 'আমীন'। সাদ বললেন, 'এবার তোমার পালা।' আবদুল্লাহ ইবন জাহশ দুআ করলেন,

*'হে আল্লাহ! আমার সাথে একজন শক্তিশালী যোদ্ধার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও, যে আমার বিরুদ্ধে লড়বে এবং আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো। এরপর সে আমাকে হত্যা করবে আর আমার নাক ও কান কেটে নেবে। আমি যেদিন তোমার সাথে মিলিত হবো, সেদিন যেন তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে পারো, তোমার নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে হে আবদুল্লাহ? আর আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের জন্য। তখন তুমি বলবে, আবদুল্লাহ, তুমি সত্যি বলেছিলে!'*

সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস এই দুআ শুনে বললেন, 'আমীন।' সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁর ছেলের কাছে যখন এ কাহিনীটি বলছিলেন, তিনি বলেন, 'শোনো বাবা, সেই দিন আমাদের দুজনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন জাহশের দুআটাই বেশি ভালো ছিল। দিনশেষে দেখতে পেলাম, তাঁর নাক আর কান একটা দড়িতে বাঁধা।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআটি সত্যিই কবুল করে নিয়েছিলেন! ঠিক সেভাবে কবুল করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন! এই দুআ থেকে এটাও জানা যায় যে নিজের মৃত্যুকামনা করা জায়েয কেবলমাত্র তখনই, যখন আল্লাহর পথে মৃত্যুর দুআ হয়।

## খাইসামা আবু সাদ ﷺ

খাইসামা ﷺ বেশ বয়স্ক একজন সাহাবি। তবুও তিনি যুদ্ধে যেতে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। কিতালে অংশ নেওয়া বৃদ্ধদের ওপর ফরয নয়, কিন্তু তিনি খুব করে চাইতেন শহীদ হতে। খাইসামার এক ছেলে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। খাইসামা বলেন,

*'বদরের যুদ্ধে আমি যেতে পারিনি। বদরের সময় আমি জিহাদে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তখন আমার আর আমার ছেলের মধ্যে লটারি হলো । লটারিতে ছেলে জিতলো। সে যুদ্ধে গেল আর আল্লাহ তাকে শাহাদাহ দান করলেন! গতরাতে ওকে স্বপ্নে দেখেছি, ওকে দেখতে অসাধারণ লাগছিল! সে খুব মজা করে জান্নাতের ফল খাচ্ছিল। আমাকে বললো, এসো, জান্নাতে আমাদের সঙ্গী হয়ে যাও! আমাকে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন তা আসলেই সত্যি হয়েছে।'*

হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি জান্নাতে তার সাথে মিলিত

হতে চাই! আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাকে শাহাদাহ দান করেন! তিনি যেন আমাকে সাদের সাথে জান্নাতে এক হওয়ার সুযোগ দেন!'

রাসুলুল্লাহ তাঁর অনুরোধ রাখেন, তাকে যুদ্ধে যেতে দেন। খাইসামা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধে না যাবার যথেষ্ট অজুহাত খাইসামার ছিল, কিন্তু তিনি আর সবার মতো নন। বরং তাঁর ভয় ছিল না জানি বিছানায় শুয়েই মারা যান আর শাহাদাহ থেকে বঞ্চিত হন! জিহাদে না-যাবার অজস্র অজুহাতের বিপরীতে, বৃদ্ধ খাইসামার এই একটি আবেগী দুআ আমাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

## ওয়াহাব আল মুযানী ﵁ এবং তাঁর ভাতিজা ﵁

ওয়াহাব আল মুযানী ছিলেন একজন রাখাল। তিনি মদীনার স্থানীয় নন, এসেছিলেন মদীনার বাইরে মুযাইনা নামের এক গোত্র থেকে। তাঁর আত্মীয়স্বজনও ছিল রাখাল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করার জন্য একদিন তারা সবাই মদীনায় এল। তাদের ভেড়াগুলিও সাথে ছিল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলো সেখানে কেউ নেই! সবাই যুদ্ধ করার জন্য উহুদের ময়দানে গেছে। এ কথা শুনে ওয়াহাব ভেড়ার পাল মদীনাতেই ফেলে রেখে ভাতিজাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা দিলেন ।

মুসলিমরা তখন সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তাঁরা পৌঁছেই যুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন খালিদ ইবন ওয়ালিদের অতর্কিত হামলায় মুসলিমরা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এল ওয়াহাব আল মুযানীর পালা। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পেলেন যে শত্রুদের একটি দল জড়ো হয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি বলে ওঠেন, 'কে আছে এদের বিরুদ্ধে লড়বে?' ওয়াহাব আল মুযানী বলে ওঠেন, 'আমি লড়বো!' এই বলে তিনি এগিয়ে যান, তাদের ওপর ক্রমাগত তীর ছুঁড়ে তাদের পিছু হটিয়ে দেন। শত্রুপক্ষের আরও একটি দল এগিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আছে এদের থামাবে?' 'আমি থামাবো! ইয়া রাসূলুল্লাহ!' বলে আল মুযানী তরবারি নিয়ে এবারো শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর পিছু হটতে বাধ্য করেন।

এরপর শত্রুদের বেশ বড়সড় একটি দল এগুতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন ওয়াহাবের জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে এসেছে। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'এগিয়ে যাও! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো!' এ কথা শুনে ওয়াহাব আল মুযানী এই বিশাল দলটির সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এগিয়ে যেতে দেখে বলেন, 'হে আল্লাহ! তাঁর ওপর রহম করো!' ওয়াহাব আল মুযানীর দেহ তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি লড়াই করতেই থাকেন। তাঁর ভাতিজাও একইভাবে শহীদ হন। যখন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল, তাঁর শরীরে তখন বিশটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন!

ওয়াহাব আল-মুযানীর ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখে উমার ﷺ বলেছিলেন, 'এর থেকে চমৎকার মৃত্যু তো আমি কল্পনাও করতে পারি না!' ওয়াহাব আল মুযানীর এই মৃত্যু ছিল উমারের কাছে 'স্বপ্নের মৃত্যু!' তেরো বছর পরের কথা। ক্বাদিসিয়ার যুদ্ধের পর সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের সাথে মুযাইনা গোত্রের এক লোকের দেখা হলো। লোকটার নাম বিলাল। তার আত্মীয়রা গনিমতের মালের অংশ পায়নি। কথাপ্রসঙ্গে সাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি ওয়াহাব আল-মুযানীর আত্মীয়?' সে বললো, 'জ্বী, আমি তার ভাতিজা।' সাদ বলে উঠলেন,

'তাই! তোমার চাচার কাহিনী জানো তো? উহুদের দিনে যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো স্বেচ্ছাসেবকের জন্য ডাক দিচ্ছিলেন, প্রতিবারই তোমার চাচা এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের হামলা করেন। তৃতীয় বারে আমিও তাঁর সাথে যোগ দিলাম। আশা ছিল যে, তাঁর সমান পুরস্কার যদি পেয়ে যাই! কারণ রাসূলুল্লাহকে ﷺ তখন বলছিলেন, জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার চাচা শহীদ হয়ে গেলেন, আমিও খুব করে চাচ্ছিলাম তাঁর সাথে শহীদ হই। কিন্তু আমার সময় তখনও আসেনি। আমি ভাবি, ইশ! আমি যদি মুযানীর মতো শহীদ হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম!'

ওয়াহাব আল মুযানীর দাফনের সময় নবীজি ﷺ আহত-ক্লান্ত-বিধ্বস্ত; তবু তিনি দাফনের পুরোটা সময় জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হও, কারণ আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট।' জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়াহাব আল মুযানী অসীম বীরত্ব আর সাহসিকতার সাথে লড়াই করে গেছেন। ওয়াহাব কিন্তু খুব নামকরা সাহাবি ছিলেন না, কিন্তু তার বীরত্বগাঁথা সাহাবিরা বহুদিন পর্যন্ত স্মরণ করেছেন।

## আমর ইবন আল জামূহ ﷺ

আমর ইবন আল জামূহ ছিলেন খোঁড়া। তাঁর ছিল চার ছেলে। প্রত্যেকেই সাহসী যোদ্ধা। উহুদের যুদ্ধের সময় এলে আমর জিহাদে যোগ দিতে চান কিন্তু ছেলেরা বাধ সাধে। তাদের যুক্তি, আমরের জন্য জিহাদে যাওয়া ফরয নয়। আমর তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে অনুরোধ জানান, 'আমার ছেলেরা চায় না আমি আপনার সাথে জিহাদে যাই। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমার এই খোঁড়া পা আমি জান্নাতে ফেলতে চাই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন,

*'তোমাদের বাবা যদি জিহাদে যেতে চায়, যেতে দাও। তাকে বাধা দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব নয়। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাহ দান করবেন।'*

আমর যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। শাহাদাতের স্বপ্নে বিভোর আমর রাসূলুল্লাহর কাছে এসে এক ফাঁকে জানতে চাইলেন,

- আচ্ছা রাসূলুল্লাহ, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় মারা যাই, তাহলে আমি জান্নাতে সুস্থ-সবল পা নিয়ে হাঁটতে পারবো তো?

- অবশ্যই পারবে!

আমর ইবন আল জামূহ্ শহীদ হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেন। একজন অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তির জন্য কিতালে যাওয়া আবশ্যক না হলেও অনুমোদিত। তবে প্রতিটি ঘটনার অসাধারণ দিকটি হলো সাহাবিদের মাঝে শহীদ হিসেবে মারা যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, অধীর আগ্রহ আর অদম্য স্পৃহা।

## হানযালা ইবন আবি আমীর ﷺ: ফেরেশতারা গোসল দিল যাকে

আনসারী সাহাবি হানযালা ﷺ, উহুদের যুদ্ধের আগের রাতেই তাঁর বিয়ে হয়। যুদ্ধের সময়টাতে সাধারণত মুজাহিদরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন। কিন্তু হানযালা ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুমতি চাইলেন স্ত্রীর সাথে রাত কাটাবার। রাসূলুল্লাহ অনুমতি দিলেন। হানযালা রাতে স্ত্রীর সাথে থাকলেন। ভোরে ফিরে এসে সাহাবিদের সাথে ফজরের সালাহ আদায় করলেন। এরপর স্ত্রীর জামিলাহর ﷺ কাছে ফিরে এলেন বিদায় নিতে। কিন্তু জামিলাহ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, তাঁরা মিলিত হলেন।

এদিকে বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই ফরয গোসল না করেই হানযালা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দুঃসাহসী হানযালা ঘোড়ার পিঠে বসে শত্রুপক্ষের নেতা আবু সুফিয়ানকে টার্গেট করলেন। হানযালা এগিয়ে গিয়ে আবু সুফিয়ানের ঘোড়াকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। আবু সুফিয়ান ঘোড়া থেকে পড়ে চিৎকার করে উঠলো। হানযালা আবু সুফিয়ানকে শেষ করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই এক মুশরিক এসে পড়লো। সে হানযালাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর বুক ভেদ করে বর্শা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু হানযালা ﷺ থামবার পাত্র নন। তিনি আবু সুফিয়ানকে আবার আঘাত করতে উদ্যত হলেন। সেই মুশরিক তাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। হানযালা ﷺ শহীদ হলেন।

হানযালাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেন! তিনি বলেন, 'আমি হানযালাকে দেখেছি ঠিক আসমান আর জমিনের মাঝে। ফেরেশতারা তাকে জান্নাতী রুপার পাত্রে রাখা আল-মুযনের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিচ্ছে!' রাসূলুল্লাহ ﷺ হানযালার খবর নিতে তার স্ত্রী জামিলাহর কাছে লোক পাঠালেন। জামিলাহ ছিলেন মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মেয়ে। কিন্তু তিনি বাবার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুত্তাক্বী মুসলিমাহ। লোকেরা জামিলার কাছে গেল। তিনি বললেন, 'যাবার আগে তিনি গোসল করার সময় পাননি, যুনুব (অপবিত্র) অবস্থাতেই তিনি চলে

যান।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, ‘এজন্যই তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়ে দিচ্ছিল!’

আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে। জামিলাহ্ যখন হানযালার ﷺ সাথে থেকেছিলেন, তিনি চারজন সাক্ষী ডেকে বিষয়টা জানান। এ অদ্ভুত কাজটা তিনি কেন করলেন? সাধারণত স্বামী বা স্ত্রীর একান্ত গোপন কথা অন্যদের জানবার কথা নয়। জামিলাহ বলেন, ‘আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আকাশ খুলে গেল আর তার ভেতর দিয়ে হানযালা চলে গেলেন, এরপর আকাশ আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমার মনে হলো যে হানযালা শহীদ হয়ে যাবেন।’ স্বামী পরদিন মারা যাবে জানলে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক না করাটাই ‘স্বাভাবিক’। কারণ তাহলে সে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা সহজ হবে। কিন্তু কীসের আশায় জামিলাহ্ জেনে শুনে স্বামীর সাথে মিলিত হলেন? কেন সবাইকে বিষয়টা জানালেন? কেন তিনি সেই পুরুষের সন্তান চাইলেন যে কিনা পরদিনই শহীদ হয়ে যাবে?

আসলে সাহাবিদের মানসিকতা আমাদের মতো ছিল না। তাঁরা দুনিয়াকে অন্যভাবে দেখতেন, তাঁরা দুনিয়াকে দেখতেন ওয়াহীর আলো দিয়ে। হানযালা শহীদ হবেন -- এটা জেনেশুনেই জামিলাহ্ তাঁর সন্তান গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন। জামিলাহর জন্য এটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার যে তাঁর স্বামী হবে একজন শহীদ! হয়তো তাঁর জন্য পৃথিবীটা কঠিন হয়ে পড়বে। হয়তো কষ্ট আর দুর্দশা তাঁর ওপর চেপে বসবে, কিন্তু শহীদের স্ত্রী হবার মধ্যে যে মর্যাদা আছে, সে মর্যাদা লাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি জামিলাহ্। তিনি যা-ই করেছেন, আল্লাহর জন্য করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাই তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন।

জামিলার সাথে এরপর সাবিত ইবন ক্বাইসের ﷺ বিয়ে হয়। জামিলার গর্ভে জন্ম নেওয়া হানযালার সন্তানের নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। আর সাবিতের সংসারে জন্ম নেয় মুহাম্মাদ। এই মুহাম্মাদই ছিল আবদুল্লাহর সবচেয়ে কাছের মানুষ। বাবা না থাকা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ঠিকই তার সৎ বাবা ও ভাইয়ের থেকে আদর-স্নেহ-মমতা পেয়েছিল, ভালোবাসায় কোনো কমতি ছিল না। নিশ্চয়ই তাক্বওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম কিছুই দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার প্রতি সাহাবিদের ভালবাসার আরেকটি নিদর্শন এই ঘটনা। সদ্যবিবাহিত হানযালা ﷺ গোসল না করে ময়দানে ছুটে যান। পদাতিক সৈন্য হয়েও তিনি পাল্লা দেন ঘোড়সওয়ারির সাথে। যেসব ভাই ও বোনেরা বিয়ে করেছেন, তারা জানেন বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে দুনিয়ার প্রতি কী প্রবল মায়া কাজ করে! সেই তীব্র বন্ধন উপেক্ষা করে ময়দানে যুদ্ধ যাওয়া কতই না কঠিন! আর সেটাই করেছিলেন হানযালা, আর তাই ‘ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়েছে!’

## আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম ﷺ

আবদুল্লাহ ইবন আমর তাঁর ছেলে জাবিরকে উহুদের আগে ডেকে বললেন,

*'বাবা শোনো, রাসূলুল্লাহর ﷺ পর এই দুনিয়ায় তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমার বোনদের দেখাশোনা করতে না হতো, আমার ঋণ পরিশোধের বিষয়টি না থাকতো, তাহলে আমি চাইতাম তুমিও যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাও। নিজের ব্যাপারে আমি আশা করি, আমি প্রথম সারির শহীদ সাহাবিদের একজন হবো। তোমার কাছে ওসিয়ত এই যে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও আর তোমার বোনদের দেখে রেখো।'*

আবদুল্লাহ ইবন আমরের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা তাঁর জন্যে কাঁদো বা না-কাঁদো, জেনে রেখো, তোমার বাবাকে ফেরেশতারা ঠিকই ছায়া দিয়ে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে দাফনের জন্য ওঠাচ্ছো।'[15]

জাবির তার বাবার লাশ দেখে খুব কাঁদছিলেন। জাবিরকে ডেকে নবীজি ﷺ বললেন, 'তুমি ভেঙে পড়ছো কেন জাবির?' জাবির জানালেন তার বোনদের দেখাশোনা আর তার বাবার রেখে যাওয়া ঋণের কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ দেবো? শোনো, আল্লাহ তাআলা কোনো পর্দা ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না, কিন্তু তিনি তোমার বাবা আবদুল্লাহর সাথে কথা বলেছেন সরাসরি! জানতে চেয়েছেন, আবদুল্লাহ তুমি কী চাও? আর আবদুল্লাহ উত্তর দিয়েছেন, হে আমার রব! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠাও, যেন তোমার জন্য যুদ্ধ করে আবার শহীদ হতে পারি!'

মৃত্যুর পর শহীদ ছাড়া আর কোনো মানুষ দুনিয়াতে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু শহীদের কাছে তার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এতই সুখকর যে, সে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে আবারও সেই মুহূর্তটি উপভোগ করতে চায়।

# শাহাদাতের মর্যাদা

### ১) সবুজ পাখির অন্তরে

শাহাদাতের মর্যাদার কথা অসংখ্য হাদীসে এসেছে, এর মধ্যে একটি চমৎকার হাদীস হলো সবুজ পাখির হাদীস। এটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

*উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইদের হত্যা করা হয়, আল্লাহ তখন তাদের*

---

[15] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩২।

*রুহকে সবুজ পাখির অন্তরে স্থাপন করেন। তারা তখন সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতের নদীর ওপর উড়ে বেড়ায়, সেখানকার ফল খায়, মহান রবের আরশের ছায়ায় রাখা সোনার প্রদীপে যেয়ে বাসা বাঁধে। জান্নাতের সুস্বাদু খাবার, মজাদার পানীয়, শান্তিময় নিবাস উপভোগের পর তারা বলতে থাকে, কে আমাদের ভাইদের যেয়ে জানাতে পারবে যে আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, আমাদের রবের রিযিক্ব প্রাপ্ত হয়েছি -- তারা যেন জিহাদ থেকে বিমুখ না হয়ে যায়, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে না যায়। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন, আমি তাদেরকে তোমাদের এ কথা জানিয়ে দেবো। এরপর তিনি নাযিল করেন সূরা আলে-ইমরানের এ আয়াত (১৬৯-১৭১):*

*আর যাদের আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার কাছে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাঁর করুণাভাণ্ডার থেকে তাদের যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কেননা তাদের উপরে কোনো ভয় নেই আর তারা অনুতাপও করবে না। তারা আনন্দ করবে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য এবং করুণাভাণ্ডারের জন্য, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না।*[16]

অর্থাৎ, শহীদেরা চাইছিলেন তাদের দুনিয়ার ভাইদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, যেন তারা জিহাদ থেকে পিছু না হটে। আল্লাহ তাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন, তাই তিনি সূরা আলে-ইমরানের আয়াতগুলো নাযিল করেন।

এই হাদীস থেকে আমরা দুটো জিনিস জানতে পারি। এক, শহীদেরা জীবিত, এবং দুই, তাঁরা চান যে, তাদের ভাইয়েরা জিহাদ অব্যাহত রাখুক। ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন মুজাহিদদের মাঝে এতই মজবুত যে, মৃত্যুর পরেও তাঁরা তাঁদের মুজাহিদ ভাইদের কাছে বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন। তাঁদের এই আন্তরিক ইচ্ছার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁদের হয়ে বার্তাটি পৌঁছে দেন।

এই ব্যাপারে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন মাসরুক্ব। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম কুরআনের এই আয়াতটির অর্থ কী: 'যাদের আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত...' তিনি বললেন, আমরা এই আয়াতের অর্থ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন,

*'শহীদদের আত্মাকে স্থাপন করা হবে সবুজ পাখিদের দেহে। মহান আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মাঝে তারা বাসা বাঁধবে। জান্নাতের ফল*

---

[16] সুনান আবু দাউ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৪৪।

*থেকে যা ইচ্ছা খাবে, এরপর আবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসবে। একবার আল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী চাও? তারা জবাব দিলো, আমরা আর কী চাইতে পারি? আমরা তো যেখান থেকে খুশি জান্নাতের ফল খেতে পারছি!*

*তাদের রব তাদেরকে তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। তারা যখন বুঝতে পারল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকবেন, তখন বললো, হে আমাদের রব, আমাদের ইচ্ছা হয় যে আপনি আমাদেরকে আবার দুনিয়ার জীবনে ফেরত পাঠান আর আমরা আবারো আপনার জন্যে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই!*

*আল্লাহ তাআলা যখন দেখলেন তাদের আর কোনো চাওয়া নেই, তিনি তাদেরকে জান্নাতের আনন্দ উপভোগের জন্য ছেড়ে দিলেন।'*[17]

## ২) সালামের জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি কেউ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করে তাদেরকে সালাম প্রদান করে, তবে তারা প্রত্যেকের সালামের জবাব দেবে।' এ প্রসঙ্গে ইবন আবি দুনিয়ার বলা একটি ঘটনা আততাফ ইবন খালিদ বর্ণনা করেছেন। আবি দুনিয়া বলেন যে তাঁর চাচী প্রায়ই শহীদদের কবরে যেয়ে হামযার ؓ জন্য দু'আ করতেন। তাঁর চাচী বলেন,

*'একদিন আমি গোরস্থানে গেলাম। সেখানে আমার উটের লাগাম টেনে ধরার লোকটি ছাড়া আর কেউ-ই উপস্থিত ছিল না। আমি হামযার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুআ করলাম। দুআ শেষ করে আমি তাকে সালাম দিয়ে বিদায় জানালাম। আর ঠিক তখনই মাটির নিচ থেকে আমি আমার সালামের জবাব শুনতে পেলাম! এই ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন -- এ নিয়ে আমার যেমন কোনো সন্দেহ নেই; রাত আর দিনের তফাত নিয়ে যেমন করে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, তেমন এই বিষয়টা নিয়েও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমি সালামের উত্তর শুনেছি। আর তা শোনার সাথে সাথে আমার গায়ের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গেল!'*[18]

## ৩) সুগন্ধী কবর

আল ওয়াক্বিদী বলেন, 'মুআবিয়া একবার পরিখা (গর্ত) খুঁড়তে গেলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যাদের আত্মীয় উহুদের যুদ্ধে শাহাদাহ লাভ করেছে, তারা যেন গর্ত খোঁড়ার আগে বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেয়। কেননা পরিখা কাটতে গেলে শহীদদের কবর বের হয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি শহীদদের আত্মীয়দেরকে সেখানে উপস্থিত থাকতে

---

[17] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৮১।

[18] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮।

বলেন যেন তারা কবরগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে সরিয়ে নিতে পারে। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ সে ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

*'এক লোক আমাকে জানালো, জাবির, মুআবিয়ার লোকেরা পরিখা খোঁড়ার সময় তোমার বাবার কবরও খুলে ফেলেছে। উনার কিছু অংশ কবরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এ কথা শুনে জাবির বাবার কবর খুঁড়তে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁদের কবরগুলো খনন করতে গিয়ে দেখি আমার বাবার শরীরটা অবিকল আগের মতোই আছে, একটুও বদলায়নি। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি ঘুমোচ্ছেন। কবর খুড়তে গিয়ে তাঁর আরেক সাথী আমর ইবন জামুহকেও দেখতে পেলাম। তাঁর হাত দিয়ে শরীরের একটি ক্ষতস্থান ঢাকা ছিল। হাতখানি সরিয়ে দেখলাম, ক্ষত থেকে গলগল করে তাজা রক্ত বেরোতে লাগলো! গর্ত খুড়তে গিয়ে হামযার ﷺ পায়ে শাবলের আঘাত লাগে, সেখান থেকেও টাটকা রক্ত ঝরতে শুরু হয়। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি গতকালই তাঁদেরকে কবর দেওয়া হয়েছে!'*

ইবন কাসির বলেন, 'তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! বলা হয়ে থাকে উহুদের শহীদদের প্রত্যেকের কবর থেকে মেশকের সুবাস ভেসে আসছিল।' এই মানুষগুলো শাহাদাহ লাভ করেছেন ৪৬ বছর আগে! অথচ তাঁদের দেহগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে।

### ৪) শহীদদের গোসল বা জানাযার প্রয়োজন নেই

বান্দা যেখানে শাহাদাহ লাভ করে, সেখানেই তাকে কবর দেওয়া সুন্নাহ। ক'জন সাহাবি উহুদের শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে মদীনায় যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে বললেন, 'তাদের নিয়ে ফিরে যাও আর উহুদের ময়দানেই কবর দাও।' ময়দানই শহীদদের গোরস্থান। মদীনা উহুদের ময়দান থেকে বেশ কাছেই ছিল। দেহগুলোকে মদীনায় নেওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের ময়দানেই শুহাদাদের কবর দিতে বলেন।

দাফন করার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের দুইজন শহীদের ওপর এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'এ দুজনের মাঝে কার কুরআনের জ্ঞান বেশি ছিল?' যার কুরআনের জ্ঞান বেশি, তাকে তিনি আগে কবরে নামাতেন। শহীদদের কবরে রেখে দুআ করতেন, 'আমি কিয়ামতের দিনে ওদের জন্য সাক্ষ্য দিবো।' দু'জন শহীদের জন্য একটি কাপড় বরাদ্দ ছিল কারণ দাফনের যথেষ্ট কাপড় পর্যন্ত ছিল না।

অবশ্য আরেকটি কারণ হতে পারে, যুদ্ধ করে সবাই এত বেশি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কবর খোঁড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আর তাই দুজনের জন্য একটি করে কবর খুঁড়ে, যার কুরআনের জ্ঞান বেশি আছে তাকে প্রথমে, এরপরে দ্বিতীয়জনকে এভাবে করে কবর দেওয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দেন যেন শুহাদাদেরকে গোসল না দিয়ে শরীরের রক্ত সহ কবর দেওয়া হয়। শহীদদের জন্য জানাযার নামাজও আদায়

করতে হয় না, কেননা তারা 'মৃত নয় বরং জীবিত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হাশরের ময়দানে তাদের রক্ত ও ক্ষতগুলো থেকে মেশকের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে।'

## ৫) নবীজির ﷺ সাক্ষ্য

উহুদ যুদ্ধের ধকলের কারণে নবীজি ﷺ সেদিন বসে যোহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি সাহাবিদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। ইমাম আহমেদ এই দুআটি বর্ণনা করেন,

> *'হে আল্লাহ! সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র তুমি। হে আল্লাহ, তুমি যা ধরে রাখতে চাও তা কেউ ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। আর যা তুমি ছাড়িয়ে নিতে চাও, তা কেউ ধরে রাখতে পারবে না। যাকে তুমি পথভ্রষ্ট করো, কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না, আর তুমি যাকে হেদায়েত দাও, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করার করতে পারবে না। যা তুমি দিতে চাও, তা বাধা দেওয়ার কেউ নেই, আর যা তুমি আটকে রেখেছো, তা ছাড়িয়ে নেবার সাধ্য কারো নেই। তুমি যা দূরে সরিয়ে দিতে চাও, তার কাছাকাছি কেউ যেতে পারবে না আর তুমি যা কাছে নিয়ে আসো তা দূরে ঠেলে দেওয়ার কেউ নেই।*
>
> *হে আল্লাহ! আমাদের ওপর তোমার রহমত, করুণা ও দয়া বর্ষণ করো!*
>
> *হে আল্লাহ! আমি তোমার সে রহমতের প্রত্যাশী যার কোনো কমতি নেই, যার কোনো শেষ নেই। হে আল্লাহ! আমি নিরাপত্তার সময় তোমার রহমত চাই, আমি তোমার রহমত চাই পরীক্ষা আর ভয়ভীতির সময়ে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যা কিছু দিয়েছ, তার মন্দ থেকে, আর যা কিছু দাওনি, তার মন্দ থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।*
>
> *হে আল্লাহ, তাওফিক দাও যেন আমরা ঈমানকে তোমার রহমত হিসেবে দেখি। ঈমানকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ তাওফিক দাও যেন কুফর ও তোমার অবাধ্যতায় আমরা বিতৃষ্ণা অনুভব করি।*
>
> *আমাদেরকে সরল পথপ্রাপ্তদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করো। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও আর মুসলিম হিসেবে পরকালে জীবন দান করো। আমাদেরকে সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। অপদস্থ ও উন্মত্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিও না! হে আল্লাহ, সেই সকল কাফিরদের ধ্বংস করে দাও যারা তোমার রাসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের বিরোধিতা করে, অত্যাচার করে আর কষ্ট দেয়। হে আল্লাহ, হে সত্যের রব! সেইসব কাফিরদের ধ্বংস করে দাও যাদেরকে তুমি কিতাব দান করেছিলে।'*[19]

---

[19] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮।

# স্নায়ুযুদ্ধ: হামরা আল-আসাদ

উভয় পক্ষ ময়দান ত্যাগ করলেও যুদ্ধের রেশ তখনো কাটেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হার মেনে যাওয়ার মানুষ নন। শত্রুপক্ষের মনস্তত্ত্বও তিনি বুঝতেন। তিনি ধারণা করলেন, কুরাইশরা যেহেতু এই যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তাই তারা আবার মদীনায় হামলা চালাতে পারে। তাঁর ধারণা সত্যি হলো। কুরাইশরা প্রথমে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পথিমধ্যে তারা মত বদলালো। ইকরিমাহ ইবন আবি জাহল সবাইকে বলে বেড়াতে থাকে, 'কী করেছো তোমরা? না পারলে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে, না পারলে তাদের নারীদের দাসী বানাতে! ছি! কিছুই তো পারলে না।' তার উসকানিমূলক কথায় কুরাইশরা মদীনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল।

তবে এ খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ দৃঢ়তায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না, বরং কুরাইশদের মোকাবেলা করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবন ইসহাক, তিনি বর্ণনা করেছেন,

'উহুদের যুদ্ধ মধ্য শাওয়ালের এক শনিবারে সংঘটিত হয়, আর ঠিক তার পরদিনই রাসূলুল্লাহর ﷺ মুয়াজ্জিন ঘোষণা দেন তারা শত্রুদের ধাওয়া করবে। তিনি বললেন, আগের দিন যারা যুদ্ধ করেছে, কেবল তারাই এই অভিযানে অংশ নেবে। কুরাইশদের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর রাসূল তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। উদ্দেশ্য -- তাদের জানান দেওয়া যে, মুসলিমরা মোটেও দুর্বল হয়নি। তারা এখনো শত্রুদের মোকাবেলা করতে সক্ষম।'

মুসলিমরা তখন সবে মাত্র ময়দান থেকে ফিরেছে। আর পরদিন সকালেই বলা হলো, অস্ত্র তুলে নাও আর শত্রুদের ধাওয়া করতে বেরিয়ে পড়ো! মুজাহিদরা ক্লান্ত, আহত, শরীর তাদের ক্ষত-বিক্ষত। আগের দিনই তারা ৭০ জন সঙ্গীকে হারিয়েছে! আর এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে পরের দিনই তাদের বলা হলো আরেকটি যুদ্ধের উদ্দেশে রওনা দিতে।

ব্যাপারটা মোটেও সহজ ছিল না। অন্যদিকে মুনাফিকরা স্বভাববশত মুসলিমদের মনে ভয় ছড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ সাফ কথা, 'আমরা বের হবো এবং শত্রুদের মোকাবেলা করবো।' শত্রুদের ধাওয়া করার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ভয় দেখানো; তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মুসলিম বাহিনী এখনও হেরে যায়নি। তাদের কাছে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দেওয়া যে, যুদ্ধে পরাজয় মুসলিমদেরকে একটুও দুর্বল করতে পারেনি। এমন বিপদ আর সংকটের মুখেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরিসীম ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। হেরে গেলেও উজ্জীবিত থাকা, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার উদ্যম থাকা, আল্লাহ আযযা ওয়াজালের ওপর আস্থা রাখা মুজাহিদদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে আহত সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের আহবানে সাড়া দেন; বেরিয়ে পড়েন জিহাদে। তারা হামরা আল-আসাদে যুদ্ধের তাঁবু গাড়েন। কুরাইশরা অবাক দৃষ্টিতে দেখছে আর ভাবছে, 'আমরা কি আসলেই তাদের হারিয়েছি!' তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না যারা গতকাল তাদের সাথে যুদ্ধে 'হেরে' গেছে, তারা কী করে ঠিক তার পরদিন যুদ্ধে নামার সাহস পেল!

এর মধ্যে ঘটে গেল একটি ঘটনা। খুযাআ গোত্রের একজন মুশরিক মা'বাদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা হলো আর সে মুসলিম হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠালেন যেন সে মুসলিমদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। মা'বাদকে দেখে আবু সুফিয়ান বলে উঠলো,

- ওদিকটার খবর কী মা'বাদ, জানো কিছু?

- মুহাম্মাদ তার দলবল নিয়ে তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এমন বাহিনী আমি জীবনেও দেখিনি! তারা তোমাদের বিরুদ্ধে মহা ক্ষ্যাপা! উহুদের যুদ্ধে যারা আসেনি, তারাও এবার যোগ দিয়েছে। আগেরবার আসতে পারেনি দেখে ওদের অনুশোচনার শেষ নেই।

মা'বাদ ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে কথা বলছিল। আবু সুফিয়ান বললো,

- আচ্ছা তোমার কী মনে হয়? আমাদের এখন কী করা উচিত?

- কসম করে বলছি, তোমরা এখান থেকে পালাবার আগেই তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী এসে পড়বে!

- কিন্তু আমরা তো চাচ্ছিলাম তাদের পুরোপুরি শেষ করে দিতে!

- সত্যি বলতে, আমি মনে করি এই পরিকল্পনা মাথা থেকে বাদ দিলেই ভালো। কসম আল্লাহর! তুমি জানো, আমি ওদের দেখে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম যে একটা কবিতাও রচনা করে ফেলেছি!

আবু সুফিয়ান তার কবিতাটা শুনতে চাইলে, মা'বাদ বলে,

*'ওদের আওয়াজে পাহাড় যেন লজ্জায় মুখ লুকোয়,*
*টগবগ করে ছোটা সারিবাঁধা সুঠাম অশ্বের ঝংকারে ধ্বনিত হয় পৃথিবী-*
*ঘোড়সওয়ারিরা, তারা তো এক একটা মস্ত সিংহ।*
*এই সৈনিকেরা যুদ্ধকে ডরায় না, অস্ত্রের অভাব নেই তাদের*
*আমি দেখে দৌড়ে পালাই, মনে হয় যেন ধরণী কাঁপছে!*
*তাদের আছে এমন নেতা যাকে কেউ কোনোদিন একা ফেলে যাবে না।'*

মা'বাদ এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করলেন। শত্রুর মনোবল ভেঙে দিলেন। কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। আবু সুফিয়ান তবু আক্রমণ করার মিথ্যা হুমকি দিয়ে মুসলিমদের ভয় দেখানোর শেষ চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলিমদের এতটুকু টলানো গেল না। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে গেল। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> "যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার। মুনাফিকরা যাদেরকে বলেছিল, নিঃসন্দেহে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, অতএব তাদের ভয় করো। কিন্তু তাদের ঈমান বেড়ে গেল, আর তারা বললো, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি অতি উত্তম রক্ষাকর্তা। সুতরাং তারা ফিরে এল আল্লাহ্র কাছ থেকে নিআমত ও করুণাভাণ্ডার নিয়ে, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি, বস্তুতঃ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করেছিল। আর আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত বিশাল। নিঃসন্দেহ শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, -- যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭২-১৭৫)

শয়তান মু'মিনদের ভয় দেখায়, *'দেখো, শত্রুরা অনেক শক্তিশালী, ওদের অনেক ক্ষমতা! ওদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকাও, ওদের সংখ্যা গুনো, ওদের সহায়-সম্পদ দেখো! ওদের সাথে লড়তে যেও না।'* -- এসব বলে শয়তান মনের মধ্যে ভয় ঢোকাতে চায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ সবই শয়তানের দেওয়া ওয়াসওয়াসা। আমরা যদি আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখি, তাহলে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল আমাদেরকেই বিজয়ী করবেন।

## উহুদের যুদ্ধবন্দী

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের একমাত্র যুদ্ধবন্দী ছিল আবু আযযা। এই আবু আযযা বদর যুদ্ধেও বন্দী হয়েছিল। তখন সে অজুহাত দেখায়, সে খুব গরিব, তার মেয়েদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। রাসূলুলাহ ﷺ সেবার কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেন। শুধু একটাই শর্ত জুড়ে দেন, তা হলো সে কখনই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আবু আযযা এ কথা মেনে নিয়ে মুক্তি পায়।

কিন্তু মক্কার কুরাইশরা উহুদের সময় আবারও তাকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নানাভাবে ফুসলাতে থাকে। আবু আযযা রাজি হলো না। আবু সুফিয়ান তাকে বললো, 'আরে! আমাদের এবার তিন হাজার সৈন্য, আমরা কীভাবে হারতে পারি! আর তোমার মেয়েদের কথা ভাবছো? শোনো, যদি তোমার কিছু হয়েও যায়, এই আমি আছি তোমার মেয়েদের দেখাশোনার জন্য।'

টাকার লোভে আবু আযযা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে রাজি হলো। আর বন্দীও হলো। এবারেও আবু আযযা পুরোনো অজুহাত খাড়া করে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলবে, তুমি মুহাম্মাদকে

দুইবার ধোঁকা দিয়েছো -- সেটা আমি হতে দেবো না। মুসলিম এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' তিনি আবু আযযাকে হত্যার আদেশ দেন।

মুসলিমদের অতি সরলমনা হলে চলবে না। কেউ যেন বোকা বানাতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সহানুভূতিশীলতা এবং সতর্কতা-এ দুয়ের মাঝে হতে হবে আমাদের অবস্থান। সবকিছুকে অতি সরল মনে গ্রহণ করা বা মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলা যেমন এক ধরনের চরমপন্থা, তেমনি সারাক্ষণ চরম নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত থাকা, সবকিছুর মাঝে মন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া আরেক ধরনের চরমপন্থা। উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চরমপন্থা একজন মানুষকে অন্যের প্রতি সদয় হতে নিরুৎসাহিত করে তোলে। তাই মুসলিমরা এ দুয়ের মাঝে এমন এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে যা হবে বাস্তবধর্মী।

## 'শেষ ভালো যার, সব ভালো তার'

মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। সেই সময়টিই বলে দেয় তাদের আখিরাত কেমন হবে। উহুদের যুদ্ধে এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায়, যাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত তাদের জীবনের গতিপথকে অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়। এমন একজন হলো কাযমান।

### ১) কাযমান

তার নাম কাযমান অথবা কুযমান। ছিল মদীনার সাধারণ এক বাসিন্দা, ইসলাম নিয়ে তার তেমন কোনো উৎসাহ নেই। উহুদের যুদ্ধে সে প্রথমে অংশ নেয়নি। কিন্তু তার গোত্রের মহিলারা তার কাপুরুষত্ব নিয়ে তাকে খোঁচা দিলে সে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিংহের মতো যুদ্ধ করে সাত-সাত জন মুশরিককে হত্যা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে তার নাম উচ্চারণ করা হলেই তিনি বলতেন, 'এই লোকটা জাহান্নামী।'

সাহাবিরা অবাক হলেন, কাযমান কীভাবে জাহান্নামী হতে পারে! সে তো মুসলিমদের পক্ষে বীরের মতো লড়ছে! কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে সে আহত হয়। শরীরে আঘাতের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। সবাই তাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেয়, অভিনন্দন জানাতে থাকে। কাযমান তখন বললো, 'তোমরা আমাকে কেন অভিনন্দন জানাচ্ছো? আমি তো ইসলামের জন্য লড়াই করিনি, আমি আমার গোত্রের জন্য যুদ্ধ করেছি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'এই লোকটা জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বদ লোকদের দ্বারাও তার দ্বীনের কাজ করিয়ে নেন।' কাযমান 'জিহাদ' করেছিল সত্যি, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সে জিহাদ করেনি। সে জিহাদ করেছে তার জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। এ কারণে তার স্থান ছিল জাহান্নাম। কাজেই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করাটাই সব নয়। বরং যুদ্ধ হতে হবে সঠিক আকীদা বিশ্বাসের জন্য।

## ২) মুখাইরিক ﵁

মদীনা সনদ অনুসারে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করা ইহুদিদের দায়িত্ব ছিল। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে কোনো সাহায্য চাননি। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এল এক ইহুদি, নাম তার মুখাইরিক। সে তার লোকদেরকে ডেকে বললো, 'ইহুদিরা শোনো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব।' তারা বললো, 'আজকে তো শনিবার, আজকে আবার কীসের যুদ্ধ?' মুসলিমদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ইহুদিদের গড়িমসি দেখে মুখাইরিক রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের জীবনে যেন আর কোনোদিন শনিবার না আসে। শোনো, আমি একাই যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার সব সম্পদের মালিক মুহাম্মাদ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা খরচ করবেন।'

এই বলে সে বেরিয়ে পড়লো। যুদ্ধে সে শহীদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে বললেন, 'মুখাইরিক -- খাইরাল ইয়াহুদ', অর্থাৎ 'মুখাইরিক হলো ইহুদিদের মধ্যে সেরা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়াকফ হিসেবে নির্ধারিত করলেন। সেটিই ছিল মদীনার প্রথম ওয়াকফ।

মুখাইরিক মুসলিম ছিল নাকি অমুসলিম ছিল, তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বেশিরভাগ উলামার মতে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁদের মতে, 'মুখাইরিক হলো ইহুদিদের মধ্যে সেরা', এই কথা দিয়ে আল্লাহর রাসূল জাতীয়তা বুঝিয়েছেন, দ্বীন বা ধর্ম বোঝাননি।

## ৩) উসাইরিম ﵁

আওস গোত্রের এক লোক ছিল উসাইরিম। সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তার গোত্রের লোকদেরও ইসলাম গ্রহণ করতে দেয়নি। সে ছিল মুশরিক। একদিন মদীনায় এসে বিভিন্ন লোকের খোঁজ করতে শুরু করছে, কিন্তু কেউই মদীনায় নেই!

- অমুক কোথায়?
- উহুদে!
- তমুক কোথায়?
- সেও উহুদের ময়দানে!

উসাইরিম যার কথাই জানতে চায়, প্রত্যেকেই উহুদে! উসাইরিম বললো, 'যদি এরা সবাই উহুদে যুদ্ধ করে, তাহলে আমিও তাদের সাথে যোগ দেবো।' এই বলে সে তরবারি, বর্শা আর যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল। পৌঁছে গেল উহুদের প্রান্তরে। মুসলিমরা তাকে দেখে অবাক! 'তুমি এখানে? চলে যাও তুমি!' উসাইরিম জবাব দিল, 'না, আমি ঈমান এনেছি।' এই বলে উসাইরিম ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে মুশরিকদের হাতে বেশ কয়েকস্থানে আহত হলেন।

যুদ্ধ তখন শেষ, ক্লান্ত উসাইরিম মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে, তার কিছু আত্মীয় তাকে দেখে খুব অবাক হলো। তারা বলাবলি করতে থাকলো, 'আরে উসাইরিম এখানে! সে তো কাফির ছিল বলেই জানতাম। সে এখানে কী করছে?' তারা উসাইরিমকে জিজ্ঞেস করলো,

- উসাইরিম, তুমি এখানে কীভাবে এলে? ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় নাকি স্বজাতির শক্তি বৃদ্ধিতে?

- আমি ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় এসেছি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সমর্থনে যুদ্ধ করবো বলে হাতে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আমার অবস্থা তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছো।

এই বলে উসাইরিম মৃত্যুবরণ করলেন। উসাইরিম পরবর্তীতে বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় না করেই জান্নাতে চলে গেছেন! এই বিষয়টা নিয়ে আবু হুরায়রা ﷺ সাহাবিদের কুইজ জিজ্ঞেস করতেন। উসাইরিম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চমৎকার কথা বলেছেন, 'তার আমল ছিল অল্প, কিন্তু যে পুরস্কার সে কামিয়ে নিয়েছে তা অসামান্য।' শাহাদাহ বা আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া হলো এমন একটি কাজ যা মানুষকে জান্নাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বাদ বাকি সব আমল ছাড়াই মাত্র এই একটি আমলের মাধ্যমে সে জান্নাতে সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে চলে যেতে পারবে। উসাইরিম নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, কিছুই করেনি। সে শুধু ঈমান এনেছে আর তারপরেই আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেছে, তাই সে জান্নাতে যাবে।

# উহুদের যুদ্ধে মু'জিযা

### ১. কাতাদাহ ইবন আন-নুমানের চোখ

বদরের যুদ্ধের অলৌকিক ঘটনাবলির মধ্যে এই কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধের ব্যাপারেও এই কাহিনীটি বলা হয়ে থাকে। কারণ আলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই ঘটনা বদরের যুদ্ধে ঘটেছে নাকি উহুদের যুদ্ধে।

### ২. উবাই ইবন খালাফ

কুরাইশদেরদের এই নেতা মাক্কী জীবনে নবীজিকে হুমকি দিত, 'এই যে মুহাম্মাদ, দেখো, দেখো! আমি এই ঘোড়াকে দিনে বারো মুঠো শস্য খাওয়াই। এর পিঠে চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো।' নবীজি তখন জবাব দিতেন, 'না, বরং আমিই তোকে হত্যা করবো!'

উহুদের দিনে উবাই ইবন খালাফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে নবীজির পেছনে ধাওয়া করতে লাগলো। সাহাবিরা এগিয়ে গেলেন তাকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু নবীজি তাদের

থামিয়ে দিলেন। একটি বর্শা হাতে নিয়ে সেটা ঝাঁকাতে শুরু করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবন খালাফের দিকে বর্শা তাক করে ছুঁড়ে মারলেন। উবাই ইবন খালাফের সমস্ত দেহ ছিল বর্মে ঢাকা। একটা বর্শায় তাকে আক্রমণ করা অসম্ভব! কিন্তু নবীজির বর্শা আঘাত করলো ঠিক তার বর্ম আর মাথার হেলমেটের মাঝখানে একটা ছোট্ট ফাঁকে।

সেই লোহার বর্মের ফাঁক গলে বর্শা খুব একটা ভেতরেও ঢুকতে পারেনি। কিন্তু উবাই ইবন খালাফ এতটুকু আঘাতেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। উন্মাদের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে তার লোকেদের কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। তারা বললো, 'তোমার হয়েছেটা কী?' সে বললো, 'মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে!' তারা তার বর্ম খুললো কিন্তু গলার কাছে কোনো আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পেল না। এরপর বললো, 'তোমার তো কিছুই হয়নি। এত ভয় পাচ্ছো কেন?' সে বললো, 'মুহাম্মাদ বলেছে সে আমাকে হত্যা করবে! সে যদি কিচ্ছু না করে শুধু আমার দিকে থুথু ছিটায়, তবুও আমি মারা যাব!' পরবর্তীতে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মক্কার কাছে সারাফ নামক স্থানে সে সত্যি সত্যি মারা যায় । রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে মাত্র একজন লোককেই হত্যা করেছেন। সে হলো উবাই ইবন খালাফ।

সীরাহ থেকে একটি বিষয় বার বার প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিটা কথায় এমনকি শত্রুরাও বিশ্বাস করতো! কুরাইশ কাফিররা অক্ষরে অক্ষরে রাসূলুল্লাহ কথা বিশ্বাস করতো। কিন্তু ঔদ্ধত্য আর অহংকারের কারণে তাঁকে নবী বলে মেনে নেয়নি। যেমন, এই ঘটনায় উবাই সামান্য একটু আঁচড় খেয়েই এত ভয় পেয়ে যায় যে, তার কাছে মনে হয় সে মারা গেছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বহু আগে হত্যা করা হুমকি দিয়েছিলেন। আর সেই হুমকি সত্য হওয়ার এই ঘটনা একটি মু'জিযাও বটে।

উবাই ইবন খালাফকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ এক রাতে হাঁটছিলেন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে আমি আগুনের হলকা দেখতে পেলাম। এরপর দেখলাম একটা লোককে শিকল বেঁধে টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সে কেবলই পানি খেতে চাচ্ছে। আর তাকে বলা হচ্ছে, 'এই লোককে পানি দিও না, এ হলো সেই লোক যাকে রাসূলুল্লাহ হত্যা করেছে।'[20] আবদুল্লাহ ইবন উমার আসলে উবাই ইবন খালাফের শাস্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। অনেক সময় কিছু মানুষ কাফিরদের প্রতি আল্লাহর আযাব, কিংবা মুসলিমদের আনন্দ ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এটা স্বপ্নেও হতে পারে অথবা সামনা-সামনিও হতে পারে। যেমন হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন উমারের ক্ষেত্রে, তিনি সরাসরি শাস্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু মানুষকে গায়েবের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়।

---

[20] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭।

# উহুদের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা

উম্মাহর জীবন থেকে জিহাদ অনুপস্থিত হয়ে পড়ায় মুসলিম নারীদের ভূমিকা অনেকাংশেই শুধুমাত্র পারিবারিক কাজে সীমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রথম যুগে বিষয়টা এমন ছিল না। সে সময়ে মুসলিম নারীরা জিহাদেও ভূমিকা রাখতেন। এ প্রসঙ্গে উহুদের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা নিয়ে না জানলেই নয়। মুসলিম ভাইদের জন্য যেমন আদর্শ প্রয়োজন, তেমনি মুসলিম বোনেরাও যেন আদর্শ হিসেবে সাহাবিয়াতদের অনুসরণ করতে পারেন সে জন্য এই আলোচনা জরুরি। বর্তমান যুগে মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়েই এমনভাবে জীবন যাপন করছে যার সাথে সাহাবিদের জীবনযাত্রার কোনো মিল-ই নেই। অথচ এই সাহাবিরাই ইসলামকে সবচেয়ে সঠিকভাবে বুঝতেন। কাজেই আমরা যদি ইসলামের অনুসরণ করতে চাই, আমাদের সাহাবিদের দিকে তাকাতে হবে। দেখতে হবে তারা কী করেছেন, কী করেননি। উহুদের যুদ্ধে মুসলিম নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেননি, কিন্তু যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

## ১) যোদ্ধাদের পানি সরবরাহ ও চিকিৎসা

উহুদের যুদ্ধে পানি সরবরাহ ও চিকিৎসার কাজে মুসলিম নারীরা সরাসরি অংশ নেন। আনাস ইবন মালিকের ভাষায়, 'সেদিন আমি দেখতে পেলাম আইশা বিনত আবু বকর আর উম্ম সুলাইম তাদের কাপড় গুটিয়ে কাজ করছেন। তাদের গোড়ালি দেখা যাচ্ছিল (এটা হিজাবের বিধান আসার আগের কথা)। তাঁরা নিজেদের কাঁধে পানির বালতি নিয়ে এক এক করে মুজাহিদ ভাইদের কাছে যাচ্ছেন আর তাদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছেন। বালতির পানি শেষ হয়ে গেলে তাঁরা ফিরে গিয়ে আবার বালতি ভরে আনছেন আর মুসলিম সৈন্যদের পানি সরবরাহ করছেন।'[21] হামনাহ বিনতে আবি জাহশ এবং উম্ম আইমানও এই কাজে অংশ নিয়েছিলেন।

এখানে দেখার মতো বিষয় হলো, সাহাবিদের জন্য জিহাদ কোনো ব্যক্তিগত কাজ ছিল না। এটা ছিল একটি পারিবারিক ও সামাজিক প্রচেষ্টা। নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ সবাই জিহাদে নিজ নিজ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। মুসলিমদের আমীর রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী হয়েও তারা মুসলিম সৈন্যদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন।

আনাস ইবন মালিক বলেন, 'যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধের জন্য বের হতেন, তিনি তাঁর সাথে উম্মে সালীম আর আনসারী কিছু নারীদেরকে নিয়ে যেতেন, যাতে তাঁরা মুসলিম সৈনিকদের পানি খাওয়াতে পারেন আর আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন।' আর-রুবায়া বিনত মু'আউইয ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথেই থাকতাম, যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতাম। আহত আর নিহত সৈনিকদের মদীনায় নিয়ে আসতাম।'

---

[21] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৯৫।

উমার ইবন খাত্তাবের খিলাফতকালের কথা। তিনি একবার মদীনার মহিলাদের জন্য কিছু উলের কাপড় বিতরণ করছেন। সবাইকে দেওয়ার পরও এক সেট কাপড় বাকি রয়ে গেল। কাপড়টি ছিল বেশ উন্নত মানের। কেউ একজন বললো, 'আমীরুল মুমীনিন, এই কাপড়টি আপনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কন্যাকে দিয়ে দিন।' তারা আসলে আলীর ﷺ কন্যা উম্মে কুলসুমের কথা বলছিল। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাতনি আর উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ স্ত্রী। উমার ইবন খাত্তাব বললেন, 'না! আনসারি সাহাবি উম্মে সালিত ﷺ এই কাপড়ের বেশি হকদার। কারণ উহুদের যুদ্ধে তিনি ছোটাছুটি করে আমাদেরকে পানি এনে দিচ্ছিলেন।' উহুদের যুদ্ধের বহু বছর পরেও উমার ﷺ এই আনসারী নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উহুদের মতো গুরুত্ববহ সময়ে এই সাহাবিয়াতের ভূমিকা অবশ্যই স্বীকৃতি পাবার মতো একটি বিষয়। আর এই সাহাবিদের অপরিসীম ত্যাগের জন্যই তাদেরকে আল্লাহ 'আনসার' অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নবীজির কন্যা ফাতিমাও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবীজি যখন রক্তাক্ত, ফাতিমা ﷺ নবীজির মুখের রক্ত ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যখন পানির কারণে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য খেজুর গাছের বাকল নিয়ে সেটা আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই আল্লাহ রাসূলের ক্ষতের ওপর চেপে ধরেন।

## ২) সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

উহুদে একজন নারীই সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন, নুসাইবাহ বিনত কা'ব আল মাযিনিয়্যাহ ﷺ। শক্তিশালী এই নারী উহুদের যুদ্ধে ছাড়াও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবু বকরের ﷺ খিলাফতকালে ভ্রান্ত নবী মুসাইলামা আল-কাযযাবের বাহিনীর বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর নাতনি তাকে গোসল করিয়ে দেয়। সে বলে, 'আমি নানীর শরীরে ১৩টি ক্ষত দেখেছি, সবচেয়ে গভীর ক্ষতটি ছিল উনার কাঁধে। সেখানে ইবন কামিয়ার তরবারির আঘাত লেগেছিল। ইবন কামিয়া যখন উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আক্রমণ করে, তখন নুসাইবাহ নবীজিকে রক্ষা করতে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। ইবন কামিয়া তখন তাকে আঘাত করে।'

ইবনে কামিয়ার এই তরবারির আঘাত এত ভয়ানক ছিল যে, এক বছর পর্যন্ত নুসাইবাহর ﷺ কাঁধে ব্যথা থাকে। অন্যান্য যুদ্ধের সময়েও তিনি আহত হয়েছেন। ভণ্ড নবী-দাবিদার মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তিনি মারাত্মক আহত হন। জখম সারানোর জন্য তাঁর ক্ষতস্থানে গরম তেল ঢালা হয়। সে যুগে জখম সারাবার পদ্ধতি ছিল জখমের ব্যথার চাইতেও কষ্টকর। এত ব্যথা, এত কষ্টকর জখমও তাকে যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

উহুদের যুদ্ধের পরদিন যখন নবীজি ﷺ শত্রুদের ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে হামরা আল আসাদে যেতে চাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে নুসাইবাহ বিনত কা'বও সেখানে যেতে চাইলেন।

কিন্তু উঠে দাঁড়ানো মাত্র তিনি ধপ করে পড়ে গেলেন। জখমের কারণে আর চলতে পারছিলেন না। উহুদে মারাত্মকভাবে আহত হবার পরেও তাঁর উদ্যম বিন্দুমাত্র কমেনি। জিহাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল এতটাই প্রবল।

আল্লাহর রাসূলকে বাঁচাতে সাহাবিরা নির্দ্বিধায় শত্রুর তরবারির মুখে দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষটাই ছিলেন এমন যার জন্য হাসতে হাসতে জান দিয়ে দেওয়া যায়। হামরা আল আসাদ থেকে ফিরে আসার পর এত উদ্বেগ, ব্যস্ততা, ক্লান্তির মধ্যেও নবীজি ﷺ কারো কথা ভুলেননি। লোক পাঠিয়ে নুসাইবার খোঁজ নিলেন। সে নবীজিকে ﷺ জানালো, 'এখন তাঁর শরীরের অবস্থা আগের থেকে কিছুটা ভালো।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠেন। এ আনন্দ কোনো লোক-দেখানো অভিনয় ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন বাবার মতোই সাহাবিদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। তাদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদের কাছাকাছি থাকতেন, সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখতেন। তাঁর মনে সবসময় সাহাবিদের চিন্তা লেগেই থাকতো।

# সাহাবিয়াতদের অপরিসীম ধৈর্য

## সাফিয়া বিনত আল-মুত্তালিব ﷺ

সাফিয়া ﷺ ছিলেন হামযার ﷺ বোন। হামযার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি ভাইয়ের মৃতদেহ শেষবারের মতো দেখতে চান। ওদিকে হামযার মৃতদেহ খুব বাজেভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। তাই তাঁর ছেলে আয-যুবাইর ইবন আওয়্যাম তাকে থামাতে চাইলেন। তিনি থামলেন না। বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে কেন আটকাচ্ছো? আমার ভাইকে কীভাবে বিকৃত করা হয়েছে সে কথা আমি শুনেছি। তাঁর সাথে যেটাই হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়েই হয়েছে। আর এটাই আমার জন্য সান্ত্বনা হিসেবে যথেষ্ট। চিন্তা কোরো না, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো আর শান্ত থাকবো, ইনশাআল্লাহ।'

হামযার ﷺ শরীর খুব খারাপভাবে বিকৃত করা হয়। শত্রুরা তাঁর নাক, কান, গোপনাঙ্গ কেটে ফেলে। তাঁর পেট আর বুক চিরে খুলে ফেলে। কিন্তু সাফিয়া ﷺ তারপরেও তাকে দেখার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। সাফিয়া ﷺ ময়দানে যান, হামযার বিকৃত মৃতদেহর কাছে দাঁড়ান। 'ভাইয়ের মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে তাঁর জন্য দুআ করেন। আল্লাহর কাছে হামযার ﷺ জন্য ক্ষমা চান। তারপর বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন - আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি, আর তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।' না, তিনি ভেঙে পড়েননি, কোনো বিলাপ করেননি। আপন ভাইয়ের এই মর্মান্তিক চিত্র দেখেও এতটুকু ধৈর্য হারাননি। তিনি ছিলেন আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট।

# হামনাহ বিনত জাহশ ﵂

হামনাহ বিনত জাহশ হলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশের বোন। উহুদের যুদ্ধে হামনা তাঁর স্বামী, চাচা আর ভাইকে হারান। একই দিনে জীবনের সবচাইতে আপন তিনজন মানুষকে হারিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো, আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- কে মারা গেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ? হামনা বুঝতে পারলেন তার কোনো আপনজন মারা গেছে।

- তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ মারা গেছে হামনাহ।

- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, হামনা তার ভাইয়ের জন্য দুআ করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো আর আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- আর কেউ কি মারা গেছে আল্লাহর রাসূল? হামনাহ জানতে চাইলেন।

- হ্যাঁ, তোমার চাচা, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব।

- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তাঁর শাহাদাহ কবুল করে নিন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তাকে বললেন,

- ধৈর্য ধরো আর আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সন্তুষ্ট হও।

- আমার আর কে মারা গেছে রাসূলুল্লাহ? হামনা বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই তার আপন আরও কেউ মারা গেছে।

- তোমার স্বামী, মুসআব ইবন উমাইর।

হামনা চিৎকার করে ওঠেন। ভাই আর চাচার মৃত্যু সংবাদ তাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু এরপর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। এ দৃশ্য নবীজি ﷺ দেখে বলেন, 'নারীর কাছে তার স্বামী খুবই বিশেষ একজন।' স্ত্রীর কাছে স্বামী সবচেয়ে আপনজন। তাই হামরা বিনত জাহশ নিজের বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেও, স্বামীর কথা শুনে ভেঙে পড়েন। হঠাৎ কেঁদে ওঠার ব্যাপারে পরে তিনি বলেন, 'আমার সন্তানদের কথা মনে পড়ে গেল। বাবাকে ছাড়া যে তারা এতিম হয়ে গেল।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

## বনু দীনারের এক নারী ﷺ

উহুদের যুদ্ধের সময় বনু দীনার গোত্রের এক নারীর বাবা-ভাই আর স্বামী তিনজনেই শহীদ হয়ে যান। যখন তার কাছে খবর আসলো, যুদ্ধে তোমার বাবা, ভাই এবং স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, শান্তস্বরে তিনি কেবল একটাই প্রশ্ন করলেন,

- রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন?
- উনি ঠিক আছেন। তুমি তাকে যেমন দেখতে চাও, তেমনি আছেন।
- কোথায় আছেন তিনি? আমাকে দেখাও, আমি তাকে দেখতে চাই!

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে বনু দীনারের সেই মুসলিমাহ খুশিতে বলে ওঠেন, 'আপনি থাকলে বাকি সব কিছু হারানোর বেদনাই তুচ্ছ!'

আমরা সবাই মুখে মুখে বলি, আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসি, তাঁর জন্য জীবন দিতে চাই। আমরা ইসলামের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এই ভালোবাসা হলো তাত্ত্বিক ভালোবাসা। যদি না আমরা এটা বুঝতে পারি যে, সাহাবিরা কীভাবে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসতেন, তাহলে এই ভালোবাসা নিছক মুখের কথাই রয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই সাহাবিয়াত তার স্বামী, বাবা, ভাইকে হারানোর কথা শুনেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। শুধু জানতে চেয়েছেন একটি জিনিস, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন? তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ এক ঝলক দেখলেন। তাতেই তার চোখ জুড়িয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'যদি আপনি থাকেন, তবে তো সব বেদনাই তুচ্ছ।'

এটাই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি আল্লাহর বান্দাদের ভালোবাসা!

## উহুদের শিক্ষা

> "নিশ্চয়ই তোমাদের আগে বহু জাতি গত হয়ে গেছে। অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ করো ও দেখো কেমন হয়েছিল মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম। এই (কুরআন) হচ্ছে মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৭-১৩৮)

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য পরাজয়। কেউ কেউ মনে করেন, উহুদ ছিল 'ড্র ম্যাচ', কারণ কুরাইশরা অনেক মুসলিমকে হত্যা করতে পারলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মদীনা দখল করা, যেটা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু শাইখ ইবনুল কায়্যিম বলছেন, না, উহুদ ছিল মুসলিমদের জন্য বিজয়। এর কারণ হলো উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত অনন্য সব শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলো অনুধাবন করতে না পারলে সীরাহ অধ্যয়নই বৃথা। এমনই কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

# # মুসলিমদের চিরশ্রেষ্ঠত্ব

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৯)

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হবার পর, উপরের এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদেরকে এটাই বলছেন যে, তোমরা যদি আসলেই মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে বিজয় তোমাদেরই হবে।

"তোমরা মানবগোষ্ঠীর জন্য এক শ্রেষ্ঠ সমাজরূপে উত্থিত হয়েছো।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১১০)

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বদরের যুদ্ধে যখন মুসলিমরা বিস্ময়করভাবে জিতে গেল, কিংবা মুসলিমরা যখন পুরো মক্কা বিজয় করে নিল, কিংবা যখন পৃথিবীর বুকের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তার করছে; তখন কিন্তু আয়াতটি নাযিল হয়নি। আয়াতটি এল উহুদ যুদ্ধের ঠিক পরে, যখন মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এখান থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, মুসলিমরা দুর্বল হোক, অত্যাচারিত হোক, পরাজিত হোক -- তবুও তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এটাই মুসলিমদের প্রকৃত পরিচয়, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

# # কষ্ট হলেও লড়তে হবে

"তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিমরা পরাজিত হলো, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনোবল তখন ভেঙে গেল, আশাভঙ্গ হলো। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমাদের সাথে উহুদের যুদ্ধে যা হয়েছে, কুরাইশদের সাথে বদরের সময় ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। তোমরা এখন জখমের কষ্ট ভোগ করছো, তারাও তখন জখমের কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এক বছর আগের বদরের পরাজয় তাদের আবার যুদ্ধ করা থেকে থামিয়ে রাখেনি। তারা আবারও প্রস্তুত হয়ে মাঠে নেমেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, উহুদের পরাজয় যেন মুসলিমদেরকে তাদের লড়াই থেকে বিরত না রাখে। তারা যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তারা যেন আশা হারিয়ে না ফেলে, উদ্যম ও উদ্দীপনা ধরে রাখে। হয়ত কিছু মুসলিম মারা গেছে, তাতে ধৈর্য হারানোর কিছু নেই, পরাজয়ের মুখেও অটল-অবিচল থাকতে হবে।

# # যুদ্ধে জয় ও পরাজয় দুটোই দরকার, তবে চূড়ান্ত বিজয় মুসলিমদের

"... আর (জয় ও পরাজয়ের) এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

একদিন কুরাইশরা জিতলো, আর একদিন মুসলিমরা জিতলো, এটাই দুনিয়ার নিয়ম। ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'আল্লাহ তাআলার অপরিসীম প্রজ্ঞা এবং তাঁর সুন্নাহ হলো, আল্লাহর নবী ও তাদের অনুসারীরা কখনো জিতবে, কখনো হারবে। তবে পরিশেষে তারাই বিজয়ী হবে। যদি মু'মিনরা সবসময় বিজয়ী হতো, তাহলে মু'মিন-মুনাফিক্ব সবাই তাদের দলে ভিড়তো। তখন কে প্রকৃত ঈমানদার তা বোঝা যেত না।' দেখা যেত মানুষ দুনিয়াবি কারণে বা জেতার আশায় মুসলিমদের দলে যোগদান করছে। তাই জয়-পরাজয় দুটোই দরকার।

ইবনুল কায়্যিম আরও বলেন, 'আর যদি মুসলিমরা সবসময় পরাজিত হতে থাকে, তাহলে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হবে না।' দুনিয়াতে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে প্রচার করা, পুরো পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। যদি মুসলিমরা সবসময় হেরে যায় তাহলে এই দ্বীনের যাত্রা স্তিমিত হয়ে যাবে। তাই মুসলিমরা সবসময় জিতবে কিংবা সবসময় হারবে -- এর কোনোটাই যথাযথ নয়। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল হার জিতের মাধ্যমে দিনবদল করে যাচাই করেন কে মু'মিন আর কে মুনাফিক্ব! পরাজয় মুনাফিক্বদের চেহারা প্রকাশ করে দিবে আর বিজয় আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। তবে যতই সময় লাগুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মু'মিনরাই বিজয়ী হবে।

> "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"

# ঈমানের মাপকাঠি

> "...আর এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

ঈমান পরীক্ষা করার সবচাইতে উৎকৃষ্ট উপায় হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এই পরীক্ষা দিতে গেলেই মানুষের ঈমানের খেদগুলো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন যখন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে বলা হয়, তখনই বোঝা যায় দ্বীনের জন্য কার কতটা ভালোবাসা। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল এভাবে পরীক্ষা নিয়ে মু'মিনদেরকে মুনাফিক্বদের দল থেকে আলাদা করে ফেলতে চান।

# জিহাদ হলো উচ্চ মর্যাদা লাভ করার একটি সুযোগ

> "...এবং তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪০)

ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'শাহাদাত হলো আল্লাহর নজরে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানের একটি। শহীদেরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। শত্রুদের হাতে নিহত না হলে কীভাবে মুসলিমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে?' শাহাদাত হলো বান্দার জীবনে

সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা। আর সেটা একমাত্র একভাবেই সম্ভব যখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের হাতে নিহত হবে। উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের পেছনে এটাও একটি হিকমত। এই পরাজয় তো ছিল আল্লাহর বাহানা মাত্র। এর মাধ্যমে তিনি ৭০ জন বান্দাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

## # জিহাদ হলো একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া

"আর এই কারণে যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে পারেন..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪১)

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিমের খুব চমকপ্রদ কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁর কিছু কিছু বান্দাকে এত ভালোবাসেন যে, তাদেরকে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে স্থাপন করতে চান। কিন্তু দেখা যায়, জান্নাতের উঁচু স্থানে যাওয়ার জন্য সেই বান্দার যথেষ্ট পরিমাণ আমল নেই। তাহলে এই ব্যক্তি কীভাবে সেই উঁচু মর্যাদা হাসিল করবে? এটা সম্ভব হয় যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীতে সেই বান্দার ওপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত করেন; আর এইসব দুঃখ-কষ্ট পার করার মধ্য দিয়ে তার গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়, জান্নাতে তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল সাহাবিদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তাদের জন্য জান্নাতে যে উঁচু স্থান রেখেছিলেন, তাদের আমল সেই স্থানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে উহুদের যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-শোক আর জখমের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন। তাদেরকে সহ্য করতে হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু সংবাদের মতো ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক একটা সংবাদ। যদিও পরে জানা যায় যে তা একটি গুজব ছিল। তাদেরকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হলো। এত কষ্টের বিনিময়ে আসলে তাদের সওয়াবের পাল্লাটাই ভারী হচ্ছিল। কষ্ট হলে গুনাহ কাটা যায়, তাই কষ্টের সময়টা খারাপ লাগলেও আখিরাতের জন্য তা কল্যাণকর। ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, 'এটি হলো একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া।'

## # কাফিরদের খারাপের পাল্লা ভারী হতে দেওয়া

"...এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেন..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪১)

আল্লাহ তাআলা কিছু কাফিরদের এত ঘৃণা করেন যে, তিনি তাদের জন্য জাহান্নামে স্থান নির্ধারিত করে রাখেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে তাদের আমল দিয়েই ধ্বংস করেন। সুতরাং, কাফিরদের হাতে মুসলিমদের পরাজয় এবং তাদের কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে সেই কাফিরদের ধ্বংস নিশ্চিত করা হয়। কাফিরদের মধ্যে ইবন কামিয়া আর উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহকে ﷺ আঘাত করেছিল। এটা কি আসলে তাদের জন্য কোনো সাফল্য? রাসূলুল্লাহকে আক্রমণ করতে পারা কি সত্যিই কোনো খুশির বিষয়? সত্যি বলতে, এটা ছিল তাদের জীবনে করা নিকৃষ্টতম অপরাধ।

আর এই একটা কাজের কারণে তারা আজীবনের জন্য জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় দেখি, কোনো কোনো কাফির জাতি অত্যন্ত দুঃসাহস দেখাচ্ছে, কোনোকিছু তোয়াক্কা করছে না। মুসলিমদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে। যখন খুশি বোমা মেরে, গুলি করে হত্যা করছে, ইচ্ছেমতো বন্দী করে নির্যাতন করছে, হেনস্থা ও লাঞ্ছিত করছে, কারাগারে বিনা বিচারে আটকে রাখছে বছরের পর বছর। তাদের এই কাজগুলো কি তাদের জন্য কোনো সুখবর বয়ে আনবে? না, কখনোই না। বরং তাদের এই কাজ থেকেই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। আর সে কারণেই তিনি তাদেরকে এই দুনিয়াতে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা নিজের হাতেই জাহান্নামের আগুন কিনে নিতে পারে।

ফিরআউন আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সে বছরের পর বছর ধরে বনী ইসরাঈলের জনসাধারণকে অত্যাচারে জর্জরিত করে এসেছে। এই কাজের পরিণতি কি ভালো কিছু ছিল? তার শেষ প্রাপ্তি কী ছিল? আসলে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করতে, প্রমাণ দাঁড়া করাতে, আর তাই তাকে এসবের সুযোগ দিয়েছেন। এই মামলার নিষ্পত্তি হবে আখিরাতে, সেদিন সে জাহান্নাম থেকে কোনোক্রমেই নিষ্কৃতি পাবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের ভেতরে কী আছে, সে সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু তিনি মানুষের কাজের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করে দেন, যেন শেষ বিচারের দিনে তারা নিজেদেরকে স্বপক্ষে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে।

অনেকে ভাবে, খারাপ লোকদের জন্যই তো জীবনটা আনন্দের! চুরি-বাটপারি-বদমাইশি করেই তারা বেশি ভালো আছে। সত্যি বলতে, দুনিয়াতে যারা স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম আর দুর্নীতির ওপর টিকে আছে, বছরের পর বছর খারাপ কাজ করার পরেও যাদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না, আসলে তাদেরকে আল্লাহ আখিরাতের কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। ইবলিসকেও আল্লাহ একইভাবে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে সে কত খারাপ কাজই না করছে প্রতিদিন! এসব জালিমের বিচার একদিন নিশ্চয়ই হবে। ফয়সালা হবে আখিরাতে।

### # জান্নাতের জন্য কষ্ট করা চাই

> **"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪২)**

জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। জিহাদ না করেই জান্নাতে চলে যাবার আশা করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে মুসলিমদের বলছেন, জান্নাতের

পথে অনেকগুলো ধাপ আছে। আর মুসলিমদেরকে একে একে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ না করেই কেউ নিজেকে জান্নাতের দাবিদার বলতে পারে না। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর পথে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। ইসলাম কোনো আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়, যেখানে কেবল কিছু ধার্মিক আচার-প্রথা পালনের মধ্য দিয়েই আমরা জাদুবলে জান্নাতে পৌঁছে যাবো। ইসলামের অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন। জান্নাত বিনামূল্যে অথবা অল্প শ্রমে লাভ করার জিনিস নয়। জান্নাতের জন্য কষ্ট করা চাই। মানুষের আমল জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি আল্লাহর দয়া ছাড়া নবীজি ﷺ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। আল্লাহর রহমত ও দয়ার কারণেই একজন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে, কিন্তু তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আন্তরিক চেষ্টাই আল্লাহর রহমত ও দয়ার দরজা খুলতে পারে।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা অবিশ্বাস্য রকমের বিজয় অর্জন করে। যেসব মুসলিম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা উহুদের যুদ্ধে যোগদান করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। অনেকের শহীদ হয়ে যাবার জন্য দুআ চাইছিল। কিন্তু তাদের এই সব আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছাগুলো মনের মধ্যেই ছিল। এই নিয়্যতগুলো কতখানি সত্য তা যাচাই করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের দরকার। আর তাই জিহাদের প্রয়োজন ছিল যাতে করে এর মাধ্যমে তাদের নিয়্যতের সত্যতা যাচাই করা যায়।

হতে পারে, তাদের মাঝে অনেকেই এমন ছিল, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগ পর্যন্ত নিজে কী চায়, তা নিয়ে সন্দিহান ছিল। এখনও দেখা যায় যে, আমাদের মাঝে অনেকেই অন্তরে শহীদ হবার ইচ্ছা রাখে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো এবং জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো? একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সে কথা ভালো জানেন। আর তাই তিনি আমাদের সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন, যাতে আমাদের অন্তরের খবর প্রকাশিত হয়ে যায়।

### # উহুদের যোদ্ধাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন

উহুদের যুদ্ধে কিছু সাহাবি ভুল করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ভুলের ব্যাপারে কী বলেছেন? মুসলিমদের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কখনোই তাদের প্রশংসা করেননি, কৃতিত্ব দেননি। বদরের যুদ্ধের পরে আল্লাহ এমন কোনো আয়াত নাযিল করেননি, যেখানে তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রশংসা করেছেন। বরং তিনি বলেছেন,

> **"বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর বিজয় শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকেই আসে।"** (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৬)

বদরের যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে যখন মতভেদ হলো, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাথে কঠিন ভাষা ব্যবহার করলেন।

> "যদি আল্লাহর তরফ থেকে বিধান না থাকতো যা আগেই উল্লেখ হয়েছে, তবে তোমরা যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলে সেজন্য তোমাদের উপরে এসে পড়তো এক বিরাট শাস্তি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৮)

মুসলিমরা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ আদায়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব এসে পৌঁছাতে পারতো! কেননা আল্লাহ তাআলা এই সিদ্ধান্তের সাথে সম্মত নন। মুসলিমরা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা না করে, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ পছন্দ করেননি।

এই আয়াতগুলো থেকে একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। বদরের যুদ্ধের পর, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্তরগুলোকে সর্বপ্রকার কলুষতা ও অন্তরের ব্যাধি থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। বদরের যুদ্ধের অসামান্য সাফল্যের পর তাদের মাঝে গর্ব, অহংকার ইত্যাদি অনুভূতি কাজ করা অসম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, বিজয় কেবলমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন, সেজন্যই এসেছে।

কিন্তু উহুদের যুদ্ধে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। মুসলিমদের মনোবল কমে গেছে, তারা কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছে। তাই আল্লাহ তাআলা তখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন, ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি করুণা দেখালেন। মুসলিমরা নবীজির ﷺ আদেশ অমান্য করে গুনাহ করেছিল। এই দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের জন্য পাহাড় থেকে নেমে মারাত্মক অপরাধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন।

# ইলমচর্চা এবং জিহাদ

> "আর আরো কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ছিল বহু আলিম..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৬)

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন, আগের নবীরা যুদ্ধ করেছেন, আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অনেক আলেম। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। আলিমদের কাজ ঘরে বসে থাকা নয়, তাদেরকেও ময়দানে যুদ্ধ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজে আলিমদের একটি বিশেষ স্থান তৈরি হয়েছে। লোকেরা সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তারা সবার চাইতে আলাদা কাপড় পরে, অন্যভাবে চলাফেরা করে। সৈনিকদের মতো তাদেরকে মাঠে-ময়দানে যেতে হচ্ছে না, আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি তাদের স্পর্শ করে না। মুজাহিদদের মতো শক্ত মাটিতে শুয়ে থাকতে হচ্ছে না, কাটাতে হচ্ছে না শত্রুর অপেক্ষায় নির্ঘুম রাত। ব্যথা-বেদনা-কষ্ট কী তারা একসময় ভুলে যান। এভাবে চলতে চলতে একসময় তাদের মনে হতেই পারে যে, তারা সবার মতো নন। শয়তান তখন তাদের বুঝায়, 'তোমার তো এতকিছু করার দরকার নেই। তোমার ইলম আছে। তুমি শুধু ঘরে বসে সবাইকে শিখাবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন, সৎকর্মশীল আলেমদের বৈশিষ্ট্য তা নয়।

নেককার আলেমগণ নবীদের সাথে ময়দানে নেমে যুদ্ধ করতেন।

> "আর আল্লাহর পথে তাদের যা কষ্ট হয়েছিল, তার জন্য তারা হতাশ হয়নি, আর তারা ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৬)

এই আলিমরা পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু দমে যাননি। পরাজয় যেন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে, আমাদেরকে হতাশ করে না দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মু'মিনদেরকে সর্বদাই দৃঢ় থাকা চাই।

> "তারা বললো, হে আমাদের রব! ক্ষমা করো আমাদের সব অপরাধ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজকর্মে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৭)

আয়াতের এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে আল্লাহর উপর ভরসা করে। নিজেদের প্রস্তুতি কিংবা সাজ-সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে নয়। মুসলিমদেরকে আল্লাহর কাছে থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। মুজাহিদদের তাদের রবের সামনে বিনয়ী হতে হবে, কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিনয় দেখতে পছন্দ করেন। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আগেকার যুগের মুজাহিদদের পথ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এটাই ছিল তাদের পথ। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতো। হেরে গেলেও বিমুখ হতো না। আর আল্লাহর কাছে তারা নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতো। তারা বলতো,

> "আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। কাজেই আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন ইহজীবনের পুরস্কার, আর পরলোকের পুরস্কার আরো চমৎকার! আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৭)

# অবাধ্যতার খেসারত

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে পেশ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসা, ৪: ৫৯)

রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্যতা ছিল উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় ও পরাজয়ের মূল কারণ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তা সমাধান করতে হবে। কেননা কুরআন আর নবীজির সুন্নাতই হলো মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

# দুনিয়াসক্তির পরিণতি ভয়াবহ

গনিমতের মাল নিয়ে মুসলিম উম্মাহর কাহিনী সত্যিই খুব দুঃখজনক। সেই বদরের যুদ্ধ থেকেই এর সূচনা। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা আনফালের আয়াত নাযিল করেন। উবাদা ইবন আস-সামিত ﷺ বলেন, 'আমরা গনিমতের মাল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম। আর আমাদের আচরণও শোভন ছিল না। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয়।' উহুদের যুদ্ধেও গনিমতের মালের আশাতেই পাহাড়ের ওপর থেকে তীরন্দাজ সৈন্যরা নিচে নেমে এসেছিল। আর সেটাই যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গনিমতের মাল পাওয়ার জন্য তাদের ধৈর্যহীনতাই বড় বিপদ ডেকে এনেছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই সমস্যা পরবর্তীতেও রয়ে যায়।

ইউরোপের পশ্চিমাংশে মুসলিমরা যখন জিহাদে একের পর এক জয় লাভ করতে থাকে, মনে হচ্ছিল সমগ্র ইউরোপ মুসলিমদের হাতে এসে যাবে। তাদের এই অগ্রযাত্রা শত্রুবাহিনী থামাতে ব্যর্থ হলেও দুনিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষার কাছে মুসলিমরা হার মানে। স্পেন জয় করে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আমীর আবদুর রাহমান আল-গাফিকী ফ্রান্সের প্যারিসের দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুসলিমদের আয়ত্তে চলে এল। তারা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। পুরো ফ্রান্স দখল করে নেওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু যখন তারা প্যারিসের সীমানায় গিয়ে পৌঁছালো, ততক্ষণে গনিমতের মাল দিয়ে তারা এতটা বোঝাই হয়ে গেল যে, শত্রুদের নিয়ে চিন্তা করার বদলে নিজেদের গনিমতের অংশ নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। তারা যুদ্ধে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারলো না, যুদ্ধে পরাজিত হলো। এই যুদ্ধকে বলা হয়, 'বালাতুশ শুহাদা' বা 'শহীদদের প্রাঙ্গন'। কারণ এই যুদ্ধে বিশাল সংখ্যক মুসলিম নিহত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনীর বীর মুজাহিদ আবদুর রহমান আল-গাফিকীও শহীদ হন। আর এরপর থেকেই মুসলিমদের অগ্রসর হওয়া থেমে যায়। পশ্চিম ইউরোপের সাথে মুসলিমরা আর কখনোই পেরে ওঠেনি। যুদ্ধ থেকে তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। মুসলিম বাহিনীর ইতিহাস এখান থেকেই অন্যদিকে মোড় নেয় শুধু একটি কারণে, গনিমতের প্রতি আসক্তি।

> "তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা চাচ্ছিল পরকাল।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

এই আয়াত শুনে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি জানতাম না যে আমাদের মাঝে, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবিদের মাঝেও এমন লোক আছে যারা আখিরাতের চাইতে দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দেয়!' মু'মিনদের মাঝে দুনিয়ার লোভ থাকতে পারে -- এ বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের ﷺ কল্পনাতেও আসেনি। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হলো একটি পরীক্ষা। এর মাধ্যমে এমন সব বিষয় উন্মোচিত হয়, যা অন্য কোনোভাবে বোঝা যায় না।

# দ্বীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা

মুহাম্মাদ ﷺ এর মৃত্যু সংবাদের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর কিছু পরাজিত মানসিকতার মুসলিম আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে ছুটে যেতে চাইল। তাদের ইচ্ছা ছিল সে যেন কুরাইশদের সাথে আপসের আলোচনায় বসে। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল শিক্ষা দিয়েছেন ভিন্ন কিছু,

> "আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো কিছুই নয়। তাঁর আগেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ অচিরেই তাদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

মুহাম্মাদ ﷺ এর আগে বহু নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন এবং তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলও ﷺ তাঁদের থেকে ব্যতিক্রম নন, তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন। আল্লাহ যেন মুসলিমদের জিজ্ঞেস করছেন,

*'যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছিয়ে যাবে? এই দ্বীন ত্যাগ করে জাহিলিয়াতের জীবনে ফিরে যাবে? তোমরা কি ব্যক্তি মুহাম্মাদকে অনুসরণ করো নাকি নবী মুহাম্মাদকে?'*

ইসলাম একটি দ্বীন যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ব্যক্তি বিশেষের উপর এই দ্বীন নির্ভরশীল নয়। কোনো ব্যক্তি যতই মহান এবং আদর্শবান হোক না কেন, ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চলে না। কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে দেখে ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। বিজয় কোনো আমীরের কারণে আসে না। উমারের ﷺ খিলাফতকালে খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ মুসলিম সেনাবাহিনীর আমীর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উমার তখন উম্মাহকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলিমদের কোনো বিশেষ একজন নেতার ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তারা একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর আবু বকর ﷺ তাই বলেছিলেন, 'যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে, জেনে রাখো, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা শুনে নাও, আল্লাহ জীবন্ত, এবং তিনি কখনো মারা যাবেন না।'

*'বস্তুত, কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না'* -- আল্লাহ তাআলা এই অংশের মাধ্যমে আমাদের কাছে এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে, আমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমাদেরই আল্লাহকে দরকার। কিন্তু তাঁর আমাদেরকে কোনো প্রয়োজন নেই।

# # মুনাফিক্ব আর গুনাহগার মু'মিন -- কখনোই সমান নয়

"তারপর আল্লাহর করুণার ফলেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। আর কাজে কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুল-কারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫৯)

দাওয়াহ এবং ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর কাজ সাধারণভাবে কোমলতার ভিত্তিতে হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে যদি তার অনুসারীদের প্রতি কঠোরতা থাকতো তাহলে তারা তাকে ছেড়ে চলে যেত। দিন শেষে যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ অমান্য করেছে, তারা তাঁরই অনুসারী। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন যেন তিনি তীরন্দাজ মুসলিম বাহিনীকে মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অথচ এই তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের মাশুল গুনতে গিয়েই মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আহত হয়েছেন এবং ৭০ জন মুসলিম নিহত হয়েছে! কিন্তু এদেরকে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন সেটাই আল্লাহ চেয়েছেন।

উহুদের যুদ্ধে কিছু মুসলিম মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে ছিল। হতে পারে এটা উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের একটি কারণ। কিন্তু তবু আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে পরামর্শ নিতে বারণ করেননি। কেননা শুরা হলো সুন্নাহ, এটাই সঠিক পথ। শুরা করে অর্থাৎ সবার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

"আর যেদিন দুদল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে প্রকৃত ঈমানদার কারা তা জানা যায়। যাতে শনাক্ত করা যায় মুনাফিক্বদের। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা (অন্ততপক্ষে) শত্রুদেরকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বললো। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬৬-১৬৭)

মুনাফিক্বদের শাস্তি দেওয়া হয়নি, এমনকি কিছু বলাও হয়নি। শুধু বলে দেওয়া হলো, তারা হলো মুনাফিক্ব। তাদের আসল চেহারা সবার কাছে খুলে দেওয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা এসেই যায়। উম্মাহর বিজয়ের শর্ত কী -- এই বিষয়ে অনেক মুসলিমের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে, উম্মাহর সবাই যখন আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, তখনই একমাত্র এই উম্মাহ বিজয়ী হবে। সত্যি বলতে, কিছু মুসলিমই শুধু নয়, কয়েকটি ইসলামী আন্দোলনই এই ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মনে করে, উম্মাহর বিজয় অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে শুধরাতে হবে, প্রত্যেককে ভালো মুসলিম হতে হবে। যতক্ষণ আমাদের মাঝে এমন মুসলিম থাকবে, যারা নামাজ পড়ে না, যারা গুনাহ করে, ততদিন আমরা জিততে পারবো না। যতদিন ফজরের সালাতে জুমুআর সালাতের সমপরিমাণ মুসল্লী হাজির না হচ্ছে, ততদিন আমাদের বিজয় অর্জিত হবে না।

এই কথাটি এসেছে আসলে এক ইহুদি পণ্ডিত থেকে। সে জেরুসালেমের মসজিদে বলেছিল, 'যেদিন মুসলিমদের জুম্মাহ এবং ফজরের জামাতে সমান সংখ্যক লোক নামাজ পড়বে, সেদিনই জেরুসালেম মুসলিমদের হাতে বিজিত হবে।' এটা একটা ইহুদি পণ্ডিতের কথা মাত্র, কিন্তু তারা এমনভাবে এই রাবীর ঘটনাকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে, যেন আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তির ওপর তাঁর আয়াত নাযিল করেছেন আর এই ইহুদি লোকটির সব ভবিষ্যদ্বাণী চিরায়ত সত্য!

সত্যি বলতে, এই চিন্তাধারা মোটেও সঠিক নয়! উম্মাহর মধ্যে সবসময়ই ফজরের সালাতের চাইতে জুমুআর সালাতে বেশি মানুষ হবে। উম্মাহর মাঝে সবসময়ই কিছু গুনাহগার মুসলিম থাকবে। অনেকেই ইসলামের বিধিনিষেধ পুরোপুরি মেনে চলবে না। আমরা সবাই 'ভালো মুসলিম' হয়ে গেলেই কেবল বিজয় আসবে--এই ধারণা সঠিক নয়। এর প্রমাণ হলো উহুদের যুদ্ধ।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পুরো তিন ভাগের এক ভাগ ছিল মুনাফিক্ব। কিন্তু তাদের কারণে মুসলিমরা হারেনি। কুরআন বা সুন্নাহতে কখনোই এক-তৃতীয়াংশ বাহিনীর পলায়নকে উহুদে পরাজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। কোনো আলিমও কখনো এমন মত দেননি।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবসময়ই কিছু মুনাফিক্ব থাকবে, কিন্তু ভালো ও মন্দের লড়াইয়ে মুনাফিক্বরা ফলাফল নির্ধারণ করে না। বরং যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয় আত-ত্বইফা আল-মানসুরাহ দ্বারা। আত-ত্বইফা আল-মানসুরাহ হচ্ছে মুসলিমদের কেন্দ্রীয় দল। একাধিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দলটকে নিয়ে কথা বলেছেন। এরা হচ্ছে সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল, যারা সর্বদা হক্কের উপরে থাকবে। এই দলের মুসলিমরা যদি গুনাহতে লিপ্ত হয়, তারা যদি আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহলে মুসলিমরা পরাজিত হবে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিজয় শুধু এই একটি দলের উপর নির্ভর করে, পুরো উম্মাহর উপরে নয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে ৩০০ জনের পলায়নে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিতে কিছু আসে যায়নি। বরং উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ সেই ৪০ জন, যারা আল্লাহর

রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

> **“আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের খতম করছিলে; যতক্ষণ না তোমরা দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়লে, আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে ও যা তোমরা ভালোবাসো তা তোমাদের দেখাবার পরে অবাধ্য হলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল, তারপর তিনি তোমাদের তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) থেকে পলায়নপর করলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মু’মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।”** (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

## # পরাজয় আশাবাদী মনকে নিরাশ করে না

স্বাভাবিকভাবে এমনটাই মনে হওয়ার কথা যে, উহুদ পর্বত দেখলেই নবীজির ﷺ দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠবে। এখানেই তিনি সাহাবিদের হারিয়েছেন, প্রিয় চাচা হামযাকে ﷺ হারিয়েছেন, নিজে আহত হয়েছেন। মুসলিমরা এই যুদ্ধেই শত্রুদের হাতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু নবীজি পরাজিত মানসিকতার মানুষ ছিলেন না, হতাশা তাঁর মধ্যে কখনই দেখা যায়নি। আমাদের রাসূল ﷺ খুবই আশাবাদী এবং ইতিবাচক মানসিকতার একজন মানুষ। উহুদে হেরে গেলেও তিনি হার মানেননি। তিনি বলতেন, ‘উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও উহুদকে ভালোবাসি।’ তিনি বলতেন, ‘উহুদ হলো জান্নাতের পাহাড়।’ উহুদ পর্বতের সাথে তাঁর কষ্টের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, কিন্তু হতাশাকে নিজের মনে কখনো স্থান দেননি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। দুঃখ, কষ্ট, হতাশা দূরে ঠেলে কাজ করে যেতে হবে। উহুদের পরাজয় মুসলিমদের বেদনাহত করবে, হতাশাচ্ছন্ন করবে না। মুসলিমরা আশাবাদী হবে, পরাজয়ের মধ্য থেকে ভালো দিকটা দেখার চেষ্টা করে। হতাশাবাদ মুসলিমদের স্বভাবের সাথে একেবারেই যায় না।

## # বিজয়ের সূত্র

বিজ্ঞান যেমন কিছু সূত্র মেনে চলে, তেমনি জয় ও পরাজয় কিছু সূত্র মেনে চলে। এই চিরন্তন সূত্রগুলো কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

*প্রথম নীতি, বিজয় একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসে।*

> **“আর বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না।”** (সূরা আনফাল, ৮: ১০)

*দ্বিতীয় নীতি, যদি আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করতে চান, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যা তা থামাতে পারবে।*

> "যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৬০)

অর্থাৎ ভয় পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আর কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা মূসাকে ﷺ বিজয় দান করেছিলেন তৎকালীন 'সুপার-পাওয়ার' ফিরআউনের বিরুদ্ধে। কাজেই মুসলিমদের একমাত্র ভরসাস্থল আল্লাহ তাআলা। যদি তারা আল্লাহর ওপর ভরসা না করে অন্য কিছু বা অন্য কারো ওপর ভরসা করে, তাহলে তিনি মুসলিমদের পরিত্যাগ করবেন।

*তৃতীয় নীতি, পরাজয়ের কারণ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া*

> "আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৫২)

এই দুনিয়ার মোহ, আসক্তি, মায়া এবং আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে স্থান দেওয়া হলো মুসলিমদের অধঃপতনের কারণ। উহুদে তারা হেরেছিল কারণ তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্য হওয়া এবং ঐক্য বজায় না রেখে দলছুট হয়ে যাওয়া ছিল তাদের পরাজয়ের প্রধান নিয়ামক।

*চতুর্থ নীতি, জয় বা পরাজয়ের সাথে সৈনিকদের সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই।*

> "আর আল্লাহ ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৩)

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের বিজয় দান করেছেন। আবার হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা অধিক হওয়ার পরেও তারা

সাময়িক পরাজয়ের শিকার হয়েছিল

> "আল্লাহ ইতিমধ্যে বহুক্ষেত্রে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, আর হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি; এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

*পঞ্চম নীতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করা।*

*ষষ্ঠ নীতি, ঐক্যবদ্ধ থাকা।*

*সপ্তম নীতি, ধৈর্য ধারণ করা।*

বিজয়ের জন্য এই তিনটি গুণের কথা আল্লাহ একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

> "আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। আর তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৬)

*অষ্টম নীতি, যুদ্ধের প্রস্তুতির মাধ্যমে বিজয় আসে না।*

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, কিন্তু এই প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামই যুদ্ধজয়ের নিয়ামক এমনটা ভাবা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামরিক সবভাবে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

> "আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরও যাদেরকে তোমরা চেনো না; (কিন্তু) আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে, তার প্রতিদান তোমাদের পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তোমাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

*নবম নীতি, দৃঢ়পদ থাকা, এবং*

*দশম নীতি, আল্লাহকে স্মরণ করা।*

শেষ এই দুটো বিষয় আল্লাহ তাআলা একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোনো সৈন্যদলের সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ়সংকল্প হও, আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৫)

সুতরাং সফল হবার জন্য মুসলিমদের দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে আর বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

## # মু'মিনদের জিহাদে ছোটার প্রেরণা হলো ঈমান

রাফী ইবন খাদীয, সামূরাহ ইবন জুনদুব, আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং আল-বারাহ ইবন আযীবের মতো অল্প বয়স্ক ছেলেরা কেন উহুদের যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে এতটা উতলা ছিল? অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, সে যুগটাই যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ, তাই বাচ্চারাও যুদ্ধে যোগ দিতে উতলা থাকতো। কিন্তু এই একই যুদ্ধে দেখা গেছে ৩০০ প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিক যুদ্ধ না করে পালিয়ে গেছে! যুদ্ধপ্রিয় সমাজ হলেই যে সবাই যুদ্ধকে ভালোবাসবে এমনটা নয়। এখানে মূল ব্যাপার হলো 'ঈমান' বা মুসলিমদের বিশ্বাস। যাদের ঈমান ছিল, তারা যুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহী ছিল। আর যাদের ঈমান ছিল না, তারা পালিয়ে যাবার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিল। আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং তার অনুসারী তিনশো লোক উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি তাবুক, খন্দক ও আরও অনেক যুদ্ধেই তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল।

## # মুনাফিক্বদের জিহাদে ছোটার প্রেরণা হলো দুনিয়া

উহুদের যুদ্ধে অংশ না নিলেও মুনাফিক্বরা ঠিকই হামরা আল আসাদের অভিযানে অংশ নিতে চাইলো। কিন্তু নবীজি ﷺ তাদেরকে অনুমতি দেননি। তিনি কেবল তাদেরকেই সঙ্গে নিলেন, যারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। হামরা আল-আসাদের অভিযানে মুনাফিক্বরা থাকতে চেয়েছে কারণ তারা মনে করছিল এই এই যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা প্রবল আর যুদ্ধে জেতার অর্থ হলো গনিমতের মালে ভাগ বসানো যাবে!

আরামের সময়, শুধুমাত্র সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় ইসলামকে মেনে চলা, আর যখন ত্যাগ স্বীকারের সময় আসে তখন ইসলাম থেকে সরে যাওয়া নিফাক্বের লক্ষণ। জিহাদ ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। তাই সকলের উচিত নিজেদের নিয়তের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। নিজেদের খতিয়ে দেখা, ইসলামী কাজের সাথে যখন দুনিয়াবি স্বার্থ মিশে থাকে, তখন আমরা খুব আগ্রহ পাচ্ছি আর কষ্টের কাজ হলে পিছিয়ে পড়ছি না তো?

যেমন, ইসলাম বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর গুরুত্ব দেয়, বাবা-

মায়ের আনুগত্য করার কথা বলে। কিছু বাবা-মা এই কথাগুলো শুনলে খুব খুশি হন, এই সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস তাদের মনের কথা বলে। কিন্তু যখন ঐ একই সন্তানের উপর ঐ একই ইসলাম জিহাদের কথা বলে, তখন তারা সেসব কথা শুনতে চান না। তাদের সন্তানদেরকেও তারা ইসলামের এই শিক্ষার দিকে মোটেও আকৃষ্ট করতে চান না। অর্থাৎ তারা ইসলামকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করছেন।

নিফাক্বের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে, আমরা যেন মুনাফিক্বদের কাতারে পড়ে না যাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন দ্বীন ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আনসারী সাহাবিদের থেকে বায়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা সহজ সময়েও আমার আনুগত্য করবে এবং কঠিন সময়েও আমার আনুগত্য করবে।'

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

*'উহুদ যুদ্ধের একটি শিক্ষণীয় দিক হলো, সাহাবিরা যে সত্যিই আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন সে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সহজ হোক, কঠিন হোক, সবরকম সময়েই তারা আল্লাহ আযযা ওয়া জালের ইবাদত করতে রাজি ছিলেন। সুসময়, দুঃসময় উভয় অবস্থাতেই দ্বীনের ওপর দৃঢ় এবং অবিচল থাকা প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ। তারা সেসব লোকের মতো নন, যারা শুধুমাত্র সহজ অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে আর বাকি সময় ভুলে থাকে।'*

# বিনয়

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, *'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে পরাজয় এবং লাঞ্ছনা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তাদের দুর্বল অবস্থার মাঝে রাখলেন। এভাবে তারা বিনয়ী হয়ে উঠলো। আর যখন তারা বিনয়াবনত হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল করে নিলেন।'* বিনয়ের সাথে করা দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

> "আর আল্লাহ ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১২৩)

# উহুদ ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় বিপর্যয় মোকাবেলার প্রস্তুতি

ইবনুল কায়্যিম মন্তব্য করেছেন, 'উহুদের যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে সবচাইতে মারাত্মক দুর্যোগের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করেছে।' এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু। এই ঘটনাটির ব্যাপকতা এত বিশাল যে, তার জন্য আগে থেকেই মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করা জরুরি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সাহাবিদের সবকিছু। তিনি ছিলেন তাদের দ্বীন ইসলামের উৎস। তাদের বই-পুস্তক বা ইন্টারনেট ছিল না। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্য কোনো মাধ্যম ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাদের পিতার মতো ছিলেন, তাঁর থেকেই সাহাবিরা সবকিছু শিখেছেন। নবীজিকে হারানো সাহাবিদের জন্য প্রচণ্ড কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার ছিল। এই ঘটনা তাদেরকে চুরমার করে দিতে পারত, তাদের সমস্ত অগ্রগামিতা থামিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল। এই ঘটনা তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধসিয়ে দিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুতে সাহাবিরা যেন ভেঙে না পড়েন। সে জন্য উহুদের মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করে তুলেছেন। এই যুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ আর নেই। আর তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়,

> "আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো কিছুই নন! তাঁর আগেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ অচিরেই তাদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেলেও কীভাবে তা সামলে উঠতে হবে সে ব্যাপারে এভাবেই মুসলিমরা শিক্ষা লাভ করে।

# উহুদ থেকে খন্দক

উহুদে মুসলিমদের পরাজয়ে শুধু কুরাইশরা নয়, বরং কিছু আরব মুশরিক গোত্রও বেশ খুশি হয়। তারা অনেকেই মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা আশা করছিল এই সুযোগে ইসলামকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া যাবে। এমনকি মুসলিমদের চুক্তিবদ্ধ কিছু গোত্রও মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগে ষড়যন্ত্র শুরু করে। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ কিছু তাৎক্ষণিক সামরিক পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করা সম্ভব হয়। তাই উহুদ পরবর্তী বেশ কয়েক মাস অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় মুসলিমদের ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়।

## বনু আসাদের সাথে যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন তুলাইহা আল আসদীর নেতৃত্বে বনু আসাদ গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই লোকটির কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। প্রথমে সে ছিল ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর শত্রু। পরে সে মুসলিম হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে বসে। এরপর আবার সে তার মন পরিবর্তন করে এবং মুসলিম হয়ে যায়। সবশেষে সে একজন মুজাহিদ হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে।

তুলাইহার পরিকল্পনা ছিল মদীনায় সর্বাত্মক সামরিক হামলা চালানোর। তার স্বপ্ন ছিল মদীনার সম্পদ লাভ করবে এবং কুরাইশদের সাথে এক হয়ে মদীনা দখল করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আগেই তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আবু সালামার রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত দেড়শো সৈন্যের একটি দল পাঠান। আবু সালামাহ ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের একজন মুসলিম, উহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। মুহাররাম মাসের এই অভিযানে অতর্কিত হামলায় বনু আসাদ তাদের গরুবাছুর রেখে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণাই ছিল না মুসলিমরা তাদের এভাবে হামলা করে বসবে। আবু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ী হয়ে ফিরে আসলেন। কিন্তু এই অভিযান শেষে তার উহুদের জখম থেকে পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন।

## খালিদ ইবন সুফিয়ানি আল-হুযালিকে হত্যা

মুসলিমদের দুর্বল অবস্থার সুযোগে আরও একটি মুশরিক গোত্র মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল, তারা হলো হুযাইল গোত্র। এর নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইবন সুফিয়ান আল হুযালি। সে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে এবং যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। সে ছিল খুব প্রভাবশালী এবং এই যুদ্ধের মূল হোতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন পুরো গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গিয়ে শুধু এই লোকটাকে

সরিয়ে দিতে পারলেই হুযাইল গোত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তিনি ডেকে পাঠালেন জুহাইনা গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে, বললেন,

- আমি জানতে পারলাম খালিদ ইবন সুফিয়ান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে এখন আরিনায় আছে। তুমি তার কাছে যাবে এবং তাকে হত্যা করবে।

- আমি কীভাবে তাকে চিনবো? আপনি কি তার বর্ণনা দিতে পারেন?

- হ্যাঁ পারি, তুমি যখন তাকে দেখবে, ভয়ে কেঁপে উঠবে।

- কিন্তু আমি এই জীবনে কখনো কাউকে দেখে ভয় পাইনি!

- তুমি খালিদ ইবন সুফিয়ানকে দেখোনি। তাকে দেখলে অবশ্যই তুমি ভয় পাবে।

খালিদ ইবন সুফিয়ান ছিল খুব শক্তিশালী মারমুখী লোক। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ছিলেন খুব সাহসী, কাউকে ভয় করতেন না। এই কাজের জন্য তাই আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ই ছিলেন যোগ্য লোক। কাহিনীটি তার মুখেই শোনা যাক,

'এরপর আমি তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়লাম । চলতে চলতে এক সময় আরিনা পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি তার দেখা পেলাম। তাকে দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। বুঝতে পারলাম যে, এই লোকটিই খালিদ ইবন সুফিয়ান। তার সাথে কিছু মহিলা ছিল, তাদের জন্য সে তাঁবুর জন্য জায়গা খুঁজছিল। সময়টা ছিল আসরের ওয়াক্ত। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম তার সাথে লড়াই করতে গিয়ে না আবার আসরের সালাহ ছুটে যায়। আমি তাই তার কাছে হেঁটে যেতে যেতে ইশারায় সালাত আদায় করে ফেললাম। রুকু আর সিজদাহ করছিলাম মাথা নেড়ে, ইশারায়। শেষ পর্যন্ত আমি তার মুখোমুখি হলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি একজন আরব বেদুইন। শুনেছি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, তাই আমি আপনার সাথে যোগ দিতে এসেছি।

- হুম, ঠিকই শুনেছ। আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছি।

এভাবে তার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। এরপর সুযোগ বুঝে দিলাম তলোয়ার দিয়ে কোপ। আসার সময় দেখি তার সাথের মহিলারা তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে (অর্থাৎ তারা কান্নাকাটি করছিল) ।

এরপর আমি মদীনায় চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বললেন, আহ! এই মুখ উজ্জ্বল হোক! আমি বললাম, আমি তাকে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাকে হত্যা করেছ এবং আমি জানি তুমি সত্যি বলছো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাসা থেকে একটা লাঠি নিয়ে আমাকে দিলেন। আমি লাঠি নিয়ে

চলে আসলাম। আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলো,

- ইবন উনাইস, তোমাকে আল্লাহর রাসূল লাঠিটা কেন দিলেন?

- তা তো জানি না, তিনি শুধু আমাকে এটা দিলেন।

- আরে! তুমি জিজ্ঞেস করবে না! তুমি যাও উনাকে জিজ্ঞেস করে আসো কেন তোমাকে লাঠিটা দিয়েছেন!

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, শেষবিচারের দিনে এই লাঠি হবে তোমার এবং আমার মধ্যকার একটি চিহ্ন। সেদিন অল্প কিছু লোকের সাথেই ভর দেয়ার মতো কোনো সম্বল থাকবে।'

আবদুল্লাহ ইবন উনাইস লাঠিটি তার তলোয়ারের সাথে বেঁধে নিলেন। আর কোনোদিন সেই লাঠি হাতছাড়া করেননি। সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তার লাঠিটিও কবরে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল শেষ বিচারের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার মধ্যকার চিহ্ন হিসেবে লাঠিটি যেন তার সাথে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'সেদিন অল্প কিছু লোকের সাথেই ভর দেয়ার মতো মতো কোনো সম্বল থাকবে।' আলিমদের মত হলো, সেই 'কিছু'টা হলো মানুষের 'আমল' যার উপর তারা ভরসা করতে পারে।

## আর-রাযীর মিশন: একটি মর্মান্তিক ঘটনা

এই মিশনে আল্লাহর রাসূল ﷺ রাযী নামক একটি স্থানে দশজনের একটি ছোট্ট দল প্রেরণ করেন। কারো কারো মতে, এই দলটি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা। তবে আল ওয়াক্বিদী বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর রাসূল এই দলটি পাঠিয়েছিলেন 'কাররাহ' এবং 'আদুল' এই দুই গোত্রের অনুরোধে। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বলেছিল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাদের কাছে কয়েকজন সাহাবিকে পাঠিয়ে দিন। আমরা তাদের কাছে দ্বীন বুঝবো, কুরআন শিখবো এবং ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানতে পারবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইবন সাবিত আল-আক্লাহর নেতৃত্বে দশ জন সাহাবির একটি ছোট্ট দল তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু 'কাররাহ' ও 'আদুল' গোত্রদুটি মিথ্যে বলেছিল। আল-ওয়াক্বিদীর মতে, খালিদ ইবন সুফিয়ানকে হত্যা করার পর হুযাইল গোত্রের একটি উপগোত্র বনু লায়হান প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা এই দুটি গোত্রকে ঘুষের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে প্রতারণা করে কিছু সাহাবিকে আটক করার প্রস্তাব দেয় যেন তারা এই সাহাবিদেরকে কুরাইশদের কাছে বেচে দিতে পারে। কাররাহ ও আদুল গোত্রদুটো প্রস্তাবে রাজি হয়।

আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে ﷺ দশ জনের দলটি উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি বনু লাইহান গোত্রের ভূমিতে যখন পৌঁছলো, তখন প্রায় ১০০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। আসিম ইবন সাবিত বুঝতে পারলেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। জান বাঁচানোর জন্য একটি ছোট পাহাড়ে তারা পালিয়ে গেলেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে তাদের বলা হলো, 'যদি তোমরা আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।'

মুসলিমদের আমীর আসিম বুঝতে পারলেন তারা মিথ্যা বলছে। যদি ছেড়েই দেওয়া হয়, তাহলে আটক করা কেন? আসিম ইবন সাবিত তাদের কথায় টললেন না, বললেন, 'মুশরিকদের অঙ্গীকারে আমি বিশ্বাস করি না!' আর এই বলে আসিম একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগলেন। একে একে সবগুলো তীর শেষ হয়ে গেল, রয়ে গেল কেবল একটি তলোয়ার। এরপর আসিম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'জীবিত থাকতে তোমার জন্য লড়েছি হে আল্লাহ! মরে যাবার পর তুমি আমার দেহকে সুরক্ষিত রেখো!' এরপর তিনি তলোয়ার হাতে লড়ে গেলেন শত্রুদের সাথে। দুজনকে হত্যা করলেন, একজনকে আহত করলেন। যুদ্ধ করতে করতে একসময় তার তরবারি ভেঙে গেল, বনু লায়হানের লোকেরা তাকে হত্যা করলো। ইসলামের এক নির্ভীক সৈনিক শহীদ হলেন।

কেন তিনি আল্লাহর কাছে তার দেহকে সুরক্ষিত করার জন্য দুআ করেছিলেন? কারণ বনু লাইহানের লোকেরা মুসলিমদের হত্যা করে তাদের দেহ বিবস্ত্র করছিল। তাছাড়া আসিমের প্রতি সেই গোত্রের এক মহিলার ছিল তীব্র বিদ্বেষ, কারণ তার দুই ছেলেকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সেই মহিলা শপথ করেছিল কেউ যদি আসিমের ﷺ কাটা মাথা তার কাছে নিয়ে আসতে পারে তবে সেই আসিমের খুলিতে মদ পান করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আসিমের ﷺ দুআ কবুল করেছিলেন। তার মৃতদেহ রক্ষার জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠালেন। যখনই কেউ তাঁর মৃতদেহের কাছে যেতে চাচ্ছিল, তখনই সেই মৌমাছির দল তাদের উপর চড়াও হচ্ছিল। তারা ভাবলো পরেরদিন এসে লাশ নিয়ে যাবে। কিন্তু সে রাতেই প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর মৃতদেহ ভেসে যায়। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে মর্যাদাহানি থেকে রক্ষা করলেন এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করলেন। আল্লাহ চাইলে কী না হয়! বৃষ্টির পানি, অবুঝ মৌমাছিও মু'মিনের জন্য বন্ধু হয়ে যায়!

যুদ্ধ চলছে। মুসলিমদের দশ জনের মধ্যে সাত জন যোদ্ধা যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন, বাকি থাকলেন তিন জন। পালিয়ে যাওয়া অথবা শত্রুদের সাথে পেরে ওঠা -- কোনোটাই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই বাঁচবার আশায় তারা অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন। কিন্তু অস্ত্র ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো।

আবদুল্লাহ ইবন তারিক্ব ﷺ বুঝতে পারলেন এবারও তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, তিনি কোনোভাবে দড়ির মধ্য থেকে তার হাত বের করে তলোয়ার হাতে নিয়ে শত্রুদের

আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা ছিল নাগালের বাইরে। শত্রুরা এরপর তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলো। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

বাকি ছিল দুজন খুবাইব ইবন আদী ﷺ এবং যাইদ ইবন আদদিসিনা ﷺ, তাদেরকে বনু লায়হান কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিল।

কুরাইশরা তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তবু আবু সুফিয়ান তাদের টলাবার জন্যই যেন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না যে আজকে তোমাদের জায়গায় মুহাম্মাদ থাকতো, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এমন চিন্তা করাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু তারা উত্তর দিলেন,

*'না! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা মরতে রাজি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে মদীনার একটি কাঁটা বিঁধতে দিতেও রাজি নই। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকবো, আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটা টোকা লাগবে, তা হতে দেবো না!'*

এই কথা শুনে আবু সুফিয়ান যেন কিছুটা অভিভূত হলো। সে বললো,

*'আমি এমন মানুষ আগে কখনো দেখি নি যারা তাদের নেতাকে এতটা ভালোবাসে...'*[22]

পাঠক, একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাববার সময় এসেছে। ভেবে দেখার সময় এসেছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহাবিরা কতটা ভালোবাসতেন! শত্রুরাও পর্যন্ত এই ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে বারবার। ভালোবাসা মানে এই নয় যে দিন-রাত আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে শুধু কথা হবে, মিলাদ-মাহফিল হবে। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ ভালবাসা মানে তাঁর দেখানো পথে চলা, যত কষ্টই হোক। সাহাবিরা শরীরের রক্ত দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন তাদের হৃদয়ে নবীজির জন্য কতটা গভীর ভালোবাসা ছিল। শত্রুরা পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে মুহাম্মাদের প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা নজিরবিহীন।

খুবাইবকে ﷺ কুরাইশরা নির্মমভাবে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে। হত্যার আগে তাকে আল-হারিসের বাড়িতে রাখা হয়। সে সময়ে কোনো কারাগার ছিল না। খুবাইব ﷺ বদরের যুদ্ধে আল হারিসকে হত্যা করেছিলেন। বন্দী খুবাইব ﷺ আল-হারিসের মেয়েকে বললেন, 'আপনি কি আমার জন্য একটি ব্লেড এনে দিতে পারবেন? আমি নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে চাই।' খুবাইব নাভির নিম্নাংশ পরিষ্কার করতে

---

[22] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১।

চাচ্ছিলেন, এটি একটি সুন্নাহ। মহিলা তার বাচ্চাকে দিয়ে তাঁর কাছে একটি ব্লেড পাঠিয়ে দিল।

এভাবে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। খুবাইবের ﷺ সাথে বাচ্চাটির বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এতই ভাল যে, বাচ্চাটি তাঁর কোলে উঠে বসে থাকে। মহিলার হঠাৎ হুঁশ হলো তার বাচ্চার কোনো হদিস নেই। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি ভেঙে এসে সে দেখলো তার বাচ্চা খুবাইবের কোলে বসা আর খুবাইবের ﷺ হাতে একটি ব্লেড।

এই দৃশ্য দেখে মহিলা আতঙ্কে জমে গেল। তার বাচ্চার বাবার হত্যাকারী খুবাইবের হাতে ব্লেড আর কোলে তার বাচ্চা! খুবাইব ﷺ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আপনি যা আশঙ্কা করছেন, সেরকম কিছুই আমি করবো না ইনশা আল্লাহ।'

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, খুবাইব ﷺ জানতেন তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এজন্য তিনি বাচ্চাটিকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি। যদিও তিনি চাইলেই তা করতে পারতেন। ইচ্ছে করে নিরপরাধ কাউকে হত্যা করা একজন মুসলিমের জন্য সংগত নয়। একজন মুসলিম কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে কোনো কাফিরকে হত্যা করে না। কারণ, জিহাদ কেবল আল্লাহর জন্যে। খুবাইবের এই আচরণে সেই মহিলা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

*'উনার চাইতে ভালো কোনো কয়েদী আমি দেখিনি। আমি তাঁর রুমে গিয়ে দেখতাম তিনি প্লেট ভর্তি আঙুর খাচ্ছেন! অথচ মক্কার কোথাও তখন আঙুর পাওয়া যেত না। আমি নিশ্চিত ঐ আঙুরগুলো ফেরেশতাদের কাছ থেকে এসেছে।'*

শুলে চড়ানোর আগে তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতে চাইলেন। তাকে সে সুযোগ দেওয়া হলো। মৃত্যুর আগের শেষ কাজ। চাইলেই তিনি লম্বাচওড়া করে সালাত পড়ে মৃত্যুর সময়টা আরেকটু বিলম্ব করতে পারতেন। খুবাইব তা করেননি। সালাত শেষ করে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'শোনো, তোমরা আমাকে মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়ার অপবাদ না দিলে আমি এই দু'রাকাত সালাত আরও দীর্ঘ করতাম।'[23]

কেউ যদি মর্যাদা কী জিনিস তা বুঝতে চায়, তবে খুবাইব একজন উজ্জ্বল উদাহরণ। মৃত্যুর আগে দু'রাকাত সালাত আদায়ের এই সুন্নাহ খুবাইব প্রচলন করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি দুআ করে যান,

*'হে আল্লাহ, এদের গুনে গুনে হত্যা করুন। একজনকেও ছাড়বেন না।'*[24]

---

[23] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৮৪।

[24] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১।

আরেক বন্দী যাইদ ইবন আদদিসিনাকে কিনে নেয় সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ্। পিতৃহত্যার প্রতিশোধে সে যাইদকে হত্যা করে। আর-রাযীর মিশনে দশজনের প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করলেন। মুনাফিক্বরা বলাবলি করতে লাগলো, 'আহারে, এদের ভাগ্যটাই খারাপ! না পারলো তারা পরিবারের সাথে থাকতে, না পারলো যুদ্ধে জিততে! এভাবে মরে গিয়ে লাভ কী?' ইনিয়ে বিনিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছিল যে, এই দশজনের জীবন ব্যর্থ! অভিযান তো সফল হলোই না বরং তারা নিজেদের জীবনটাই হারালো। বাড়িতে বসে থাকলেই কাজের কাজ হতো। এই মুনাফিক্বদের ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করেছেন,

> "এবং মানুষের মধ্যের যারা পার্থিব জীবনের কথাবার্তায় আপনাকে মোহিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সাক্ষী রাখে, মূলত সে আপনার কঠোর বিরোধী।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ২০৪)

আর সেই দশজনের প্রশংসায় আল্লাহ্ বললেন,

> "আর অনেকেই রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজের জীবন সমর্পণ করে দেয় এবং আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াবান।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ২০৭)

এই আয়াতগুলো এই ঘটনার প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় আসল কথা নয়, আসল কথা হলো এই, তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহই তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

## বীর মাউনার হত্যাকাণ্ড

নজদের বনু আমর গোত্রের নেতৃস্থানীয় এক মাথামোটা ব্যক্তির নাম আমীর ইবন আত-তুফাইল। তার না ছিল চিন্তাশক্তি, আর না ছিল সুবুদ্ধি। কিন্তু ঔদ্ধত্য ছিল আকাশছোঁয়া। সে সমগ্র আরবের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। অথচ নিজের গোত্রের নেতাও সে নয়। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ একবার প্রস্তাব দিল,

*'হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, আপনি এই শহরের রাজা হবেন এবং আমি হবো বেদুইনদের শাসনকর্তা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, আপনি আমাকে আপনার মৃত্যুর পর খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে যাবেন। আর শেষ প্রস্তাব হচ্ছে আমি বনু গাতফানের এক হাজার পুরুষ আর এক হাজার নারী নিয়ে আপনার উপর হামলা করবো।'*

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাত্তাই দেননি। তার একটি প্রস্তাবেও রাজি হননি। এর সূত্র ধরে সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে একদিন সেই বনু আমর গোত্রের প্রধান নেতা আবু বারা আমীর ইবন মালিক রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উপহার নিয়ে আসে। সে বললো, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি নজদের লোকদের মাঝে আপনার সাহাবিদের পাঠান, তাহলে আমার বিশ্বাস তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।' সে নিজে মুসলিম না হলেও ইসলামের প্রতি বেশ আন্তরিক ও আগ্রহী ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নজদে পাঠাতে ভরসা পেলেন না। কারণ তার কিছুদিন আগেই প্রতারণা করে দশ জন সাহাবিকে আর-রাজীতে হত্যা করা হয়েছে। আবু বারা তখন সেই সাহাবিদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ৭০ জন সাহাবি পাঠালেন। এদের বলা হতো আল-কুররা, অর্থাৎ 'কুরআন তিলাওয়াতকারী'। তারা দিনের বেলা কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর রাতের বেলা ক্বিয়ামুল লাইলে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এটাই ছিল তাঁদের জীবনযাপনের ধরন। তাদেরকে নজদে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠানো হলো।

আমীর ইবন আত-তুফাইল ছিল গোত্রনেতা আবু বারার ভাতিজা। সাহাবিদের আগমনের খবর শুনে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে তার চাচার কথার বিরুদ্ধে গিয়ে বনু সুলাইম গোত্রের লোকদের নিয়ে সত্তর জন সাহাবির উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। একশোর উপরে তীরন্দাজ যোগাড় করে সে বি'র মাউনা জলাশয়ের কাছে সাহাবিদের উপর হামলা চালালো। সাহাবিরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে লড়াই করলেন। ৭০ জনের মধ্যে এক জন ছাড়া সবাই শহীদ হয়ে গেলেন।

শুধুমাত্র একজন ক্বুরার জীবন বেঁচে গিয়েছিল। তিনি হলেন আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরি। তারা তাকে বন্দী করলেও মুযার গোত্রের হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়। আমীর ইবন তুফাইলের মা শপথ করেছিল যে, সে মুযার গোত্রের এক লোককে মুক্ত করবে। তাই মায়ের শপথ রক্ষার্থে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পৌঁছালে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। সেই সমাজে সত্তর জন সাহাবির মৃত্যু সহজে মেনে নেওয়ার মতো কোনো খবর ছিল না। তারা ছিলেন ইসলামের দাঈ। কিন্তু তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই সত্তর জন সাহাবি যেনতেন কেউ ছিলেন না। তারা কুরআন অধ্যয়ন করতেন। রাতের বেলা একসাথে বসে কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করতেন। আর দিনের বেলা মসজিদে পানি নিয়ে আসতেন। কাঠ বিক্রি করে সেই টাকা আহলুস সুফফার জন্য ব্যয় করতেন। তারা ছিলেন সবাই উঁচু পর্যায়ের সাহাবি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ কুনূত পড়া শুরু করলেন। দুআ কুনূত পড়ার এটিই ছিল প্রথম ঘটনা। ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা -- সব ওয়াক্তের সালাতেই তিনি দুআটি পড়লেন। টানা কয়েক মাস ধরে প্রত্যেক সালাতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দুআ করলেন। তিনি দুআ করলেন সুলাইম গোত্রের বিভিন্ন উপগোত্র রা'ইল, যাকওয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে। তারা এই মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করেছিল এবং তাদেরকে ঠাণ্ডা

মাথায় হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ দুআর ফল তারা পেয়েছিল। শত্রুদের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আলোচনা হবে ষষ্ঠ হিজরির অংশে।

## শিক্ষা

### #১ রাসূলুল্লাহর ﷺ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশল

অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুকে অপ্রস্তুত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধের একটি নিয়মিত কৌশল। এভাবে তিনি শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিতেন এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে দিতেন। বনু আসাদ গোত্র ভাবতেই পারেনি তারা আক্রমণ করার আগে মুসলিমরা তাদের উপর এভাবে প্রচণ্ড হামলা চালাবে। অথচ এরাই কিনা মাত্র উহুদে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। এই আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

### #২ গুপ্তহত্যার কারণ

অনেক মানুষ বিশ্বাসই করতে চায় না রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়েছেন। আসলে এই ধরনের রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল অহেতুক রক্তপাত বন্ধ করা। খালিদ ইবন সুফিয়ানের পুরো গোত্রের সাথে যুদ্ধ না করে শুধু তাদের নেতা খালিদকেই হত্যা করা হয়েছিল। তার গোত্রের অন্য লোকেরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যুদ্ধ করতে তেমন আগ্রহী ছিল না। কিন্তু খালিদ ইবন সুফিয়ান ছিল এতটাই শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি যে, তার কথায় বাকিরাও যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হতো। সে ছিল নাটের গুরু, যাবতীয় কলকাঠি সে-ই নাড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার পুরো গোত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এবং তিনি তা-ই করেছিলেন। ফলে হুযাইল গোত্র যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে দেয়। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সময়ে হত্যা করার মাধ্যমে পুরো বিষয়টা মোটামুটি রক্তপাতহীনভাবে সমাধান হয়ে যায়।

### #৩ সুন্নাহর প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি

খুবায়েব ؓ যখন কুরাইশদের হাতে বন্দী, মৃত্যু তখন তার দরজায় কড়া নাড়ছে। তিনি জানতেন আর কিছুদিন পরেই তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তবুও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ ছাড়তে চাননি। আর তাই নাভির নিম্নাংশ পরিষ্কার করার জন্য ব্লেড চেয়েছেন। সাহাবিরা কোনো সুন্নাহকে 'ছোটখাটো মনে করতেন না। তারা সব সুন্নাহ পালনে সচেষ্ট ছিলেন।

### #৪ 'কাবার রবের শপথ! আমি সফল হয়েছি!'

বি'র মাউনার মিশনে মুসলিমদের আমীর ছিলেন হারাম ইবন মিলহান ؓ। তাকে হঠাৎ করে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি যখন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তখন আমীর ইবন আত-তুফাইল তার এক লোককে ইশারায় হত্যার নির্দেশ দেয়। যে লোকটিকে ইশারা করা হয়েছিল তার নাম জাব্বার। জাব্বার হঠাৎ করে হারামের ؓ পিছনে বর্শা

দিয়ে আঘাত করলো, বর্শার ফলা হারাম ইবন মিলহানের বুক ভেদ করে বের হয়ে এল। হারাম ﷺ তখন বলে উঠলেন, 'কাবার রবের শপথ! নিশ্চয়ই আমি সফল হয়েছি!'[25] মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর রক্তাক্ত এক লোক, আর সে কিনা বলছে সে সফল হয়েছে! এ কথার অর্থ কী! ঘটনাস্থলে উপস্থিত সবাই বিস্মিত। তাদের চোখেমুখে অবিশ্বাস! তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না একটা মানুষ মারা যাচ্ছে আর সে বলছে সে সফল!

কথাগুলো হত্যাকারী জাব্বারের জন্য ছিল একটা বিরাট ধাক্কা। সে পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিল। তার মুসলিম হওয়ার কাহিনী সে নিজেই বর্ণনা করেছে, 'আমি তাকে পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম আর সে বলে উঠলো, 'কাবার রবের শপথ! আমি সফল হয়েছি!' আমি খুব অবাক হলাম, এই কথা সে কেন বললো? অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এই কথা দিয়ে সে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে। তারা বললো, তিনি শহীদি মৃত্যু লাভ করেছেন তাই নিজেকে সফল বলছেন। তারা আমার কাছে বুঝিয়ে বললো শহীদ মানে কী। আমি সব শুনে বললাম, সে ঠিকই বলেছে। আসলেই সে সফল হয়েছে।' এই ঘটনার সূত্র ধরেই জাব্বার মুসলিম হয়ে যায়।

হারাম ইবন মিলহান ﷺ ছিলেন একজন শহীদ এবং একই সাথে দাঈ। মৃত্যুর সময় তার বলা কথাগুলোও ছিল ইসলামের দিকে দাওয়াত। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করে গেছেন। আর তার বলা কথাগুলো অনুধাবন করতে পেরে খোদ তার হত্যাকারীই ইসলাম গ্রহণ করে।

## #৫ আবদুল্লাহ ইবন উনাইসের ﷺ সালাত থেকে শিক্ষা

আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ছিলেন একটি গুপ্তহত্যার অপারেশনে। তিনি ভয়ে কাঁপছেন, কিন্তু ঠিকই হেঁটে হেঁটে সালাত আদায় করেছেন। সালাতের ব্যাপারে সাহাবিদের এতটুকু ঢিলেমি ছিল না। সাহাবিদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলা হলো যে, সেসময়ের একেকটি দিন একেকটি বছরের সমান হবে। তখন তাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল, এক বছরের সমান দিনে তারা কীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবেন। একটি দিন কীভাবে এক বছরের সমান হতে পারে, সেই আলোচনা বা কুতর্কে তারা যাওয়ার চেষ্টাই করেননি। অথচ এটাই আমরা সচরাচর করে থাকি। আমরা অতি সামান্য অজুহাতে, অসুস্থতায় সালাত ছেড়ে দিই বা কাযা করি। অথচ আবদুল্লাহ ইবন উনাইস এর চাইতেও শতগুণ কঠিন পরিস্থিতিতে সালাত আদায় করেছেন।

## #৬ হাসসান ইবন সাবিতের ﷺ মিডিয়া যুদ্ধ

বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আমীর ইবন আত-তুফাইলের বিরুদ্ধে হাসসান

---

[25] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ইমারাহ, হাদীস ২১২।

ইবন সাবিত ব্যাপক মিডিয়া ক্যাম্পেইন শুরু করেন। তিনি বি'র মাউনার বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে একের পর এক কবিতা লেখেন। কবিতার মাধ্যমে বনু আমর গোত্রের নেতা আবু বারার ছেলে রাবীয়াহকে ক্ষেপিয়ে তোলেন যেন সে তার চাচাতো ভাই আমীর ইবন তুফাইলের উপর প্রতিশোধ নেয়। কেননা এই আমীর ইবন তুফাইল তার বাবার বিরুদ্ধাচারণ করে মুসলিমদের হত্যা করেছে। পুরো বিষয়টা আবু বারার জন্য বেশ মানহানিকর ছিল। হাসসানের লেখা কবিতা আরবদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। রাবীয়াহর মর্যাদা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। কীভাবে সে তার পিতার অপমানে চুপ থাকতে পারে? সে সিদ্ধান্ত নেয় আমীরকে মেরে হত্যা করবে। হত্যার উদ্দেশ্যে সে তরবারি নিয়ে আমীরকে আঘাতও করে। আমীর আহত হয়, তবে বিষয়টা আর বেশিদূর গড়ায়নি। আমীর পরবর্তীতে বাজে ধরনের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। একসময়ে যে আরব জয়ের স্বপ্ন দেখতো, সে আমীর একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। প্লেগ সংক্রমণের ভয়ে সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। একাকি, ক্লান্ত আর হতাশ আমীর পাগল অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়।

### #৭ কষ্ট ছাড়া বিজয় আসে না

আর রাযী এবং বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ড থেকে এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। উহুদের পরাজয়, এরপর চারপাশে গোত্রের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা, আচমকা হামলার পরিকল্পনা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অনেকগুলো মুসলিম প্রাণের ঝরে যাওয়া -- এগুলো কিছুই সাহাবিদের দমাতে পারেনি। তারা জানতেন, এই ত্যাগ, এই রক্তের মাধ্যমে বিজয় আসবে। সবকিছুরই একটি মূল্য আছে। আর বিজয়েরও মূল্য আছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে পরাজয়গুলো হলো মূল্য। আর বিজয়গুলো হলো সেই মূল্যের বিনিময়ে প্রাপ্তি।

# কিছু টুকরো ঘটনা

## উম্মুল মাসাকীনের সাথে বিয়ে

লোকে তাকে ডাকতো উম্মুল মাসাকীন বা গরীবের মা। তিনি মদীনার গরীব লোকদের খোঁজ খবর রাখতেন, খাওয়াদাওয়া, টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। তার আসল নাম হলো যাইনাব বিনত খুযাইমাহ ﵂। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিয়ের আগে যাইনাব ﵂ ছিলেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের ﵁ স্ত্রী। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করে নেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যাইনাব বিনত খুযাইমাহর সংসার স্থায়ী হয় নয় মাস। এরপর যাইনাব মারা যান। তাই তার ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়। এই বিয়ের পেছনে রাসূলুল্লাহর ﷺ উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কল্যাণ। উম্মাহর প্রতি আল্লাহর রাসূল সবসময় সহমর্মী ছিলেন। সাহাবিরাও চাইতেন না কোনো মহিলা স্বামী বা পরিবার ছাড়া থাকুক। ইসলামে বহুবিবাহ চালু রাখার পেছনে এটি একটি প্রজ্ঞা।

## উম্ম সালামার ﷺ সাথে বিয়ে

উম্ম সালামা ﷺ ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু মাখযুম গোত্রের। তার আসল নাম হিন্দ বিনত আবু উমাইয়্যা। ইনি-ই সেই উম্ম সালামা যার কাছ থেকে হিজরতের সময় স্বামী-সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে কাহিনী আগে আলোচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন আবু সালামার স্ত্রী। তারা ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের দম্পতি। দ্বীন ইসলামে আবু সালামার ছিল 'বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার'। খুব অল্প ক'জন সাহাবি প্রথমে হাবাশায় এবং পরে মদীনায় - এই দুই হিজরতের সুযোগ পান। আবু সালামাহ তাদের একজন। তিনি বদরে অংশ নেন, উহুদে আহত হন। উহুদের যুদ্ধে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষতটি ভালো হয়ে উঠতে শুরু করে। এরপর তিনি বনু আসাদের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এই অভিযানে সেই ক্ষতস্থান গুরুতর আকার ধারণ করে এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই দম্পতির মাঝে ছিল চমৎকার ভালোবাসার সম্পর্ক। একটা সময় তারা দু'জন অনেক কষ্টের সময় পার করেছিলেন। হয়তো সে কারণে তাদের মধ্যে গাঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়। কেমন ছিল তাদের ভালোবাসা? একদিন উম্ম সালামা তাঁর স্বামীকে বলেন,

*'শোনো, আমি রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছি। যদি কোনো মহিলার স্বামী মারা যায়, আর তখন সে মহিলা যদি আর বিয়ে না করে, আর তার স্বামী যদি জান্নাতে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের দু'জনকে জান্নাতে একত্রিত করবেন। তাই আমি চাই আমি মারা গেলে তুমি আর কোনো বিয়ে করবে না। আর তুমি মারা গেলে আমিও বিয়ে করবো না।'*

আবু সালামা ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে যেটা বলি সেটা শুনবে? আমি যদি মারা যাই, তুমি আরেকটা বিয়ে করে নিও।' এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার চাইতে ভালো কারো সাথে উম্ম সালামার বিয়ে দিও, যে তাকে কষ্ট দিবে না, তার কোনো ক্ষতি করবে না।' যখন আবু সালামাহ মারা গেলেন, তখন উম্ম সালামা বলতেন, 'আবু সালামার চেয়ে ভালো মানুষ আমি আর কোথায় পাবো?' এই মৃত্যুর কিছুদিন পরেই উম্ম সালামার দরজায় কড়া নাড়লো আবু সালামা থেকেও উত্তম একজনের প্রস্তাব। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ।

উম্মে সালামাকে ﷺ বিয়ের জন্য আবু বকরও ﷺ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ প্রস্তাবও উম্ম সালামা ফিরিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রস্তাবে তিনি খুশি মনে রাজি হলেন, কিন্তু বললেন, 'খুবই উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু আমার মধ্যে অনেক ঈর্ষা কাজ করে। তাছাড়া আমার ছোট ছোট সন্তান আছে আর আমার অভিভাবকদের কেউ তো উপস্থিত নেই।' উম্ম সালামা নিজের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে ধারণা দিতে চাইছিলেন। তিনি বলতে চাইছিলেন, তিনি কিছুটা 'অভিমানী' গোছের, তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্য স্ত্রীদের নিয়ে তার মধ্যে ঈর্ষা কাজ করতে পারে। এছাড়া তার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে যাদের দেখাশোনা করা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য বোঝা হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে

বললেন, 'তুমি বলেছ তোমার ছেলে মেয়ে রয়েছে, আল্লাহই তাদের দেখাশোনা করবেন। তুমি ঈর্ষার কথা বলেছো, আল্লাহর কাছে আমি দুআ করি তিনি যেন তা দূর করে দেন। আর তোমার ওয়ালিরা অনুপস্থিত হলেও তাদের কেউই আমাকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।'

বিয়ের পর উম্মে সালামাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে সে পরিমাণ আসবাবপত্র দেবো যতটুকু যাইনাবকে দিয়েছি। তোমাকে আমি দুটো যাঁতাকল, দুটো মাটির কলস আর একটি পাতা দিয়ে ঠাসা চামড়ার বালিশ দেবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তখন একটি রাষ্ট্রের অধিপতি। চাইলে বিভিন্ন যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মালের একটা বড় অংশ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারতেন, কারো কিছু বলার থাকতো না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর নবী হিসেবে 'আরামদায়ক জীবনযাপন' তো তারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি একান্তই সাদামাটা, ছিমছাম জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

বিয়ে হলো। কিন্তু উম্ম সালামার ﷺ কোলে তখন আবু সালামার সন্তান বাররাহ। তার নাম পরে বদলে রাখা হয় যাইনাব। বাররাহ তখন দুধের শিশু, তাই নববধূর সাথে রাসূলুল্লাহ একান্তে সময় কাটাতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন লাজুক, মুখ ফুটে বিষয়টা বলতেও পারছিলেন না। বিষয়টি খেয়াল করলেন তাঁরই সাহাবি আম্মার ইবন ইয়াসির। তিনি ছিলেন উম্ম সালামার দুধ ভাই। তিনি বোনের কাছ থেকে বাররাহকে নিয়ে অন্য এক মহিলার কাছে রেখে আসলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে পারেন। রাসূলুল্লাহ যেমন করে সাহাবিদের দিকে খেয়াল রাখতেন, সাহাবিরাও রাসূলুল্লাহর সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখতেন।

এরপর নবীজি উম্ম সালামার সাথে তিন দিন কাটালেন। তিনি ﷺ বলেছেন, 'নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয় তাহলে সাতদিন, আর যদি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হয়, তাহলে তিন দিন।' অর্থাৎ কেউ যদি একের অধিক বিয়ে করে, তাহলে নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয় তাহলে তার সাথে প্রথমে সাতদিন কাটাবে, আর বিধবা হলে তিনদিন। এরপর থেকে সব স্ত্রীর সাথে পালা করে সমান সময় দিতে হবে।

উম্ম সালামা ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী নারী। তার বুদ্ধিমত্তার ছাপ পাওয়া যায় হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন প্রায় ৩৮৮টি হাদীস। এগুলোর অনেকগুলোই নবীজির ﷺ একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকি ঘটনা। এগুলো পুরুষ সাহাবিদের জানার কোনো সুযোগ ছিল না। এই বিয়ে ছিল স্বামী-হারা উম্ম সালামার জন্য একটা আশ্রয়স্থল। এই বিয়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের পরিবারকে ভুলে না যাই। তাদের দেখাশোনা করি ও দায়িত্ব নিই।

## হাসানের ﷺ জন্ম

একই বছর, চতুর্থ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাতি হাসান ইবন আলী

ইবন আবি তালিব ﵁। এই খুশির খবরটি নিয়ে আলী ﵁ নবীজির কাছে গেলেন। নবীজি জানতে চাইলেন তার সন্তানের নাম কী রাখা হয়েছে। আলী ﵁ বললেন, 'হারব', হারব অর্থ যুদ্ধ। রাসূল ﷺ বললেন, 'না! সে হাসান।' নামের অর্থে কাঠিন্য থাকা রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাতির কানে আজান দিলেন। মেয়ে ফাতিমাকে ﵂ বললেন সন্তানের মাথা মুড়িয়ে দিতে, এরপর মুড়ানো চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদাকাহ করে দিতে। পরে আক্বীকার সময় তিনি ﷺ দুটো ভেড়া কুরবানি করলেন।

## যাইদ ইবন সাবিতের ﵁ ভাষাশিক্ষা

একই বছরের ঘটনা, রাসুলুল্লাহ ﷺ যায়িদ ইবন সাবিতকে ﵁ ডেকে বললেন, 'যাইদ, তুমি হিব্রু ভাষা শিখে ফেলো। আমি ইহুদিদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।' রাসূল ﷺ যেসব চিঠি পেতেন, অথবা কারো কাছে লিখে পাঠাতেন সেগুলো ইহুদিরা তাকে পড়ে শুনাতো কারণ তাদের পড়াশোনা ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন বিশ্বস্ত মুসলিমকে নিয়োগ দিতে চাইলেন। কারণ ইহুদিদের উপর থেকে তিনি ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে যায়িদ ﵁ মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে হিব্রু ভাষা রীতিমতো রপ্ত করে ফেললেন!

সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ যে কোনো আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আরবি ভাষা শিখতে আগ্রহী ভাই বোনদের জন্য নিঃসন্দেহে এই ঘটনা একটা বড় অনুপ্রেরণা। কোনো কাজে পদক্ষেপ নিতে বছরের পর বছর সময় লাগিয়ে দেওয়া উচিত নয়। মুসলিমদের জন্য আরবি ভাষা শেখা অনেক জরুরি। আরবি ভাষা থেকে দূরত্বের কারণে ইসলাম থেকেও মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইসলামী শরীয়াহর মূল দুটি উৎস, কুরআন এবং হাদীস; দুটোই আরবি। আরবি না জানলে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন। যদি যায়িদ ﵁ একটি বিদেশী ভাষা ১৫ দিনের মাথায় শিখে ফেলতে পারেন, তাহলে সে ভাষা শেখার ব্যাপারে কী অজুহাত থাকতে পারে যে ভাষা মুসলিমদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়?

# বনু নাযিরের যুদ্ধ

কাব ইবন আশরাফের হত্যাকাণ্ড ছিল মদীনার ইহুদিদের জন্য একটা কঠিন সতর্কবার্তা। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। ইহুদিরা সেদিন থেকেই তাদের অবস্থান নিয়ে বেশ ভীত ছিল। এছাড়া তাদের বন্ধুগোত্র বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উহুদে মুসলিমদের পরাজয়, আর তার কিছুদিন পরেই আর-রাযী এবং বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে তারা কিছুটা আশার আলো দেখতে পায়। তারা মুসলিমদের মনে মনে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। যদিও সরাসরি তারা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাদের কাজ বলে দিচ্ছিল তারা মুসলিমদেরকে আর আগের মতো সমীহের চোখে দেখে না।

আর তাই সুযোগ বুঝে একদিন তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই তারা মদীনাকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়।

## সূত্রপাত

বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি উমাইয়্যা আদ-দামরি বি'র মাউনা থেকে মদীনায় ফিরছিলেন। পথেই বনু আমর গোত্রের দুই লোকের সাথে দেখা। এই বনু আমর গোত্রই বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। ৭০ সাহাবিকে হারিয়ে উমাইয়্যা তখন শোকে কাতর। মনের মধ্যে ক্ষোভ দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রতিশোধ নেওয়ায় সুযোগ এভাবে সামনে এসে পড়বে ভাবেননি। তিনি বনু আমরের লোক দুটোকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেললেন।

তার মনে হলো তিনি ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু এটা তার জানা ছিল না যে, এই দুই লোক বনু আমরের হলেও তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। রাসূল ﷺ এ ঘটনা শুনে বললেন, 'তুমি এমন দুই লোককে হত্যা করেছ যাদের জন্য আমাকে রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে।'[26] রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কথার বরখেলাপ করতেন না। ওয়াদা করলে পূরণ করতেন। তিনি রক্তপণ দিলেন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান লক্ষণীয়, কোনো কাফিরকে হত্যার জন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হয় না। উমাইয়্যা ﷺ এমন দুজন লোককে হত্যা করেন যাদের হত্যা করা ছিল বেআইনি। কিন্তু এর শাস্তিস্বরুপ তাকে হত্যা করা হয়নি, বরং রক্তপণ শোধ করতে হয়েছে।

রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে ইহুদিদের চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী, রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল। বনু আমরের এই দু'লোককে হত্যা করার পর তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে ইহুদিদের বনু নাযির গোত্রের কাছে গেলেন।

## হত্যাচেষ্টা

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অভ্যর্থনা জানালো, অভিনয় করলো রাসূলুল্লাহর আগমনে তারা খুব খুশি। রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি দেওয়ালের পাশে বসে বললেন, 'বনু আমরের দুই লোককে ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে। তাদের রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করছি।' তারা রাজি হবার ভান করলো। টাকা নিয়ে আসার কথা বলে ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলো কীভাবে রাসুলুল্লাহকে ﷺ মেরে ফেলা যায়। একজন বললো, 'এমন সুযোগ আর কক্ষণো পাবো না! উনি আজকে দেওয়ালের ঠিক পাশেই বসেছেন! ছাদে উঠে একটা পাথর ফেললেই খেল খতম! আহ! তারপর সারাজীবনের মুক্তি!'

---

[26] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪।

ইহুদিরা সবসময়ই এমন--মুখে এক আর মনে আরেক। কিন্তু তাদের দুরভিসন্ধির কথা জিবরীল ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানিয়ে দেন। তিনি কাউকে কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন এবং মদীনায় চলে যান। সাহাবিরা তাঁর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, পরে তারাও মদীনা ফিরে আসলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন,

> "হে মু'মিনগণ, তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নিআমত, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের ওপর হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ১১)

এর আগেও ইহুদিরা বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। এর আগে তারা আহলুস-সুফফার এক মুসলিমকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাদের নেতা মূসা ইবন উক্বাহ উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের গোপনে সাহায্য করেছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা মুসলিমদের বদর এবং উহুদে সাহায্য করেনি। উল্টো তাদের নেতা সালাম ইবন মিশকাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানে তাদের স্পর্শকাতর তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এবং আবু সুফিয়ানকে আতিথেয়তা করে।

এসব কিছু সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেননি। যদিও এগুলো ছিল মদীনা সনদের লঙ্ঘন। কিন্তু এবারের ষড়যন্ত্র সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং তারচেয়েও মারাত্মক। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। বনু নাযির গোত্রকে দশ দিনের আল্টিমেটাম দেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

> *'আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। তিনি আদেশ করেছেন তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও, কারণ তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছো। আমি তোমাদের চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিচ্ছি। এরপর যদি কাউকে দেখা যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলো বনু নাযিরের কাছে পৌঁছে দেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ﷺ। কিছুদিন আগেও জাহিলিয়াতের যুগে এই মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহই ছিলেন বনু নাযির গোত্রের বন্ধু। তারা তাকে দেখে অবাক! 'আমরা ভাবতেই পারিনা যে তুমি আমাদের কাছে এই রকম একটা খবর আনতে পারো।' জবাবে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ বলেন, 'এখন আর সেই দিন নেই। ইসলাম আমাদের বদলে দিয়েছে। অতীতের সমস্ত বন্ধুত্ব আর মিত্রতা বাতিল হয়ে গেছে।' তার কাছে এখন ইসলামই সব। তার সমস্ত আনুগত্য এখন আল্লাহর জন্য। কে আগে বন্ধু ছিল, কে মিত্র ছিল, সেসব দেখার সময় নেই। তারচেয়ে অনেক বড় হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মর্যাদা আর

আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা।

## দশ দিন পর...

ইহুদিরা বরাবরের মতোই ছিল কাপুরুষ প্রজাতির। আল্টিমেটাম পেয়ে প্রথমে তারা চলে যেতে রাজি হয়। কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ালো তাদের 'আধ্যাত্মিক ভাই', মুনাফিক্বদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে বললো,

*'তোমরা দৃঢ় থাকো! প্রতিরোধ গড়ে তোলো! আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তোমাদের আক্রমণ করা হলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো! তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে চলে যাবো! আমার সাথে আমার গোত্রের ও আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে আরও দুহাজার লোক আছে যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শত্রুরা তোমাদের আক্রমণ করলে তারা তোমাদের জন্য জান দিতে প্রস্তুত!'*

লক্ষণীয়, আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইসলাম গ্রহণের আগে ছিল মুশরিক আর বনু নাযির গোত্র হচ্ছে ইহুদি। কিন্তু মুসলিমদের বিরোধিতায় তারা একেবারে গলায় গলায় ভাই হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের আশ্বাস পেয়ে বনু নাযিরের ইহুদিরা কিছুটা সাহস পেল, বলা চলে একরকম ঝোঁকের মাথায় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

আল্টিমেটামের দশ দিন শেষ। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বনু নাযির গোত্রের দুর্গ অবরোধ করলেন। বনু নাযির গোত্র ততদিনে বেশ ধনী হয়েছে। তাদের নিজেদের দুর্গ আছে। দুর্গের বাইরে প্রচুর আবাদি জমি, বিশাল খেজুরের বাগান। এগুলোর উপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করতো। তারা আশা করছিল মুসলিমরা অবরোধ করতে করতে একসময় ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। অবরুদ্ধ অবস্থাতেও অনেক দিন টিকে থাকার মতো অবস্থা তাদের ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন যা তাদেরকে পুরোপুরি হতবুদ্ধি করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ তাদের খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে তো তারা আতঙ্কে অস্থির। মদীনাতে তাদের আছেই হলো এই জমি। সেই জমিই যদি আগুনে পুড়ে যায় তাহলে মদীনায় থেকে কী লাভ! এদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বনু নাযীরের সাহায্যার্থে একটি আঙুলও তুললো না। বনু নাযীর হতাশ হয়ে গেল।

মরার আগে মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমনি শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগলো, 'এই মুহাম্মাদ লোকটাই তো ফিতনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলা করতে নিষেধ করতো! গাছ কাটতে নিষেধ করতো! আর এখন তো সে নিজেই এই কাজ করছে! আমাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলছে, পুড়িয়ে ফেলছে!' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই প্রোপাগান্ডায় কোনো পাত্তা দিলেন না। তারা পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়লো।

বনু নাযির আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো যেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হলো, সহায় সম্পদ নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন, তবে কয়েকটি শর্ত দিলেন। এক, সাথে কোনো অস্ত্র নেয়া যাবে না। দুই, একটা উটের পিঠে যতটুকু মাল বহন করা যায় শুধু ততটুকু মালামালই নেওয়া যাবে। তিন, প্রতি তিন জনের জন্য একটি করে উট বরাদ্দ।

পুরো ব্যাপারটি দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহর ওপর। ইহুদিরা ছিল পয়সার পাগল। একটা উটের পিঠে যে যত পারছে ভরছে। কেউ কেউ তো ঘরের দরজার চৌকাঠ ভেঙে উটের পিঠে তুলে নিল! দেখার মতো দৃশ্য। টাকার কুমীর ইহুদি সাল্লাম ইবন আবি হুক্বাইক ষাঁড়ের চামড়া সোনা রূপা দিয়ে ভরে ফেলে। যাবার সময় আবার দম্ভভরে বলে, 'হুম! এভাবেই আমরা নিজেদের পৃথিবীর যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেছি। এখানে খেজুর বাগান ছেড়ে যাচ্ছি তো কী হয়েছে, খাইবারে গিয়ে আবার তা ফিরে পাবো।'

হেরে গিয়েও কত গর্ব, কত ভান! কিছুই যেন হয়নি। ইহুদি গোত্রগুলোর চোখে বনু নাযির অনেক সম্মানিত গোত্র, সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। তারা চাচ্ছিল তাদের এ লজ্জাজনক নির্বাসনে কেউ তাদের নিয়ে হাসাহাসি না করুক। মুসলিমরা যেন তাদের এই পলায়ন উপভোগ করতে না পারে এজন্য তারা তাদের বহরের পেছনে গায়িকাদের দিয়ে গান-বাজনা করাতে করাতে ভেগে গেল।

কাপুরুষ পরাজিত বনু নাযির গোত্রের একটি অংশ চলে গেল শামে, আরেকটি অংশ গেল খাইবারে। খাইবারে তাদের বরণ করা হয় বীরের মতো করে। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে মহিলা আর কমবয়সী বাচ্চারা নেমে আসে। উপহার দিয়ে, খঞ্জনী আর বাঁশি বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে গর্ব আর অহংকারের সাথে তাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। সে যুগে আর কোনো পরাজিত গোত্রকে এভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই।

## শিক্ষা

### #১ কাফিরদের মনে ত্রাস

এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে একটি পুরো সূরা নাযিল হয়েছিল যার নাম সূরা হাশর। ইবন আব্বাস ﷺ একে 'বনু নাযিরের' সূরা বলেও অভিহিত করতেন।

> "আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তিনিই তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। তোমরা ধারণাও করোনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে আসলো যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি

> তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, ফলে তারা তাদের বাড়ী-ঘর আপন হাতে ও মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" (সূরা হাশর, ৫৯: ২)

কি মুসলিম কি ইহুদি, কোনো পক্ষই আশা করেনি ইহুদিরা চলে যেতে বাধ্য হবে। মুসলিমরা ভেবেছিল ইহুদিরা অনেক শক্তিশালী, ইহুদিরাও ভেবেছিল মুসলিমরা তাদের হারাতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিমরাই জয়ী হয় আর তা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে। আল্লাহ তাদের বহিষ্কার করে দেন।

কোনো বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের দুর্বলতা থাকবেই. আর কার দুর্বলতা কোথায় তা আল্লাহ তাআলা ভালোই জানেন। কোনো জাতি যদি নিজেদের খুব শক্তিশালী কিছু মনে করে, যদি মনে করে যে আমাদের কাছে পারমাণবিক শক্তি আছে, সবার চেয়ে বেশি মারণাস্ত্র আছে, আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন -- আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আল্লাহ তাদের এমন এক দুর্বল দিকে আঘাত করবেন যা তারা কল্পনাও করে না। আল্লাহ তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবেন।

একবার যখন মনে ভয় ঢুকে যায়, তখন অস্ত্রশস্ত্র বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা কিছুই কাজে আসে না। ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেছিলেন, 'রোমান ও পারসিকদের ছিল শক্তিশালী দৈহিক গঠন। সংখ্যায় তারা ছিল অধিক। মুসলিমদের চাইতে তাদের ছিল অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাদের ছিল না মনোবল। একারণে তারা হেরে যেত। আর যুদ্ধে জিততে মনোবলই সবচে বেশি দরকার।' সাহাবিদের অন্তরে ছিল ঈমান। এই ঈমান তাদের আল্লাহর পথে অটল-অবিচল রেখেছিল। আর আল্লাহর শত্রুদের মনে ছিল দুনিয়াপ্রীতি, আর একারণেই তারা হেরে গিয়েছিল।

### #২ জিহাদের নিয়মে ব্যতিক্রম

> "তোমরা যে সব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ। তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।" (সূরা হাশর, ৫৯: ৫)

ইসলামে গাছ কাটা নিষেধ, তবুও কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছ কাটার আদেশ দিয়েছিলেন? অথচ তিনি নিজেই এই কাজ করতে নিষেধ করতেন। বিষয়টা নিয়ে ইহুদিরা বেশ জল ঘোলা করার চেষ্টা করে। এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, এটি করা হয়েছিল আল্লাহর অনুমতিতে। কিন্তু কেন? আল্লাহই তা ব্যাখ্যা করছেন। তা এজন্য যে, 'আল্লাহ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, যুদ্ধের সময় গাছপালা কাটা যাবে না, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ লোকদেরকে হত্যা করে যাবে না, আশ্রমে বসবাসরত সন্ন্যাসীদের হত্যা করা যাবে না। কিন্তু এই বিধানগুলির প্রত্যেকটিরই ব্যতিক্রম আমরা আল্লাহর রাসূলের জীবনে দেখি। যেমন, বনু নাযিরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর গাছ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাইফের অভিযানে

রাতের বেলা কাফিরদের বাসায় আক্রমণ করা এবং তাদের অধিবাসীদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। এটা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দু'জন মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এদের একজন ছিল এক ইহুদি মহিলা। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। সালাহউদ্দীন আইয়ুবি رحمه الله ক্রুসেডারদের প্রতি বেশ সহনশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি শত্রুপক্ষের কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি যেমন টেম্পলারদের (যারা মূলত ছিল ধর্মযোদ্ধা) ছেড়ে দিতেন না। তাদের তিনি হত্যা করতেন, গীর্জার পুরোহিত হলেও হত্যা করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি শরীয়াহ লঙ্ঘিত হচ্ছে না? এই বৈপরীত্যের জবাব কী?

ইসলাম সহনশীলতার দ্বীন। কিন্তু এই সহনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা সুবিধা নেবে এবং মুসলিমদের ক্ষতি করবে -- সেই অনুমতি ইসলাম দেয় না। ইসলামী জিহাদের কিছু নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু শত্রুরা যখন জিহাদের কোনো নীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সুবিধা নিতে চায়, তখন সেসব নীতি স্থগিত রাখা হয়। শত্রুরা যদি জিহাদের কোনো নীতি ব্যবহার করে পুরো জিহাদকে থামিয়ে দিতে চায় বা জিহাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাহলে পরিস্থিতির বিচারে মুসলিমদের জন্য সেসব নীতিকে স্থগিত করার অনুমতি রয়েছে।

যেমন, সাধারণভাবে গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও উপরোক্ত পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ গাছ না কাটার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইহুদিরা নিরাপদে টিকে থাকার সুযোগ পাচ্ছিল। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ রেখেও তাদের বাগে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে তারা যে অপরাধ করেছিল, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার ষড়যন্ত্র -- সে কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই ইসলামের বিধান মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ ইহুদিদের দেওয়া হয়নি। এটি ছিল সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম।

### #৩ নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন

> "আল্লাহ তাদের (ইহুদিদের) নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন তোমরা তার জন্য কোন ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অভিযান পরিচালনা করনি। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যাদের ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা হাশর ৫৯: ৬)

যুদ্ধের পর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব মালামাল লাভ করে, সেগুলোকে বলা হয় গনিমাহ'। আর কাফিরদের যে সম্পদ তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলিমরা লাভ করে সেটাকে বলা হয় 'ফাই'। বদর যুদ্ধে মুসলিমরা 'গনিমাহ' লাভ করেছিল আর বনু নাযিরের অবরোধের পর মুসলিমরা লাভ করে 'ফাই'। কারণ বনু নাযিরের সাথে কোনো যুদ্ধ হয়নি। অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়াই মুসলিমরা এসব সম্পদ লাভ করেছে। এই সম্পদের ব্যাপারে কী করা হবে তা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পাঁচ

ভাগের চার ভাগ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার যে নীতি -- সেটি ছিল গনিমাহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বনু নাযিরের ফেলে যাওয়া এই সম্পদগুলো আল্লাহর রাসূলের হাতে এল। এগুলোর মাঝে ছিল খেজুর বাগান আর ক্ষেতখামার। এগুলো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যায়। এগুলো থেকে তিনি ইচ্ছামতো ব্যয় করার অধিকার রাখেন। যদিও তিনি সমস্ত সম্পত্তি নিজের কাজে ব্যবহার করেননি। যখন সুযোগ পেয়েছেন গরীব এবং অভাবিদেরকে সাহায্য করেছেন। বনু নাযিরের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের ডেকে একটা প্রস্তাব দিলেন,

> *'যদি তোমরা চাও তাহলে আমি এই সম্পত্তি তোমাদের সবার মাঝে বণ্টন করে দেবো। সেক্ষেত্রে মুহাজিররা তোমাদের বাড়ি ঘরেই থেকে যাবে এবং তোমাদের ক্ষেত খামারে কাজ চালিয়ে যাবে। আর তোমরা যদি চাও তাহলে এই সম্পত্তিগুলো শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেবো। সেক্ষেত্রে তারা তোমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এবং তোমাদের শস্যের কোনো ভাগ নেবে না।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন আনসারদের উপর কষ্ট কিছুটা লাঘব হোক। আনসারদের দুই নেতা সাদ ইবন মুআয এবং সাদ ইবন উবাদা এই প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আমরা চাই তারা বরং আমাদের সাথেই থাকুক। আর অর্থসম্পদ যা আছে সেসবও তাদেরকেই দিয়ে দিন।'

কীভাবে পারে মানুষ এতটা উদার হতে? এত বড় মনের মানুষ হতে? নিঃসন্দেহে এই মানুষগুলো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব! সত্যিকার দয়া, মহত্ত্ব, ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারাই।

মুহাজিররা আনসারদের ঘর ছেড়ে বনু নাযিরের ঘরগুলোতে বসবাস করতে শুরু করেন। বনু নাযিরের ক্ষেত খামারগুলো শুধু মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। আনসারদের থেকে শুধু দু'জন কিছু ভাগ পেয়েছিলেন-- আবু দুজানা ؓ ও সাহল ইবন হানিফ ؓ। কারণ তারা ছিলেন দরিদ্র। বনু নাযিরের এই সম্পদের মালিকানা ছিল রাসূলুল্লাহর একার। কিন্তু তবু তিনি এগুলো ভাগাভাগি করার সময় আনসারদের ডেকে আলোচনা করেন যেন তারা সম্মানিত বোধ করে এবং বুঝতে পারেন যে, তারা আল্লাহর রাসূলের আপনজন।

ইবনে কাসির رحمه الله বলেন, 'এই যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সম্পদ লাভ করেন। এ থেকে তিনি তার পরিবারের সারাবছরের খরচ দিতেন। এরপর যা থেকে যেত, সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সামরিক খাতে ব্যয় করতেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন শুরু করেছিলেন একজন মেষ পালক হিসেবে। এরপর তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। যখন নবী হলেন, তখন অন্যান্য কাজ বন্ধ করে দাওয়াহর জন্য তাঁর সমস্ত সময় ব্যয়

করেন। খাদিজা ﵂ এবং চাচা আবু তালিবের অর্থের উপরেই নির্ভর করতেন। মদীনায় আসার পর আনসারদের দেওয়া হাদিয়ার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বনু নাযিরের যুদ্ধ থেকে অর্থ পাওয়ার পর তা থেকে এক বছর পরিবারের খরচ চালানোর জন্য অর্থ নিলেন এবং বাকি অংশ কোষাগারে ব্যয় করেন। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করার মতো কিছু অর্থ পেলেন।

## #৪ মুনাফিকরা হলো মিথ্যাবাদী আর কাফিররা হলো কাপুরুষ

> "তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্য বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১২)

কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুনাফিক্ব ও ইহুদিদেরকে 'ভাই' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই মুনাফিক্বরা ছিল মিথ্যাবাদী। ইহুদিদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেকোনো পরিস্থিতিতেই তারা তাদের পাশে থাকবে। কিন্তু সে ওয়াদা তারা পূরণ করেনি। আল্লাহ বলছেন, এই মুনাফিক্বরা কখনোই তাদের সাহায্য করতো না। এগুলো সবই তাদের মুখের কথা। আর যদি সাহায্য করতো, তবু তারা পালিয়ে যেত। এটাই মুনাফিক্বদের আসল চরিত্র। তারা কাফিরদের পক্ষে থাকে, তাদের থেকে সাহায্য কামনা করে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

> "প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি; এটা এই জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। তারা সম্মিলিতিভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, (যদি করেও, সেটা তারা করবে) কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতরে বসে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরাল থেকে। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছো, অথচ তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এই জন্যে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১৩-১৪)

কাপুরুষতা কাফির সেনাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুরক্ষিত অবস্থা ছাড়া তারা যুদ্ধ করে না। তাদের এই চারিত্রিক দিকটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে দেখা যায় যে, তারা দুর্গের ভেতরে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে যুদ্ধ করতো। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ও তাই। সিরিয়াতে ক্রুসেডারদের বানানো কিছু দুর্গ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। স্থাপত্যশৈলির বিচারে সেগুলো খুবই চমৎকার। এই দুর্গগুলোর ভেতরে থেকে তারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো। আসলে এই দুর্গগুলো তাদের অন্তরের ভীতির নিদর্শন। বর্তমান সময়েও আল্লাহর দুশমনরা ফিলিস্তিনে প্রাচীর বানিয়ে রেখেছে। এটি তাদের ভয়েরই এক প্রতিচ্ছবি। এই প্রাচীর কুরআনের আয়াতকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় -- সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ

করতে আসবে না।

আল্লাহ বলছেন, 'তাদের অন্তর শতধা বিভক্ত।' কাফির, মুশরিক, মুনাফিক্বের দল যদিও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। ইউরোপের মানচিত্রে ছোট্ট একটু জায়গায় অনেকগুলো দেশের উপস্থিতি তাদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ইঙ্গিত দেয়। বিশ্বযুদ্ধ অথবা অন্যান্য যুদ্ধগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা নিজেরা মোটেও এক জাতি নয়। কিন্তু যখনই ইসলামের ব্যাপার আসে, তখনই তারা সবাই এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাদের মাঝেও কোন্দল রয়েছে।

সবশেষে আল্লাহ তাআলা বনু নাযিরকে তুলনা করেছেন তাদের পূর্বসূরি বনু কায়নুকার সাথে। তাদেরকেও একইভাবে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের প্রতি মুনাফিক্বদের অঙ্গীকারকে তুলনা করেছেন আদম সন্তানের প্রতি করা শয়তানের অঙ্গীকারের সাথে।

> "এদের অবস্থা সেই আগের লোকদের মতো, যারা মাত্র কিছুদিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি।" (সূরা হাশর, ৫৯: ১৬-১৭)

### #৫ ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না

জাহিলিয়াতের সময় মদীনার আরবদের মাঝে একটি কুসংস্কার ছিল, কারো সন্তান যদি জন্মের পর না বাঁচে, তখন পরবর্তী সন্তানকে ইহুদি বানালে তার সন্তানরা বেঁচে থাকবে। এভাবে তাদের অনেকের সন্তানই ইহুদি হিসেবে বড় হচ্ছিল। যখন বনু নাযির গোত্রকে বহিষ্কার করা হলো তখন কিছু লোকজন রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু সন্তান ও ভাই তো তাদের সাথে রয়েছে। আমরা এখন কী করবো?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে ওয়াহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কোনো জবাব দিলেন না। অবতীর্ণ হলো সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। সত্যের পথ আর মিথ্যার পথ- দুটোই পরিষ্কার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'তোমাদের ভাই ও সন্তানদের যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বলো। তারা যদি তোমাদের পছন্দ করে তাহলে তোমাদের সাথে থাকবে। আর যদি তারা ইহুদিদের সাথে থাকতে চায়, তাহলে তাদের চলে যেতে দাও।' অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।

# যাত আর-রিক্বার যুদ্ধ

উহুদে পরাজয়ের পর মদীনার ভেতরে ইহুদিরা এবং মদীনার বাইরে নজদের গোত্রগুলো বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বনু নাযিরকে শায়েস্তা করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর তিনি মনোযোগ দেন নজদের গোত্রগুলোর দিকে। আরবের শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করাটা ছিল সময়ের দাবি। যাতুর রিক্বা অভিযান সে উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছে। নজদের গোত্রগুলো এরই মাঝে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করেছে। ৭০ জন সাহাবিকে হত্যা করেছিল নজদেরই একটি গোত্র। এর জবাবে আল্লাহর রাসূল ৪০০ সাহাবিকে সাথে নিয়ে অভিযানে বের হন, টার্গেট গাতফানের দুটো গোত্র: বনু মুহারিব এবং বনু সালাবা। এই অভিযানই ইতিহাসে যাতুর রিক্বা নামে পরিচিত। রিক্বা মানে কাপড়ের টুকরো। এই অভিযানকে কেন যাতুর রিক্বা বলা হয় -- সে জবাব দিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া এক যোদ্ধা আবু মূসা আল-আশআরি ﵁। অভিযানের বর্ণনায় তিনি বলেন,

*'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে একটি অভিযানে বের হলাম। প্রতি ৬ জনের জন্য বরাদ্দ হলো একটি করে উট। পালা করে একজন উটের পিঠে চড়ছি, বাকিরা পায়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে পা'গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, চামড়ায় ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। আমার তো নখই খসে পড়ল। আর তাই আমরা আমাদের পায়ে কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিলাম। এ জন্যই অভিযানের নাম হলো যাত আর-রিক্বা--কাপড়ের টুকরোর অভিযান।'*

## সালাতুল খওফ

এই যুদ্ধে কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না। শত্রুরা মুসলিমদের হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের পাহাড়ে পালিয়ে গেল। তাদের নারী-শিশু আর গরুবাছুর পর্যন্ত রেখে গেল। কিন্তু তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তারা হয়তো কাছেই আছে, যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন এক পন্থায় জামাতের সালাত আদায় করলেন।

> "এবং আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের নিয়ে নামায পড়বেন, তখন একদল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে; অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে, আর অপর এক দল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমাদের সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীরা কামনা করে যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় বা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা, ৪: ১০২)

এই সালাতের নিয়ম হলো, প্রথমে অর্ধেক সৈন্য ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে আর বাকিরা পাহারা দেবে। প্রথম রাকাতের পর ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রথম দল তখন নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত পড়ে সালাত শেষ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এগিয়ে আসবে, ইমামের দ্বিতীয় রাকাতের সাথে নিজেরা প্রথম রাকাত পড়বে। ইমাম বসা অবস্থায় তারা নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাত শেষ করবে। এটা নিয়ে ভিন্ন মতও আছে। এই সালাতের নাম হলো সালাতুল খাওফ।

তবে এই আলোচনায় দেখার বিষয় হলো সালাতুল খাওফের ফিকহ নয়, বরং সালাতের গুরুত্ব। সালাতের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, শত্রুর সীমানায় জীবন-মরণ অবস্থাতেও সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের জন্যই যদি এই বিধান হয় তাহলে যারা নিরাপদে আছে তাদের জন্য কী করণীয় হতে পারে? তবুও কিছু মানুষ সালাতকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ইসলামে প্রতিটি ইবাদাহর ক্ষেত্রেই শর্ত থাকে, যেমন, গরীবদের যাকাত আদায় করতে হয় না, হজ্জ পালন করতে হয় না, এখানে সম্পদ থাকা হলো শর্ত। অসুস্থ-দুর্বলদের সাওম পালন না করলেও চলে, এখানে স্বাস্থ্য হলো শর্ত। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই, একজন মুসলিমকে সালাত আদায় করতেই হবে। যদি দাঁড়াতে না পারে তবে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে মাথা নেড়ে। মাথা নাড়াতে না পারলে আঙুলের ইশারায়। আঙুল নাড়াতে অক্ষম হলে চোখের ইশারায় হলেও আদায় করতে হবে -- সালাতের কোনো মাফ নেই। সাহাবিদের জিহাদী অভিযানগুলো আমাদেরকে সালাতের গুরুত্বও শিক্ষা দেয়।

## কুরআনের প্রতি ভালোবাসা: আব্বাদ ইবন বিশর ﷺ

সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আম্মার ইবন ইয়াসির ﷺ ও আব্বাদ ইবন বিশরকে ﷺ প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। দুজন পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছেন। আম্মারের ঘুমের পালা এল, আব্বাদ ﷺ বসে না থেকে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিরআত পাঠ করছেন, এমন সময় শত্রুর একটি তীর এসে বিঁধলো। মুহূর্তের মধ্যে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কিন্তু সেদিকে আব্বাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই! তিলাওয়াত করছেন তো করছেন। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর কিরআতের সুর।

শত্রু আবারও আঘাত হানল। গায়ে বিঁধলো আরেকটি তীর, এরপর আরও একটি। তিন নম্বর তীর বিদ্ধ হওয়ার পর আম্মারকে ﷺ ঘুম থেকে ডাকলেন। আম্মার উঠে দেখলেন আব্বাদের ﷺ শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

- সুবহানাল্লাহ! আপনি এতক্ষণ আমাকে ঘুম থেকে ডাকলেন না কেন?
- সূরাটা শেষ না করে তিলাওয়াত থামাতে চাচ্ছিলাম না। আল্লাহর কসম, আজ যদি

পাহারার দায়িত্বে না থাকতাম, তাহলে সূরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত চালিয়ে যেতাম, মৃত্যু হলেও পরোয়া করতাম না।'

কুরআনের প্রতি সাহাবিদের এ এক অদ্ভুত রকমের ভালোবাসা! একটা মানুষকে একের পর এক তীর বিদ্ধ করে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে তিলাওয়াতে। আবার তিলাওয়াতে বিভোর হয়েও মানুষটা তাঁর দায়িত্ব ভোলেনি, পাহারা দেওয়ার কথা তাঁর ঠিক মনে ছিল। এভাবেই সাহাবিরা তাদের দায়িত্বের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতেন।

## রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বন্ধু: একজন তরুণ সাহাবির সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথন

জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন শহীদের সন্তান। তার বাবা উহুদের শহীদ। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাঁর অনেক সময় একসাথে কাটানোর সুযোগ হয়। ঘটনাটি জাবিরের মুখে শোনা যাক[27]:

'যাত আর-রিক্বার অভিযানে বেরিয়েছি একটা দুর্বল পাতলা উট নিয়ে। বাকিরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমি পেছনে পড়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাক দিলেন,

- জাবির! কী হলো?

- উটটার কারণে বারবার পেছনে পড়ে যাচ্ছি রাসূলুল্লাহ।

- আচ্ছা তুমি উটটাকে বসাও তো। আর তোমার হাতের ছড়িটা আমাকে দাও নয়তো একটা ডাল ভেঙে আনো।

আমি হাতের ছড়িটা এগিয়ে দিলাম। তিনি ছড়ি দিয়ে উটকে কয়েকটা খোঁচা দিয়ে বললেন, উঠে পড়ো। উটের পিঠে উঠলাম, অবাক হয়ে দেখি আমার উট রীতিমতো দৌড়াচ্ছে! রাসূলুল্লাহর উটের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে!

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে গল্প করতে করতে চলছি, হঠাৎ তিনি বললেন,

- জাবির, তোমার উটটা আমার কাছে বিক্রি করবে?

- নাহ, আমি আপনাকে এমনিই এটা দিয়ে দেবো, উপহার হিসেবে।

- না, না, আমি কিনতে চাই।

- আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কত দেবেন?

- এক দিরহাম দিলে হবে? রাসূলুল্লাহ রসিকতা করলেন।

- নাহ! তাহলে তো আমি ঠকে যাবো।

- ঠিক আছে তাহলে দুই দিরহাম দিলে চলবে?

---

- না, না, আরও চাই!

রাসূলুল্লাহ উটের দাম বাড়াতে লাগলেন, দাম এক উকিয়ায় (চল্লিশ দিরহাম) গিয়ে ঠেকলো। রাজি হয়ে গেলাম, বললাম,

- আপনি এই দামে খুশি তো?

- হ্যাঁ।

- ঠিক আছে এই উটের মালিক এখন আপনি!

রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে নেতাসুলভ মেকি গাম্ভীর্য ছিল না। তরুণ সাহাবিদের সাথে বন্ধুর মতো মিশে যেতেন। জাবিরকে জিজ্ঞেস করলেন তার বিয়ের কথা।

- আচ্ছা জাবির, তুমি কি বিবাহিত?

- হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ, বিয়ে করেছি।

- কুমারী?

- না।

- কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে পারতে, সেও পারত।

- আসলে, আমার বাবা সাত মেয়ে রেখে মারা গেছেন। তাদের দেখাশোনার জন্য অভিজ্ঞ মানুষ প্রয়োজন। তাই বয়স্ক একজনকে বিয়ে করেছি!

- ইনশা আল্লাহ, আমার মনে হয় তুমি ঠিক কাজই করেছো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জাবিরের ওয়ালিমার আয়োজন করতে চাইলেন। বললেন, 'শোনো জাবির, আমরা যদি সিরারে পৌঁছতে পারি, তাহলে কিছু উট জবাই করবো। রাতটা সেখানেই কাটাবো। তোমরা আমাদের জন্য বালিশের ব্যবস্থা কোরো। জাবির বললেন, আমাদের তো বালিশই নেই আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ অভয় দিলেন, চিন্তা কোরো না, এখন না থাকলেও তখন থাকবে।'

সিরারে সেদিন জাবিরের বিয়ে উপলক্ষে উট জবাই করা হলো। রাসূলুল্লাহ জাবিরকে স্ত্রীর সাথে রাত কাটাতে বললেন। পরদিন সকালের কথা। জাবির বলেন,

'পরদিন সকালে সেই উটটা নিয়ে বের হলাম। রাসূলুল্লাহর ঘরের দরজার সামনে উটটাকে বেঁধে রেখে আসলাম। উটের উপর চোখ পড়তেই আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন,

- এটা কার উট?

- জাবির এই উট আপনার জন্য নিয়ে এসেছে। উপস্থিত সাহাবিরা জবাব দিল।

- জাবিরকে ডেকে পাঠাও।

আমি গেলাম। আমাকে বললেন, ভাতিজা শোনো, এই উট নিয়ে যাও, তোমার উট তোমারই থাকবে। বিলালকে ডেকে বললেন, যাও, জাবিরকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে আসো। আমি বিলালের সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ থেকেও কিছুটা বেশি দিলেন। আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই ভালো হতে থাকে, যতদিন না আমাদের উপর ইয়াউম আল হাররার দুর্দশা আপতিত হয়।'[28]

আসলে কিছু মানুষ দান করার সময় বুঝতেও দেয় না যে তারা দান করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন জাবিরকে সাহায্য করতে। উট কেনার কথা, দরদাম করা এসব ছিল বাহানা মাত্র। সাহাবিদের জন্য তাঁর মমতা পৃথিবীর কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যাবে না। তিনি তাদের ভালো-মন্দের খেয়াল রাখতেন, নিজে না খেয়ে তাদের খাওয়াতেন। মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক অদ্ভুত গুণ নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। সাহাবিদের সাথে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এমন একজন মানুষ যার কাছে মনের সব কথা খুলে বলা যায় -- নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে!

## বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ: বদর আল-মাউইদ

বদর হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষে, আর উহুদের যুদ্ধ ৩য় বর্ষে। এর রেশ ধরে হিজরী চতুর্থ বছরে কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলিমদের তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ করে। সে দুই হাজার সৈন্যের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পর সে মন পরিবর্তন করে। সবার উদ্দেশে বলে, 'আমার মতে, স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তির সাথে পশুদের ভালো ঘাসপাতা খাওয়াতে পারবে এবং নিজেরা ইচ্ছেমতো দুধপান করতে পারবে, সে বছরই যুদ্ধ করা ভালো হবে। এবার শুষ্ক মৌসুম। আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো।' হতে পারে এ কথাগুলো আবু সুফিয়ানের অজুহাত মাত্র। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে কুরাইশরা এর আগেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। হয়তো ঝোঁকের বশে সে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে কিন্তু পরে বুঝতে পারছে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ দৃঢ়তায় কোনো ফাটল ধরেনি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় দেড় হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে আট দিন অবস্থান করলেন। ওদিকে কুরাইশদের দেখা নেই। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর সাথে দেখা হলো বনু দামরা গোত্রের মুখশীর সাথে। ইতিপূর্বে এই গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল। মুখশী রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি

---

[28] ইয়াউম আল হাররা অনেক দিন পরের একটি ঘটনা। এটি ছিল মদীনাবাসীর একটি দুর্যোগের দিন, সেদিন অনেকে নিহত হয়। মুসলিমদের অন্তর্কোন্দলের এ ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৬৩ সালে।

কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যই এসেছি। আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা প্রত্যাহার করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।' মুখশী জবাব দিল, সে বললো, 'নাহ, এমন কিছু করার কোনো প্রয়োজন দেখি না।'[২৩]

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলো বলে মুখশীকে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন; আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি, সেই শক্তি আমাদের ভালোই আছে। চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই।

বর্তমান সময়ে চিত্রটা উল্টো। মুসলিমরা এখন বিপাকে পড়ে শান্তিচুক্তি করে আর শান্তিচুক্তির নামে যা হয় তা লাঞ্ছনা আর অবমাননার চুক্তি ছাড়া কিছুই না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো সাথে চুক্তি করতেন সেটা প্রতিপক্ষের চাপে করতেন না। মুসলিমরা দুর্বল বলে শান্তিচুক্তি করতেন এমন হতো না। মুসলিমরা শক্তিশালী -- তা তিনি পরিষ্কার করেই অপর পক্ষকে বুঝিয়ে দেন।

## দুমাতুল জান্দাল

বনু আসাদ ও গাতফান গোত্র থেকে আরও উত্তরে, গাসাসিনাহ সীমানার কাছেই কুদাআহ গোত্র। এই কুদাআহ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান হলো দুমাতুল জান্দাল। এরা মূলত রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রভাববলয়ভুক্ত একটি গোত্র। অভিযানের নাম দুমাতুল জান্দাল হওয়ার কারণ হলো সেখানে এই নামে একটি বিখ্যাত বাজার ছিল। তাদের এলাকাটি ছিল মদীনা থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার উত্তরে।

অন্য গোত্রগুলোর মতো এই গোত্রের পক্ষ থেকেও মদীনা আক্রমণের আশু কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিংবা তারা সেভাবে মুসলিমদের প্রতি বৈরী আচরণ করেনি। তবু সাড়ে চারশো কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কেন তাদের দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযান পরিচালনা করলেন? এর বেশ কিছু কারণ আছে:

#এক, কুদাআহ গোত্রটি তাদের সীমানা ঘেঁষে যাওয়া যেকোনো কাফেলাকে আক্রমণ করতো। মুসলিমদের কোনো কাফেলা বা মুসলিমদের কাছ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোনো কাফেলা তাদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অর্থ হলো মুসলিমদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া। একটি বিশ্বজনীন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে মানুষের মন থেকে নিরাপত্তাহীনতার বোধটুকু নিশ্চিহ্ন করা জরুরি ছিল। সেই সাথে বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ রাখাও ছিল আরেকটি উদ্দেশ্য।

**#দুই,** আরবে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাব সম্পর্কে কুরাইশদের একটি ধারণা দেওয়াও ছিল অভিযানের আরেকটি উদ্দেশ্য। কুদাআহ গোত্রের বাজারে কুরাইশদের যাতায়াত ছিল। তারা কাফেলা নিয়ে সেখানে যেত। এমন একটা স্থানে সামরিক শক্তির প্রদর্শনী দেখলে স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা মুসলিমদের আরও সমীহের চোখে দেখবে। আল-ওয়াক্বিদী, আয-যাহাবীদের মতে এই অভিযানের মাধ্যমে রোমানদের একটি সূক্ষ্ম আভাস দেওয়া হয়। রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী গোত্রে হামলা চালানো হলে রোমানদের টনক নড়বেই। তারা জানবে আরবে নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটছে।

পঞ্চম হিজরীর এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার সৈনিকের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। তারা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতের বেলা এগিয়ে যেতেন। দুমাতুল জান্দালে পৌঁছে গেলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। একজন ধরা পড়ে এবং মুসলিম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অগ্রসর হওয়ার সামান্য সুযোগটুকুও দেননি। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চলে আসেন।

## অভিযানে মুসলিমদের অর্জন

১) এই অভিযান থেকে ফেরার পথে উয়াইনাহ নামের এক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা হয়। সে মদীনা থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার দূরের মাঠে তার উট আর ভেড়া চরানোর অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিলেন। প্রতিবেশি গোত্রগুলোর উপর মুসলিমদের কী পরিমাণ প্রভাব ছিল এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

২) এ অভিযানের মাধ্যমে মুসলিমরা নতুন নতুন এলাকা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। একটি সুদীর্ঘ সামরিক অভিযানের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৩) এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়। এক সময় যে বন্ধন ও আনুগত্য ছিল নিজ গোত্র আর পরিবারের প্রতি, সে বন্ধন এখন মুসলিমদের সাথে, আর আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ প্রতি। তাদের পরিচয় এখন আর আওসী, খাযরাজি কিংবা কুরাইশি নয়। তাদের পরিচয় তারা মুসলিম। অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ছিলেন গিফার গোত্রের সিবা ؓ। এই গিফার গোত্র ছিল ডাকাতির জন্য বিখ্যাত। এরকম একটা গোত্রের লোককে এত বড় পদে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। বলা চলে ব্যাপারটা ছিল মদীনাবাসীদের জন্য একটা পরীক্ষা। দেশ-গোত্র ভুলে তারা কি পরস্পরকে আপন করে নিতে পেরেছে? এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল তাদের শিক্ষা দিলেন, নেতার বংশমর্যাদা বা গোত্র যা-ই হোক, তার আনুগত্য করতে হবে। দেশ-গোত্র ভুলে মুসলিমদের পরস্পরকে আপন করে নিতে হবে।

## বনু আল-মুস্তালিক্বের যুদ্ধ

সমসাময়িক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালাক্বের যুদ্ধ। কুরাইশদের মিত্র এই গোত্রটির অবস্থান ছিল কৌশলগত বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মক্কার কুরাইশদের সাথে যদি বোঝাপড়া করতে হয়, তবে খুযাআ গোত্রের সাথে আগে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনার নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতশো মুজাহিদ নিয়ে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেন। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল-মুরাইসী।

মুসলিমদের অতর্কিত হামলায় প্রতিরোধ গড়ার কোনো সুযোগও তারা পায়নি। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী করে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়।

সাধারণত, মুসলিমবাহিনী শত্রুদের উপর আক্রমণ করার আগে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনদিন সময় দিয়ে থাকে। তাদের বলা হয় -- মুসলিম হও, না হলে জিযিয়া দাও, আর এ দুটো প্রস্তাবের কোনোটাতেই রাজি না হলে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো।[30] কিন্তু বনু মুস্তালিক্বকে এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হয়নি কারণ তাদের কাছে আগেই দাওয়াহ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আরবেই বসবাস করতো, ইসলাম সম্পর্কেও জানতো। জেনে শুনেই তারা কুরাইশদের পক্ষ নিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, বনু মুস্তালিক্বকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। তারা তখন পশুদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিল।[31]

## রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জুয়াইরিয়্যাহর ﷺ বিয়ে

জুয়াইরিয়্যাহ ﷺ ছিলেন বনু মুস্তালিক্বের গোত্রনেতা আল হারিসের মেয়ে। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহর বিয়ে নিয়ে প্রবল ঈর্ষা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা আইশা ﷺ। মজার এই ঘটনাটি তাঁর মুখেই শোনা যাক.

*'যখন আল্লাহর রাসূল বনু মুস্তালিক্বের বন্দী নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দিলেন, তখন জুয়াইরিয়্যাহ পড়লেন সাবিত ইবন কাইসের ভাগে। তিনি সাবিতের সাথে মাকাতুবা (দাসমুক্তির চুক্তি) করলেন। জুয়াইরিইয়্যাহ দেখতে ছিলেন খুবই মিষ্টি, আর অসম্ভব সুন্দরী! এতটাই সুন্দরী যে, যে-ই তাকে দেখবে, সে-ই তার প্রেমে পড়ে যাবে! তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে দাসমুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন তাকে আমার দরজায় দেখলাম, (প্রচণ্ড ঈর্ষার কারণে) তাকে আমার*

---

[30] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩।

[31] সহীহ বুখারি অধ্যায় গোলাম আজাদ, হাদীস ২৫।

*একটুও ভালো লাগেনি। আমি জানতাম, যে রূপ আমি তার মধ্যে দেখছি, তা আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়াবে না।*

*জুয়াইরিয়্যাহ আসলেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল-হারিসের মেয়ে জুয়াইরিয়্যাহ, আমার বাবা গোত্রের নেতা। আর এখন আমি হয়েছি সাবিতের দাসী! আমার কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে চুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করুন! আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,*

*- আচ্ছা, তোমাকে যদি এর থেকেও ভালো কিছু দেওয়া হয়?*

*- সেটি কী?*

*- আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করবো আর তোমাকে বিয়ে করে নেব।*

*- হে আল্লাহর রাসূল, আমি অবশ্যই তা কবুল করবো।*

*রাসূলুল্লাহ জুয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করে নিলেন। সবাই তখন বলতে লাগলো, আরে! এরা তো রাসূলুল্লাহর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, এদেরকে আমরা কী করে দাস বানিয়ে রাখি! তাই তারা তাদের ভাগের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিল। জুয়াইরিয়্যাহর মতো আর কেউ নিজ গোত্রের জন্য এত বরকত বয়ে এনেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই এক নারীর কারণে বনু মুস্তালিক্বের একশো পরিবার আজাদ হয়ে যায়।'*[32]

এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক্ব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যক্তিজীবনে নেওয়া একটি সিদ্ধান্তে পাল্টে যায় হাজারো মানুষের ভাগ্য।

## মুরাইসী থেকে ফেরার পথে: অনৈক্য তৈরির অপচেষ্টা

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ একজন মুহাজির কাজের লোক ছিলেন। একদিন এক আনসারী সাহাবির সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টা হাতাহাতির দিকে গড়ায়। আনসারী সাহাবি চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'আনসাররা সব কোথায়? সাহায্য করো আমায়!' মুহাজির সাহাবিও তখন চিৎকার দিয়ে মুহাজিরদের কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। খবর কানে পৌঁছামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুটে এলেন, 'কী হচ্ছে এসব! আমি তোমাদের মাঝে এখনো বেঁচে আছি, এখনই তোমরা জাহিলিয়াতের ডাক দিচ্ছ? ছাড়ো এসব!' তিনি দ্রুত তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বিষয়টি শান্ত করে ফেলেন। এই ঘটনা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কানে পৌঁছলে তার প্রতিক্রিয়া হয় দেখার মতো। সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তরুণ সাহাবি যাইদ ইবন আরকাম। তিনি ছিলেন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন:

---

[32] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় দাসমুক্তি, হাদীস ৬।

*'আমি আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে বলতে শুনলাম,*

*কী! মুহাজিররা এই কাজ করেছে! এরা আমাদের দেশে এসে, আমাদের খেয়ে-পরে আমাদের উপর জারিজুরি ফলাচ্ছে! এই কুরাইশগুলোকে দেখলে আমরা একটি কথাই শুধু মনে পড়ে -- দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষো, আর সেই সাপই তোমাকে একদিন দংশন করবে! আল্লাহর কসম করে বলছি, মদীনায় গেলে আমাদের সম্মানী লোকেরা এই নিকৃষ্ট লোকগুলোকে বের করে দেবে। এই আপদ তো তোমরাই ডেকে এনেছো, নিজেদের শহরে জায়গা দিয়েছ, ধনসম্পদ ভাগাভাগি করেছো। খবরদার! মুহাজিরদের পেছনে আর টাকা নষ্ট কোরো না, তারা নিজেরাই অন্যত্র ভেগে যাবে।*

*আমি কথাগুলো চাচাকে জানালাম, চাচা রাসূলুল্লাহকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের মুখে যা যা শুনেছি বললাম। রাসূলুল্লাহ এরপর ইবন উবাই আর তার সঙ্গীদের তলব করলেন। তারা মুখের উপর সবকিছু অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। এটা দেখে আমার যে কী কষ্ট হলো, জীবনে এত কষ্ট আমি কখনো পাইনি। এরপর কুরআনে আয়াত নাযিল হলো:*

> *"মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ১)*

*রাসূলুল্লাহ এরপর খবর পাঠালেন, আমাকে এই আয়াত শুনিয়ে বললেন, যাইদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বিশ্বাস করেছেন।[33]'*

এই ঘটনার পর যাইদের কান ধরে রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটা হলো সেই কান যে কানকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন!' মুনাফিকদের এই আচরণের পর আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকুন নাযিল করেছেন। মুনাফিকদের সমালোচনায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"ওরা এমন লোক যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের জন্য কিছু ব্যয় করো না, তাহলে ওরা সরে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহ তো আল্লাহ্রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। ওরা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে আমরা হীন তুচ্ছদের/দুর্বলদের (মুসলমানদের) বহিষ্কৃত করবোই। কিন্তু প্রকৃত শক্তি যে কেবল আল্লাহরই, তাঁর রাসূলের ও বিশ্বাসীদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ৭-৮)**

---

[33] ঘটনাটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত। সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯। তিরমিযী, অধ্যায় তাফসীর, হাদীস ৩৬২৯ (আরবি রেফারেন্স)।

শিক্ষা:

১) ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা।

এই ঘটনার পর নবীজি ﷺ তাঁর সৈন্যদের প্রায় দু'দিন ধরে টানা মার্চ করান। তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। দুদিন আগে কী ঘটেছে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো সময়ই পেল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই চাচ্ছিলেন। ভালো কাজে ব্যস্ত না থাকলে মানুষ আজেবাজে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু এই ফিতনাহর কারণে অনেক কানাকানি আর গুজব ছড়িয়েছিল, রাসূল ﷺ তাই তাঁর বাহিনীকে ব্যস্ত রাখলেন যেন তারা কানাঘুষা থেকে দূরে থাকে। একজন দক্ষ নেতার গুণ এটাই-- যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন দক্ষ নেতা হতে পেরেছিলেন।

২) মুসলিমদের সুনাম বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যখন উমার ইবন খাত্তাব ﷺ জানতে পারেন ইবন উবাই মুসলিমদের মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে, তখন তিনি ইবন উবাইকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহর অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'দেখো উমর, যদি তাকে হত্যা করি আর মানুষ বলে: মুহাম্মাদ তার অনুসারীদের হত্যা করে। তখন বিষয়টা কেমন হবে ভেবে দেখেছো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সুনামের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতেন। তিনি চাচ্ছিলেন না মানুষ ভাবুক যে, তারা মুসলিম হলেও তাদের নেতা তাদের হত্যা কিংবা অত্যাচার করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগে কিছু মানুষকে হত্যা করেছেন। চাইলে তিনি ইবন উবাইকেও হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রজ্ঞা। রাসূলুল্লাহর ﷺ বিচক্ষণতার কারণে ইবন উবাইয়ের আসল চরিত্র সবার কাছে প্রকাশিত হতে থাকে। এই ঘটনার পর থেকে খারাপ কিছু ঘটলেই লোকজন ইবন উবাইকে দোষারোপ করতো। কিন্তু যদি তাকে তখনই হত্যা করা হতো, তাহলে তার অনুসারীরা দম্ভ আর জাতীয়তাবাদের অন্ধ আক্রোশে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতো। তাকে ছেড়ে দেওয়ায় সময়ের সাথে সাথে তারা নিজেরাই ইবন উবাইয়ের আসল চরিত্র উপলব্ধি করে।

এ ঘটনার আগে যখনই নবীজি ﷺ জুমার খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরের দিকে অগ্রসর হতেন, তখন ইবন উবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, 'তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁকে সাহায্য করো, আঁকড়ে ধরো।' কিন্তু যখন তার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করলো, তখন সে উঠে দাঁড়ালে লোকজন তাকে টেনে ধরে বসিয়ে দিত। এটিও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিচক্ষণতারই ফল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেই, তাদের সবাই তাকে হত্যা করবে।' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন রাসূলুল্লাহ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আপনার সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের চেয়ে

প্রজ্ঞাময়।'[34]

## ৩) জাতীয়তাবাদ একটি ইসলামবিরোধী চেতনা।

মুহাজির ও আনসার -- এ দুটো শব্দ ছিল রাসূলুল্লাহর খুব প্রিয় দুটো শব্দ। কিন্তু যখন মুহাজির আর আনসারি সাহাবি এই নাম দুটো ধরে তাদের নিজেদের দলকে ডাক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ এই ডাককে অভিহিত করলেন 'জাহিলিয়াতের ডাক' বলে। কেননা শব্দ দুটো চমৎকার হলেও তাদের এই ডাকের পেছনে ছিল জাতীয়তাবাদের চেতনা। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যাচ্ছিলেন। এই ডাকের পেছনে তাদের 'হিজরাহ' কিংবা 'নুসরাহ'র কোনো সম্পর্ক নেই, বরং আছে গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যে বোধ। 'আমি মুহাজির, তুমি আনসার, আমি তোমার থেকে সেরা' -- এই ধরনের মানসিকতা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাহাবিদের গড়ে তুলতে চাননি। তিনি তাদের ভাই হওয়া শিখিয়েছেন। ইনসাফ ও সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। 'আমি আমার গোত্রের পক্ষে থাকবো। আমার জাতিই সেরা জাতি' -- এমন অযৌক্তিক বিশ্বাসের কোনো স্থান ইসলামে নেই।

উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শয়তানের হাজারো পদ্ধতি আছে। তাই আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। আরব মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিম, ব্রিটিশ মুসলিম -- এ ধরনের তকমা উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমাদের পরিচয় আমরা মুসলিম। ইসলাম আমাদের গোত্র বা জাতিপরিচয়কে অস্বীকার করে না। তবে শুধুমাত্র জাতিপরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে।

## ৪) ঈমান সবার আগে।

মুনাফিক্ব আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ছেলের নাম ছিল আবদুল্লাহ। বাবা মুনাফিক্ব হলেও ছেলে ছিলেন সত্যিকারের মুসলিম। তিনি যখলেন জানতে পারলেন তার পিতার আজেবাজে কথার কারণে শাস্তিস্বরুপ তাকে হত্যা করা হতে পারে, তখন নিজেই নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললেন,

*'আমি শুনেছি আপনি আমার পিতাকে হত্যা করতে চান। যদি তা-ই করেন, আমাকে নির্দেশ দিন, আমিই তাকে হত্যা করবো। পুরো খাযরাজ গোত্রে আমার মতো আর কেউ আমার বাবার অনুগত নয় -- এ কথা খাযরাজের লোকেরা ভালো করেই জানে। আমার সামনে দিয়ে আমার পিতার হত্যাকারী নিরাপদে চলাফেরা করবে -- আমি সেটা মেনে নিতে পারবো না। শয়তান তখন আমাকে পিতার হত্যাকারীকে হত্যার জন্য ফুসলাতে থাকবে। আর আমি তখন একজন কাফিরের বদলায় একজন মু'মিনকে হত্যা করে বসতে পারি। তাই যদি আপনি তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকেই তা করতে আদেশ করুন।'*[35]

---

[34] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬।

[35] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬।

নবীজি বললেন, 'না, আমরা তাকে হত্যা করবো না। এ দুনিয়ায় আমরা তাকে সঙ্গ দেবো।' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবন উবাইয়ের পুত্রের জন্য দুআ করলেন। যে আবদুল্লাহ সারাটি জীবন 'বাবার বাধ্য সন্তান' হয়ে ছিলেন, সেই আবদুল্লাহ-ই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুমতি চাচ্ছিলেন যেন তার বাবাকে হত্যা করা হলে তিনিই তা করার সুযোগ পান!

কেন তিনি নিজের বাবাকে হত্যা করতে চেয়েছেন? এর কারণ হলো ঈমান। ঈমান সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য পায়, এমনকি পারিবারিক বন্ধনের ওপরেও। বাবা-ভাই-স্ত্রী সবকিছুর চেয়েও বেশি দামি আল্লাহর আদেশ মেনে চলা, আখিরাতে জান্নাতের যোগ্য হওয়া। ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ তাই মুহাম্মাদের ﷺ বিশ্বস্ত সৈনিক, অতীতের সকল আনুগত্য থেকে মুক্ত। কেননা ঈমান আনার পর চূড়ান্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।

## ইফকের ঘটনা

বনু মুসতালিক্ব থেকে ফেরার পথে মা আইশার ﷺ সাথে খুব দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে। এটা ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত। আইশার ﷺ মুখেই কাহিনীটি শোনা যাক:

*'রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওনা দেওয়ার আগে আমাদের নামে লটারি করতেন। যার নাম লটারিতে উঠতো, তিনি তাকে নিয়েই যাত্রা করতেন। বনু মুসতালিকের অভিযানের সময়েও লটারি হলো। সে বার লটারিতে আমার নাম উঠলো। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। তখন হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। সফরের সময়টায় আমি তাই একটা পালকির ভেতর বসে থাকতাম। ছোট্ট বাক্সের মতো একটা জিনিস। সেটাকে উটের পিঠে রাখা হতো। আর আমি তার ভেতর বসে থাকতাম। আশেপাশের লোকেরাই একে উটের পিঠে উঠিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। এরপর মাথায় রশি টেনে ধরে উটকে চালানো শুরু হতো।*

*সেবার সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা বিরতি নিলেন। ঠিক হলো রাতের কিছু সময় সেখানেই কাটানো হবে। এরপর যখন আবার যাত্রা করার সময় হলো, আমার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল। সবাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে, এর মাঝেই আমি বাইরে বেরোলাম। সে সময় আমার গলায় ছিল জাফর পাথরের একটা হার। কিন্তু ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি হারটি নেই। কখন গলা থেকে খুলে পড়ে গেল কিছুই টের পাইনি। হার খুঁজতে আবারও ফিরে গেলাম। যেয়ে দেখি ওখানেই হারটা পড়ে আছে।*

*ওদিকে সবাই ততক্ষণে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেছে। যারা আমার উট চালানোর দায়িত্বে ছিল, তারা আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল, পালকিটিও উটের পিঠে*

চড়িয়েছিল। আমি যে পালকির মধ্যে নেই এটা ওরা বুঝতে পারল না। আসলে সে সময়ে মহিলারা বেশ হালকা পাতলা ছিলেন। যতটুকু না খেলেই নয় ততটুকুই খেতেন, এর বেশি না। আর আমার বয়সও তখন কম ছিল। ওরা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই পালকির ভেতরেই আছি। সবাই আমাকে রেখেই রওনা দিয়ে দিল।

সেনাশিবিরে পৌঁছে দেখি সেখানে কেউ নেই! কিন্তু আমি জানতাম, তারা যখন আমাকে পাবে না, তখন আমার খোঁজে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বসে বসে থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল হয়ে এল। আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখানে এলেন সাফওয়ান ইবন আল-মুআত্তিল আস-সুলামী। উনি মুজাহিদ ভাইদের থেকে পেছনে ছিলেন (সম্ভবত কারো ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিতে পিছিয়ে পড়েছিলেন)। তিনি দূর থেকে কালো মতন কিছু একটা দেখেই বুঝেছিলেন কেউ শুয়ে আছে। কাছে আসার পর আমার অবয়ব দেখে আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ, হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই সাথে সাথে চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সাথে আর একটা কথাও বলেননি, আমিও চুপ করে ছিলাম। একটা উট এনে তিনি সেটাকে আমার সামনে বসালেন। আমি উটের পিঠে চড়লাম, আর উনি উটের মাথা ধরে টানতে টানতে দ্রুত কাফেলার দিকে এগিয়ে চললেন।

সময়টা মধ্য দুপুর। ভরদুপুরের প্রচণ্ড গরমে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন একটা সময় উনি আমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। এ দৃশ্য দেখে যা হওয়ার হয়ে গেছে। কিছু লোক (আমার আর সাফওয়ানের ব্যাপারে) কুৎসা রটিয়ে দিল। মুসলিমদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো।

মদীনায় মানুষের মুখে মুখে সেই একই গল্প। আর সবকিছুর পিছে মূল হোতা হলো আবদুল্লাহ ইবন উবাই। আমি কিন্তু এসবের কিছুই জানি না। মদীনায় পৌঁছেই আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় এক মাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। বাইরে কী কথাবার্তা হচ্ছে কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আর আমার পরিবারের কান পর্যন্ত কাহিনী ঠিকই পৌঁছালো। কেউই আমাকে কিছুই বললো না। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম আমার প্রতি নবীজির আচরণ কেমন যেন বদলে গেছে, ঠিক আগের মতো আর নেই। এমনিতে আমি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু এবার তেমনটা করলেন না। শুধু ঘরে আসতেন, সালাম দিতেন আর বলতেন, কেমন আছো? -- ব্যস, এটুকুই। এরপরই চলে যেতেন। আমার মন বলছিল, কী যেন একটা সমস্যা আছে।

ভেতরে ভেতরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূলের এমন নির্লিপ্ত আচরণ একেবারেই মেনে নিতে পারছিলাম না। একদিন বললাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি মায়ের কাছে যেতে চাই। তিনিই আমার দেখাশোনা করুক। তিনি বললেন, যেতে পারো। কোনো বাধা নেই। আমি তখন মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখনও কিন্তু কী হচ্ছে তার কিছুই জানি না।

প্রায় তিন সপ্তাহ রোগে ভুগে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছি। সে সময় আরবদের মাঝে বিদেশীদের মতো ঘরের ভেতর পেশাবখানা ছিল না। ওগুলো আমরা খুব অপছন্দ করতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার দরকার হলে বাইরে বেরিয়ে মদীনার খোলা জায়গাগুলো ব্যবহার করতাম। তেমনি এক রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হয়েছি উম্ম-মিসতাহকে নিয়ে। সে ছিল আবু রুহম ইবন আব্দ-মানাফের মেয়ে। আমরা দুজন আল-মাসানাই এর দিকে চলছি। হঠাৎ সে কাপড়ে বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়লো, আর ফট করেই তার মুখ দিয়ে ছেলের নামে অভিশাপ বেরিয়ে এল, ওরে মিসতাহ, তুই শেষ হয়ে যা! আমি বললাম, কী বলছো এসব! যে মানুষটা বদরে অংশ নিয়েছে, তাকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ? সে বললো, তুমি কি জানো না তোমার ব্যাপারে ও কী বলেছে? আমি জানতে চাইলাম। উম্ম মিসতাহ তখন আমাকে সমস্ত কাহিনী খুলে বললো।

ওয়াল্লাহি! আমার তখন এত বেশি খারাপ লাগছিল যে, আমি কিছুই করতে পারলাম না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন না সেরেই ঘরে ফিরে এলাম। অনেক কাঁদলাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে মনে হচ্ছিল কলিজাটা ফেটে যাবে। মা'কে গিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। লোকেরা যা বলার তা তো বলেছে। তুমি কেন আমাকে কিছুই জানালে না? ওরা আমার নামে এসব কী বলছে মা? মা বললেন, এমনটাই হয় রে মা। একজন সুন্দরী নারী যখন স্বামীর ভালোবাসা পায় তখন বাকি স্ত্রীরা তার দোষ খুঁজে বেড়াবেই। তুই দুশ্চিন্তা করিস না।

মানুষ আমার নামে এসব কী বলছে! আমি সারারাত কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত কেঁদেই গেলাম, কেঁদেই গেলাম। সকাল হয়ে গেল। চোখ বেয়ে অঝোর ধারা বইছে। সারারাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি।

সবচেয়ে বেশি কুৎসা রটিয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সাথে ছিল খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক, মিসতাহ, আর জাহশের মেয়ে হামনাহ। হামনার এসব কথা ছড়ানোর কারণ ছিল। সে ছিল উম্মুল মুমিনীন যাইনাবের আপন বোন। নবীজির ﷺ বাকি স্ত্রীদের মাঝে এই এক যাইনাবই ﷺ আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। অথচ যাইনাব আমার নামে একটা খারাপ কথাও বলেননি। কিন্তু হামনা তার বোনের পক্ষ নিতে গিয়ে আমার নামে এমন বাজে কথা ছড়াল যে আমি খুবই কষ্ট পেলাম।

আমার ব্যাপারে ওয়াহী আসতে দেরি হচ্ছিল। নবীজি ﷺ আলী ﷺ আর উসামাহ ইবন যাইদের ﷺ সাথে আমার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। উসামাহ বললেন, আমরা তো

তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু কখনো শুনিনি। আলী বললেন, আল্লাহ তো আপনার জন্য বিষয়টা কঠিন করেননি। আরও কত মহিলা আছে। আপনি বরং আইশার সেবিকা বারীরার সাথে কথা বলে দেখুন, সে আপনাকে আইশার ব্যাপারে সত্য জানাতে পারবে।

নবীজি ﷺ বারীরাকে ডেকে জানতে চাইলেন আমার মধ্যে সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কি না। বারীরা বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, কমতি বলতে আমি তার মধ্যে শুধু এটুকু গাফেলতি দেখেছি যে, ময়দার কাই বানিয়ে সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ছাগল এসে সেগুলো খেয়ে নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে তোমাদের কি কিছু বলার আছে? এই লোক আমার পরিবারকে নিয়ে মিথ্যা কথা ছড়িয়েছে। আমার পরিবার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা এমন একজন লোকের (সাফওয়ান) বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছে যার সম্পর্কে আমি ভালো বাদে কিছু জানি না। আমি না থাকলে সে কোনোদিন আমার ঘরে ঢোকেনি।

সাদ ইবন মুআয বললেন, আপনি তার সাথে যা খুশি করুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। সে যদি আওস গোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে আমরাই তার গর্দান আলাদা করে দেবো। আর যদি সে খাযরাজ গোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাদের যা আদেশ দেবেন আমরা তা-ই করবো।

খাযরাজের নেতা সা'দ ইবন উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে সবাই তাকে ভালোই জানতো, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত গোত্রীয় চেতনা তাকে পেয়ে বসলো। তিনি বলে উঠলেন, মিথ্যে বলছো তুমি! তুমি তাকে এভাবে হত্যা করতে পারো না। সে মুরোদও তোমার নেই! তোমার নিজ গোত্রের হলেও তুমি এই কাজ করতে পারো না।

এই কথা শুনে সাদ ইবন মুয়াযের ভাই উসাইদ ইবন হুদাইর রেগে গেলেন। সাদ ইবন উবাদাকে বললেন, আরে ব্যাটা মিথ্যা তো তুই বলছিস। তুই নিজে একটা মুনাফিক্ব। এখন এসে আরেক মুনাফিক্বের পক্ষ নিচ্ছিস! আমরা ঐ ব্যাটাকে মারবোই মারবো।

চেতনার উন্মাদনায় দুই গোত্রের মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ তখন মিম্বরে বসা। তিনি দু'পক্ষকে শান্ত করলেন, নিজেও শান্ত হলেন।

আর আমি! আমি সেদিন সারাটা দিন শুধুই কাঁদলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারলাম না। দুই রাত এক দিন টানা কেঁদেই গেলাম। আমার বাবা মা আমার পাশে এসে বসলেন। তাদের মনে হলো আমার বুক ফেটে কলিজাটা বুঝি বের হয়ে আসে। এক আনসারি মহিলা আমার ঘরে এল। আমি কাঁদছিলাম, আমার সাথে সেও কাঁদতে শুরু করল।

*এমন সময় নবীজি ﷺ এলেন। আমার পাশে এসে বসলেন। এই ঘটনার পর এই প্রথম তিনি আমার পাশে বসলেন। আমাকে বললেন, শোনো আইশা, তোমার ব্যাপারে আমি এই এই কথা শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি কোনো পাপ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। যখন বান্দা আল্লাহর কাছে তার দোষ স্বীকার করে তখন তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে নেন।*

*এ কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমার আশা ছিল আমার বাবা-মা আমার হয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অন্তত কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তারাও চুপ, কারো মুখে কোনো রা নেই। বাবা-মাকে বললাম, আমার হয়ে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কিছু তো বলো! তারা বললেন, জানি না কী বলবো। বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না... বাবা-মা'র নীরবতা দেখে আমি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লাম।*

*আমার বয়স তখন অনেক কম। খুব বেশি কুরআনও আমি পড়িনি। কিন্তু সেই আমিই তখন আল্লাহর রাসূলকে বললাম, আল্লাহর শপথ! যে গুনাহর কথা আপনি বলছেন তার জন্য আমি কখনো আল্লাহর কাছে তাওবা করবো না। মানুষ যা বলছে, তা যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে এমন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া হবে যা কখনো ঘটেনি। আর যে কথা আমার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সে কথা আপনি এতবার শুনেছেন যে এটা আপনার অন্তরে গেঁথে গেছে। আপনি মানুষের কথাই বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন আমি যা-ই বলি না কেন, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি বলি আমি দোষ করেছি, সেটা আপনি ঠিকই বিশ্বাস করে ফেলবেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ। আমার তো শুধু একটা কথাই মনে পড়ছে, যে কথা নবী ইয়াকুব তাঁর ছেলেদের বলেছিলেন,*

> ***"এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। বললেন, এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।" (সূরা ইউসুফ, ১২: ১৮)***

*এই বলে আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত জানতাম আল্লাহ অবশ্যই আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, কখনো ভাবতেও পারিনি যে, আল্লাহ আমার জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল করে ফেলবেন আর সেই আয়াত মানুষ (কিয়ামত পর্যন্ত) পাঠ করে যাবে! নিজেকে আমার খুব নগণ্য মনে হয়। কুরআনের আয়াতে উল্লেখ্য হবার মতো যোগ্য নিজেকে কখনোই মনে হয়নি। আমার আশা ছিল নবীজি ﷺ হয়ত স্বপ্নে কিছু দেখতে পাবেন, যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন এবং কিছু তথ্য দেবেন।*

*ওয়াল্লাহি! নবীজি তাঁর আসন ছেড়ে ওঠেননি। তার আগেই আল্লাহ আয়াত নাযিল*

করতে শুরু করলেন। তাঁকে তাঁর চাদর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। তাঁর মাথার নিচে একটা চামড়ার বালিশ রাখা হলো। আর আমি যখন আমার চোখের সামনে এগুলো দেখছিলাম, ওয়াল্লাহি, তখন আমার ভেতর কোনো উৎকণ্ঠা, ভয় কিছুই নেই। আমি জানতাম আমি পবিত্র। আমি জানতাম আল্লাহ আমার ক্ষতি করবেন না। আল্লাহর শপথ, যে মহান রবের হাতে আইশার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যখন নবীজির ﷺ ওপর আয়াত নাযিল হওয়া শেষ হলো, আমার বাবা-মায়ের ততক্ষণে মরার হাল! লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা যদি ওয়াহীর মাধ্যমে সত্য প্রমাণ হয়ে যায়!

কিন্তু ওয়াহী নাযিল শেষ হবার পর আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রথম কথাটি ছিল, ও আইশা! তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন! মা বললেন, যাও তোমার স্বামীর কাছে যাও। আমি বললাম, না, আমি যাবো না। আমি কেবল আল্লাহর কাছেই শুকরিয়া আদায় করবো।

নবীজি ﷺ কুরআনের আয়াতগুলো লোকেদের কাছে পড়ে শোনাতে বেরিয়ে গেলেন। মিসতাহ, হাসসান ইবন সাবিত আর হামনার উপর শাস্তি কার্যকর করলেন। কারণ তারা ছিল অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাযিল করলেন সেগুলো হলো,

> “যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করতো। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো এবং

*আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত।" (সূরা নূর, ২৪: ১১-২০)*

এই ছিল সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম[36] এবং সীরাতে ইবন হিশামে[37] বর্ণিত ইফকের ঘটনা।

## ইফকের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা একটি কবীরা গুনাহ।

২) এ দুঃখজনক ঘটনার মাঝেও ভালো কিছু ব্যাপার আছে। আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল বলেছেন, তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা আমরা এই ঘটনা থেকে শিখলাম। আবু বকরের ﷺ পুরো পরিবার এই ঘটনায় অনেক কষ্ট আর বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু উম্মাহ্ এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। অন্যদিকে আবু বকর ও তাঁর পরিবারের সকলে ধৈর্যের বিনিময়ে অনেক হাসানাত (সওয়াব) লাভের সুযোগ পান।

৩) মুসলিমদের উচিত অন্য মুসলিম ভাইবোনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া এবং তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা। কোনো ভাই বা বোনের নামে খারাপ কিছু শুনে কোনো মুসলিম খুশি হতে পারে না। বরং খারাপ কিছু শুনলে সে তার প্রতিবাদ করবে, এটাই হবে তার সহজাত আচরণ। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? ... তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান?"

মুসলিম ভাই বা বোনের ব্যাপারে খারাপ কিছু শুনলেও সেটা চট করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং আগের সুধারণার ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। আর গুজবে তো একেবারেই কান দেওয়া উচিত নয়। অর্থহীন খারাপ কাজে মুসলিমরা নাক গলাবে না। যেচে পড়ে রঙচঙে কাহিনী শোনার চেষ্টা করবে না, প্রচার করা তো দূরে থাক।

৪) অশ্লীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক সময় ইসলাম পালন করা মুসলিমরাও উম্মাহর মধ্যকার ফিতনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় টেনে আনে। কিছু মানুষ আছে যারা অশালীন বিষয় নিয়ে কথা

---

[36] সহীহ বুখারি, অধ্যায় তাফসীর, হাদীস ৪৭৫০ (আরবি রেফারেন্স); অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ১৮৫। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় তাওবা, হাদীস ৬৫।

[37] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫।

বলতে পছন্দ করে। আল্লাহ্ বলেছেন, “যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।”

খারাপ কাজকে বন্ধ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় সেই খারাপ কাজ নিয়ে এত কথা বলে যা সেই খারাপ কাজকেই আরও উসকে দেয়। সমাজে যদি এমন কোনো খারাপ কাজ চলতে থাকে, যে ব্যাপারে কারো ধারণা নেই, তাহলে অনেকসময় এই না-জানাটাই সবার জন্য মঙ্গলজনক। বিশেষ করে যিনা, ব্যভিচার এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায়, তত উত্তম। এগুলো নিয়ে বেশি কথা বললে মানুষের মনে হতে পারে সমাজটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে, মন্দ কাজ গা-সওয়া হয়ে যাবে এবং এসব কাজকে হালকাভাবে দেখা শুরু করবে। মানুষ তার সমাজকে যেমন মনে করে, নিজেও তেমনই আচরণ করে। দুর্বল ঈমানদারদের জন্য বিষয়টি খুবই বিপজ্জনক। তারা যদি সমাজের এসব গোপন পাপ সম্পর্কে না জানে, তাহলে তারা নিজেরাও সেসব থেকে দূরে থাকবে।

খারাপ কাজ থামানো আর খারাপকে আরও উসকে দেওয়া - এ দুয়ের মাঝে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে। কোনো পাপ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার সময় যেন তারা উল্টো তাতে উৎসাহিত বা কৌতূহলী না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। যতটুকু বলা জরুরি, ততখানিই বলতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বললে এমন অনেক মানুষ সে বিষয়ে জেনে যায় যারা এই পাপ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পরে বরং তারাই সেই পাপে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এভাবে অনেক সময় খারাপ কাজে বাধা দিতে গিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনা হয়।

৫) যে বা যারা উম্মুল মু'মিনীনের চরিত্রে অপবাদ দেয় তারা কাফির -- এই ব্যাপারে আলিমদের ঐক্যমত আছে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট করে আইশার চরিত্রের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এরপরেও কেউ যদি আইশাকে অপবাদ দেয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে কাফির।

৬) মিসতাহ্ নামের যে লোকটি মা আইশার ﷺ নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল, সে ছিল বেশ দরিদ্র। আবু বকরই ﷺ আত্মীয় হিসেবে তাকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। যখন আবু বকর ﷺ জানতে পারলেন এই লোক তাঁর মেয়ের ব্যাপারে বাজে কথা ছড়িয়েছে, তিনি রাগ করে কসম করলেন যে, মিসতাহকে আর কখনো সাহায্য করবেন না। তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বললেন,

> “তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।” (সূরা নূর, ২৪: ২২)

এই আয়াত নাযিলের পর আবু বকর তার ভুল বুঝতে পারেন। তিনি মিসতাহকে ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ, কারো প্রতি রাগ বা ক্ষোভ যেন আমাদেরকে ভালো কাজ থেকে বা তার প্রতি ইনসাফ করা থেকে বিরত না রাখে।

৭) কোনো নারীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনা একটি গুরুতর অপরাধ। যদিও এ আয়াতে কেবল নারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, তবে পুরুষের ব্যাপারেও একই বিধান। নারীরা স্বভাবগতভাবে কিছুটা দুর্বল আর আবেগী। তাই কোনো সচ্চরিত্রা নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলা আরও বেশি অপরাধ।

৮) মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। কষ্ট তারও হতো, দুঃখ তিনিও পেতেন। গায়েবের খবর যেমন আমরা জানি না, তিনিও জানতেন না। পুরো একটা মাস যখন লোকেরা তাঁর স্ত্রীর নামে আজেবাজে কথা বলেছে, তখন তাঁর কষ্ট হয়েছে। আইশার ﷺ সাথে স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারেননি। নবীজির জীবনে এটা ছিল এক বিশাল পরীক্ষা।

৯) যদি কেউ কোনো মুসলিমের ওপর যিনা বা ব্যভিচারের অভিযোগ আনে, তবে তাকে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। তা নাহলে অভিযোগকারীকেই ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। তারা ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে আর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসলিমদের ইজ্জত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই একে সুরক্ষিত রাখা খুব জরুরি। সেজন্যই এত কঠোরতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসব ব্যাপার খুবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। মুসলিমরা উঠতে-বসতে একে-অপরকে অপবাদ দিচ্ছে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা কবীরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১০) হাসসান ইবন সাবিত এবং মিসতাহকে বেত্রাঘাত করা হলেও, আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ আবদুল্লাহ ইবন উবাই-ই ছিল এই ঘটনার মূল হোতা। তাহলে তাকে শাস্তি না দেওয়ার কারণ কী? এই সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম চারটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন।

*প্রথমত, কাউকে কোনো গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হলে, সেটি গুনাহর জন্য কাফফারা হিসেবে কাজ করে। তখন তাকে আখিরাতে আর শাস্তি ভোগ করা লাগবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এতটাই জঘন্য এক লোক যে তার আখিরাতেই শাস্তি প্রাপ্য। তাই হয়তো এ কারণে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়নি।*

*দ্বিতীয়ত, হতে পারে সে এতটাই চতুরতার সাথে এই গুজবটি ছড়িয়েছে যে তাকে প্রমাণসহ পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।*

*তৃতীয়ত, মিথ্যা অপবাদ দানকারীর ওপর তখনই শাস্তি প্রয়োগ করা হয় যখন তার অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষী থাকে কিংবা কেউ নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করে নেয়।*

*কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। কারণ সরাসরি মুসলিমদের সামনে সে এসব কথা বলেনি, বলেছে তার অনুসারীদের কাছে। তার অনুসারীরাই মদীনায় এসব কথা ছড়িয়েছে।*

*চতুর্থত, তার অনুসারী লোকদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং ফিতনা এড়াতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।*

১১) আমীর বা নেতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা দ্বীন ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর শত্রুদের একটি বড় অস্ত্র হলো ইসলামী নেতা বা আলিমের চরিত্রহনন। মদীনায় শত্রুরা প্রথমে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ হত্যার অপচেষ্টা চালায়, তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর চরিত্রে কালিমালেপনের চেষ্টা করে। দ্বীনের শত্রুরা দ্বীনের কর্ণধারদের ব্যাপারে নোংরা সব কাহিনী রচনা করে যেন মানুষের মনে তাদের ব্যাপারে অবিশ্বাস জন্ম নেয়, শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়। আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। আজকে আর কোনো নেতা বা আলিমের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে না। কিন্তু যা ইতিমধ্যে নাযিল হয়েছে, আমাদের উচিত তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা।

১২) জাতীয়তাবাদ একটা রোগ এবং এই রোগ সারতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। ইফকের ঘটনার প্রায় দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর আগে আওস আর খাযরাজ গোত্র মুসলিম হয়েছে। অথচ এত বছর পরেও এই সমস্যাটি তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতে কিছুটা রয়েই গেছে। তার জের ধরে মসজিদের ভেতর মারামারি শুরু হবার উপক্রম! মদীনায় আনসার বনাম মুহাজির কিংবা আওস বনাম খাযরাজের মধ্যে আকস্মিক লেগে যেওয়ার ঘটনা এবারই নতুন নয়, এর আগেও হয়েছে। প্রতিবারই ঘটনার সূত্রপাত নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় থেকে। তুচ্ছ বিষয়ও বড় হয়ে যায় যখন একপক্ষ নিজের গোত্র পরিচয় টেনে আনে।

জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়াহ একটা ফাঁপা আদর্শ। উসকানিমূলক বক্তৃতা আর চেতনার ধুয়া তুলে মানুষকে উন্মাদ বানানোই এর হাতিয়ার। এই জাতীয়তাবাদ দিয়েই মুসলিমদের বিভক্ত করে রাখা হয়েছে গত একশো বছর ধরে। মুসলিমরা এখন তাই আমেরিকান মুসলিম, বাঙালি মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিম। এভাবে বিভক্ত থেকে ইসলামের প্রকৃত ঐক্য আর ভ্রাতৃত্বের স্বাদ কখনোই মিলবে না।

# খন্দকের যুদ্ধ

ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেওয়া ব্যাপার যাকে বলে, খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে তেমন মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ যতটা না ছিল ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধ, তার চাইতে বেশি ছিল স্নায়ুযুদ্ধ। এ যুদ্ধ মুসলিমদের যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় হতে হয় তা আর কখনো হয়নি। না এর আগে, না এর পরে।

## যুদ্ধের কারণ

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে। সেই যে বনু নাযির গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হলো, এরপর তারা তাদের বাক্স-পেটরা, ধন-দৌলত নিয়ে আশ্রয় নিল খাইবারে। ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করে কখনো ক্লান্ত হয় না। খাইবারে এসেও তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরিকল্পনা করলো একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গঠন করার। মুসলিমদের অগ্রগতি দমন করতে এরচেয়ে ভালো কোনো রাস্তা তাদের মাথায় আসলো না। তাদের নেতারা মক্কায় সফর করে। সফরে প্রতিনিধিদলে ছিল সালাম ইবন আবি আল হুকাইক, হুয়াই ইবন আখতাব, কুনানাহ ইবন আর-রাবী, হাউযাহ ইবন কাইস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সফরের উদ্দেশ্য সফল হয়। কুরাইশ, গাতফান ও তাদের আরও কিছু মিত্রশক্তি একটি সম্মিলিত সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ ছিল প্রতিটি ফ্রন্টে -- ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক। কিন্তু গাতফান গোত্রের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের এই জোটে অংশ নেওয়ার একটাই কারণ, অর্থনৈতিক স্বার্থ। মদীনার গনিমতের মালে ভাগ পাওয়া। এই সম্মিলিত জোটে সৈন্য ছিল দশ হাজার, যার ছয় হাজারই সরবরাহ করে বনু গাতফান ও তাদের মিত্রশক্তি। বিনিময়ে তারা খাইবারের এক বছরের খেজুর পাবে। আর বাকি চার হাজার সৈন্য সরবরাহ করে কুরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তি। ইহুদিদের নিজস্ব তেমন কোনো লোকবল ছিল না।

ইলম ও পাণ্ডিত্যের কারণে ইহুদিদের আরবরা সমীহ করতো। তারা পড়াশোনা করতো, তাদের মাঝে আলিম ছিল। এই বৈঠকে মক্কার মুশরিকরা ইহুদিদের জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তোমরা তো ধর্মের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখো। একটা কথা বলো তো, কারা সঠিক পথে আছে -- আমরা নাকি মুহাম্মাদ? ইহুদিরা তখন উত্তর দেয়, 'তোমরাই সঠিক পথে আছো।'[38] আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে? এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।" (সূরা নিসা, ৪: ৫১-৫২)

আক্বীদা বিশ্বাসের বিবেচনায় ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। ইহুদিরা ভালো করেই জানতো মুসলিমরা বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে মুশরিকদের সাথে তাওহীদের যোজন যোজন দূরত্ব। তবুও শুধুমাত্র হিংসা, শত্রুতা আর অন্ধ বিদ্বেষে তারা মূর্তিপূজারি কুরাইশদের ধর্মকে সঠিক বলে দেয়। ওদিকে ইহুদিদের কাছ থেকে মনমতো 'ফতোয়া' পেয়ে কুরাইশরাও বিপুল উৎসাহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

## মুসলিম পক্ষ

সামরিক জোটের খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ সবই জানতে পারলেন। জরুরি ভিত্তিতে শুরা ডাকা হলো। এই পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ হবে। কিন্তু কেউই তেমন বাস্তবসম্মত বা কার্যকরী কোনো বুদ্ধি দিতে পারলো না। এবার মুখ খুললেন সালমান আল ফারসি ؓ। এই সেই সাহাবি যিনি সত্যের সন্ধানে বহু দেশ ঘুরে অবশেষে ইসলামের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ তার দেশের কথা তুললেন, পারস্যের অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি যখন পারস্যে ছিলাম, তখন ঘোড়সওয়ারি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে পরিখা খনন করতাম। আমার মনে হয় আপনি এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।'

প্রস্তাবটি রাসূলুল্লাহর ﷺ মনে ধরল। বাকি সাহাবিদেরও বেশ পছন্দ হলো। পরিখা খননের জন্য বেছে নেওয়া হলো মদীনার উত্তর দিক। এ দিকটাতেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মদীনার পূর্ব-পশ্চিম দু দিকেই পাথুরে পাহাড়ি অঞ্চল, আর দক্ষিণে ঘন সন্নিবেশিত ঘরবাড়ি, কৃষিজমি। অর্থাৎ মদীনার উত্তর দিকটাই ছিল সবচাইতে অরক্ষিত।

## পরিখা খনন

পরিখা খনন শুরুর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাদের বনু হারিসার দুর্গে পাঠিয়ে দেন যেন তারা নিরাপদে থাকে। এরপর শুরু হলো পরিখা খনন। পরিখা খনন যেমন-তেমন কাজ না, কঠিন কাজ! আর সীমিত লোকবল নিয়ে এই কাজ করা তো রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। মানুষজন উত্তেজিত,

উদভ্রান্ত। এমন সংকটের মুহূর্তে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাওয়া সহজ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ অসাধারণ ব্যবস্থাপনায় পরিখা খননের কাজটি সহজ হয়ে গেল। সাহাবিদেরকে দশ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিলেন। প্রতিটি দলের উপর দায়িত্ব ছিল চল্লিশ হাত খনন করা। এভাবে করে পুরো উত্তর দিকজুড়ে নিয়োজিত হলো সাহাবিদের অনেকগুলো দল। খননের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলে এই পরিখাই মদীনাকে দেবে সুদৃঢ় নিরাপত্তা।

খননের কাজ শুরু হলো খুব প্রতিকূল আবহাওয়ায়। প্রচণ্ড শীত, কনকনে বাতাস। এরই মাঝে চলছে ঠুকঠুক করে মাটি খনন। রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া কারো জায়গা থেকে সরার অনুমতি নেই। নয় জন মাটি কাটে, এক জন পাহারা দেয়। এভাবে পালাবদল করে কাজ চলতে থাকে। মাটি কাটার জন্য কোনো যন্ত্র নেই, নেই অত্যাধুনিক কোনো ব্যবস্থা। নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে সেগুলোকে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। শারীরিক কষ্ট তো আছেই, তার উপর যোগ হয়েছে প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর শঙ্কা। যেকোনো মুহূর্তে শত্রুরা চলে আসতে পারে।

নেতা ও সামরিক কমান্ডাররা সাধারণত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা আর নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতার আসনে বসে থাকেননি। নিজেই নেমে পড়লেন পরিখা খননে। পৃথিবীর কজন নেতা অনুসারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছোটখাটো কাজ করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। সারা বিশ্বের নেতা হয়ে তিনি মাটি কেটেছেন। তাঁর চোখ-মুখ-গা ধুলোয় ধূসরিত হয়েছে।

শুধু গায়ের জোরে কতক্ষণ টেকা যায়? কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ চালাতে হলে চাই প্রচণ্ড মনোবল, তীব্র উৎসাহ আর উদ্দীপনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো সময়টা জুড়ে সাহাবিদের মনোবল চাঙ্গা রাখেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ؓ কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। আনাস ইবন মালিক ؓ সেদিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

*'আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোনো ক্রীতদাস ছিল না, যাদেরকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হলেন। সাহাবিদের ক্ষুধায় ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। তুমি আনসার আর মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও।*

*সাহাবিরা উত্তরে বললেন,*

*আমরা তো সব বাইয়াত করেছি মুহাম্মাদের ﷺ হাতে,*
*জিহাদ করবো, লড়ে যাব, দেহে যতদিন প্রাণ থাকে।*

*সেসময় সাহাবিদের খাবার হিসেবে বরাদ্দ ছিল এক মুঠো যব। বাসি চর্বিতে মিশিয়ে*

*সেই যব রান্না করা হতো। বড় বিস্বাদ সে খাবার, বড় দুর্গন্ধময়।'*[39]

নেতৃত্বের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত সেদিন রচিত হলো। আল্লাহর রাসূল কবিতা পড়ছেন, সাহাবিরাও সমবেত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করছে। এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিখা খননের কাজ সহজ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা এই আন্তরিক মানুষগুলোর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন,

> "মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ না করে চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।" (সূরা নূর, ২৪: ৬২)

জিহাদ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে মু'মিন ও মুনাফিক্বদের আচরণে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিক্বদের কখনোই মু'মিনদের মতো উৎসাহ থাকবে না। খন্দক্বের যুদ্ধে জরুরি প্রয়োজনে মু'মিনরা রাসূসুল্লাহর ﷺ অনুমতি নিয়ে কাজ থেকে বিরতি নিতেন। প্রয়োজন মেটাতে শহরের ভেতরে যেতেন এবং দ্রুত চলে আসতেন। অন্যদিকে মুনাফিক্বরা ছোটখাটো অজুহাত দিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে। এমনকি অনুমতি না নিয়েই ভেতরে চলে যায়। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

> "রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মতো গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নিসা, ২৪: ৬৩)

সাহাবিরা পরিখা খননের কাজ শেষ করলেন। কুরাইশ ও গাতফান বাহিনী মদীনার কাছে চলে আসে। পরিখা দেখে তারা হতচকিত হয়ে যায়। তারা এরকম কিছু আশাই করেনি! তারা ভাবছিল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে খুব সহজে মদীনা দখল করে ফেলবে। তাদের মনোবলে কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। কেননা তারা এসেছিল সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিয়ে। মদীনাকে অবরোধ করে রাখা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

খন্দক্বের যুদ্ধে বদর বা উহুদের মতো মুখোমুখি যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ হয়। জোট বাহিনী বিভিন্নভাবে মদীনায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু

---

[39] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ৬৪ মাঘাজি, হাদীস ১৪৪।

উহুদ পর্বত
পরিখা
মসজিদে নববী
খাযরায গোত্র
বনু কুরাইযা গোত্র
বনু নাযির গোত্র
আউস গোত্র
মসজিদে কুবা
খন্দকের যুদ্ধ

সেটা তারা করতে পারেনি।

## দ্বন্দ্বযুদ্ধ: আলী ﷺ বনাম আমর ইবন আব্দ আল-উদ

আমর ইবন আবদ আল-উদ ছিল কুরাইশদের এক জনপ্রিয় বীরযোদ্ধা। সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দ্বৈতযুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করে, 'কে আছে আমার সাথে লড়বে?'

আলী ﷺ এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'আমি যেতে চাই আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তুমি যেও না। ও হলো আমর ইবন আব্দ আল-উদ।' আমর ছিল বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে নিরুৎসাহিত করলেন।

আমর তখন টিটকারি মেরে বলে উঠলো, 'কী হলো! তোমাদের কি একজনও নেই? কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যেখানে তোমরা শহীদ হলে যেতে পারবে?'

আলী ﷺ আবার উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ না করলেন। আমর তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ জানালে আলী ﷺ আবার অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

- আলী! বোঝার চেষ্টা করো। এটা হচ্ছে আমর ইবন আব্দ আল-উদ!

- হোক, তবু আমি লড়তে চাই।

এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি পেয়ে আলী এগিয়ে গেলেন দ্বৈতযুদ্ধে। আমর আলীকে জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি আলী।

- আবদ মানাফের ছেলে আলী?

- না, আমি আবু তালিবের ছেলে আলী।

- দেখো, ভাতিজা, তোমার চাচাগোছের কেউ নেই লড়াই করার জন্য? তোমার রক্ত ঝরানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

- কিন্তু আমার আছে! আল্লাহর কসম করে বলছি!

আমর ক্ষেপে গিয়ে আলীর বর্মে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। সেই আঘাতে বর্ম ভেঙে আলী ﷺ মাথায় আঘাত পেয়ে যান। আমরের তলোয়ার আলীর বর্মে আটকে যায়। আলী তখন আমরের ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

# বিপদের প্রথম কালো মেঘ: ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা

পরিখা খনন করে রাখায় সামরিক জোট খুব বেশি সুবিধা করতে পারছিল না। এদিকে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে মুসলিমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। মদীনা অবরোধ করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোটবাহিনীর ছিল না। তাই তারা মদীনার অভ্যন্তরে বনু কুরায়যাকে দিয়ে মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা করে যেন মুসলিমরা ভেতরে-বাহিরে দু'দিকেই বিপদে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব বনু কুরায়যার নেতা কা'ব ইবন আসাদের সাথে দেখা করতে যায়।[40]

হুয়াইকে দেখে তার দুরভিসন্ধির আঁচ করতে পেরে কা'ব দরজা বন্ধ করে দেয়। হুয়াই কড়া নাড়তে নাড়তে বলে,

- কা'ব! তোমার কী হলো! দরজা খোলো!

- তুমি একটা আস্ত অলক্ষুণে লোক! মুহাম্মাদের সাথে আমার চুক্তি আছে। আমি সেই চুক্তি কিছুতেই ভাঙবো না। সে সবসময় ওয়াদা রক্ষা করেছে। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তুমি আমাকে এসবের মাঝে টেনো না।

- ধেত্তেরি! আগে তুমি দরজা খোলো তো! তোমার সাথে আমার কথা আছে!

- খুলবো না আমি দরজা।

- হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। তোমার খাবারে আমি ভাগ বসাবো সেই ভয়ে তুমি দরজা খুলছো না।

কথাটা কা'বের খুব গায়ে লাগলো, সে ক্ষেপে গেল। সে দরজা খুলে দিলো। হুয়াই বললো,

- শোনো কা'ব! তোমার জন্য আমি এসেছি বিরল সম্মান আর অতল সাগরের সন্ধান নিয়ে, আর আমার সাথে তুমি এই আচরণ করছো! তুমি কি জানো আমি কুরাইশদের সব নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে এসেছি? রুমার স্রোত-সংযোগস্থলে তাদের মোতায়েন করেছি। গাতফানের নেতা আর লোকদেরকেও নিয়ে এসেছি। তারা আছে উহুদের পাদদেশে নাকমা পাহাড়ে। ওরা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে, মুহাম্মাদ ও তার দলবলকে উৎখাত না করে তারা এবার ছাড়বে না।

- তুমি কোনো খুশির খবর আনোনি হুয়াই। তুমি এনেছো আমার লাঞ্ছনা আর অপমানের খবর। তুমি এনেছ এক পানিশূন্য মেঘ, যা শুধু চমকে আর গর্জে, বর্ষে না মোটেও। তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনো না, আমি এসবের মাঝে নেই।

কিন্তু হুয়াই তাকে ফুসলাতে লাগলো। একপর্যায়ে কা'ব কিছুটা নরম হলো। কা'বের

---

[40] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০।

মনে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সাহস করতে পারছিল না। কিন্তু হুয়াই এর চাপাচাপিতে সে উৎসাহ বোধ করলো এবং চুক্তিভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি টের পেলেন। তিনি এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য আয-যুবাইর ইবন আওয়্যামকে ؓ পাঠান । যুবাইর ফিরে এসে জানান, বনু কুরায়যা তাদের দুর্গগুলো প্রস্তুত করছে, রাস্তাঘাট খালি করছে আর তাদের গবাদিপশু জড়ো করছে। এগুলো ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষণ। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাদ ইবন মুআয, সাদ ইবন উবাদাহ, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এবং খাওয়াত ইবন যুবাইর -- এই চারজন সাহাবিকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠান। তাদেরকে বলে দিলেন, 'যদি বনু কুরাইযা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আমাকে তা গোপনে জানাবে। আর যদি তেমন কিছু না হয় তাহলে সবাইকে জানাতে সমস্যা নেই।' এই চারজনের প্রতিনিধি দল বনু কুরায়যার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন তারা যা আশঙ্কা করছিলেন, অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। বনু কুরায়যা বলাবলি করছে, 'মুহাম্মাদ! সে আবার কে! তার সঙ্গে আমাদের কোনো চুক্তি নেই!'[41]

সাদ ইবন মুআয খুব ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তারা বুঝলেন রাগারাগি করে লাভ নেই, অবস্থা বেগতিক। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে এসে সালাম দিলেন, আর শুধু দুটো শব্দ বললেন, 'আদুল এবং কাররাহ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বোঝার বুঝে নিলেন। আদুল এবং কাররাহ হচ্ছে আরবের দুই গোত্র। এরা ইতিপূর্বে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এ দুটো গোত্রের নাম দিয়ে তারা বুঝিয়েছেন বনু কুরায়যাও এদের পথ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামাহ ইবন আসলামের ؓ নেতৃত্বে দুইশো এবং যাইদ ইবন হারিসার ؓ নেতৃত্বে তিনশো সৈন্যের দুটো বাহিনী পাঠালেন বনু কুরায়যার এলাকায়। উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরায়যাকে ইঙ্গিত দেওয়া: মুসলিমরা মোটেও ভেঙে পড়েনি, বরং তারা লড়াই করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে জোটের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে বনু কুরায়যা ২০টি উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য জোটবাহিনীর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করে কিন্তু মুসলিমরা সেগুলো আটক করে।

## সংকটের কালো মেঘের ঘনঘটা: মুনাফিকদের পিছুটান

মদীনার উত্তরে দশ হাজার বহিরাগত সৈন্য, আর মদীনার অভ্যন্তরে বনু কুরায়যার বিদ্রোহ। এ পরিস্থিতিতে কী ছিল মুসলিমদের মনের অবস্থা? একজন ইতিহাস রচয়িতা ঘটনা বর্ণনা করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর মনের ভেতরে কী ঘটছে তা জানা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং

---

[41] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

> "যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নিচ থেকে তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য আসছিল, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত, আর (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ১০-১১)

সবার মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছিল। চাপের মুখে তাদের মনে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বিরুপ ধারণা আসতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে -- আল্লাহ যদি আমাদের জয়ী না করেন? ইসলাম কি আসলে সত্য দ্বীন? আল্লাহ কি আসলেই আছেন? কিন্তু এই পরীক্ষা সত্যিকারের মু'মিনদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।

> "যখন মু'মিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখলো, তখন বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২২)

এই কঠিন পরিস্থিতিতে, এই অস্থিরতার মাঝে সত্যিকারের মুসলিমদের ঈমান ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্যবোধ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তারা জানতেন এটা আল্লাহ তাআলার একটা পরীক্ষা। তারা ভয় পেয়েছিলেন সত্যি। ভয় পেয়েছিল মুনাফিক্বরাও, কিন্তু পার্থক্য ছিল তাদের প্রতিক্রিয়ায়। মুনাফিক্বরা হাল ছেড়ে দিল, নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু মু'মিনরা হাল ছাড়লেন না। মু'আত্তাব ইবন কুশাইর নামের এক মুনাফিক্ব তো রাখঢাক না রেখে বলেই বসলো, 'মুহাম্মাদ তো আমাদের কিসরা আর সিজারের ধনদৌলতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর পরিস্থিতি এখন এমন যে, শান্তিতে পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা পর্যন্ত নেই!'

হতাশা, ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দোষারোপ ও নিন্দা করা -- এগুলো মুনাফিক্বদের ট্রেডমার্ক। সামান্য বিপদে পড়লে তারা ভেঙে পড়ে, হাল ছেড়ে দেয়। শত্রুদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চায় এবং মুজাহিদদের দোষারোপ করা শুরু করে। সেই যুদ্ধে মুনাফিক্বদের মনোভাব, আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

> "এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, (আজ শত্রুবাহিনির সামনে) দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই। কাজেই, তোমরা ফিরে চলো। তাদের একটি অংশ তোমার কাছে এই বলে অনুমতি চাইছিল যে, আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো সব অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, পলায়ন করাই ছিল ওদের ইচ্ছা।

যদি শত্রুপক্ষ চারদিক থেকে শহরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতো, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করতো এবং তারা মোটেই বিলম্ব করতো না। অথচ এই লোকেরাই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (তাদের জানা উচিত,) আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করতে চাও, তবে এ পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।

বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা (অন্যদের যুদ্ধে যেতে) বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে, আমাদের কাছে এসো। ওদের অল্পসংখ্যক লোকই যুদ্ধ করে।

তোমাদের বিজয়ে তারা কুণ্ঠিত বোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। এরপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা গনিমতের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে। তারা মু'মিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।

(অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা মরুভূমির বেদুঈনদের সাথে থেকে যেতে পারতো আর সেখানে বসে তোমাদের খবর নিতে পারতো। যদিও ওরা এখনো তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এরা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ১৩-২০)

এই আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১) দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে মুনাফিকরা রাজি থাকে না। কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে না, বরং তারা আল্লাহ সম্পর্কে উদ্ভট সব কথা বলতে থাকে। কাফিরদের সামান্য চাপে তারা ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে।

২) মুনাফিকরা স্বার্থপর প্রকৃতির হয়। যে সময়টাতে মুসলিমদের এক হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা জরুরি ছিল, সেই সময় মুনাফিকরা নিজেদের গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়ে যায়। বিপদের সময় তারা চোখ উল্টে ফেলে। যখন বিপদ কেটে যায় তখন গনিমতের মালের হিসাব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩) মৃত্যু নির্ধারিত। সুতরাং এ মৃত্যু থেকে মানুষ পালানোর যত চেষ্টাই করুক না কেন

কোনো লাভ নেই। মুনাফিক্বরা ভুল জায়গা থেকে সাহায্য আশা করছিল। তারা কাফিরদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেছেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন।

৪) জিহাদে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে মুনাফিক্বদের অনীহা কাজ করে। মুনাফিক্বরা চাইছিল মদীনার অদূরে বসে সেখান থেকে সব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে, কিন্তু নিজেরা 'ঝামেলা' থেকে দূরে থাকবে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন, মুনাফিক্বরা মুসলিমদের পাশে থাকবে না কিন্তু টেলিভিশনে মুসলিমদের অবস্থা দেখবে। তারা নিজেরাও জিহাদে অংশ নিচ্ছিল না, অন্যদেরকেও জিহাদে যেতে অনুৎসাহিত করছিল।

## একের পর এক আক্রমণ

কুরাইশ ও গাতফানের সামরিক জোট মদীনার ব্যূহ ভেঙে ঢুকে পড়তে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রতি রাতে তারা পরিখার এক মাথা থেকে আরেক মাথা টহল দিয়ে অরক্ষিত জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। একবার খালিদ ইবন ওয়ালিদ তার ঘোড়সওয়ারি দল নিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে থামিয়ে দেয় উসাইদ ইবন হুদাইরের ২০০ সেনার একটি দল। সেই খণ্ডযুদ্ধে তুফাইল ইবন আন-নুমান শহীদ হন। তাকে বর্শা ছুঁড়ে হত্যা করে হামযার হত্যাকারী ওয়াহশি। এই যুদ্ধে হাব্বান ইবন আল-আরিকাহর তীরের আঘাতে সাদ ইবন মুআয ﷺ আহত হন। হামলা-পাল্টাহামলা-প্রতিরোধ -- এভাবে কেটে যায় প্রায় বিশটি দিন।

## কূটনৈতিক যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শত্রুদের কার কী উদ্দেশ্য তা খুব ভালোই জানতেন। শত্রু বলতে তখন তিনটি ভিন্ন দল। বহিরাগত শত্রু মক্কার কুরাইশ আর গাতফান তো আছেই, সাথে যুক্ত হলো অভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যা।

কুরাইশ আর ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ ছিল ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিরোধ। তারা নিছক অর্থ-সম্পদের জন্য লড়ছিল না। তারা জানতো মুসলিমদের দমন করতে না পারলে আরবে তাদের আদর্শ, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবই বিলীন হয়ে যাবে। তাদের কাছে এটা টাকা-পয়সা থেকেও গুরুতর বিষয়। ইসলামের উত্থান মানে তাদের জন্য অস্তিত্বের প্রশ্ন। অন্যদিকে গাতফানের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই অর্থনৈতিক স্বার্থ। কীভাবে নিজেদের পকেট ভারী করা যায় সেটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। হোক তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে হচ্ছিল শত্রুপক্ষের একটি অংশের সাথে চুক্তি করে তাদের ঐক্য ভেঙে

দেওয়ার মাধ্যমে এই অবরোধকে দুর্বল করে দেওয়া সহজ হবে। চুক্তির জন্য আল্লাহর রাসূল বেছে নিলেন গাতফান গোত্রকে।

জিহাদ যুদ্ধক্ষেত্রের ইবাদত বটে, কিন্তু কেবল সামরিক শক্তিই সবকিছু নয়। জিহাদকে সফল করতে চাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক পারদর্শিতা। গাতফানের সাথে চুক্তি করার বিষয়টা আল্লাহর রাসূলের ﷺ অসাধারণ কূটনৈতিক পারদর্শিতাই প্রমাণ করে।

গাতফানের নেতাদের প্রস্তাব করা হলো, যদি তারা কুরাইশ-ইহুদির সম্মিলিত জোট ভেঙে চলে যায় আর মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করে তাহলে মদীনার এক বছরে যত ফসল হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধ না করেই এতগুলো শস্য পেয়ে যাওয়া কম কথা নয়! তারা অনায়াসে রাজি হয়ে গেল। চুক্তিপত্র লেখা হলো, বাকি থাকলো স্বাক্ষর করে চূড়ান্ত করা।

কিন্তু চুক্তি সাক্ষরের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা মদীনার সিংহভাগ ফসলের মালিক ছিল এই আনসাররাই। তিনি আনসারদের দুই নেতা, সাদ ইবন মুআয ﷺ এবং সাদ ইবন উবাদাহকে ﷺ গাতফানের সাথে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়টি জানালেন।

সাদ ইবন মুআয ﷺ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। এরপর বললেন,

- হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন এই চুক্তি করতে চান? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাকি আল্লাহর আদেশ? আল্লাহ তাআলার আদেশ হলে তো মানা অবশ্য কর্তব্য, আর আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হলেও আমরা মাথা পেতে নেব। তবে আপনি যদি আমাদের ভালোর কথা ভেবে এই চুক্তি করতে চেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন,

- আমি তোমাদের স্বার্থেই এই চুক্তিটি করতে চাই। আরবরা সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে, সবদিক থেকে তোমার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এই চুক্তি করা হলে তোমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে আমি মনে করি।

কঠিন এক মুহূর্ত। দীর্ঘ বিশ দিন ধরে শত্রুরা মদীনা অবরোধ করে রেখেছে। মুসলিমরা ক্লান্ত। এ অবস্থায় কতদিন নিজেদের মনোবল ধরে রাখা সম্ভব, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দশ হাজার সেনাদল যদি মদীনায় ঢুকে পড়ে, হয়তো মৃত্যুই হবে মুসলিমদের পরিণতি। অন্যদিকে এই ধরনের একটা চুক্তিতে নিশ্চিতভাবে মুসলিমরা উপকৃত হবে। তবু সেই বিপদের ঘনঘটায় অবিচল সাদ ﷺ দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন,

*'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একটা সময় মুশরিক ছিলাম। গাতফানরাও মুশরিক। আমরা*

*আল্লাহর ইবাদত করতাম না, মূর্তিপূজা করতাম। আল্লাহ যে কে -- সেটাই তখন জানতাম না। সেই (জাহিলিয়াতের) সময়ের কথা বলছি, এই গাতফানের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে একটা খেজুর কেড়ে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। হয় তারা আমাদের অতিথি হিসেবে এসে আমাদের খেজুর খেতে পেরেছে, নয়ত নিজের পয়সা দিয়ে কিনে খেয়েছে। আর আজকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলাম দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, আপনাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন -- আজ কিনা আমরা আমাদের সম্পত্তি ওদের হাতে তুলে দেবো? এমন চুক্তির আমাদের প্রয়োজন নেই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম করে বলছি, ওদের আমরা কিচ্ছু দেবো না। ওদের জন্য আমাদের তরবারিগুলো উঁচিয়ে ধরবো -- যতক্ষণ না মহান আল্লাহ আমাদের আর ওদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'*[42]

উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো। সাদ ইবন মুয়াজ ؓ তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে চুক্তিপত্রের দলিল নিয়ে লেখাগুলো মুছে ফেললেন। বললেন, 'এবার তারা আমার সাথে লড়াই করুক।'

রাসূল ﷺ সমঝোতা করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু আনসাররা যুদ্ধ করতেই আগ্রহী ছিলেন। তাদের ঈমান দৃঢ় ছিল। তারা ছিলেন মর্যাদাবান মানুষ। যে গাতফান গোত্র জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সমীহ করে চলত, ইসলামের যুগে এসে সেই গাতফানের সাথে সমঝোতা করতে তাদের আত্মমর্যাদায় বাধে। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কারো সাথে কিছুমাত্র আপস করতে তারা রাজি ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা এই অসাধারণ মানুষগুলোর উপর রহম করুন।

এই কথোপকথন থেকে আরেকটা চমৎকার বিষয় শেখার আছে। তা হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তাঁর সাহাবিদের চমৎকার বোঝাপড়া। সাহাবিরা যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যেকোনো আদেশ মেনে নিতে এক পায়ে খাড়া ছিলেন, তেমনি আল্লাহর রাসূলও তাদের মতামত শুনতেন, সম্মান দেখাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ছিলেন নেতাদের মধ্যে সেরা আর তাঁর অনুসারীরাও ছিল অনুসারীদের মধ্যে সেরা!

## আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম সাহায্য: নুআইম ইবন মাসউদ ؓ

পরিস্থিতির এই পর্যায় পর্যন্ত মুসলিমরা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছে, তাঁর উপর ভরসা করে এসেছে এবং দ্বীন ইসলামের আদর্শে অটল থেকেছে। ঈমানের পরীক্ষায় মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করবেন। বাহ্যিক বিবেচনায় মুসলিমদের এই যুদ্ধে হেরে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ তাঁর

---

42 সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২।

বান্দাদের অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করেন। তিনি পাঠালেন নুআইম ইবন মাসউদ নামের এক ব্যক্তিকে।

নুআইম ইবন মাসউদ ছিলেন গাতফান গোত্রের। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার গোত্রের লোকজন তা জানে না। আপনি আমাকে যা খুশি আদেশ করুন।' গাতফান মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলিমরা টিকে থাকবে নাকি কোনো ঠিক নেই। এমন সময়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে ভাবাই যায় না! কিন্তু এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ চেয়েছিলেন তাকে আল্লাহর সৈনিক বানাবেন, তাই উপযুক্ত সময়ে তাকে বের করে এনেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নুআইমকে বললেন, 'তুমি একা একজন মানুষ, যদি আমাদের সেনাদলে যোগ দাও, তাতে পরিস্থিতি খুব বেশি হেরফের হবে না। কাজেই এমন কিছু করো যাতে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধ মানেই ধোঁকা।'

নুআইম ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানতেন কে কার আদর্শিক শত্রু এবং কে কার কৌশলগত মিত্র। এই সহজ সমীকরণটি আবিষ্কার করে তিনি প্রথমে বনু কুরাইযার ইহুদিদের কাছে গেলেন। তাদের বললেন,

*'দেখো তোমরাও আমাকে এতদিন ধরে চেনো, আমিও তোমাদের চিনি। আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তোমরা ভালো করেই জানো, আমি যদি তোমাদের কোনো উপদেশ দিই, সেটা তোমাদের ভালোর জন্যই। তোমরা আসলে বেশ বড়সড় একটা ভুল করেছ। মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধে নামতে চাচ্ছো, অথচ তোমরা থাকো কিন্তু এই মদীনাতেই। এখানে তোমাদের স্ত্রী-সন্তান আছে, সহায়-সম্পত্তি আছে। কুরাইশ আর গাতফানের অবস্থা কিন্তু তোমাদের মতো না, এটা তাদের দেশ না। তারা পরিবার-পরিজন সব ঠিকঠাক রেখে যুদ্ধে এসেছে। এখন যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে যেমন এসেছে, তেমনি অবস্থা বেগতিক দেখলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেরত যাবে। তখন তোমাদের কী হবে ভেবেছো? তোমরা থাকবে মুহাম্মাদের হাতের মুঠোয়। তার সঙ্গে লড়ে তোমরা সুবিধা করতে পারবে না। তারচেয়ে বরং তোমাদের একটা বুদ্ধি দিই, শোনো: তোমরা কুরাইশদের নেতাদের থেকে কিছু লোককে বন্ধক হিসেবে তোমাদের কাছে রাখো। এটা নিশ্চিত করতে না পারলে যুদ্ধ কোরো না। তাদের সাথে তোমরা যে চুক্তি করলে, তার নিশ্চয়তাস্বরূপ তাদের কিছু লোক তোমাদের জিম্মায় থাকুক, যুদ্ধ শেষ হলে তারপর ছেড়ে দেবে।'*[43]

তখনকার দিনে এভাবে কাউকে জিম্মি রাখা অস্বাভাবিক কোনো রীতি ছিল না। তাই

---

[43] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭।

বনু কুরায়যা নুআইমকে সন্দেহ করলো না। আর তার কথায় যুক্তিও ছিল, তাই তারা রাজি হয়ে গেল। এরপর নুআইম ﵁ গেলেন কুরাইশদের কাছে, তাদের বললেন,

*'তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে আশা করি নতুন করে কিছু বলতে হবে না। তোমরা তো আমাকে চেনোই। আমি তোমাদের ভালোর জন্যই উপদেশ দেবো, সেটাও তোমরা জানো। আমার কানে একটা খবর এসেছে। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাদের সেটা জানানো কর্তব্য বলে মনে করি। তোমরা হয়তো টের পাওনি, আমি শুনেছি, মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি বাতিল করে ইহুদিরা এখন অনুতপ্ত। তারা তার সাথে আবার পুরোনো চুক্তিতে ফিরে যেতে চায়। তারা যে আসলেই অনুতপ্ত সেটা প্রমাণ করার জন্য তারা মুহাম্মাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে এই বলে যে: আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। এই কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি আমরা কুরাইশ ও গাতফানদের কিছু নেতাকে আপনার হাতে তুলে দিই আর আপনি তাদের হত্যা করতে পারেন -- আপনি কি তাতে খুশি?*

*মুহাম্মাদ তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বলেই জানি। কাজেই ইহুদিরা যদি তোমাদের কাউকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে যেতে চায় তাহলে সাবধান! ভুলেও তোমাদের কাউকে তাদের হাতে দিও না।'*[44]

এরপর তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন।

জোটের প্রত্যেকে নুআইমের কথা বিশ্বাস করলো আর তাদের নিজেদের মধ্যে জন্ম নিল অবিশ্বাস। কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে, নুআইম মুসলিম হয়ে এখন আল্লাহর রাসূলের পক্ষে কাজ করছে। এদিকে কুরাইশরাও অস্থির হয়ে ওঠে। তারা যে করেই হোক একটা দফারফা চাচ্ছিল। ইকরিমা ইবন আবু জাহলকে প্রতিনিধি হিসেবে তারা বনু কুরায়যার কাছে পাঠায়। সে বলে, 'দীর্ঘদিন অবরোধ করে আমরা বেশ ক্লান্ত। আমাদের ঘোড়া আর উটগুলো মারা যাচ্ছে। আমরা যুদ্ধের জন্য সরবরাহ চাই। তোমরা প্রস্তুতি নাও। আমরা আজকেই মুহাম্মাদের সাথে চিরতরে বোঝাপড়া করে ফেলি, তাকে খতম করে দিই।' ইহুদিরা বললো, 'আমরা তো শনিবারে যুদ্ধ করি না। আর তোমরা আদৌ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে কি না -- সেটা নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। তাই জামানতস্বরূপ তোমাদের কিছু লোককে আমাদের কাছে দাও। মুহাম্মাদকে শেষ করা পর্যন্ত তারা আমাদের কাছেই থাকবে।'

ইকরিমা ফিরে এসে আবু সুফিয়ানকে এ খবর জানালে সে বলে, 'আরে! নুআইম তো ঠিক এই কথাটাই আমাদের বলেছিল!' আবু সুফিয়ান বনু কুরায়যার কাছে খবর পাঠায় যে, তারা ইহুদিদের কাছে কোনো কুরাইশিকে জিম্মি রাখবে না। সে কথা শুনে ইহুদিরা বললো, 'নুআইমের কথা দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল! এই কুরাইশের

---

[44] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮।

লোকেরা মোটেও আন্তরিক নয়। বিপদে পড়লে ঠিকই আমাদের ছেড়ে পালাবে। কুরাইশ আর গাতফানকে সাফ জানিয়ে দাও আমাদের হাতে তাদের কাউকে জিম্মি না দিলে আমরা তাদের সাথে নেই।'

নবীজি ﷺ তখন আল্লাহর কাছে একটা দুআ করেছিলেন,

> *'হে আল্লাহ, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! ঐ সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে দিন! তাদের পরাজিত করে দিন, তাদের নড়বড়ে করে দিন!'*[45]

তাঁর এই দুআ কবুল হয়েছিল, একটি বিশাল সামরিক জোটকে আল্লাহ ভেঙে দিলেন একটি মাত্র মানুষকে ব্যবহার করে -- নুআইম ইবন মাসউদ ﷺ। মুসলিমরা ঈমান, ধৈর্য, অধ্যবসায় আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহও তাদের সাহায্য করলেন।

## গাতফানের সাথে চুক্তি ও নুআইমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন গাতফানকে জোট থেকে আলাদা করে দিতে। এটা হিকমাহর পরিচায়ক। কারণ সবার সাথে একসাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যদি শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা যায় কিংবা একটি অংশকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায়, তবে সেটাই উত্তম। কেননা তাতে শত্রুকে দুর্বল করে ফেলা যায়।

২) নেতার উচিত তার প্রত্যেকটা সৈনিক এবং উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করা। সবাইকেই ময়দানের সৈনিক হতে হবে এমন নয়। রাসূল ﷺ নুয়াইমের হাতে তরবারি তুলে দেননি। তিনি জানতেন কী কাজে তাকে ব্যবহার করা সর্বোত্তম। প্রত্যেককে তার উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত পরিবেশে নিয়োগ করা উচিত।

## আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য: ঝড়ো বাতাস

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল প্রথমে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন নুআইম ইবন মাসউদের মাধ্যমে। এর পরেই তিনি পাঠান প্রচণ্ড ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস আর ফেরেশতাদের বাহিনী, যা শত্রুদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

> **"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে**

---

[45] সহীহ বুখারি, অধ্যায় দুআ, হাদীস ৮৭।

তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।” (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৯)

এই হিমশীতল হাওয়ায় কুরাইশরা ধ্বংস হয়নি সত্যি, কিন্তু ভয়ানক বাতাসের তোড়ে তাদের মনে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়। ভয়াবহ সেই বাতাস, ভয়ানক সে বাতাসের জোর। তাঁবুর রশি ছিড়ে গেছে, রান্নার পাতিলগুলো উল্টে পড়ে কোথায় উড়ে গেছে। আলো নিভে গেছে, ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। সেই সাথে ফেরেশতারা চারপাশ থেকে চিৎকার করে বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবার!

সব মিলিয়ে শত্রু শিবিরে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, গোত্রের নেতারা সব চিৎকার করে উঠলো, ‘কে আছো! জলদি আসো! আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!’ প্রচণ্ড ভয়ে তাদের মনে হচ্ছিল তারা বুঝি মারাই যাবে। যুদ্ধ করার মতো মনোবল বা সাহস কিছুই আর অবশিষ্ট থাকলো না।

অদ্ভুত বিষয় হলো, এতকিছু হয়ে গেল অথচ মুসলিমরা কিছু টেরও পায়নি। এই বাতাস শুধু শত্রুশিবিরেই আক্রমণ করেছিল। আল-কুরতুবির মতে, এই বাতাস ছিল নবীজির একটি মু’জিযা।

খন্দক্বের যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ী হবার কোনো কারণ ছিল না। মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা আর শক্তির সামনে সেসব নিতান্তই অপ্রতুল। যতই অভিনব কিংবা কার্যকরী সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হতো না কেন, এই যুদ্ধে জেতা অসম্ভব ছিল। পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার। তাই আল্লাহর রাসূল সাহায্য চেয়েছিলেন সেই সত্তার কাছে যিনি চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারেন। এবং তা-ই হয়েছে, আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেছেন।

## জোটবাহিনীর প্রস্থান

অবরোধের ক্লান্তি, হতাশা, কোন্দল আর সবশেষে ঝড়ো বাতাস -- সব মিলিয়ে কুরাইশরা মানসিকভাবে একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা যেন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের অবস্থা ও কৌশল বোঝার জন্য একজন সাহাবিকে শত্রু ক্যাম্পে নজরদারি করার জন্য পাঠাতে চাইলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, ‘কে আছে যে আমাকে শত্রুর ব্যাপারে তথ্য এনে দেবে? যে এই কাজ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আমার সাথে স্থান দেবেন।’

চারদিকে পিনপতন নীরবতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার ডাকলেন। কেউ সাড়া দিল না। তারপর আবার।

সাহাবিরা সাধারণত ভালো কাজের সুযোগ পেলেই লুফে নিতেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ মানতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউই জবাব দিল না।

হিমশীতল রাত। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সারাদিনের ধকলের পর সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। এর মধ্যে শত্রুশিবিরের একেবারে ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে আসার মতো বিপজ্জনক মিশনে যাওয়ার অবস্থা কারোরই নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁর দক্ষ নজরে বেছে নিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত সৈনিকটিকে। হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামানের নাম ধরে ডেকে বললেন, 'হুযাইফা, তুমি যাও, শত্রুদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আনো। কিন্তু এমন কিছু করে তাদের উসকে দিও না যাতে করে তারা আমাদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে নেমে পড়ে।'

এতক্ষণ বিষয়টা ছিল ঐচ্ছিক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সরাসরি আদেশ করলেন, হুযাইফাকে তাই যেতেই হলো। হুযাইফা ছিলেন বুদ্ধিমান, চোখ-কান খোলা, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরিস্থিতি চট করে সামাল দিতে সক্ষম।

হুযাইফা ﵁ বের হলেন। বাইরে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা, কিন্তু হুযাইফা ﵁ তার কিছুই টের পেলেন না। সবই আল্লাহর সাহায্য! সেই অন্ধকার রাত্রিতে হুযাইফার ﵁ অভিজ্ঞতা তার মুখেই শোনা যাক,

*'আমি বের হয়ে এলাম, মনে হলো যেন উষ্ণ পানির উপর হাঁটছি। সুযোগ বুঝে শত্রুদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম। গিয়ে দেখি লণ্ডভণ্ড অবস্থা। আবু সুফিয়ান আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে গা গরম করছে। তাকে দেখেই আমি আমার ধনুকে তীর বসিয়ে ফেললাম। তাকে হত্যা করতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল, আল্লাহ রাসূল তো আমাকে নিষেধ করেছেন যেন উসকানিমূলক কোনো কাজ না করি। এই ভেবে আর কিছু করলাম না। কিন্তু আমি যদি চাইতাম, সেদিনই তাকে হত্যা করতে পারতাম।'*

*গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আবু সুফিয়ানের হঠাৎ সন্দেহ হলো এই অন্ধকারের মাঝে শত্রুপক্ষের কেউ তো চাইলে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে! সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'কুরাইশরা, তোমরা দেখে নাও তোমাদের পাশে কে আছে। সবাই সবার পাশেরজনের পরিচয় জেনে নাও।'*

*হুযাইফা এ কথা শোনার পর এক সেকেন্ডও দেরি করলেন না। ঝট করে তার ডান পাশেরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই, তুমি কে?' উত্তর এল, 'আমি মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান।' ডানপাশের জনকে জিজ্ঞেস করেই সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' বাম পাশ থেকে উত্তর এল, 'আমি আমর ইবন আল-আস।' হুযাইফা এত বুদ্ধিমত্তার সাথে পুরো ঘটনা ঘটালেন যে পাশের দুইজন সন্দেহই*

*করলো না হুযাইফা বাইরের কেউ। তারা তাকে কিছু জিজ্ঞেসই করলো না।*

*'আমি আমার কাজ শেষ করে চলে এলাম। আসার সময় আবারও মনে হলো উষ্ণ পানির ওপর দিয়ে হাঁটছি। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যখন ফিরে গেলাম, তখন বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করলো। আমি যা যা দেখে এসেছি তা রাসূলুল্লাহকে জানালাম (শত্রুরা চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে)। তিনি তখন আমাকে তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে আমাকে জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো ফজরের সময়ে, আল্লাহর রাসূল আমাকে ডাকছেন, এই যে ঘুমকাতুরে! ওঠো!'*

## হুযাইফার ﷺ ইন্টেলিজেন্স অপারেশন থেকে শিক্ষা

### ১) হুযাইফার শৃঙ্খলাবোধ

হুযাইফা চাইলেই আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতেন।[46] আবু সুফিয়ান তখন মক্কার নেতা। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এটা ছিল একটা ইন্টেলিজেন্স অপারেশন, গুপ্তহত্যার অপারেশন নয়। তাই হুযাইফা সুযোগ পেয়েও হত্যা করেননি।

### ২) আল্লাহর সাহায্য

যতক্ষণ মিশনে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি একেবারেই ঠাণ্ডা অনুভব করেননি। যখন তিনি ফিরে এসেছেন, তখন তার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে। এটা ছিল একটা কারামাত।

### ৩) সাহাবিদের প্রতি রাসূলুল্লাহর ﷺ স্নেহ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাহসিকতা আর আনুগত্যের কদর করতে কখনো ভোলেননি। এই দুঃসাহসী অপারেশন শেষে হুযাইফা ফিরে আসার পর যখন তার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের শরীর থেকে চাদর খুলে হুযাইফার গায়ে জড়িয়ে দেন। নিজে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। স্নেহমাখা কণ্ঠে বলেন -- এই যে ঘুমকাতুরে! স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুম থেকে ডাকতে এসেছেন!

### ৪) সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটা অনেক পরের, হুযাইফা তখন বৃদ্ধ। কুফার এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি রাসূলুল্লাহকে দেখেছেন? আপনি কি তাঁর সাহাবি ছিলেন?' এই লোকটি ছিল তাবেয়িদের একজন, অর্থাৎ সাহাবিদের পরের প্রজন্ম। হুযাইফা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি। আমরা তাঁর সাহাবি ছিলাম।' তাবেয়ি তখন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনারা তাঁকে কেমন কদর করতেন?' হুযাইফা বললেন, 'তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁকে যথাযথ কদর করা

---

[46] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১২২।

খুব কঠিন ছিল। তবু আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।' সেই তাবেয়ি তখন বললো, 'আল্লাহর শপথ, যদি আমরা তাঁর সময়ে বেঁচে থাকতাম তাহলে আমরা তাঁর পায়ে একটা ধুলোও লাগতে দিতাম না। আমরা তাঁকে মাথায় করে রাখতাম।'

হুযাইফা ﷺ সেই তরুণ তাবেয়িকে একটা শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করলেন। তাকে শোনালেন খন্দক্বের সেই রাতের কাহিনী। তিনি তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে মুখে বলা অনেক সহজ, কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। পরিস্থিতি কতটা কঠিন হলে রাসূলুল্লাহ তিন তিনবার ডাকার পরেও কেউ সাড়া না দিয়ে থাকে! শেষ পর্যন্ত তিনি হুযাইফাকে আদেশ করে এই মিশনে পাঠান।

সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্মকে সাহাবিদের সেই কষ্ট-ত্যাগ-সংগ্রামের কিছুই করতে হয়নি। তাদেরকে সাহাবিদের মতো নিজ বাবা-চাচা-ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়নি। খন্দক্বের যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। দুনিয়াতে আসার সাথে সাথেই তারা সাহাবিদের মিশনের সুফল উপভোগ করতে শুরু করেছেন। তাই তাদের জন্য এটা বলা খুব সহজ যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরও বেশি কদর করতেন। রাসূলুল্লাহর যমানায় জন্ম নিয়ে অনেকেই কাফির হিসেবে মারা গেছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সে ফিতনায় পড়তে হয়নি। সাহাবিদের যুগ ছিল শিরক, মূর্তিপূজা আর জাহিলিয়াতের যুগ। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার সময়ে তাদের ইসলামকে চিনে নিতে হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম সেসবের কিছুই দেখেনি। তারা জন্মের পর থেকেই ইসলামের শাসন, ন্যায় আর নিরাপত্তা উপভোগ করেতে পেরেছে। এ সবই অর্জিত হয়েছে সাহাবিদের রক্ত দিয়ে। কোনো প্রজন্মই সাহাবিদের সমান হতে পারবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্যই বলেছিলেন, 'আমার প্রজন্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।'

## খন্দক্বের যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা

### ১) মু'জিযা - এক বকরিতে আটশো লোকের খাওয়া!

এই মজার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ,

'তখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম। জানতে চাইলাম, ঘরে কি কোনো খাবার আছে? রাসূলুল্লাহকে এত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে আর সহ্য হচ্ছে না! তোমার কাছে কোনো খাবার-টাবার কিছু আছে? সে বললো, খাবার বলতে আছে অল্প কিছু যব আর একটা বকরির বাচ্চা। আমি তখন বকরিটাকে জবাই করলাম। ওদিকে স্ত্রী যব পিষতে শুরু করে দিল। গোশত ডেকচিতে দিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি দু-একজনকে সাথে নিয়ে চলে আসুন না! তিনি জানতে চাইলেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি বললাম কী কী আছে। শুনে তিনি বললেন, বাহ! বেশ ভালোই তো আছে! তোমার স্ত্রীকে গিয়ে

বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন সে চুলা থেকে গোশত না নামায়।’

এর পরের ঘটনাটার জন্য জাবির ﷺ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। জাবিরকে হতবাক করে দিয়ে নবীজি ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘মুহাজির আর আনসাররা শোনো সবাই! জাবির আজ তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। সবাই চলো।’ জাবির ﷺ পড়লেন মহাচিন্তায়, যাকে বলে অতল সমুদ্রে। এত অল্প খাবার দিয়ে এতজনের আপ্যায়ন করবেন কীভাবে! বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন,

- আল্লাহর রাসূল তো মুহাজির, আনসার আর তাদের সব সঙ্গীসাথীকে নিয়ে চলে এসেছেন!
- আল্লাহর রাসূল কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন খাবারের পরিমাণ কেমন?
- হ্যাঁ জানতে চেয়েছিলেন। তুমি আমাকে যা বলেছো আমি ঠিক তা-ই তাঁকে বলেছি।
- আচ্ছা, তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের থেকে ভালো জানেন।

জাবিরের স্ত্রী পরম নির্ভরতার সাথে জবাব দিলেন। তার মধ্যে কোনো উদ্বেগের ছাপ দেখা গেল না!

সাহাবিরা আসা শুরু করলেন। সবাই ক্ষুধায় অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ধীরস্থির হতে বললেন। সাহাবিরা দশ জনের দলে ভাগ ভাগ হয়ে আসতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন, তাঁরা খেয়ে গেলেন। এরপর আসলো আরেকটি দল। এভাবে প্রায় আটশো থেকে এক হাজার লোক তৃপ্তি সহকারে খেলেন। যখন সবার খাওয়া শেষ, তখনও গোশতের ডেকচিটা গোশতে পরিপূর্ণ। আর রুটিও তৈরি হচ্ছে সমান তালে। সবার খাওয়া শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ জাবিরের স্ত্রীকে বললেন তিনি যেন নিজে খেয়ে নেন আর প্রতিবেশীদের মাঝে বাকি খাবারগুলো ভাগাভাগি করে দেন।[47] আল্লাহর রাসূলের ﷺ মু’জিযায় এক বকরি আর সামান্য যব দিয়েই আটশ’রও বেশি লোক সেদিন তৃপ্তি করে খেলো।

## ২) রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী

এটাও পরিখা খননের সময়ের একটা ঘটনা। পরিখা খনন করতে করতে এক বিশাল পাথর এসে পড়ে। সেটাকে কোনোভাবে ভাঙাও যাচ্ছিল না, সরানোও যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাথরে আঘাত হানলেন। একটা স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন,

> *‘আল্লাহু আকবর! আমাকে শামের চাবি দেওয়া হয়েছে! আল্লাহর শপথ, আমি এখন শামের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!’*

---

[47] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ১৪৫।

এরপর তিনি আবার আঘাত করলেন। আবারো একটি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ বললেন,

*'আল্লাহু আকবার! আমাকে দেওয়া হয়েছে পারস্যের চাবি! আমি পারস্যের শ্বেতশুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!'*

তৃতীয়বার আঘাত হানার পর পাথরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ আবারো বলেন,

*'আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেওয়া হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে সানার দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছি!'*[48]

ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিমদের অবস্থা খুবই করুণ। তারা তখন অবরুদ্ধ। ক্ষুধা, পিপাসা, আর অনিদ্রায় শরীর-মন অবসন্ন হয়ে আছে। এ অবস্থায় যদি এমন কেউ থাকতো, যার অন্তরে ঈমান নেই, সে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহর কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সাহাবিদের দৃঢ় ঈমান। সেই কঠিন মুহূর্তেও তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথাগুলোকে দিনের আলোর মতো বিশ্বাস করেছে। চরম দুর্দশার দিনে বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছে। এটাই হলো সত্যিকার ঈমানওয়ালার পরিচয়।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর সত্যি সত্যিই মুসলিমরা এই জায়গাগুলো জয় করেছিল। শাম, পারস্য, ইয়েমেন। সব তখন মুসলিমদের হাতে।

শোচনীয় অবস্থাতেই সুসংবাদ দিতে হয়। আমাদের এই সময়ে, যখন মুসলিমরা দুর্বল, ক্রমাগত মার খাচ্ছে, আমাদের জন্য সুসংবাদ কী? আমাদের জন্য সুসংবাদ হলো, শুধু শাম, পারস্য বা ইয়েমেন নয়, একটা সময় আসবে যখন মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বকে পদানত করবে! নবীজি ﷺ বলেছেন,

*'দিন আর রাত যেখানে পৌঁছেছে, এই দ্বীনও সে সমস্ত স্থানে পৌঁছে যাবে।'*[49]

*'আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীকে ভাঁজ করে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছবে।'*[50]

কাজেই এই উম্মাহর অবস্থা এখন যতই খারাপ হোক না কেন, বিশ্বাস হারালে চলবে

---

[48] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩।

[49] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস ১৬৫০৯।

[50] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ফিতান, হাদীস ২৪।

না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে যে বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সে বিজয় অবশ্যই ঘটবে। আর আল্লাহ চাইলে খুব শীঘ্রই তা সম্ভব।

# খন্দকের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

## ১) মুসলিমদের ব্যাপারে কাফিরদের দ্বিমুখী নীতি

ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইহুদিরা মুশরিকদের চাইতে মুসলিমদের অধিক নিকটবর্তী। সে হিসেবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তাই হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখনও এমন ঘটছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলো সত্যের বিরুদ্ধে এক হতে মোটেই দ্বিধা করছে না। পশ্চিমা বিশ্বের যেসব সরকার নিজেদের 'গণতান্ত্রিক', 'মানবতাবাদী' ও উদারমনা হিসেবে দাবি করে তারা মুসলিম বিশ্বের স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, জালিম ও নিষ্ঠুর শাসকগুলোকে মদদ দিয়ে চলছে শুধুমাত্র ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য।

## ২) কাফিরদের প্রযুক্তি গ্রহণে কোনো বাধা নেই

অনেক মুসলিম কাফিরদের প্রযুক্তিকে তাদের বিশ্বাস-সংস্কৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলে। কাফিরদের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, লাইফস্টাইল -- এসব গ্রহণ না করা গেলেও তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বা তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিতে কোনো বাধা নেই। পরিখা খননের যে প্রস্তাব সালমান ফারিসী ؓ করেছিলেন সেটি ছিল কাফিরদের প্রযুক্তি। এ ধরনের কৌশলগত ব্যাপার বা কাফিরদের তৈরি প্রযুক্তির ব্যবহার ইসলামে জায়েজ।

## ৩) সামরিক শক্তি ও জিহাদ

এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা চাই যা সহজলভ্য। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমরা যোজন-যোজন পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তবু তারা হাল ছাড়েনি। অনেক মুসলিম মনে করে, আগে কাফিরদের সমপরিমাণ শক্তি ও প্রযুক্তি অর্জন করে তারপর জিহাদে অংশ নেব। সাহাবিরা কিন্তু বিষয়টা এভাবে দেখেননি। তারা তাদের হাতে যে প্রযুক্তি ছিল সেটা দিয়েই লড়ার চেষ্টা করেছেন। জিহাদ ছেড়ে আগেই সমঝোতার রাস্তায় চলার চেষ্টা করেননি।

## ৪) নেতৃত্বে আন্তরিকতা

লোক-দেখানো নেতারা অনেক বড় বড় কথা বলে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করে, পরিদর্শনে বের হয় -- তাদের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। লোক-দেখানো, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে এসব মেকি আচরণ ছিল না। সাহাবিরা যা খেয়েছেন, তিনিও তা-ই খেয়েছেন। তাদের সাথে কাজ ভাগাভাগি করেছেন, কাদামাখা হয়ে গর্ত খুঁড়েছেন। সাহাবিদের খাটিয়ে নিজে আয়েশ করে থাকেননি। এটা লোক-দেখানো মেকি মমতা না, এটা ছিল সত্যিকারের মমতা।

### ৫) সৈনিকদের দৃঢ়তা ধরে রাখা

বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি চারজনের দল পাঠিয়েছিলেন। তাদের তিনি বলে দিয়েছিলেন বনু কুরাইযা যদি চুক্তিভঙ্গ করে থাকে তাহলে সেটা যেন জনসমক্ষে না বলে ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহকে জানানো হয়। যখন তিনি খবরটি শুনলেন তখন বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো!' তিনি চাচ্ছিলেন মুসলিমরা ভেঙে না পড়ুক। তিনি সুসংবাদ দিয়ে তাদের মনোবল ধরে রাখতে চাইছিলেন।

### ৬) জিহাদ হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ

> "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২১)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কুরআনের এই আয়াতটি সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সুন্নাহ বলতে আমরা আজকাল কেবল বুঝি মিসওয়াক ব্যবহার করা, টাখনুর উপর পায়জামা পরা, দাড়ি রাখা এসব। কিন্তু কোনো মুসলিমের এসব সুন্নাহ পালন না করার কারণে এই আয়াত নাযিল হয়নি। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত তিনটি আমলও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, আরও গভীর কিছু বোঝাতে। ইবন জারির আত-তাবারীর মতে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জিহাদবিমুখদের তিরস্কার করেছেন। এরা জিহাদে অংশ না নিয়ে পেছনে রয়ে যায়, খন্দকের শিবিরে যোগ দেয়নি। আল্লাহ তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন তাদের উচিত রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করা, তাঁর পাশে থাকা। আল্লাহ বলছেন, তোমরা কেন আমার নবীর অনুসরণ করছো না? তার আদর্শ তো তোমাদের সামনেই আছে!

ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেন, মুফাসসির আস সুদ্দী বলেছেন এই আয়াতের অর্থ হলো তোমরা রাসূলুল্লাহর সাথে থাকো এবং যুদ্ধ করো। জিহাদের প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকাল লোকেরা সুন্নাহ নিয়ে প্রচুর কথা বললেও জিহাদের কথা অবজ্ঞা করে। অথচ এই জিহাদ আল্লাহর রাসূলেরই সুন্নাহ।

## বনু কুরায়যার অভিযান

খন্দকের যুদ্ধ শেষ। ক্লান্তিকর অনেকগুলো দিন পার করে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ফিরে এসেছেন। অস্ত্রশস্ত্র রেখে বের হলেন গোসল করতে। যুহরের ওয়াক্ত চলছে। এমন সময় ধূলি-ধূসরিত বেশে তড়িঘড়ি করে জিবরীল ﷺ হাজির হলেন। বললেন,

- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! কিন্তু আমরা ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র

নামাইনি। আপনি এখনই ওদের ধাওয়া করুন!

- কোন দিকে?

- এই দিকে, জিবরীল বনু কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

খন্দকের রেশ তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে বনু কুরায়যাকে শায়েস্তা করার নির্দেশ চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের ﷺ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন। বলে দিলেন তারা যেন বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবেই আসরের সালাত আদায় করে। মদীনায় ইবন উম্মু মাকতুমকে অস্থায়ী প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। সাহাবিরা যখন বনু কুরায়যার এলাকায় পৌঁছলেন তখন আসরের ওয়াক্ত শেষ, তবে একদল আগেই পথিমধ্যে আসর পড়ে নিয়েছিলেন। সবার আগে পৌঁছলেন আলী ﷺ। দেখতে পেলেন বনু কুরায়যা একেবারে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করছে। গালিগালাজ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ।

## অবরোধের সিদ্ধান্ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

> "কিতাবিদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণ করতে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কাউকে করেছো হত্যা এবং কাউকে করেছো বন্দী। এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করোনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২৬-২৭)

প্রায় পঁচিশ দিন অবরোধ করে রাখা হলো। বনু কুরায়যা বুঝতে পারছিল সময় শেষ হয়ে আসছে। নেতা কা'ব ইবন আসাদ একদিন সবাইকে ডাক দিয়ে বললো,

*- তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো পরিস্থিতি খুব কঠিন। আমি তোমাদের তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমাদের যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো। প্রথম প্রস্তাব, আমরা মুহাম্মাদের আনুগত্য করবো এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেব। আল্লাহর কসম, তোমরা ভালো করেই জানো মুহাম্মাদ একজন নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর বর্ণনা পেয়েছ, ইনিই সেই লোক। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো, তাহলে বেঁচে যাবে। সেই সাথে তোমাদের জান-মাল-স্ত্রী-পুত্র সবকিছুই রক্ষা পাবে।*

উত্তর এল,

*- না, আমরা কখনোই তাওরাতের বিধান ত্যাগ করবো না। তাওরাত বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান আমরা মানবো না।*

কা’ব বললো,

*- ঠিক আছে, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা দিই -- আমরা আমাদের সন্তান ও নারীদের হত্যা করবো এবং তারপর খোলা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তাহলে আমাদের আর কোনো পিছুটান থাকবে না। এরপর ততক্ষণ লড়াই করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের আর তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন। যদি হেরে যাই, তো এমনভাবে মরবো যখন আমাদের কোনো বংশধর বেঁচে নেই। কাজেই আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করারও কিছু থাকবে না। আর যদি জিতে যাই, তাহলে নারী আর শিশুর অভাব আমাদের কখনোই হবে না।*

উত্তর এল,

*- এই অসহায় নারী-শিশুদের শুধু শুধু মেরে ফেলবো? এদের যদি মেরেই ফেলি তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভটা কী?*

কা’ব তখন শেষ প্রস্তাবটি দিল।

*ঠিক আছে, তোমরা যদি এটাও মানতে না চাও তাহলে অন্য একটা প্রস্তাব দিতে পারি। আজকে শনিবারের রাত, আমরা যে শনিবারে যুদ্ধ করি না তারা নিশ্চয়ই এটা জানে। এটা ভেবে হয়তো মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীরা কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এই সুযোগে আসো তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শেষ করে দিই।*

উত্তর এল,

*- আরে! তুমি কি পবিত্র শনিবারের পবিত্রতা নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি কি জানো না এই শনিবারের অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের কী ভীষণ শাস্তি হয়েছিল?*

বনু কুরায়যার কাপুরষতা আর সিদ্ধান্তহীনতা দেখে কা’ব ভীষণ বিরক্ত হলো। বললো,

*- ধুর! তোমাদের মধ্যে একটা বাপের ব্যাটা নেই, যে মায়ের পেট থেকে বেরোনোর পর একটা রাত কোনো বিষয়ে মনস্থির করে ঘুমাতে গেছে।’*[51]

এই অল্প কদিনের মধ্যেই বনু কুরায়যা একেবারে ভেঙে পড়ে। লড়াই করার মানসিক শক্তিটুকু পর্যন্ত আর তাদের কারো মাঝে নেই। ভয়, সিদ্ধান্তহীনতা তাদের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। যত সাহস আর আস্ফালন, সব তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবতে পারছিল না। তারা আবু লুবাবার ﷺ কাছে পরামর্শ চাইলো। আবু লুবাবা ﷺ জাহিলিয়াতের যুগে তাদের বন্ধু ছিলেন। তাকে দেখে নারী ও শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের অবস্থা দেখে আবু লুবাবার মন

---

[51] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩।

একটু যেন দুর্বল হয়ে যায়। তারা আবু লুবাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে-- কোনো ধারণা করতে পারেন?' আবু লুবাবা হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত দেখালেন। বোঝালেন, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে মৃত্যুই হবে পরিণতি।

কিন্তু বনু কুরায়যার অবস্থা ততদিনে এতটাই শোচনীয় যে আত্মসমর্পণের সম্ভাব্য পরিণতির কথা জেনেও তারা অগত্যা সেই পথই ধরে। আসলে খন্দকের যুদ্ধে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তারা আর প্রতিরোধ গড়ার কথা ভাবতে পারছিল না।

বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণের পথই বেছে নেয়। তাদের একটাই শর্ত, সাদ ইবন মুআয যেন তাদের বিচারক হয়। সাদ আওস গোত্রের লোক। আওস গোত্রের সাথে বনু কুরায়যার মিত্রতা ছিল। তাদের আশা ছিল সাদ ইবন মুআয ﷺ নিশ্চয়ই তাদের প্রতি কঠোর হবেন না!

## সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ দুআ

এই ঘটনার কিছুদিন আগের কথা। খন্দকের যুদ্ধের সময় সাদ ইবন মুআয ﷺ আহত হন। আহত অবস্থায় আল্লাহর কাছে একটি চমৎকার দুআ করলেন,

*'হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের সাথে আমাদের আরও যুদ্ধ হয়, তাহলে সে যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি ভালোবাসি। আর যদি এই যুদ্ধই তাদের সাথে আমাদের শেষ যুদ্ধ হয়, তবে এই আঘাতের মাধ্যমেই আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নাও। কিন্তু বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার অন্তরের জ্বালা না মিটিয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।'*[52]

সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। খন্দকের যুদ্ধের চরম দুর্যোগের মুহূর্তে বনু কুরায়যা প্রিয় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে কথা সাদ ﷺ কী করে ভুলতে পারেন! তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, বনু কুরায়যার শেষ পরিণতি দেখেই তিনি মরতে চান।

এর আগে বনু কায়নুকার ভাগ্য খাযরাজের হাতে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাই বনু আওস চাপাচাপি করছিল যেন তাদের হাতে বনু কুরায়যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তোমাদের গোত্রের কেউ এই বিচার করে তোমরা খুশি তো?' বনু আওস এক কথায় রাজি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইচ্ছে অনুসারে আওস গোত্রের নেতা সাদ ইবন মুয়াযের হাতে বনু কুরায়যার ভাগ্য ছেড়ে

---

[52] সীরাত ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫।

দিলেন। ইহুদিদেরও এটাই ইচ্ছা ছিল।

আওসের লোকেরা সাদ ইবন মুআযকে খুব চাপাচাপি করতে থাকে যেন তিনি বনু কুরায়যার প্রতি সদয় হন। কেননা এর আগে খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন উবাই বনু কায়নুকার প্রতি সদয় হয়ে তাদের হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিল। আওসের সাথে খাযরাজের সবসময়ই একটা প্রতিযোগিতা কাজ করতো। তাই আওস গোত্র চাচ্ছিল বনু কুরায়যার সাথেও যেন তেমন কিছু হয়।

সাদ ইবন মুআয ﵁ তাদের সব কথা আর উপদেশ চুপ করে শুনলেন। এরপর শুধু এতটুকুই বললেন, 'সাদের সময় এসেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারে সে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না।'

একটা মাত্র বাক্য। অথচ সবাই যা বোঝার বুঝে গেল। বুঝে গেল-- বনু কুরায়যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

## বিচারের রায়

খন্দকের যুদ্ধে আহত সাদ ইবন মুআযকে ﵁ রাখা হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মসজিদের ভেতরে একটি তাঁবুতে। রুফাইদাহ আল-আসলামিয়্যাহ নামের এক আনসারী নারীকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। বলা যেতে পারে, এই তাঁবু ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সামরিক হাসপাতাল। সাধারণভাবে কেউ আহত হলে তার পরিবার দেখাশোনা করতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদকে নিজের কাছাকাছি রাখেন যেন তাকে বারবার দেখতে পারেন।

বিচারের দিন এল। কাঠগড়ায় ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যা। বিচারক তাদের অতীতের বন্ধু সাদ ইবন মুআয ﵁। অপরপক্ষে আছে মদীনার মুসলিমরা। দু পক্ষই সাদ ইবন মুয়াযের রায় মেনে নিতে রাজি। সাদ তখন অসুস্থ, তাকে বহন করে নিয়ে আসা হলো। তার এক পাশে মুসলিম, আরেক পাশে ইহুদি।

আদালতে সাদের আগমন ঘটলো। সাদ ইবন মুআয ﵁ ইহুদিদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- তোমরা সবাই কি আমার ফয়সালা মেনে নিতে রাজি?

- জ্বী, আমরা রাজি।

এরপর তিনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করলেন,

- তোমরা কি আমার ফায়সালা মেনে নেবে?

মুসলিমদের প্রশ্ন করার সময় সেদিকে তাকালেন না। কীভাবে তাকাবেন তিনি? মুসলিমদের মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত। যতবার মনে হচ্ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে আছেন, ততবার তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি প্রবল সম্মানে তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলেন না।

- হ্যাঁ, আমরা মেনে নেব, রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন।

থমথমে আবহাওয়া। সবার মনে উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, সংশয়। সময় যেন স্থির হয়ে আছে। সাদ ইবন মুয়াযের এই একটি রায়ের উপরে নির্ভর করছে পুরো একটি গোত্রের ভবিষ্যৎ যারা কিনা এই মদীনায় বছরের পর বছর ধরে বসবাস করে এসেছে।

সাদ ইবন মুআয ﷺ দৃঢ়কণ্ঠে রায় দিলেন।

*'আমি এই মর্মে রায় দিচ্ছি যে, বনু কুরায়যার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে। তাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বণ্টন করে দেওয়া হবে আর তাদের নারী আর শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে।'*

সবাই নিশ্চুপ। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রথম কথা বললেন, 'তুমি ঠিক সেই রায় দিয়েছ, যা আল্লাহ সাত আসমানের উপরে ফায়সালা করে রেখেছিলেন।'[53]

আল্লাহর পছন্দনীয় রায় বেরিয়ে এল তাঁর পছন্দনীয় এক বান্দার মুখ থেকে।

মদীনার বাজারে বিশাল কয়েকটি গর্ত করা হলো। পুরুষদের হাত বেঁধে ফেলা হলো। নারী ও শিশুদের আলাদা করা হলো। এরপর দলে দলে ইহুদি পুরুষদের নাম ধরে ডাকা শুরু হলো। কেউ কেউ বুঝতে পারছিল না কী হতে যাচ্ছে। তারা তাদের নেতা কা'বকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি কি জানো আমাদের সাথে কী হতে যাচ্ছে?'

অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সাথে কা'ব উত্তর দিল, 'তোমরা কি সারা জীবন এমন বেকুবই থেকে যাবে? দেখতে পাচ্ছো না যাদের ডাকা হচ্ছে তারা কেউ ফিরে আসছে না? আল্লাহর কসম, এক এক করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে।'

## বিশ্বাসঘাতক দুই ইহুদি শীর্ষনেতার শেষ মুহূর্ত

বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব আন-নাযরীকে ধরে আনা হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনার আগমনের প্রথম দিন থেকে সে রাসূলুল্লাহর শত্রু, সে ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বনু কুরায়যার বিদ্রোহের পেছনে মূল নায়কও ছিল হুয়াই। সে-ই কা'ব

---

[53] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৪৯।

ইবন আসাদকে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ফুঁসলে দিয়েছিল। কা'ব ইবন আসাদকে কথা দিয়েছিল যদি খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশরা মুসলিমদের পরাজিত করতে না পারে, তাহলে সে বনু কুরায়যার সাথে থেকে যাবে, তাদের ভাগ্য সেও বরণ করে নেবে।

হুয়াই ইবন আখতাবের হাত বেঁধে টেনে টেনে আনা হলো। তার গায়ে একটা দামি চাদর, সেই চাদরের জায়গায় জায়গায় ফুটো। সে নিজেই নিজের চাদরে ফুটো করে রেখেছিল যেন মুসলিমরা কেউ এই চাদরকে গনিমত হিসেবে নিতে আগ্রহী না হয়। রাসূলুল্লাহকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার সাথে শত্রুতা করে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, যে আল্লাহকে ত্যাগ করে তার ধ্বংস অনিবার্য -- যা আজকে আমার সাথে হচ্ছে।' এ কথা বলে সে তার নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'আজকে যা হচ্ছে তা আল্লাহরই ফয়সালা। বনী ইসরাঈলের কপালে আল্লাহ এটাই লিখে রেখেছিলেন।'[54] এরপর তাকে হত্যা করা হয়।

ধরে আনা হলো বনু কুরায়যার নেতা কা'ব ইবন আসাদ আল-কুরায়যীকে। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ বললেন,

- তুমিই কি কা'ব ইবন আসাদ?

- জ্বী, আমিই কা'ব ইবন আসাদ।

- ইবন খুরাশ তোমাকে একটা ভালো উপদেশ দিয়েছিল, সেটা তুমি শুনলে না। সে কি তোমাকে বলেনি আমার অনুসরণ করতে? সে কি বলেনি আমার সাথে তোমার দেখা হলে তার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিতে?

- তাওরাতের কসম, এ কথাগুলো সে আমাকে বলেছিল আবুল কাসিম! সত্যি বলতে কী, আমি আপনার অনুসারী হতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা করলে আজ ইহুদিরা বলতো আমি কাপুরুষের মতো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েছি। সে ভয়ে আর অনুসরণ করা হলো না। আজ তাই আমি ইহুদিদের ধর্মের উপরেই অটল আছি।

এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ আদেশে কা'বকেও হত্যা করা হলো।

## বনু কুরায়যার পরিণতি

অল্প কজন ছাড়া প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদি পুরুষকে হত্যা করা হয়। প্রত্যেক পুরুষের গোঁফ, দাড়ি বা লজ্জাস্থানের লোম পরীক্ষা করে দেখা হলো তারা যুবক না শিশু। যাদের লোম গজায়নি, তারা ছাড়া পেল। আর যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রায় সবাইকে এক এক করে হত্যা করা হয়। সেদিনের এক নাবালেগ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন

[54] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮।

আতিয়া। তিনি বলেন, 'সেদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হয়। আমি সে সময় কিশোর, তাই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

এই অভিযানে এক মহিলাকেও হত্যা করা হয়। যখন বনু কুরায়যার পুরুষদের নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল তখন এক মহিলা পুরো সময় জুড়ে হা হা করে হাসতে থাকে। এরপর হঠাৎ সেই মহিলার নাম ধরে ডাক দেওয়া হয়। তার কাছেই বসা ছিলেন মা আইশা ﷺ। তিনি অবাক হয়ে সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার হয়েছেটা কী? তোমার নাম কেন ডাকা হলো?' সে বললো, 'কারণ আমাকে এখন হত্যা করা হবে।' আইশা জানতে চাইলেন, 'কেন?' সে বললো, 'কারণ আমি একটা অন্যায় করেছি।'

আইশা ﷺ পরবর্তীতে সেই মহিলার অপরাধের কথা জানতে পারেন। সে যাঁতা ছুঁড়ে খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদকে হত্যা করেছিল। নিহতদের মধ্যে সে-ই ছিল একমাত্র মহিলা।

মদীনার বাজারে সেদিন কয়েকশো ইহুদির উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সংখ্যাটি চারশো থেকে নয়শোর মাঝামাঝি। অল্প কিছু ইহুদিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আত্মসমর্পণের আগে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১) রাসূলুল্লাহর সাহাবি সাবিত ইবন কায়িস ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে অনুরোধ করলেন যেন এক ইহুদিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জাহিলিয়াতের যুগে সেই লোক তার উপকার করেছিল। সেই ইহুদির নাম ছিল আয-যুবাইর ইবন বাতা। রাসূলুল্লাহ সাবিতের অনুরোধ রাখলেন, আয-যুবাইরকে ছেড়ে দিলেন।

সাবিত তার জাহিলিয়াতের বন্ধু আয-যুবাইরকে এই সুখবর দিয়ে আসলো। আয-যুবাইর ছিল অন্ধ। সে বললো, 'আমাকে দেখাশোনা করার তেমন কেউ তো নেই। এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী?' সাবিত তখন রাসূলুল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন যেন আয-যুবাইরের স্ত্রী সন্তানদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ রাজি হলেন, সাবিত তার কাছে সেই সুখবর দিয়ে আসলেন। কিন্তু তাতেও আয-যুবাইরের মন ভরলো না। সে বললো, 'অর্থ-সম্পদ ছাড়া একটি পরিবার কীভাবে হিজাযের মতো স্থানে বেঁচে থাকবে?' সাবিত খুব করে চাচ্ছিলেন আয-যুবাইরের জন্য কিছু একটা করতে, কারণ বুআসের যুদ্ধে এই আয-যুবাইর সাবিতকে সাহায্য করেছিলেন। তাই সাবিত আবারো আয-যুবাইরের পক্ষ হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলেন যেন তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাও মঞ্জুর করলেন।

সাবিত আয-যুবাইরের কাছে ছুটে গেলেন। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার পরিবার আর সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলো। আল্লাহর শাস্তি থেকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়ে যাও!' আয-যুবাইর তখন বনু কুরায়যার নেতাদের কথা জানতে চাইলো। সাবিত বললেন তাদের হত্যা করা হয়েছে। আয-

যুবাইর তখন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আমার সেই দুই সঙ্গীর খবর বলতে পারো?' সাবিত বললেন, 'তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে। দেখো, আয-যুবাইর, ওদের যা হওয়ার হয়েই গেছে। কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বেঁচে থাকার মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন।'

আয-যুবাইর তখন বললো, 'সাবিত, সেই অনুগ্রহের দোহাই, যা আমি তোমাকে বুআসের যুদ্ধে করেছিলাম। তুমি আমাকে আমার প্রিয় মানুষগুলোর কাছে যেতে দাও। তাদের থেকে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারছি না।' এ কথা শুনে সাবিত নিজেই আয-যুবাইরের গর্দান উড়িয়ে দেন। 'প্রিয়জনের' সাথে তার মিলিত হবার আকুতি শুনে আবু বকর ﵁ মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর শপথ, এই লোক তার বন্ধুদের সাথেই মিলিত হবে। তবে সেটা হবে জাহান্নামে, সেখানেই সে চিরকাল থেকে যাবে।'[55]

২) সালমাহ ইবন কাইস ﵁ ছিলেন রাসূলুল্লাহর একজন খালা। তিনি অনেক পুরনো একজন মুসলিম। দুই কিবলার দিকে সালাত আদায় করা এবং বায়াতে অংশ নেওয়া নারীদের একজন। বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণ করার পরে রিফাআহ ইবন সামাওয়াল নামের এক ইহুদি তার কাছে আশ্রয় চায়। সেই ইহুদি তার পরিবারের পরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সালামাহ অনুরোধ করেন যেন রিফাআহকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ তাঁর খালার অনুরোধ রক্ষা করেন। রিফাআহকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রিফাআ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে।

৩) আমর ইবন সুদা নামের এক ইহুদি বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতায় অংশ নেয়নি, বরং সে এর প্রতিবাদ করেছিল। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ছিলেন বনু কুরায়যার অবরোধকালীন প্রহরী। তিনি আমরের বিষয়টি জানতেন, তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

## বনু কুরায়যার সম্পদ বণ্টন

১) সাদ ইবন মুয়াযের ﵁ রায় অনুসারে বনু কুরায়যার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গনিমত হিসেবে মুসলিমরা সেগুলো লাভ করে। মুসলিমরা এই অভিযান থেকে দেড় হাজার তরবারি, দু'হাজার বর্শা, তিনশো শিরস্ত্রাণ, হাজার দেড়েক বর্ম এবং অসংখ্য উট আর ভেড়া লাভ করে। এই সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। মুসলিমরা বিপুল পরিমাণ মদও লাভ করে কিন্তু হারাম হওয়ার কারণে সেগুলো থেকে কিছুই গ্রহণ করা হয়নি। সেগুলো ফেলে দেওয়া হয়। এই অভিযানে শহীদ খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদ ﵁ এবং আরেকজন সাহাবির পরিবারদের গনিমতের ভাগ দেওয়া হয়।

---

[55] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮।

বনু কুরায়যার কিছু সম্পদ মুসলিমরা অস্ত্রের জোর ছাড়াই লাভ করেছিল। সেগুলো দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ শাম থেকে অস্ত্র কেনার জন্য সাদ ইবন উবাদাহকে ﷺ পাঠান। আর কিছু যুদ্ধবন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নজদে। সেখানে তাদেরকে ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ে আসেন সাইদ ইবন যায়িদ ﷺ।

২) যেসব সম্পদ বহনযোগ্য ছিল না, যেমন বনু কুরায়যার বাড়িঘর, সেগুলো পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া হয় মুহাজিরদেরকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের আদেশ করলেন তারা যেন আনসারদের থেকে পাওয়া সকল খেজুর বাগান আর জমি আনসারদের ফিরিয়ে দেন। এভাবে তিনি তাদের মাঝে ভারসাম্য তৈরি করে দিলেন।

৩) রায়হানাহ বিনত আমর ইবন খুনাফাহ নামের একজন মহিলাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে দাসী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। রাসূল ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। প্রথমে তিনি রাজি হননি, কিন্তু পরে মুসলিম হয়ে যান। রাসূল ﷺ তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন যেন তিনি তাকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু রায়হানা দাসী হিসেবেই থাকতে চাইলেন।[56] শেষ পর্যন্ত তিনি দাসী হিসেবেই থেকে যান। দাসপ্রথার কথা বললেই আমাদের চোখের সামনে একটা নির্মম দৃশ্য ভেসে ওঠে, কিন্তু ইসলামের দাসপ্রথা নিষ্ঠুরতা শেখায় না। এটা একটা চাকরির মতো। রায়হানার মতো অনেকেই স্বাধীন হবার চাইতে দাস হিসেবে থাকাকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন।

## বনু কুরায়যার ঘটনা থেকে শিক্ষা

### ১) শাস্তির ভয়াবহতা

বনু কুরায়যার এই ঘটনা ইসলামবিদ্বেষীদের একটি প্রিয় হাতিয়ার। সন্দেহ নেই বনু কুরায়যাকে অত্যন্ত গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কয়েকশো পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে, নারী-শিশুদের দাস বানানো হয়েছে, সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এসব দেখিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা বলতে চায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নিষ্ঠুর, মুসলিমরা হলো বর্বর।

কিন্তু পুরো ঘটনার প্রেক্ষাপটকে তারা এড়িয়ে যেতে চায়। কেন তাদেরকে এত বড় শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর এক শব্দেই দেওয়া যায়, তা হলো-- বিশ্বাসঘাতকতা। তারা যে অপরাধটি করেছিল, সেই অপরাধটিকে এখনকার আইনের ভাষায় বলা হয় -- রাষ্ট্রদ্রোহ। বনু কুরায়যার সাথে মূসলিমদের চুক্তি ছিল। তারা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। চুক্তিবদ্ধ ও নাগরিক থাকা অবস্থায় তারা একটি বহিঃশত্রুর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনার রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া এবং মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানো। আইনের বিচারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মানদণ্ডে এটি হলো সর্বোচ্চ অপরাধ। আর এখানে, ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আল্লাহর

---

[56] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪১।

রাসূলের ﷺ সাথে -- সাধারণ কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা।

এর আগেও মদীনার দুটি গোত্র বনু কায়নুকা এবং বনু নাযিরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে এত ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ ইসলাম অপরাধের অনুপাতে শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করে। বনু কায়নুকা একজন মুসলিম মহিলার সম্মানহানি করে এবং একজন মুসলিমকে হত্যা করে। বনু নাযির রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যার চেষ্টা করে। এ দুটো গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু বনু কুরায়যার অপরাধ ছিল সবচাইতে মারাত্মক। তারা খন্দকের সেই দুর্বল মুহূর্তে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিমদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এটা ভয়াবহ মাত্রার অপরাধ।

## ২) তিরস্কারকারীদের তিরস্কার

সাদ ইবন মুআযকে ﵁ তার গোত্র খুব করে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন বনু কুরায়যার ব্যাপারে উদারতা দেখান। কিন্ত তিনি তাদের অনুরোধ রাখেননি। কারণ তিনি জানতেন, এই ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো মানে দুর্বলতা। ক্ষমার অর্থ সবসময় উদারতা নয়। কখনো কখনো ক্ষমার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জুলুম করার আরও সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিছু পরিস্থিতিতে কঠোরতা দেখানোই উচিত। কিছু মুসলিম মনে করে, মুসলিমদের সবসময় উদার হতে হবে, ক্ষমাশীল হতে হবে। যাতে ইসলামের শক্ররা কোনো অপবাদ দিতে না পারে। তারা চায় মানুষ যেন মুসলিমদের শান্তিপ্রিয়, মহানুভব মনে করে, সন্ত্রাসী মনে না করে। আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যিনি দুনিয়ার সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের মানুষ, তিনিও সবসময় ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেননি।

বনু কুরায়যাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ ক্ষমা করে দেননি। সাদ ইবন মুআয ﵁ রায় দেওয়ার আগে বলেছিলেন তিনি এই ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় পাবেন না। মুসলিমরা শক্রর সাথে কঠোর হতে পারবে না, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরাজিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। কিছু মুসলিম আজ কাফিরদের তিরস্কারকে এতটাই ভয় করে যে গোটা ইসলামকেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে। শুধুমাত্র কাফিরদের খুশি করার জন্য । তারা কাফির এবং ইসলামবিদ্বেষীদের সমালোচনার মুখে পড়তে চায় না।

অথচ তারা জানে না, কাফিরদের এভাবে খুশি করে তাদের মুসলিম বানানো যায় না। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনেও সব কাফির মুসলিম হয়ে যায়নি। কখনো কখনো কঠোরতাই শ্রেয়। যে ইসলাম ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দেয়, সেই একই ইসলাম ন্যায়বিচারের শিক্ষাও দেয়। এটা সত্য যে, মুসলিমদের ব্যাপারে অমুসলিমদের সুধারণা ধরে রাখতে পারলে ভালো। তবে সেটা যারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তাদের ক্ষেত্রে মোটেও জরুরি নয়। সীরাহ থেকে শিক্ষা হলো, শক্রদের সাথে পরিস্থিতিভেদে কখনো উদারতা দেখাতে হবে, আর কখনো কঠোরতা। কখনো কলম ধরতে হবে, আর কখনো তলোয়ার।

### ৩) একজন মুসলিমের জীবন-মরণ শুধুই আল্লাহর জন্য

সাদ ইবন মুয়ায আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন,

*'হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের সাথে আমাদের আরও যুদ্ধ হয়, তাহলে সে যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি ভালোবাসি। আর যদি এই যুদ্ধই তাদের সাথে আমাদের শেষ যুদ্ধ হয়, তবে এই আঘাতের মাধ্যমেই আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নাও। কিন্তু বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার অন্তরের জ্বালা না মিটিয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।'*

সাদের এই দুআটা বিস্ময়কর। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া তাঁর বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকতে চাননি তিনি। টাকা হবে, সংসার হবে, এসব চিন্তা মনে স্থান পায়নি। তিনি একটা জিনিসই চেয়েছেন -- আল্লাহর রাস্তায় লড়াই। ইসলামের শত্রুরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন যেন তিনিও যেন বেঁচে থাকেন, যেন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারেন। যেন বনু কুরায়যার শেষ দেখে নিতে পারেন। এরপর আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই।

### ৪) আবু লুবাবাহর ﷺ তাওবা: আল্লাহর সাথে সততা, রাসূলুল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা

আবু লুবাবাহর কাছে বনু কুরায়যা জানতে চেয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আত্মসমর্পণ করা হলে সম্ভাব্য কী পরিণতি হতে পারে। তখন তিনি গলার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন তাদের মেরে ফেলা হবে। কাজটা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, কাজটা ঠিক হলো না। বনু কুরায়যার কাছে ইঙ্গিত দেওয়ার মাধ্যমে একটা গোপন সামরিক তথ্য পাচার হয়ে গেল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়ে গেল। কাজটা যে তিনি খুব ভেবেচিন্তে করেছেন, তা নয়। কিন্তু এই গুনাহর অনুশোচনা তাকে বারবার দংশন করতে থাকে। আবু লুবাবাহ ﷺ চাইলে পুরো বিষয়টা রাসূলুল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারতেন। বিষয়টা তিনি চেপে গেলে কেউ কিছু বুঝতোও না, জানতোও না। তিনি চাইলে এভাবেই গোটা জীবন পার করে দিতে পারতেন। মুখে একটা মেকি হাসি ধরে রেখে রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে এমনভাবে কথা বলতে পারতেন, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু সেটা চাননি। তিনি চেয়েছেন গুনাহ থেকে মুক্তি। তিনি সৎ ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন। তাই বিষয়টা গোপন করার চেষ্টা করলেন না, নিজেই জানিয়ে দিলেন। ফিরে এসে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করা না পর্যন্ত আমি নিজেকে মুক্ত করবো না।' খুঁটিতে বাঁধা সেই দিনগুলিতে সালাতের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন, সালাত শেষ হলে আবার বেঁধে দিতেন।

এভাবে ছয়দিন পার হয়ে গেল। সপ্তম রাতের কথা, ভোরের দিকে উম্মু সালামাহ ﷺ

দেখলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ মুচকি হাসছেন। তিনি হাসির কারণ জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আবু লুবাবার তওবা কবুল করেছেন। উম্ম সালামাহ বললেন, 'আমি এই খবরটা তাকে দিয়ে আসি?' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চাইলে অবশ্যই দিতে পারো!

উম্ম সালামাহ মহা উৎসাহের সাথে সুসংবাদ নিয়ে মসজিদে ছুটে গেলেন। আবু লুবাবাহকে বললেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ আপনার তাওবাহ কবুল করেছেন!' সাহাবিরা দৌড়ে এসে তার বাঁধন মুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আবু লুবাবা বললেন, 'নাহ! আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাড়া এই কাজ কেউ করবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন।[57] মসজিদে নববীতে তওবার খুঁটি নামে একটি খুঁটি আছে। এই খুঁটিতেই আবু লুবাবাহ ﷺ নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা মানুষ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য কতটা কষ্ট করতে পারে! অথচ সে তিনি বুঝেশুনে ইচ্ছা করে ভুল করেননি। এটাই হলো সততা, এটাই হলো সত্যিকারের মানুষের সংজ্ঞা। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন এই অসাধারণ মানুষগুলোকে তৈরি করার কারিগর।

### ৫) অন্তরের কাঠিন্য

হুয়াই ইবন আখতাব এবং কা'ব ইবন আসাদ-- জীবনের শেষ মুহূর্তে এই দুই নেতার বলে যাওয়া কথাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা জেনেশুনেই আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচারিতা করেছিল। মৃত্যু যখন নিজের ছায়ার চেয়েও কাছাকাছি, তখনো তারা নিজেদের ভুলের উপর অটল ছিল। তারা জানতো তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, অন্যায় করেছে। তারা জানতো জাহান্নামে তাদের ঠাঁই হবে। তবু শেষ মুহূর্তে এসেও তাদের হৃদয় এতটুকু গলেনি। নিজেদের ভুল স্বীকার করার মতো বাসনা জাগেনি। ঔদ্ধত্য আর অহংকার তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঔদ্ধত্য আর অহংকারের উপরই তারা মারা গেছে, এতটুকু আফসোস ছিল না। অন্তরের এই কাঠিন্যের কারণ কী? যখন একজন মানুষ অন্যায় করে কিন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কেউ যখন অবাধ্যতা করতেই থাকে, করতেই থাকে, তখন একসময় তার অন্তর এতটা শক্ত হয়ে যায় যে, তার আর সত্যপথে ফিরে আসতেও ইচ্ছা হয় না। এই দুই নেতার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল।

### ৬) মতভেদ বা ইখতিলাফের ধারণা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের আদেশ করেছিলেন যেন তারা বনু কুরায়যার এলাকায় গিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই সূর্য ডুবে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সাহাবিরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল বললো, 'আমাদের এখনই আসরের সালাত পড়ে ফেলা উচিত কারণ সূর্য ডুবে যাচ্ছে।' আরেকদল বললো, 'না আমরা বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তারপরই সালাত পড়বো।' দুটো

---

[57] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪।

দল তাদের বুঝ অনুসারে সালাত আদায় করলো। পরে তারা তাদের এই মতভেদের বিষয়টা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। তিনি তাদের কাউকেই ভুল বললেন না, দুটো কাজকেই স্বীকৃতি দিলেন।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় ইসলামী শরীয়াহ ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। একটি বিষয়ে একাধিক মত থাকতে পারে। তবে তা দ্বীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে হবে না। অন্যান্য বিষয়ে একাধিক দলিলের কারণে মতপার্থক্য হতে পারে। আবার বোঝার ভিন্নতার কারণেও নানা মত তৈরি হতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এর মানে এই নয় যে, কেউ একটা মত দিলেই সেটা গ্রহণযোগ্য মত হয়ে যাবে। একাধিক মতের ক্ষেত্রে কোন মত গ্রহণ করতে হবে, বা সেটার প্রক্রিয়া কী -- এই বিষয়টি এই বইটির আলোচনার গণ্ডির বাইরে বিধায় আলোচনা করা হলো না।

## সাদ ইবন মুয়াযের ﵁ মর্যাদা

আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দা আছে। তারা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তা কবুল করে নেন। সাদ ﵁ ছিলেন এমন একজন।

সাদ চেয়েছিলেন কুরাইশদের সাথে শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকতে পারেন। চেয়েছিলেন বনু কুরায়যার পরিণতি দেখে যেন অন্তরকে শান্ত করতে পারেন। চেয়েছিলেন, খন্দকের যুদ্ধের সেই পুরোনো ক্ষত যেন বেড়ে যায়। যেন এই ক্ষতের মাধ্যমে তিনি শহীদ হতে পারেন। আল্লাহ তার সব দুআ কবুল করেছেন।

খন্দকের পর কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে আর যুদ্ধ করার সাহস দেখায়নি। সাদ শুধু বনু কুরায়যার শাস্তি দেখেই যাননি বরং আল্লাহ তাআলা বনু কুরায়যার ওপর তাকেই বিচারক বানিয়ে দেন। আর এরপরই তার ক্ষতের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। তিনি যে শাহাদাত চেয়েছিলেন, আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ ইবন মুয়াযের ﵁ সম্মানে বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও।'[58] সাধারণভাবে কারো জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। কিন্তু সাদ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের উঠে দাঁড়াতে বলেন। ইমাম নববীর মতে, কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য কখনো কখনো দাঁড়ানো যেতে পারে। তবে সেটা অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারলেন সাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। তিনি রীতিমতো ছুটে গেলেন। এত দ্রুত হাঁটছিলেন যে, সঙ্গের সাহাবিদের জুতো ছিঁড়ে

---

[58] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় আদাব, হাদীস ৪৪৩।

যাচ্ছিল, গায়ের চাদর খুলে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেটা জানালে তিনি বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি, না জানি আমাদের আগেই ফেরেশতারা তার কাছে পৌঁছে যায়! আর হানযালার মতো করে তাকেও গোসল করিয়ে দেয়!" পৌঁছে দেখা গেল সাদকে গোসল দেওয়া হচ্ছে। তার মা কাঁদছেন।

সাদ ইবন মুয়াযের লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবিরা বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এত হালকা লাশ এর আগে কখনো বহন করিনি।' রাসূল ﷺ বললেন, 'কেনই বা হবে না বলো? এমন সব ফেরেশতারা আজ জমিনে এসে সাদের লাশ বহন করছেন যারা এর আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি।' অন্য এক হাদীসে আছে, সাদের লাশ বহন করতে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে জমিনে নেমে আসে।[59]

সাদ ইবন মুআয ؓ আল্লাহর কত প্রিয় ছিলেন একটা হাদিস থেকে বোঝা যায়। বলা হয় যে, তার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল![60] সাদের মৃত্যুর অনেক দিন পরের কথা, একদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উপহার হিসেবে একটা চাদর আসে। চাদরের কাপড়টা খুব নরম, মোলায়েম। সাহাবিরা সব অবাক হয়ে চাদরটা নেড়েচেড়ে দেখছেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা এই চাদরের কোমলতা দেখে অবাক হচ্ছ? জেনে রাখো, জান্নাতে সাদ ইবন মুয়াযের যে রুমালটা আছে তা এই চাদরের চাইতেও উত্তম আর কোমল।'[61]

লক্ষনীয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ থেকে সাদের কথা স্মরণ করলেন, সাহাবিদের কাছে সাদের মর্যাদা প্রকাশ করলেন। এটাই বলে দেয় সাদ রাসূলের ﷺ চোখে কতটা প্রিয় ছিলেন! মৃত্যুর দীর্ঘ দিন পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্মরণ করেছেন। মানুষ মারা গেলে আমাদের মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের কথা কখনো ভুলে যাননি। দুনিয়ার ব্যস্ততা, রাষ্ট্র চালাবার দুশ্চিন্তা, পারিবারিক কাজকর্ম, কোনো কিছুই সাহাবিদেরকে ভালোবাসার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই মানুষটাই তার উম্মাহর জন্য প্রত্যেক দিন দুআ চাইতেন। এই মানুষটাই কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে, আমাদের মুক্তির জন্য দুআ চাইতে থাকবেন। দুনিয়ার সবার চেয়ে উপরে ভালোবাসা পাবার যোগ্য হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

সাদ ইবন মুআযকে ؓ কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারা বদলে যায়। তাকে দেখতে বেশ চিন্তিত লাগে। তিনবার তাসবীহ পড়লেন, 'সুবহানআল্লাহ', সাহাবিরাও ؓ তাই করলেন। একটু পর তিনি ﷺ স্বাভাবিক হলেন। তিনবার তাকবীর দিলেন, 'আল্লাহু আকবার'। দেখাদেখি সাহাবিরাও তাই করলেন। সাহাবিরা জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ কেন প্রথমে তাসবীহ এবং পরে তাকবীর দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন,

---

59 সুনান নাসাঈ, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ২৩৯।

60 সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৪৭।

61 সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৪৬।

'কারণ কবর সাদকে চাপ দিয়ে ধরেছিল। যদি কেউ কবরের চাপ থেকে মুক্তি পেত সে হতো সাদ। এরপর কবর আবার প্রশস্ত হয়ে গেল।'

সাদ ইবন মুআয ﷺ যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স কত? মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। নিতান্ত তরুণ বয়সে তিনি নেতৃত্ব লাভ করেন। আল্লাহর নবীর আনসার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যখন, তখন তিনি ত্রিশ বছরের টগবগে যুবক। দ্বীনের জন্য একজন মুসলিম যুবক কীভাবে নিজের জীবন দিয়ে দেয়, তার উৎকৃষ্ট নমুনা সাদ ইবন মুয়াযের জীবন। সাদ ইবন মুআয ﷺ সফল। আখিরাতের দাঁড়িপাল্লায় তার জীবনটা সোনার চেয়েও দামি।

আজ আমরা যেন ভুলেই গেছি দ্বীনের খেদমত রক্ত দিয়ে করা লাগে। আজকাল অনেকের চোখে দ্বীনের খেদমতের অর্থ হলো -- ঘরের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা, ফাইভ স্টার হোটেলে কনফারেন্স করে ইসলামি লেকচার দেওয়া। এটুকু করেই তারা মনে করে আল্লাহর দ্বীনের বিশাল খেদমত করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহর রাস্তায় তাদের শরীরের এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। গ্রীষ্মের দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চড়ে আর শীতের দিনে হিটারের উষ্ণতা উপভোগ করে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করাটা যথেষ্ট না। দ্বীনের খেদমত করতে হলে শরীর থেকে আরামের চাদরটা ঝেড়ে ফেলতে হয়। পরিশ্রম করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়, রক্ত ঝরাতে হয়।

আনসাররা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেছেন। সেই যুদ্ধে নিজেদের জান-মাল, নিজের জীবন-সম্পদ সমস্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। তাদের চোখে এটাই ছিল দ্বীনের জন্য খেদমত। আর তাই তো তারা দ্বীনের সাহায্যকারী, 'আনসার!'

# খন্দক থেকে হুদাইবিয়া

## খন্দক যুদ্ধের প্রভাব

খন্দকের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক 'টার্নিং পয়েন্ট'। খন্দক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের লড়াই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কিন্তু এ যুদ্ধের পর একটা ভিন্ন ইতিহাস রচিত হয়। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবার টিকে থাকার সংগ্রামকে ছাড়িয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজ ধারণ করে। রাজনৈতিক ময়দানে দাবার ছক উল্টে যায়। বিশাল এক সামরিক জোটকে পরাস্ত করার মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধে মুসলিমরা যোজন যোজন এগিয়ে যায়। আরবের রাজনৈতিক শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযান পরিচালনা করার মতো সাহস বা মনোভাব হারিয়ে ফেলে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল কুরাইশদের সর্বশেষ আক্রমণ। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, তারা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গেছে। বরং যুদ্ধে হেরে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। তাদের শক্তি কমে যায় এবং একটা সময় মুসলিমদের তারা সমীহের চোখে দেখা শুরু করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মুসলিমদের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় বাকি ছিল না। খন্দক যুদ্ধের এক বছর পরের ঘটনাই এর প্রমাণ। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলিমদের অস্তিত্বকে কার্যত স্বীকার করে নেয়।

আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে বলেন, 'ইসবিরু ওয়া সবিরু', অর্থ হলো, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং এই ধৈর্যে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো।' অর্থাৎ শুধু ধৈর্য ধরাটাই যথেষ্ট নয়, বরং এমন ধৈর্য ধরা চাই যেন ধৈর্যশীল শত্রুর সাথেও পেরে ওঠা সম্ভব হয়। বদর, উহুদ, খন্দক -- তিনটি বড় বড় যুদ্ধ যখন মুসলিমরা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করলো, তখন কাফিররাই মানসিকভাবে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়ে। একারণে আবু সুফিয়ান আর কখনোই মদীনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী জড়ো করতে সক্ষম হয়নি।

খন্দকের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা একটি কঠিন সময় শেষ করে। এটা ছিল টিকে থাকার সময়। যদিও বলা হয়ে থাকে হিজরতের সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এর শুরুর বছরগুলো ছিল শঙ্কা, গোপনীয়তা আর নিরাপত্তাহীনতার বছর। প্রতিষ্ঠালগ্নে মদীনা রাষ্ট্র কোনো সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না। ত্রিমুখী আক্রমণের শঙ্কায় মদীনার পরিবেশ থমথমে হয়ে থাকতো। একদিকে মক্কার কুরাইশ, আরেকদিকে ইহুদি গোত্রগুলো আর অন্যদিকে বেদুইনরা। সে সময়টায় সাহাবিরা অস্ত্র পাশে রেখে ঘুমাতেন -- সময়টা এতটাই অনিরাপদ ছিল।

মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচটা বছর ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু

মুসলিমরা ছিলেন দৃঢ়পদ। তারা সাহস হারাননি, আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। তাই সময়ের পরিক্রমায় খন্দকের পর মুসলিমরা শক্ত অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে মুসলিমদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, কেবলই এগিয়ে যাওয়া। এই যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'এখন থেকে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করবো, তারা আর আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না।'[62] খন্দকের যুদ্ধের সাথে সাথে মদীনার পররাষ্ট্রনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে, সেটা হলো আক্রমণাত্মক জিহাদের সূচনা। খন্দকের আগের জিহাদগুলো ছিল মূলত রক্ষণাত্মক। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মদীনা থেকে ইহুদিদের সর্বশেষ গোত্রটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মদীনার ভেতরের শত্রু বলতে বাকি থাকলো কেবল মুনাফিকরা। বলা যেতে পারে, খন্দকের যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলো।

## যাইনাবের ﷺ সাথে বিয়ে

যাইনাব বিনত জাহশ ছিলেন প্রথম যুগের একজন মুসলিমাহ। সম্মানিতা এই নারী ছিলেন জাহশ ইবন রিবাব এবং আমীনাহ বিনত আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। উহুদে শহীদ আবদুল্লাহ ইবন জাহশের বোন। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ ফুপাতো বোন। মদীনায় একেবারে প্রথমদিকে হিজরত করেছিলেন। মুত্তাকী এই নারী দিনে রোযা রাখতেন, রাতে সালাতে দাঁড়াতেন। পা ব্যথা হয়ে যেত, তবু সালাত ছাড়তে চাইতেন না। তাঁর অন্তর ছিল উদার, দান করতেন হাত খুলে। তাঁর দানের চমৎকার একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন মা আইশা ﷺ। আসলে যাইনাব এতই গুণী একজন নারী ছিলেন যে খোদ আইশাও তাঁর সতীনের প্রশংসা না করে পারেননি।

*'দ্বীনদারিতার বিচারে যাইনাবের মতো অসাধারণ আর কোনো নারীকে দেখিনি। তাকওয়ায় বলো, সত্যবাদিতায় বলো, তিনিই ছিলেন সেরা। আত্মীয়স্বজনের প্রতি তার যে দরদ ছিল, তেমনটাও আর কারো মাঝে দেখিনি। দান করার ক্ষেত্রেও সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। দান করার সময় কখনো নিজের কথা ভাবতেন না। এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন এই বান্দী। হ্যাঁ, দোষ বলতে একটা দোষ তার ছিল -- চট করে রেগে যেতেন, প্রচণ্ড রেগে যেতেন। তবে সেই রাগ কখনোই খুব দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতো না...'*[63]

যাইনাবের দানশীলতা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। আইশা বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচাইতে লম্বা সে-ই সবার আগে আখিরাতে আমার সাথে মিলিত হবে।' এ কথা শুনে তাঁরা সবাই নিজেদের হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে শুরু করে দিলেন, দেখা যাক কার হাত বেশি লম্বা! আসলে 'হাত লম্বা' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছিলেন কে কত বেশি সাদাকাহ করে।

---

[62] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ১৫৪।

[63] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১২০।

বিষয়টি পরে বুঝতে পেরে আইশা বলেন, 'আমাদের মধ্যে সবচাইতে লম্বা হাত ছিল যাইনাবের।'[৮৪] রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদাকাহ করতেন যাইনাব। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটিও সত্যি হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে তিনিই সবার আগে মারা যান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন তাঁর এই ফুপাতো বোনকে পালকপুত্র যাইদ ইবন হারিসার ﷺ সাথে বিয়ে দিয়ে তৎকালীন আরবের কৌলিন্যপ্রথাকে ভেঙে দিতে। যাইদ অতীতে ছিলেন একজন দাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে যাইনাব কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। সামাজিক মর্যাদায় দু'জনের মাঝে বিশাল পার্থক্য। সে সময় আরবরা স্বাধীন হওয়া দাসকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখতো না। কিন্তু এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন আরবদের বৈষম্যমূলক মনোভাব বদলে যাক। মুসলিমরা যেন তাকওয়া দিয়ে মানুষকে বিচার করে, বংশ-মর্যাদা দিয়ে নয়। আর তাই তিনি নিজ পরিবার, নিজ আত্মীয়দের দিয়েই স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার সূচনা করেন। যাইনাবের কাছে তিনি যাইদকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। যাইনাব রাজি হলেন না। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে (ভিন্ন) কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৬)

এ আয়াত নাযিলের পর যাইনাব বিনা তর্কে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যায়িদকে বিয়ে করবেন। কাহিনীর এ পর্যায়ে যাইদ ইবন হারিসার পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

## কে ছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ

যাইদ ইবন হারিসা ছিলেন ইয়েমেনি গোত্রের সন্তান। তাকদীরের লিখনে এক অন্যায় যুদ্ধের বলি হয়ে মায়ের কোল থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গেলেন। একটা মানুষের জীবনে এর চেয়ে খারাপ সময় আর কী হতে পারে? অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই দুঃসময়ের হাত ধরেই যায়িদের জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছিল। এক মর্যাদাবান নারী উকায মেলা থেকে যাইদকে দাস হিসেবে কিনে নেন। তাঁর সেবক হিসেবেই যাইদের মক্কার জীবন শুরু হলো। বিয়ের পর এই নারী যাইদকে তুলে দিলেন স্বামীর হাতে। নতুন স্বামীর জন্য উপহার!

এই নারী ছিলেন খাদিজা ﷺ। আর যে স্বামীর কাছে যাইদকে তুলে দিয়েছিলেন তিনি

---

[৮৪] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১২০।

হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এভাবেই খাদিজার কাছ থেকে যাইদ চলে এলেন নবীজির ﷺ কাছে। বড় হতে লাগলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মানুষ -- মুহাম্মাদের ﷺ হাতে।

এই ঘটনার বহু বছর পরে যাইদের বাবা জানতে পারেন যাইদ মক্কায় আছেন। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সন্তানের সাথে মিলন হবে! যাইদের বাবার যেন আর তর সইছিল না। ভাইকে সাথে নিয়ে তড়িঘড়ি করে চলে এলেন মক্কায়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ খুঁজে বের করলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যাইদকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে যা পারেন সবই দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ফিরিয়ে দিতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ততদিনে যাইদের সাথে তাঁর একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যাইদ তাঁর খুবই প্রিয় একজন, সন্তানের মতো আদরে আদরে তাকে বড় করেছেন তিনি, ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হবেই-বা কেন? অন্যদিকে আরেকজনের সন্তানকে জোর করে রেখে দেওয়ার এখতিয়ারও তাঁর নেই।

কিন্তু মন না মানলেও কিছু কাজ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ যাইদের বাপ-চাচার থেকে কোনো বিনিময় চাইলেন না, পুরো বিষয়টা যাইদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। বললেন, যাইদ যা চায় তা-ই হবে। যাইদের বাবা-চাচা শুনে খুবই খুশি! তারা ভাবতেই পারেননি এত সহজে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ডেকে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। যাইদ বহুদিন পর নিজের আপনজনদের দেখলেন। বাবা-চাচাকে দেখেই চিনতে পারলেন। কিন্তু তাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে যাইদ বললেন, 'আমি আমার বাবা-চাচার চাইতে আপনার সাথে থাকা বেশি পছন্দ করি।'[65]

আল্লাহর রাসূল এরপর যাইদকে নিজের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। যাইদ ইবন হারিসা হয়ে গেলেন যাইদ ইবন মুহাম্মাদ, একজন স্বাধীন ব্যক্তি! যাইদের বাবার প্রথমে খুব মন খারাপ ছিল। ছেলেকে এতদিন পর পেলেন। কিন্তু ছেলে বাবার কাছে আসতে চাইল না। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে তারা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, যাইদকে রেখে ফিরে গেলেন।

যাইদ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ অত্যন্ত স্নেহভাজন। আর যাইদও রাসূলুল্লাহকে ﷺ এত বেশি পছন্দ করতেন যে, বাবার সাথে থাকার চেয়েও আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকাটাই তার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের ছেলের মতো আদর করতেন। যাইদের কখনো মনে হয়নি তিনি একজন দাস। বরং মনে হতো যেন তিনিও আল্লাহর রাসূলের পরিবারের একজন। যেন তিনি আল্লাহর রাসূলেরই সন্তান! এ সবকিছুই ঘটে নবুওয়াতের আগে।

যাইদের সন্তান উসামাও ﷺ বড় হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে। যাইদ শুধু আল্লাহর রাসূলের স্নেহভাজন ছিলেন না, ছিলেন আস্থাভাজনও। যাইদ প্রথম যুগের মুসলিমদের

[65] সীরাহ ইবন হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯।

একজন, নবুওয়াতের শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দক -- গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর একটিতেও তাঁর অংশগ্রহণ বাদ যায়নি। হিজরত করেছিলেন একদম শুরুর দিকে। রাসূলুল্লাহ আর আবু বকরের পরিবারের সাথে নিজ পরিবারকে মক্কা থেকে নিরাপদে মদীনায় নিয়ে আসার কাজটিও করেন এই যাইদ। একাধিক সামরিক অভিযানের কমান্ডার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

নিজের সন্তানতুল্য, দায়িত্ববান, সাহসী এই যুবককেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফুপাতো বোন যাইনাবের জন্য পছন্দ করলেন। বংশের মর্যাদায় দু'জনের মধ্যে যাইনাব এগিয়ে থাকলেও দ্বীনদারিতা, চরিত্র আর তাক্বওয়ায় দু'জনেই ছিলেন অনেক এগিয়ে। তাই বংশের কারণে উঁচু বা নিচু চোখে দেখার যে প্রথা আরবদের ছিল, সেই প্রথাকে ভেঙে দিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের এই দুই সদস্যকে বেছে নিলেন। নিচু বংশের কারো সাথে সংসার করার ব্যাপারে মানুষের যে অস্বস্তি কাজ করতো, সেই অস্বস্তিটুকু যেন এর মাধ্যমে মুছে যায়।

## যাইদ-যাইনাবের ﷺ সংসার ও বিচ্ছেদ

কিন্তু দু'জনের সংসারে বনিবনা হলো না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দ্বীনদার হলেই যে সংসার সুখের হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাদের সংসার টিকেছিল মাত্র এক বছর। বিচ্ছেদের আগে যাইদ রাসূলুল্লাহর কাছে এসে অনুযোগ করতেন যে, তাদের সংসারে ভালোবাসা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদকে ধৈর্য ধরতে বলতেন। বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সংসার টিকলো না। তারা দু'জনেই সংসার না চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। দুজনের সম্মতিতে যাইদ যাইনাবকে তালাক দিয়ে দেন।

## জাহিলিয়াতি আরবে সন্তান দত্তকের ধারণা

দত্তক নেওয়া বলতে আমরা বর্তমান সময়ে যা বুঝি তৎকালীন আরবে তেমনটা ছিল না। সে সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে দত্তক হিসেবে নিত, তাহলে পালক পুত্র বা পালক কন্যা দত্তকগ্রহণকারীর আপন পুত্র বা কন্যার মতো সমস্ত অধিকার লাভ করতো। তারা দত্তক গ্রহণকারীর বংশনাম গ্রহণ করতো, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করতো। পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা ছিল জাহিলিয়াতের সংস্কৃতিতে 'হারাম', একেবারেই মেনে নেওয়ার মতো না। অর্থাৎ, সত্যিকারের পিতা-পুত্রের যেমন সম্পর্ক, সেটাই তাদের উপর প্রযোজ্য হতো। কিন্তু ইসলাম এসে এই নিয়মগুলো বদলে দেয়।

> **"...আল্লাহ তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে**

ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তাতে তোমাদের জন্য কোনো গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৪-৫)

অর্থাৎ, পালক পুত্রকে পুত্র বললেই সে পুত্র হয়ে যায় না। বরং তাদের সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত যাইদকে ডাকা হতো যাইদ ইবন মুহাম্মাদ। এই আয়াত নাযিলের পর তিনি আগের নামে ফিরে যান -- যাইদ ইবন হারিসা। ইসলামে পোষ্যপুত্রের নাম তার আসল পিতার নামেই হতে হবে, পালক পিতার নামে নয়। নিঃসন্দেহে ইয়াতীমের দেখাশোনা ও ভরণপোষণ করা ইসলামের নজরে অত্যন্ত মহৎ একটা কাজ, অনেক বেশি সাওয়াবের একটা কাজ। কিন্তু ইয়াতীম বা পালকপুত্র (কিংবা কন্যা) কখনোই পালকপিতার নামে পরিচিত হবে না এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্ক তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না।

## একটি সামাজিক কু-প্রথার পরিসমাপ্তি

যাইদ এবং যাইনাবের সংসারে যখন টানাপোড়েন চলছে, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতেন তাদের এই সংসার টিকবে না এবং শেষ পর্যন্ত যাইনাবের সাথে তাঁর বিয়ে হবে -- আল্লাহ তাঁকে বিষয়টি আগেই জানিয়ে দেন। কিন্তু তবু তিনি যাইদকে যাইনাবের সাথে সংসার চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। নিকট ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে সেটা ভেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠবে। সমাজের লোক ছি ছি করবে। কারণ সেই সময়ে পালকপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা ছিল সমাজের দৃষ্টিতে খুব বাজে একটি বিষয়। কেমন ছিল তখন আল্লাহর রাসূলের মানসিক অবস্থা? আল্লাহ বলছেন,

"আর স্মরণ করো! যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন ও যার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো, আর আল্লাহকে ভয় করো। (কিন্তু এ পর্যায়ে) আপনার মনের ভেতরে যে কথা আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দিলেন। (আসলে আপনার পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) আপনি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলেন, অথচ (আপনি জানেন) আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশি হকদার।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাজের এই অর্থহীন প্রথাকে ভেঙে দিতে চাইলেন। এই প্রথা মুখের আদেশ দিয়েও ভাঙা যেত, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই প্রথাকে ভেঙে দিতে। আর তাই তাঁর রাসূলকে বিয়ে দিলেন

যাইনাবের সাথে। মুখে বলা আর করে দেখানো কখনোই এক নয়। কোনো কথা বলার চেয়ে করে দেখালে নিশ্চিতভাবেই সেটা অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। আল্লাহ সেটাই ফয়সালা করেন, আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়ে দিয়ে দেন। এই বিষয়টা নিয়ে যাইনাব খুব গর্ব করে রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্যান্য স্ত্রীদের বলতেন, 'তোমাদের বিয়ে তো হয়েছে জমিনে, আর আমার বিয়ে হয়েছে আসমানে!'

পুরো ঘটনায় দুটো বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এক, দত্তক নেওয়া বলে কিছু নেই, পালকপুত্র বা কন্যাকে স্ব-স্ব পিতৃপরিচয়ে বড় করতে হবে।

দুই, পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই, এটি সামাজিক কু-প্রথা মাত্র।

বিয়ে হলো, ওয়ালিমা হলো। প্রায় তিনশো জন অতিথিকে আপ্যায়ন করা হলো ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে। আনাস ইবন মালিকের ﷺ মা উম্ম সালিম ﷺ তার সাধ্যমতো কিছু খাবার রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য রান্না করে পাঠান। বলা বাহুল্য, এই খাবার তিনশো জনের জন্য মোটেও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এবারও ঘটলো একটি মু'জিযা, যেমনটা ঘটেছিল জাবির ইবন আবদুল্লাহর সাথে। এই অল্প খাবার তিনশো জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।

## যাইনাবের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার

কাফিররা রাসূলুল্লাহর ﷺ যে দুটো বিয়ে নিয়ে সবচাইতে বেশি আক্রমণ করে তার একটি হলো আইশার সাথে বিয়ে, আরেকটি হলো যাইনাবের সাথে বিয়ে। মজার বিষয় এ দুটো বিয়েই সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

১) ইসলামবিদ্বেষীরা বলে থাকে যাইদের বিয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইনাবের প্রেমে পড়েছিলেন। তাই যাইদকে তিনি তালাক দিতে বলেছেন যেন যাইনাবকে বিয়ে করতে পারেন। এর জবাব হলো, আল্লাহর রাসূল অনেক আগে থেকেই যাইনাবকে চিনতেন। তখনো হিজাবের আয়াত নাযিল হয়নি, তিনি যাইনাবকে আগেই দেখেছেন। বিয়ে করতে চাইলে তিনি আগেই যাইনাবকে বিয়ে করতে পারতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই চেয়েছেন যাইদের সাথে যাইনাবের বিয়ে হোক। তাদের সংসারে যখন বনিবনা হচ্ছিল না, তখনো আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইদকে বারবার বলেছেন যেন তিনি সংসার করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

২) ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি বড় অপপ্রচার হলো আল্লাহর রাসূল নিজে কুরআন রচনা করেছেন। এই অপবাদ নিয়ে আলোচনার বিশাল জায়গা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শুধু

একটা বিষয়ের অবতারণা করা হলো: আল্লাহর রাসূল ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, যাইনাবের সাথে তাঁর বিয়ে হবে। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তিনি কাউকে কিছুই বলতে পারেননি, বরং যাইদকে তালাক না দিতেই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টির নিন্দা করেছেন।

> "আর তুমি মানুষকে ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহরই বেশি অধিকার যে তুমি তাঁকেই ভয় করবে।"

সমাজের মানুষ কী বলবে এটা ভেবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভয় পাচ্ছিলেন -- আর এজন্য আল্লাহ তাঁকে নিন্দা করেন। যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে কুরআন লিখতেন, তাহলে তিনি নিজের লেখা কিতাবে নিজের নিন্দা বা সমালোচনা করতেন না। কারণ একজন মানুষ কখনোই প্রকাশ্যে লজ্জায় বা অস্বস্তিতে পড়তে চায় না। কিন্তু এই আয়াতটি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য অস্বস্তিকর, কেননা এখানে আল্লাহ তাঁকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার করছেন। এই প্রসঙ্গে মা আইশার একটি চমৎকার মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, 'যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআনের কোনো আয়াত গোপন করতেন, তবে তিনি তাঁকে নিন্দা করার এই আয়াতটি মানুষের কাছে গোপন করতেন।'

# ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত কিছু সারিয়া

খন্দকের পরে কুরাইশরা দমে গেলেও নজদের গোত্রগুলো পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেনি। তারা ছিল মুসলিমদের উত্থানের বিরুদ্ধে বড়সড় একটা হুমকিস্বরূপ। তাই রাসূলুল্লাহ এবার নজদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

## ১) আল-কারতার অভিযান

নজদের বনু বাকর ইবন কিলাব গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ؓ। ত্রিশ জনের একটি দল নিয়ে তিনি বনু বাকরের শাখাগোত্র বনু আল-কারতাহর উপর হামলা চালান। তাদের দশ জন মারা যায়। গনিমত নিয়ে ফিরে আসার সময় সুমামাহ ইবন উসাল নামের লোককে গ্রেপ্তার করেন। সে ছিল বনু হানিফা গোত্রের নেতা। বন্দীত্বের তিনদিনের মাথায় সে মন পরিবর্তন করে। গোসল করে মসজিদে এসে শাহাদাহ পাঠ করে, উমরা করার অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পেয়ে তাকে অনুমতি দিলেন। সে মক্কায় গেল উমরা করতে[66], পথিমধ্যে মক্কার এক লোক তাকে বললো,

- এই, তুই নাকি মুরতাদ হয়ে গেছিস?

- না, আমি মুহাম্মাদের দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল-

---

[66] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২০৩।

ইয়ামামা থেকে যেন এক দানা শস্যও তোদের মক্কায় রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া না ঢুকে সেই ব্যবস্থা করছি।

সুমামাহর এই কথা ফাঁকা বুলি ছিল না। সে তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সত্যি সত্যি ইয়ামামা থেকে মক্কায় শস্য পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তখন মক্কার নেতারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করেন যেন তিনি সুমামাহকে সামলে রাখেন। রাসূলুল্লাহ তাদের অনুরোধ রাখেন। ইসলাম মানুষকে যখন সত্যিই বদলে দেয়, তখন আমূলে বদলে দেয়। সে নিজের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা সবকিছু দিয়ে ইসলামের খেদমত করার চেষ্টা করে, সুমামাহ তেমনই এক উদাহরণ।

## ২) আল-খাবত অভিযান

এটি মাছের অভিযান নামেও পরিচিত। তিনশো সৈনিকের এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবন আল-যাররাহ। কুরাইশদের অর্থনীতির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর সিরিজ হামলার মধ্যে এটি একটি। কারো মতে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল জুহাইনাহ গোত্র। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এই অভিযানে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু যাত্রাপথে মুসলিমদের রসদ প্রায় ফুরিয়ে যায়। খাবার বাঁচিয়ে রাখার জন্য আবু উবায়দাহ দিনে প্রত্যেক মুজাহিদের ভাগে একটি করে খেজুর খেতে দেন। দিনগুলি ছিল খুবই কষ্টের! সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'যখন সব খেজুর শেষ হয়ে গেল, দিনে একটা খেজুরের মর্ম যে কী আমরা তখন বুঝতে পেরেছি!'

কাইস ইবন সাদ ইবন উবাদাহ ছিলেন এই অভিযানে অংশ নেওয়া এক সৈনিক। এই অবস্থা দেখে তিনি ধার করে এনে নয়টি উট জবাই করে সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ সাধারণত ধনী অবস্থায় বেশি সাদাকাহ করে, কিন্তু কাইস এমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন আনসারী সাহাবি সাদ ইবন উবাদার সন্তান। এ পরিবার ছিল উদারতার জন্য বিখ্যাত।

এই অভিযান 'মাছের অভিযান' নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল। রসদের সব খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসলিমরা সাগরের তীরে এক বিশাল তিমি মাছ পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। প্রথমে তারা ভাবলেন সেই মাছ খাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আবু উবায়দা ﵁ বললেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবি। আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণ করছি। আমাদের যেহেতু প্রয়োজন, কাজেই তোমরা খেতে পারো।' এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মরা পশু খাওয়া জায়েয না হলেও মরা মাছ খাওয়া জায়েয।

তারা ছিলেন আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। তাই আল্লাহই তাদের জন্য রিযিক পাঠিয়ে দেন। বিশাল আকৃতির এক তিমি। এতই বিশাল যে, তিনশো মুজাহিদ আঠারো দিন

ভরপেট খেয়েও শেষ করতে পারেননি।[67] অভিযান থেকে ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ এই ঘটনা বলা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, 'এই মাছ ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রিযিক।' তারা ফিরে আসার সময় সেই মাছের কিছু অংশ নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আগ্রহ ভরে সেই রিযিক খেয়ে দেখলেন।

## ৩) আবু রাফে: পাঁচ সাহাবির ﷺ দুঃসাহসী অপারেশন

এক আনসারি সাহাবির ভাষায়, 'আওস ও খাযরাজ গোত্রের উদাহরণ হলো দুই তেজী ঘোড়ার মতো যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।' একটি গোত্রের কেউ যখন নবীজির ﷺ সেবায় কিছু করতো, অন্য গোত্রও সেরকম কিছু করে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করতো। এই প্রতিযোগিতা দুনিয়ার সাফল্যের জন্য ছিল না, তাদের প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতকেন্দ্রিক। সাফল্য বলতে আজকের পশ্চিমা বস্তুবাদী পুঁজিবাদী বিশ্ব বোঝে অর্থ, ক্ষমতা আর মর্যাদা। কিন্তু ইসলামে সাফল্য বলতে বোঝায় আল্লাহর নৈকট্য।

আওস গোত্রের সাহাবিরা কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করেছিল। এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট একটা অর্জন। খাযরাজ গোত্রও পেছনে পড়ে থাকতে চায়নি। তারাও চাইলো ইসলামের খেদমতে এরকম একটা কিছু করতে। এজন্য তারা বেছে নিলো কা'ব ইবন আশরাফের মতো আরেক ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তিকে। তার নাম হলো সালাম ইবন আবী আল-হুকাইক। সে পরিচিত ছিল আবু রাফাই বা আবু রাফে নামে।

আবু রাফে ছিল একজন জনপ্রিয় কবি। আর সে যুগে কবি মানেই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। আগেই বলা হয়েছে, সেই সময়ের একটি কবিতা হচ্ছে আজকের যুগে একটি নিউজসাইটের প্রবন্ধ, টুইটারের টুইট কিংবা ব্লগপোস্ট অথবা ফেসবুক স্ট্যাটাসের মতো। সেটা মুহূর্তের মাঝে সবার কাছে পৌঁছে যেত। আবু রাফে তার এই কাব্যিক 'প্রতিভা' কাজে লাগিয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখার কাজে। ইসলাম ও মুসলিমদের অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ করা ছিল তার কবিতার মূল উপজীব্য। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া-যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়াও সে ছিল খন্দক যুদ্ধের অন্যতম কারিগর। খন্দকের অর্থায়নে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গাতফান গোত্র যখন খন্দকের সামরিক জোটে অংশ নেয়, সে তখন গাতফানকে মোটা অংশের পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

খাযরাজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এই আবু রাফের নাম প্রস্তাব করা হয়। আবু রাফেকে হত্যা করা হলে নিশ্চিতভাবেই ইসলামের বড় একটা শত্রুকে শেষ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমোদন দেন। পাঁচ জনের একটা দলকে পাঠানো হয় আবু

---

[67] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৯২।

রাফেকে হত্যা করার মিশনে। এর নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আতিক। এই দলে আরও ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ﷺ, গুপ্তহত্যায় তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি খালিদ ইবন সুফিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। সে কাহিনী আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আবু রাফে ছিল ইহুদি। সে থাকতো খাইবারের নিরাপদ একটা দুর্গের মধ্যে। আবদুল্লাহ ইবন আতিকের নেতৃত্বে পাঁচ সাহাবির ছোট্ট দলটি যখন খাইবারে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নেমেছে। সবাই পশুপাল নিয়ে বাড়ির পথে। দুর্গে ঢুকতে হলে এখনই ঢুকে পড়তে হবে, কারণ সন্ধ্যার পর দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ তার সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একাই দুর্গের দিকে যেতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে দুর্গের মাঝে ঢুকে পড়া।

তিনি চট করে একটা কাজ করলেন। একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে এমন একটা ভান করলেন যেন মনে হয় দুর্গের দেওয়ালের পাশেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বসেছেন। মানুষ দেখলে ভাববে, তিনি এই দুর্গেই থাকেন, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়েছেন। সে যুগে এটা স্বাভাবিক ছিল। আর হলোও ঠিক তাই। তাকে দেখে প্রহরী বলে উঠলো, 'এই যে আল্লাহর বান্দা, ভেতরে যেতে চাইলে এখনই যাও। আমি কিন্তু দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন। টুপ করে দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়লেন। এরপরের কাহিনী ইতিহাস! আবদুল্লাহ ইবন আতিকের ﷺ মুখেই শোনা যাক সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী,

*'আমি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সবাই ভেতরে চলে এসেছে ভেবে প্রহরী দরজা লাগিয়ে দিল। আর চাবিটা একটা খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখল। বেশ খানিকক্ষণ পর চারদিক সুনসান নীরব হয়ে যাওয়ার পর আমি উঠে গিয়ে চাবিটা নিলাম, আর দরজা খুলে দিলাম (যেন দলের বাকি সদস্যরা যোগ দিতে পারে)।*

*আবু রাফে থাকতো দোতলার একটা ঘরে। দেখলাম সেখানে কিছু লোক গল্পগুজবে মত্ত। আমি তাদের যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা গাধার খোঁয়াড়ে বসে আছি। এক সময় লোকগুলো চলে গেল। তখন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভেতর থেকে দরজাটা দিলাম বন্ধ করে। ভাবলাম, তারা যদি আমার উপস্থিতি টেরও পায়, তবু আমাকে ধরার আগেই আমি আবু রাফেকে মেরে ফেলতে পারবো।*

*আবু রাফের ঘরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সে তার তার পরিবার-পরিজন নিয়ে শুয়ে আছে। ঘরটা ছিল অন্ধকার। আবু রাফে ঠিক কোথায় আছে বোঝা যাচ্ছিল না। তাই তাকে ডাক দিলাম,*

*- আবু রাফে!*

- কে রে, কে কথা বলে? আবু রাফে জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার গলার আওয়াজ শুনে সে কোথায় আছে আন্দাজ করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তলোয়ার দিয়ে দিলাম এক কোপ। আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ছিলাম তাই আঘাতটা ঠিক জায়গামতো লাগলো না। আবু রাফে চিৎকার করে উঠলো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। একটু পর আবারও তার ঘরে ঢুকলাম। এবার ঢুকলাম বন্ধুর বেশে। ভান করলাম যেন তাকে সাহায্য করতে এসেছি। গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম,

- আবু রাফে! কী হয়েছে আপনার?

- তোমার মায়ের জীবন বরবাদ হোক! দেখছো না কী হয়েছে! এক লোক এইমাত্র আমাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে!

এবার আমি সুযোগ বুঝে তার কাছে গিয়ে তাকে আবার কোপ মারলাম। এবারও খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না। তার স্ত্রী চিৎকার করে উঠলো। আমি আবারও গলার স্বর পরিবর্তন করে সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। দেখলাম আবু রাফে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। এবার তার পেট বরাবর তলোয়ার চালালাম। এরপর তলোয়ার বাঁকিয়ে ধরলাম। তলোয়ার তার পিঠ পর্যন্ত ঢুকে গেল, হাড় ভাঙার মচমচ আওয়াজ শুনতে পেলাম। নিশ্চিত হলাম, এবার তাকে হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। একটার পর একটা দরজা খুলছি আর বেরোচ্ছি, এভাবে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, একদম নিচে পৌঁছে গেছি ভেবে যে-ই না পা ফেলেছি, ওমনি পিছলে পড়ে গেলাম।

সেদিন ছিল জোৎস্না রাত। আমার পা ভেঙে গেছে। পাগড়ি খুলে পা বাঁধলাম। (ভাঙা পা নিয়ে) সামনে এগোতে থাকলাম। দরজা পর্যন্ত এসে বসে পড়লাম। ভাবলাম, আবু রাফেকে হত্যা করতে পেরেছি কি না এটা নিশ্চিত না হয়ে এখান থেকে যাবো না।

সকাল হলো। মোরগের ডাক শুনতে পেলাম। কেউ একজন ঘোষণা করলো, হে হিজাজের অধিবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফে নিহত হয়েছেন। আমার মনে হলো, এর চাইতে মধুর কোনো কথা আমি কখনো শুনিনি।

ঘোষণা শোনার পর সঙ্গীদের কাছে চলে এলাম। বললাম, আমাদের এখন যেতে হবে। আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলাম, তাকে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তিনি বললেন, দেখি তো তোমার পা'টা বাড়িয়ে দাও। আমি আমার পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার পা'টা তাঁর হাত দিয়ে শুধু ছুঁয়ে দিলেন। ওমনি আমার পা একদম সুস্থ হয়ে গেল! মনে হলো যেন এই পায়ে কখনোই কিছু হয়নি।'

এই ঘটনাটি সহীহ বুখারিতে বর্ণিত।[68] ইবন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তারা পাঁচ জনই আবু রাফের ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেছিলেন। তবে দুটো বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ আমরা ধরে নিতে পারি, উপরের বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন আতিক শুধু নিজের অংশের কথাই বর্ণনা করছিলেন।

### আবু রাফের ঘটনা থেকে শিক্ষা

#### ১) সুপরিকল্পনা

দুর্গে ঢোকার সময়ের কৌশল ছাড়াও আবু রাফের ঘরে প্রবেশের জন্য আবদুল্লাহ ইবন আতিককে ﷺ বেশ কিছু চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। আবু রাফের স্ত্রীকে তারা বলেন, তারা আরব থেকে আবু রাফের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য এসেছেন। তারা নাটকটি এমনভাবে সাজান যেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। আর এসব কথোপকথনই হচ্ছিল ইহুদিদের ভাষায়। আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ ইহুদিদের ভাষায় কথা বলেছেন যেন তার জন্য ভেতরে ঢোকা সহজ হয়। এ ধরনের কাজ অত্যন্ত পরিকল্পিত হওয়া চাই। সাহাবিরা সেটা নিশ্চিত করেছেন।

#### ২) উপস্থিত বুদ্ধি

শুরু থেকেই আবদুল্লাহ ইবন আতিক ﷺ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছেন। প্রস্রাব করার ভান করে দুর্গে ঢুকে পড়া, গাধার আস্তাবলে লুকিয়ে থাকা, আবু রাফের স্ত্রীকে ধোঁকা দেওয়া, আবু রাফের সাহায্যকারী সেজে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে কথা বলে তার অবস্থান খুঁজে বের করা -- প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। ঈমান-আমলের সার্বিক বিবেচনায় আবু বকর, উমর, উসমানরা ﷺ এগিয়ে আছেন সত্যি। কিন্তু কিছু কাজ আছে যেটার জন্য বিশেষ কিছু দক্ষতা লাগে যেটা ছিল মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস কিংবা আবদুল্লাহ ইবন আতিকদের ﷺ। একজন নেতার কাজ এই বিশেষ যোগ্যতা এবং সুপ্ত প্রতিভাগুলো খুঁজে বের করা।

## ৪) আল-গাবার অভিযান: পদাতিক সৈনিক সালামাহ ইবন আল-আক্কওয়ার বীরত্ব

এই অভিযানটি ছিল ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় অভিযান[69]। আর অভিযানের মূল নায়ক ছিলেন সালামা ইবন আল-আকওয়া ﷺ। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন পাঁচশো সাহাবি, কিন্তু সালামার বীরত্ব আর সাহসিকতা আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। সালামা ইবন আল-আকওয়া ﷺ ছিলেন মক্কা ছেড়ে আসা এক মুহাজির। পরিবার, সহায়-সম্পদ সবকিছু ছেড়েছুড়ে তিনি আল্লাহ ও তাঁর নবীর পথে হিজরত করেছিলেন।

---

[68] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ৮৬, ৮৭।

[69] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৭।

মদীনায় এসে তিনি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহর ﷺ চাকরি নেন। তাঁর ঘোড়া চড়ানো, তাঁকে খেদমত করা, এভাবেই দিন কাটতে থাকে।

ঘটনার সূত্রপাত অনেকটা এভাবে, আবদুর রহমান উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিজারীর নেতৃত্বে গাতফানের কিছু লোক গাবাহ নামক স্থানে হামলা চালায়। গাবাহ মদীনার কাছেই একটা উর্বর জায়গা। সেখানে মুসলিমরা তাদের উট চড়ানোর জন্য পাঠাতো। একদিন আবদুর রহমান আল-ফিজারীর লোকেরা এসে মুসলিম মেষপালক যার ইবন আবি যারকে ﷺ হত্যা করে। তার স্ত্রী লাইলাকে ﷺ বন্দী করে এবং বিশটা উট লুট করে পালিয়ে যায়। উটগুলো ছিল আল্লাহর রাসূলের উট।

ঘটনাস্থলের কাছেই উপস্থিত ছিলেন সালামা ইবন আল আকওয়া এবং রাবাহ। তারা দুজনেই সেদিন উট চরাতে তৃণভূমিতে নিয়ে এসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভোর বেলায়। সালামা ﷺ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাবাহকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠিয়ে দেন। আর তিনি নিজে শত্রুদের দৌড়ে ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন,

*"ওয়া সুবহা! ওয়া সুবহা! ওয়া সুবহা!"*

'ওয়া সুবহা' ছিল সে যুগের বিপদ সংকেত। আজকের যুগে অ্যামবুলেন্স বা দমকল বাহিনীর গাড়ির সাইরেনের মতো। সালামার চিৎকার মদীনা থেকেও শোনা গেল। সাহাবিরা দ্রুত রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে জমা হলেন। এই আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতেই হবে। রাসূলুল্লাহ তৎক্ষণাৎ পাঁচশো সৈনিকের দল প্রস্তুত করলেন।

এদিকে সালামা সৈন্যবাহিনী আসার অপেক্ষা না করে একাই উয়াইনা আর তার দলবলের পিছু নেওয়ার জন্য ছুটে গেলেন। কিন্তু তার কাছে তখন না আছে কোনো ঘোড়া, না আছে কোনো উট, ছিল শুধু দুটো পা। সেই পা দুটোকে পুঁজি করেই লুটেরাদের ধরার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। সালামার ভাষায়,

*'আমি লুটেরাদের তাড়া দিতে বেরিয়ে পড়লাম। তাদের দিকে একের পর এক তীর ছুঁড়ছি আর ছন্দ মিলিয়ে হুংকার দিচ্ছি,*

*এই দ্যাখ! আমি হলাম আকওয়ার পুত্র!*
*আজকের দিন ইতরদের ধ্বংসের দিন!*
*আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, দেখে নে-*
*ইতরের দল মরবে এই দিনে!*

*যাকেই হাতের নাগালে পাচ্ছি, এমনভাবে তীর ছুঁড়ে মারছি যে কাঁধ ছেদ করে তীরের মাথা বেরিয়ে আসছে। তাদের কেউ যখন আমার দিকে পিছু ফিরতো, আমি গাছের*

*গোড়ায় বসে পড়তাম আর আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে কিংবা তার পশুকে ঘায়েল করতে লাগলাম!'*

লুটেরাদের সবাই ছিল ঘোড়ায় আর সালামা ইবন আল আকওয়া পদাতিক একজন সৈনিক মাত্র। অথচ সালামার ধাওয়া খেয়ে তাদের রীতিমতো পাগল হওয়ার মতো অবস্থা! তারা কোনোরকমে একটা পাহাড়ের পাশে সরু গিরিপথের মতো জায়গায় আশ্রয় নিল। সালামা ﷺ এরপর সেই পাহাড়ে উঠে উপর থেকে তাদের উপর একের পর এক পাথর মারতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তারা লুট করা সবগুলো উট ছেড়ে দিয়ে ক্ষান্ত হলো।

শত্রুরা ক্ষান্ত হলেও সালামা ইবন আল আকওয়া মোটেও ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাদের ধাওয়া করতেই থাকলেন, করতেই থাকলেন। ধাওয়া খেতে খেতে শত্রুদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম! কোনোমতে ত্রিশটা জোব্বা আর ত্রিশটা বর্শা ফেলে নিজেদের বোঝা হালকা করে পড়িমরি করে পালাতে লাগলো। ফেলে যাওয়া জিনিসগুলোও সালামা চমৎকারভাবে কাজে লাগালেন। জিনিসগুলোর উপর সালামা একটা করে নিশানা রেখে দিতে দিতে এগোচ্ছিলেন যেন জিনিসগুলো পরে খুঁজে পেতে সমস্যা না হয় আর রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো বাহিনীও যেন এই চিহ্ন দেখে পথ চিনে নেয়। সালামা বর্ণনা করেন,

*'শেষ পর্যন্ত লুটেরার দল এক সরু পাহাড়ি পথে গিয়ে থামলো। সেখানে তারা বদর আল ফাজরির ছেলের সাথে মিলিত হলো। সবাই মিলে সকালের নাস্তা খেতে বসেছে, আমি তখন একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়ানো। আমাকে দেখিয়ে ফাজারি বললো, এই লোকটা কে? তারা বললো, এই লোক-ই তো আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে! সেই ভোর থেকে আমাদের পিছু ছাড়েনি! তীর মারতে মারতে আমাদের থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। ফাজারি বললো, তোমরা তাকে তাড়া করছো না কেন! যাও, চার জন গিয়ে এখনই এই লোককে শেষ করে দাও।*

*তাদের মধ্যে চারজন পাহাড়ে উঠে আমার কাছাকাছি এল। আমি বললাম,*

*- তোরা চিনিস আমাকে?*

*- না, চিনি না। কে তুমি?*

*- আমি হলাম সালামা ইবন আল-আকওয়া। সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, আমি চাইলে তোদের প্রত্যেককে এক এক করে শেষ করে দিতে পারি কিন্তু তোরা কেউ আমার কিছুই করতে পারবি না!*

*এই কথা শুনে তাদের একজন বললো, আমার মনে হয় সে ঠিকই বলছে।*

*এরপর তারা চলে গেল। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘোড়সওয়ারিরা আসা পর্যন্ত আমি*

*সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। সবার আগে দেখতে পেলাম আখরাম আল-আসাদীকে। তার পেছনে পেছনে আসছে আবু কাতাদা আল-আনসারি, আর তারও পেছনে ছিল মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে বললাম, আখরাম, তুমি সতর্ক থাকো। ওরা একা পেলে তোমাকে মেরে ফেলবে।*

*আখরাম আমাকে বললো, সালামা! যদি তুমি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো, তুমি যদি বিশ্বাস করে থাকো যে জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য -- তাহলে আমার আর শাহাদাতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িও না।'*

কারো কারো বুকের ভেতর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বাসনা কত যে তীব্র হয়! আখরামের অদম্য সাধ শহীদ হবেন। এরপর সালামাহ আর বাধা দিলেন না। পথ ছেড়ে দিলেন। আখরাম ছুটে গেলেন লুটেরাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হতে। উয়াইনার মুখোমুখি আখরাম। দু'জন প্রচণ্ড লড়াই করছেন। আখরামের আঘাতে উয়াইনার ঘোড়া আহত হলো, কিন্তু উয়াইনার পাল্টা আঘাতে আখরাম শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদাত। আখরামের কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত। আল্লাহর রাসূলের ﷺ থেকে শিক্ষা নেওয়া মানুষগুলো এভাবেই মৃত্যুকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। বরণ করে নিতেন।

আখরামকে হত্যা করে উয়াইনাহ তাঁর ﵁ ঘোড়ায় চড়ে বসলো। এরপর দৃশ্যপটে আসলেন দ্বিতীয় বীরযোদ্ধা আবু কাতাদা। আবু কাতাদা ﵁ উয়াইনাকে আক্রমণ করলেন, পাল্টা আঘাতে উয়াইনা আবু কাতাদার ঘোড়াকে মেরে ফেললো। কিন্তু আবু কাতাদা আল্লাহর ইচ্ছায় উয়াইনাকে হত্যা করলেন আর তার ঘোড়া নিজের দখলে নিয়ে সেটায় চড়ে বসলেন। সেটা আসলে আখরামের ঘোড়া ছিল। সালামা এরপর আবারও ডাকাতদলকে তাড়া করতে শুরু করলেন। আবার ফেরা যাক সালামার বর্ণনায়,

*'সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদের মুখকে উজ্জ্বল করেছেন, আমি তখন এতটাই ক্ষিপ্রগতিতে তাদের ধাওয়া করছি যে পেছনে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো সাহাবিকেই দেখতে পেলাম না। এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের উড়ানো ধূলিও আমার চোখে পড়ল না। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ডাকাতদল একটা গিরিপথে থামলো। সেখানে যি-কারদ নামে একটা ঝর্ণা ছিল। খুব তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি খাবে, এরকম মুহূর্তে তারা আমাকে দেখে পানি খাওয়া ছেড়ে পড়িমরি করে পাহাড়ের উপরে পালাতে শুরু করলো! আমি হুংকার দিয়ে বলে উঠলাম,*

*এই দ্যাখ! আমি আকওয়ার পুত্র!*
*আজকের দিন ইতরদের ধ্বংসের দিন!'*

*সারাদিনের ছুটোছুটির পর লুটেরার দল তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত। তাদের আর চলার শক্তি বাকি নেই। সালামাকে দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল! তারা বিশ্বাসই*

*করতে পারছিল না এই একটি লোক সেই ভোর থেকে দৌড়ে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে তাদের একজন বললো,*

*- তুমিই কি সেই লোক যে ভোর থেকে আমাদের তাড়া করে ফিরছো!*
*- হ্যাঁ! আমিই তোদের জানের দুশমন! ভোরবেলার সেই আকওয়া!'*

লুটেরার দল সারাদিন ঘোড়ায় করে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাদের ঘোড়াগুলোও ছুটতে ছুটতে কাহিল হয়ে পড়েছে, শক্তির আর লেশমাত্র নেই। তারা দুটো ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় রেখে চলে গেল। সালামা বলেন,

*'তারা যে দুটো ঘোড়া পেছনে ফেলে পালিয়েছিল আমি সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফেরত গেলাম। তিনি তখন সেই ঝর্ণার কাছে। সেখান থেকে সকালে মুশরিকদের পানি খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে শত্রুদের ফেলে যাওয়া চাদর আর বর্শাগুলো রাসূলুল্লাহর ﷺ হস্তগত হয়েছে। আর বিলালকে দেখলাম উদ্ধার করা উটগুলোর একটিকে জবাই করে সেটার কলিজা ভুনা করছেন। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে তাঁকে বললাম,*

*- ইয়া আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আপনার বাহিনী থেকে একশো জন লোক নিয়ে এই কাফিরদের ধাওয়া করবো। এমনভাবে তাদের হত্যা করবো যে তাদের খবর আনার মতো একটা লোকও থাকবে না।*

*এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, আগুনের আলোয় আমি তাঁর দাঁত দেখতে পেলাম!*

*- তুমি আসলেই এই কাজ করতে পারবে তো সালামা?*
*- সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, অবশ্যই পারবো!'*

গাতফানের এক লোক থেকে পরে সাহাবিরা জানতে পারেন যে, সেদিন তারা একটা উট জবাই করেছিল । এমন সময় তারা সালামাহ ইবন আল-আকওয়ার আগমন টের পেয়ে জবাই করা উট ফেলেই পালিয়ে যায়। এই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবিদের কাজের নমুনা! শত্রুদলের লোকগুলো তাদের খাবার পর্যন্ত মুখে তোলার সুযোগ পায়নি।

পরদিন সকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন, 'আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য হলো সালামা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামাকে পদাতিক এবং অশ্বারোহী দুটো ভাগেরই গনিমত দেন।

যখন কোনো সাহাবি কৃতিত্বের কোনো কাজ করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কদর

করতে ভুলতেন না। তিনি সালামা ইবন আল আকওয়াকে ﷺ তাঁর উট 'আদবা'র পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। দুজন একই উটের পিঠে চেপে একসাথে মদীনায় ফেরত আসলেন।

## রাসূলুল্লাহর উট: আদবা

রাসূলুল্লাহর উটের নাম ছিল আদবা। অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি উট। হজ্জের সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় এটি ব্যবহৃত হতো। রাসূলুল্লাহর ﷺ মালিকানায় আসার আগে উটটি বনু আকিলের এক লোকের মালিকানায় ছিল। সেই লোক একবার উটসমেত মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছেই ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো, 'মুহাম্মাদ, তুমি কেন আমাকে আর আদবাকে আটক করেছো?' বনু আকিল গোত্র মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত ছিল না। তাই লোকটি তাকে বন্দী করার ব্যাপারে প্রতিবাদ করছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দেন, 'তোমাকে আটক করেছি তোমাদের মিত্র সাকীফ গোত্রের কারণে।' সাকীফ গোত্রের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ না হলেও তারা ছিল কুরাইশদের পক্ষে এবং তারা ইসলামের বিরোধিতা করে আসছিল। সাকিফ গোত্রের কাছে দু'জন মুসলিম বন্দী অবস্থায় ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাকীফের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বনু আকিলের এই লোককে আটক করেছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে লোকটি বলে বসলো, 'আমি তো মুসলিম!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি যদি স্বাধীন অবস্থায় এই কথা বলতে তাহলে কথাটা মেনে নেওয়া যেতো। এখন তুমি একজন বন্দী। তাই এই কথা এখন তোমার কাজে আসবে না।' লোকটি তখন খেতে চাইলো। তাকে খাওয়া দাওয়া করতে দেওয়া হলো। বন্দী হওয়া দুই মুসলিমকে ফিরে পেতে পরবর্তীতে এই ব্যক্তিকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উটটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য রেখে দেন।

গাতফানের লুট করা বিশটি উটের মাঝে এই আদবাও ছিল। গাতফানের ডাকাতরা রাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলে উটগুলোকে সেখানেই ছেড়ে রাখত। সেই সময়ের কথা, একদিন তারা সবাই যখন ঘুমাচ্ছে। তখন তাদের হাতে বন্দী হওয়া সেই মুসলিম নারী লাইলা ﷺ, চুপে চুপে উটের পালের কাছে চলে গেলেন। তিনি কোনো একটি উটে চেপে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু কোনো উট উঠে দাঁড়াচ্ছিল না। অবশেষে তিনি আদবার কাছে এলে সে সহজেই পোষ মেনে যায়।

লাইলা খুশি হয়ে মানত করলেন, যদি তিনি এই উটে সওয়ার হয়ে পালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে এই উটকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করে দেবেন।

লাইলা মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তার মানতের কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে হেসে বললেন, 'হায়! সে তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে আর তুমি তাকে জবাই

করে দিতে চাচ্ছো! কী মন্দ প্রতিদান! শোনো, যে মানতের সাথে আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত, সেই মানত পূর্ণ করতে হয় না। সেই মানতও পূর্ণ করতে হয় না যেখানে তুমি এমন কিছু দান করার মানত করেছো যা তোমার নয়।'[70]

উটটি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ, সেই মহিলার নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বুঝাচ্ছিলেন অন্যের সম্পত্তি নিয়ে মানত করতে হয় না, এটা আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাকে মানত পূর্ণ করতে নিষেধ করেন।

আল-গাবার অভিযান থেকে শিক্ষা

প্রথমত, শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার গুরুত্ব। সালামা ইবন আল-আকওয়া رضي الله عنه ছিলেন সুস্থ-সমর্থ, শক্তিশালী একজন মানুষ। দীর্ঘ সময় ধরে অনায়াসে পরিশ্রম করে গেছেন। ঘোড়াও তার সাথে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ক্লান্ত হননি। সেই অভিযান থেকে আসার পথেও এক আনসারী সাহাবির সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামেন। আজকের দিনের যুবকদের মধ্যে এমন ফিটনেস বিরল। সাহাবিরা ঘরের কোণে বসে থেকে বইপত্র বা কম্পিউটারে মাথা গুঁজে থাকার মানুষ ছিলেন না। দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর ছোঁড়া -- এসব ছিল সাহাবিদের নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন। জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে তারা নিয়মিত এসব অনুশীলন করতেন।

দ্বিতীয়ত, লাইলার ঘটনা থেকে ইমাম নববী মহিলাদের একা ভ্রমণের উপর একটি মাসআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জরুরি প্রয়োজনে মুসলিম নারী নিজের স্বামী বা অভিভাবক ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন। এরকম জরুরি প্রয়োজন উদ্ভূত হতে পারে যদি কোনো মহিলা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করতে চায় কিংবা কেউ তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করাতে চায় বা এরকম কিছু। প্রয়োজন ছাড়া একাকী ভ্রমণ মুসলিম মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ।' অর্থাৎ প্রয়োজনে মুসলিম নারীদের একা ভ্রমণ করা জায়েয তবে প্রয়োজন বলতে কী বোঝায় সেটা ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হওয়া চাই।

## ৫) উরাইনার রাখালদের কাহিনি: কুরয ইবন জারির আল-ফিহরীর অভিযান

উরাইনাহ গোত্র থেকে কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ইসলাম নিয়ে কথাবার্তা বলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। মদীনায় এসেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রথমবার মদীনায় আগতদের জন্য এটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। তারা তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, 'আমরা তো মেষপালক, শহুরেদের মতো এক জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত নই।' তারা আর মদীনায় থাকতে

---

[70] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় মানত, হাদীস ১১।

চাচ্ছিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের কিছু উট দেন। একজন মেষপালককে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন আর অসুস্থতার চিকিৎসা হিসেবে উটের দুধ ও মূত্র পান করতে বলে দিলেন। লোকগুলো রাখালসহ উটগুলো নিয়ে মদীনার বাইরে চলে এল। আস্তে আস্তে সবাই সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু শরীর সুস্থ হলেও তাদের হৃদয় ছিল অসুস্থ। বেদুইন এই লোকগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের অকৃতজ্ঞ। কঠোর তাদের হৃদয়। সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পরেই তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল। খুব নৃশংসভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ মেষপালককে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল।

এই খবর আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন যেন তাদের পথ সংকুচিত হয়ে যায়, হলোও তাই। তারা পথ হারিয়ে ফেললো। কুরয ইবন জারির বিশ জন মুসলিমকে সাথে নিয়ে তাদের খুঁজতে বেরোলেন। ভরদুপুরে কুরয ইবন জারির বিশ্বাসঘাতকদের ধরে নিয়ে রাসুলের ﷺ শহরে ঢুকলেন। জালিমদের শাস্তি এবার বাস্তবায়িত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, লোহার গরম শিক দিয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে। ঠিক যেভাবে করে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মেষচালককে হত্যা করেছিল। এটাই ছিল লোকগুলোর অপরাধের শাস্তি। এরপর তাদেরকে না মেরে মদীনার আল-হুররাহ পাহাড়ের কাছে ফেলে রাখা হয়। প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা পানি চাইতে থাকে, কিন্তু তাদেরকে এক ফোঁটা পানিও খেতে দেওয়া হয়নি। এভাবেই তাদের কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়।[71]

### শিক্ষা

১) এই ঘটনায় আমরা দেখেছি রাসূলুল্লাহ বেদুইনদেরকে উটের মূত্রকে ওষুধ হিসেবে খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে এটা বিতর্কিত একটা ব্যাপার। ইসলাম বিদ্বেষীরা এই হাদীসকে নিয়ে মুসলিমদের উপরে এক চোট নেয়। তারা বলে, ছি! ছি! মুহাম্মাদ উটের মূত্র পান করার আদেশ দিয়েছেন, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার! আবার কেউ কেউ এই হাদীসের কারণে পুরো হাদীসশাস্ত্রকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। তারা বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের মূত্র পান করতে বলেছেন এটা হতেই পারে না। অথচ এই ঘটনাটি সহীহ, মুসলিম এবং বুখারি দুই কিতাবেই আছে।

খুব বিশদ আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই মূত্রকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা অস্বাভাবিক কিছু না। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেই এমনটা হচ্ছে। প্রিমারিন (Premarine) নামের একটি ঔষধ আছে যার উপাদান হচ্ছে সংশ্লেষিত ইস্ট্রোজেন (Conjugated Esrogen) । এটি সংগ্রহ

---

[71] সহীহ বুখারি, অধ্যায় যাকাত, হাদীস ১০২।

করা হয় মাদী ঘোড়ার মূত্র থেকে। এই ওষুধটি প্রস্তুত করে ওয়েথ ফার্মাসিউটিক্যালস এবং এটি বাজারজাতকরণ হয়ে আসছে সেই ১৯৪৩ সাল থেকে।

গর্ভবতী ঘোড়ার মূত্র থেকে আধুনিক চিকিৎসাবিদরা ঔষধ তৈরি করলে ইসলামবিদ্বেষীদের মধ্যে তেমন গুঞ্জন শোনা যায় না, অথচ একই কাজ যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন তারা সেটা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি করে। অমুসলিমদের উচিত ইসলামের বিষয়গুলো সততার সাথে বোঝার চেষ্টা করা। ইসলাম বিরোধিতার হুজুগে গা ভাসানো উচিত নয়।

আর আমাদের মুসলিমদের উচিত হচ্ছে যখনই আমরা দেখব কোনো ঘটনা সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত, তখনই আমরা একে সত্য বলে ধরে নেব। সেই ঘটনাকে সত্য বলে গ্রহণ করার জন্যে কোনো ধরনের ফার্মাসিউটিক্যাল বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। রাসূল ﷺ বলেছেন, তাই আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি। এটাই হচ্ছে ঈমান। মুসলিমদের অবস্থান হবে এরকম। কথাটা অবৈজ্ঞানিক, বা সমাজের রীতিবিরুদ্ধ শোনালেও আমাদের তাতে বিশ্বাস করতে হবে। নিজেদের পছন্দ বা যুক্তির সাথে খাপ না খেলে হাদীসকে বাতিল বা দুর্বল বলে সাব্যস্ত করা -- এটা মুসলিমদের জন্য একেবারেই সঙ্গত নয়।

২) দ্বিতীয় বিষয়টি হলো শাস্তির তীব্রতা। রাহমাতাল্লিল আলামিন রাসূলুল্লাহর ﷺ গোটা সীরাতে এরকম কঠোরভাবে শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কেন এত কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হলো? সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবু কিলাবা। তার মতে, 'এই লোকগুলো হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং জমিনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।' তাদের দ্বারা সংঘটিত সবগুলো অপরাধই মারাত্মক পর্যায়ের অপরাধ। তারা শুধু ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদই হয়নি, তারা হারাবা করেছিল অর্থাৎ অস্ত্রসহ ডাকাতি করেছিল।

এই ধরনের অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের সূরা মায়িদায় আছে তাদের একহাত এবং এক পা কেটে ফেলতে হবে। এটা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের উপর প্রযোজ্য। লোকগুলোর চোখ উপড়ে ফেলা সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে তারা মেষপালকের চোখ উপড়ে ফেলেছিল, তাই তাদের সাথেও একই রকম কাজ করা হয়েছে। এটা হলো কিসাস। যদিও সাধারণভাবে এই কাজ জায়েয নয়। কিছু আলিমের মতে অবশ্য এই ধরনের শাস্তির বিধান রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক আলিমই এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, এসব ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'যদি সানার সকল মানুষ মিলে একজন মানুষকে হত্যা করে তাহলে সানার সকল মানুষকেই কিসাসের বিধান হিসেবে হত্যা করা হবে।' এটাই হচ্ছে হুদুদের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সাধারণ বিধান।

## ৬) বনু কালবের বিরুদ্ধে অভিযান

আবদুর রহমান ইবন আউফকে ﵁ পাঠানো হয় দাউমাতুল জান্দালে, বনু কালবের কাছে। এটি ছিল রোমান সাম্রাজ্য নিকটবর্তী একটি খ্রিস্টান গোত্র। আবদুর রাহমান ইবন আউফ ছিলেন মুহাজির, রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কাছের মানুষ। এই অভিযানে যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। এরপর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

*'যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। জিহাদ করো কাফিরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্যায়ভাবে গনিমতের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না, চুক্তিভঙ্গ কোরো না, কোনো শিশুকে হত্যা কোরো না।'*

জিহাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মুসলিমরা জিহাদ করে শুধু আল্লাহর জন্য। নিজেদের দল নিয়ে গর্ব করাও জিহাদের নিয়ত হতে পারে না। এ বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ সবসময় তাঁর সৈনিকদের মনে করিয়ে দিতেন। যুদ্ধের উত্তেজনায় যেন তারা বাড়াবাড়ি না করে বসে।

নির্দেশ মোতাবেক আবদুর রহমান বনু কালবকে ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রথমে তারা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তৃতীয় দিনে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশে তিনি তাদের নেতার মেয়ে তুমাদির বিনত আসবাগকে বিয়ে করে ফিরে আসেন। এর মাধ্যমে মদীনার বাইরের কোনো স্থানে সর্বপ্রথম ইসলামী আইন চালু হয়।

## অন্যান্য কিছু অভিযান

ষষ্ঠ হিজরী মুসলিমদের জন্য ব্যস্ত একটি বছর ছিল। বড় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও পুরো সময় ধরে অনেকগুলো আক্রমণাত্মক অভিযানে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এরকম আরও কিছু অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১) রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উকাশাহ ইবন মিহসানের ﵁ নেতৃত্বে চল্লিশ জনের একটি দলকে পাঠান বনু আসাদ গোত্রকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে। তারা বনু আসাদের এলাকায় যান। তাদের পানির কুয়া 'আল-গামর' দখল করে নেন এবং সেখানেই তাঁবু গাড়েন। শত্রুরা সবকিছু রেখে পালিয়ে যায়। তাদের রেখে যাওয়া দু'শোর মতো উট গনিমাহ হিসেবে নিয়ে উকাশাহ ফিরে আসেন।

২) মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার নেতৃত্বে ﵁ দশ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয় যিল-কিসসায়। উদ্দেশ্য ছিল বনু সালাবা এবং উওয়্যাল গোত্রকে ভয় দেখানো যেন গোত্র দুটি মুসলিমদের ভূমিতে অতর্কিত আক্রমণ করতে সাহস না পায়। তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল মদীনা থেকে মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে। রাতের বেলা সেখানে পৌঁছলে

একশোর মতো লোক তাদের ঘিরে ধরে। তারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দশ জনের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ ছাড়া প্রত্যেকে শহীদ হয়ে যান। মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাথে সাথে আবু উবায়দার ﷺ নেতৃত্বে চল্লিশ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। তাদের আগমন আঁচ করতে পেরে শত্রুরা পলায়ন করে। তাদের কিছু সম্পদ আর একজন লোককে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হয়।

৩) যায়িদ ইবন হারিসাকে ﷺ পাঠানো হয় আল-ঈসে। জায়গাটি ছিল মদীনা থেকে চার রাতের দূরত্বে। মক্কার একটি কাফেলাকে আক্রমণ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তারা কাফেলা আটক করেন, কাফেলার সম্পদ জব্দ করেন এবং কিছু লোককে বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা যাইনাবের ﷺ স্বামী আবুল-আস।

৪) একই বছরে আলী ইবন আবি তালিবকে ﷺ পাঠানো হয় বনু সাদ ইবন বকরের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে। গোত্রটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে খাইবারের ইহুদিদের সাহায্য করার পরিকল্পনা করছিল। আলীর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করে গোত্রটি সেখান থেকে সরে পড়ে। একজন লোক বন্দী হয়। তার থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

অভিযানগুলো থেকে দুটো বিষয় লক্ষণীয়,

প্রথমত, চারপাশের কোথায় কী ঘটছে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সজাগ ছিলেন। মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দানেই কেবল শক্তিশালী ছিলেন না, বরং গোয়েন্দাগিরিতেও তারা ছিলেন সমান পারদর্শী। নজরদারি (Surveillance) এবং তথ্য সংগ্রহ (Intelligence) দুটো কাজে তাঁর গোয়েন্দা বাহিনী সবসময়ই পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহকে ﷺ কখনই শত্রুরা চমকে দিতে পারেনি, বরং তিনিই সবসময় তাদেরকে চমকে দিতেন।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ কেবল কুরাইশদের বিরুদ্ধে সীমিত ছিল না। বরং যে বা যারা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রুদের গোপনে বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে আসছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করেছেন। যদি শুরু থেকেই তাদেরকে প্রতিহত করা না হতো, তাহলে অনেকেই মদীনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস দেখাতে শুরু করতো। রাষ্ট্রপরিচালনার কাজটি সবসময়ই জটিল। কিতাবি জ্ঞান এই কাজের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আরও প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তি এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ধারণা।

# হুদাইবিয়ার সন্ধি

## রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বপ্ন

"আমি কা'বাকে করেছি মানুষের জন্য মাসাবাহ..." (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২৫)

কা'বার একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। যে কা'বাকে একবার দেখে, সে বার বার সেখানে ফিরে যেতে চায়। তীব্র একটা টান তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, বাইতুল্লাহ হলো মাসাবাহ। মাসাবাহ মানে সম্মিলনস্থল। কোনো বাচ্চা উট যখন খেলতে যায়, সে একটু পর পর তার মাকে দেখার জন্য ফিরে আসে। এই ঘটনাকেই বলে মাসাবাহ। কা'বাঘর ঠিক তেমনই মানুষের জন্য মাসাবাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবরাহীমের ﷺ দুআর কারণে মানুষের অন্তরে কা'বার প্রতি একটা তীব্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন । যে এই ঘরে যাবে সে এর প্রেমে আটকে যাবে।

প্রায় ছয় বছর কা'বা থেকে দূরে থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মনে কা'বার কাছে যাওয়ার তীব্র বাসনা জেগে উঠলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আর সাহাবিরা একসাথে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন, আবার কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর রাসূল ﷺ মুসলিমদের তাঁর সাথে উমরা করার আহবান জানালেন। মক্কায় যাওয়ার জন্যে, আল্লাহর ঘরকে এক নজর দেখার জন্যে সাহাবিরাও উতলা হয়ে উঠলেন।

## মক্কার পথে যাত্রা

আল্লাহর রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দিলেন প্রায় চৌদ্দশ সাহাবি। সবাই মিলে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যুল হুদাইফায় ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানীর পশুগুলোর গায়ে চিহ্ন লাগিয়ে দিলেন। কুরবানীর আগে পশুর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন দেওয়া ছিল আরবের ঐতিহ্য। এই যাত্রায় নবীজির ﷺ সাথে ছিল প্রায় সত্তরটি উট।

সফর শুরু হলো। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথীরা তালবিয়া পাঠ করছেন-- লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ মেজাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা এগিয়ে চলছেন। কোনো যুদ্ধংদেহী ভাব নেই। সবার সাথে শুধুমাত্র একটি তরবারি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। এই অস্ত্র রাখাও ছিল আরবদের ঐতিহ্য মাত্র। অস্ত্র ছাড়া ভ্রমণ করার কথা আরবরা চিন্তাও করতে পারত না। যার অস্ত্র নেই তার সাথে একটা উটের কোনো পার্থক্য নেই। যুদ্ধের কোনো পরিকল্পনা ছিল না বিধায় রাসূলুল্লাহ কোনো ভারী

অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখেননি।

যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি কোনো অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাননি। তাই বিশ সদস্যের একটা অশ্বারোহী দলকেও সাথে রেখেছিলেন। তাদের কাজ ছিল পুরো জামাআতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পথে কোনো বাধাবিপত্তি আছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা। গুপ্তচর হিসেবে সাথে ছিলেন বিশর ইবন সুফিয়ান আল-খুযাই ؓ। তার কাজ ছিল প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নবীজির ﷺ কাছে পৌঁছে দেওয়া।

উমার ؓ ছিলেন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং সতর্ক একজন মানুষ। তাকে বোকা বানানো যেত না। তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে একবার বলেছিলেন, 'আমি নিজে ধুরন্ধর নই, কিন্তু ধুরন্ধর লোকেরা আমাকে বোকা বানাতে পারবে না।' তাঁর এই গুণের পরিচয় মেলে তাঁর কথা, কাজ এবং নবীজিকে ﷺ দেওয়া পরামর্শে। উমরা করার উদ্দেশ্যে একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা তাঁর কাছে কেমন যেন ঠেকলো। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি কোনো রকম অস্ত্র ছাড়া এমন লোকদের দেশে প্রবেশ করতে চান যারা আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত?'

রাসূল ﷺ বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন এবং উমারের সাথে একমত পোষণ করলেন। তাই তিনি মদীনা থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। কিন্তু অস্ত্রগুলোকে দল থেকে দূরে রাখা হলো। তিনি চাননি মানুষ ভাবুক যে তিনি যুদ্ধ করতে এসেছেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ গোয়েন্দা বিশর ইবন সুফিয়ান ؓ কুরাইশদের ব্যাপারে তথ্য নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি জানালেন কুরাইশরা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেকোনো মূল্যে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা প্রবেশ ঠেকাবে। এজন্য তারা লোকও জড়ো করছে। নারী-শিশুদের নিয়ে ময়দানে নামছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *"হায় রে কুরাইশ! যুদ্ধের চিন্তা ওদের পাগল করে রেখেছে! তাদের কী এমন ক্ষতি হতো যদি তারা পুরো বিষয়টাকে আমার আর আরবদের হাতে ছেড়ে দিত! আরবরা যদি আমাকে হত্যা করতো, তাহলে তো এমনিতেই তাদের মনের আশা পূর্ণ হয়ে যেতো। আর আল্লাহ যদি আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাই লাভবান হতো। কিন্তু না, যতদিন তাদের শক্তি আছে ততদিন তারা আমার সাথে লড়ে যেতে চায়! কুরাইশরা ভেবেছেটা কী? আমি হাল ছেড়ে দেবো? আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন, আমি সে উদ্দেশ্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো -- যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আল্লাহর পথে আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়!'*

মুসলিমদের কা'বায় প্রবেশের বাধা দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার কুরাইশদের ছিল না। কুরাইশরা ছিল কা'বার রক্ষণাবেক্ষণকারী, কা'বা তাদের সম্পত্তি ছিল না। কা'বা তৈরি করে গেছেন আরবদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল ﷺ। তাই সবারই কা'বাঘরে যাওয়ার অধিকার আছে। কাউকে কা'বায় প্রবেশ করতে না দেওয়া খুবই গুরুতর বিষয়। আর বিশেষত যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি শুধু উমরা করতে চান, যুদ্ধ করতে চান না। কুরাইশদের এই সিদ্ধান্ত আরবরা তেমন পছন্দ করলো না। জনমত রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষেই গেল।

দেখতে দেখতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলো। রাসূল ﷺ সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা কী চাও? যারা আমাদের কাবাঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, আমরা তাদের সন্তান এবং পরিবারদের দিকে অগ্রসর হই?'

এখানে সেসব গোত্রের কথা বোঝানো হয়েছে যারা রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের কাবাঘরে প্রবেশে বাধাদানের মতো ঘৃণ্য কাজে কুরাইশদের সাহায্য করছে। এই যুদ্ধে কুরাইশরা একা ছিল না, তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল আল হাবিশ। তারা ছিল তিন বা ততোধিক গোত্রের মিলিত জোট। রাসূল ﷺ সাহাবিদের কাছে জানতে চাইছিলেন হাবিশদের আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা। আবু বকর ﷺ তখন নবীজিকে ﷺ বললেন,

*“হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাবাঘর তাওয়াফে এসেছেন, কারো সাথে যুদ্ধ করতে নয়। আপনি আপনার লক্ষ্যে অটল থাকুন। যারা এই লক্ষ্যে বাধা দেবে, আমরা কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।'*

আবু বকরের ﷺ পরামর্শ নবীজির ﷺ পছন্দ হলো। তিনি নিজ থেকে যুদ্ধে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হলেন।

কুরাইশরা খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং ইকরামা ইবন আবু জাহলের নেতৃত্বে দুইশো সৈন্যের এক বাহিনী পাঠালো। খবর পেয়ে রাসূল ﷺ বিকল্প পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিলেন যেন খালিদ ইবন ওয়ালিদকে এড়াতে পারেন। আসলাম গোত্রের এক লোক মুসলিম বাহিনীকে বিকল্প পথে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিলেন। নতুন পথটি ছিল খুবই রুক্ষ, বন্ধুর। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হলেন। মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া থেকে মক্কার দূরত্ব ছিল মাত্র এক দিনের। মক্কার বিপদসীমার ভেতরে। খালিদ ইবন ওয়ালিদ তখন তড়িঘড়ি করে বাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

হুদাইবিয়া পৌঁছে নবীজির ﷺ বিখ্যাত উট কাসওয়া হঠাৎ বসে পড়ল। অনেক পীড়াপীড়ি করেও তাকে ওঠানো যাচ্ছে না। সাহাবিরা মন্তব্য করতে লাগলেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, 'না, কাসওয়া অবাধ্য হয়নি। অবাধ্যতা কাসওয়ার স্বভাব নয়। সে তাঁর নির্দেশেই থেমেছে যিনি আবরাহার

হাতিগুলোকে থামার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[72]

অর্থাৎ, স্বয়ং আল্লাহর আদেশেই কাসওয়া বসে পড়েছিল। যখন আবরাহা ও তার বাহিনী মক্কা আক্রমণ করতে গেল তখন তার হাতিগুলো মাটিতে বসে পড়েছিল। অনেক ঠেলেও হাতিগুলোকে ওঠানো সম্ভব হয়নি। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলো, উট বসে পড়লো। কিন্তু আবরাহার বাহিনী ছিল কাফির বাহিনী, আর রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনী। সেক্ষেত্রে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায় থাকলো? ইবন হাজার আসকালানি এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

*"আল্লাহ আযযা ওয়া জাল অতীত বর্তমান সবই জানেন। তিনি জানতেন যে, মক্কার লোকেরা একসময় মুসলিম হবে। তাই তিনি অতীত এবং বর্তমান কোনো সময়ই রক্তপাত হতে দেননি। আবরাহার ক্ষেত্রে সেটি করেছেন আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসের মাধ্যমে, আর হুদাইবিয়ার সময় তা করেছেন শান্তির দরজা উন্মোচনের মাধ্যমে। রাসূল ﷺ যদি সেদিন সামনে অগ্রসর হতেন তাহলে যুদ্ধ লেগে যেত, অনেক রক্তপাত হতে পারতো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাসওয়াকে থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের যুদ্ধে জড়ানো থেকে বিরত রেখেছিলেন।"*

কাসওয়াকে বসে পড়তে দেখে রাসূল ﷺ বললেন,

> *"সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কুরাইশদের যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি আছি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মর্যাদা রক্ষিত হয়।"*

রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে দিলেন যে তিনি শান্তি চান এবং তিনি তাদের যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা বা অধিকার লঙ্ঘিত না হলেই হলো, এই ক্ষেত্রে সেটি ছিল হারামের ভেতরে রক্তপাত।

হুদাইবিয়াতে একটি কুয়া ছিল। কিন্তু সাহাবিরা পানি পান করতে গিয়ে দেখলেন যে কুয়াটি খালি। রাসূল ﷺ একটি তীর তাদের হাতে দিলেন, বললেন সেটিকে কুয়ায় নিক্ষেপ করতে। তীর নিক্ষেপ করতেই কুয়া থেকে কলকল করে পানি বের হতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরও একটি মু'জিযা।

# দুই পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ

## মুসলিমদের প্রথম দূত: খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহ

একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল দুই শিবিরেই। রাসূল ﷺ কুরাইশদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাইলেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন আল্লাহর ঘর

---

[72] সহীহ বুখারি, অধ্যায় শর্তাবলী, হাদীস ১৯।

তাওয়াফ করতে। এই কাজের জন্যে পাঠানো হলো খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহকে ﷺ। খারাশ মক্কায় গেলেন। কিন্তু খাররাশের ﷺ সাথে মক্কাবাসীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রূঢ়। তারা তার উটকে হত্যা করে এবং তাকেও মেরে আধমরা করে ফেলে।

একজন দূতের সাথে এরকম হীন আচরণই বলে দেয় মক্কাবাসীরা তখন চূড়ান্তভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে ছিল। তাদের ছিল প্রচণ্ড অহংকার কিন্তু এখন তারা অপমানিত। তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধীরে ধীরে খর্ব হচ্ছিল। তারা বিষয়টা মানতে পারছিল না বিধায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করতে থাকে।

## মুসলিমদের দ্বিতীয় দূত: উসমান ইবন আফফান ﷺ

রাসূল ﷺ আরেকজনকে দূত হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, উমারকে ﷺ ডাক দিলেন। উমার ﷺ বললেন,

*'ইয়া রাসূলুল্লাহ, মক্কায় আমার পরিবারের এমন কেউ নেই যে আমাকে নিরাপত্তা দেবে। আর আমি কুরাইশদের কী পরিমাণ ঘৃণা করি সেটাও তাদের ভালোই জানা আছে। তারপরও আপনি যদি যেতে বলেন, আমি যাবো।'*

রাসূল ﷺ কিছু বললেন না। উমার তখন আরেকটি নাম প্রস্তাব করলেন-- উসমান ﷺ। কারণ উসমানের ﷺ গোত্র তখনো মক্কায় ছিল।

উসমান ﷺ ছিলেন বনু উমাইয়্যা গোত্রের। উমাইয়্যা গোত্র কুরাইশদের অন্যতম প্রধান শাখা বনু আবদে মানাফের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা শহরের নেতৃত্ব ছিল দুই গোত্রের হাতে। বনু মাখযুম আর বনু আবদে মানাফ। বনু মাখযুমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল আবু জাহল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। এই গোত্রে আরও ছিল ওয়ালিদ ইবন মুগিরা এবং তার ছেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ। অন্যদিকে বনু আবদে মানাফের প্রধান দুই শাখা গোত্র হচ্ছে বনু হাশিম আর বনু উমাইয়্যা। এই শাখা গোত্র দুটির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূল ﷺ ছিলেন বনু হাশিমের আর উসমান ﷺ ছিলেন বনু উমাইয়্যার। বনু উমাইয়্যার শীর্ষনেতা ছিল আবু সুফিয়ান। রাসূল ﷺ যখন উসমানকে ﷺ কুরাইশদের কাছে পাঠালেন, সাথে সাথেই তিনি বনু উমাইয়্যার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার কাছে থেকে সুরক্ষার আশ্বাস লাভ করলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন উসমানের ﷺ চাচাতো ভাই আব্বান ইবন সায়িদ ইবন আল আস। তিনি উসমানকে ﷺ নিজের উটের পিঠে করে কুরাইশদের সামনে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, এই লোকটিকে আমি আমার তরফ থেকে নিরাপত্তা দান করলাম।

**উসমানের ﷺ সফরের উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুইটি।**

প্রথমত, এটা ঘোষণা করা যে, মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মক্কায় আসেনি।

আর দ্বিতীয়ত, মু'মিন নরনারী যারা তখনো মক্কায় রয়ে গেছেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আশ্বাসবাণী পৌঁছে দেওয়া যে ইসলাম অবশ্যই বিজয়ী হবে।

উসমান মক্কার ভেতর পুরো সময়টিকে কাজে লাগালেন। কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনায় বসলেন, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন মুসলিমদের অভিপ্রায়। কিন্তু কুরাইশা গোঁ ধরেই থাকলো। তাদের এক কথা -- তোমাদের আমরা মক্কায় ঢুকতে দেবো না, বলেছি তো দেবো না। উসমান ؓ মক্কার জনগণের কাছে গেলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

*'আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠিয়েছেন যেন তোমাদেরকে আল্লাহ আর ইসলামের পথে ডাকি, যেন তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করবেন এবং তার রাসূলকে সম্মানিত করবেন। তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও যেন অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। যদি তারা আমাদের পরাজিত করতে পারে, তাহলে তো তোমাদের মনের আশা পূর্ণ হয়েই যাবে। আর যদি আমরা তাদের পরাজিত করি তাহলে তোমরা আমাদের অনুসরণও করতে পারো, আবার চাইলে আমাদের সাথে যুদ্ধও করতে পারো। কিন্তু এখন আমার মনে হয় তোমাদের বিশ্রাম দরকার। আমাদের সাথে যুদ্ধে না যাওয়াই তোমাদের জন্য ভালো হবে। তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছ। তোমাদের সেরা লোকগুলোও সব মারা গেছে। তোমরা জেনে রাখো, আমরা এখানে এবার যুদ্ধের জন্যে আসিনি, এসেছি উমরা করতে। কুরবানির পশু চিহ্নিত করে রেখেছি, পশুগুলো কুরবানী করে চলে যাবো।'*

আবান ইবন সায়িদ উসমানকে ؓ বললেন, 'তুমি চাইলে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।' মুসলিমরা তখন বলতে লাগলো উসমান ؓ কতই না সৌভাগ্যবান। তিনি কাবাঘর তাওয়াফের সুযোগ পেয়েছেন! কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, 'তার প্রতি আমার চাওয়া, সে যদি যুগ যুগ ধরেও সেখানে থাকে, আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে কাবাঘর তাওয়াফ করবে না।'

উসমান ؓ রাসূলুল্লাহর ﷺ চাওয়া অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। এক পা বাড়ালে যেই কাবাঘরকে ছোঁয়া যাবে, তা না ছুঁয়ে আবান ইবন সায়িদকে তিনি বলে দিলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি কাবাঘর তাওয়াফ করবো না।'

এই একটা কথা অনেক কিছুই বলে দেয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ভক্তি আর ভালোবাসা কত গভীর, তা বুঝতে এই একটি কথাই যথেষ্ট।

## কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত বুদাইল ইবন ওয়ারকা

কুরাইশরাও দূত পাঠাতে লাগলো। প্রথমে তারা পাঠালো বুদাইল ইবন ওয়ারকাকে। সে ছিল বনু খুযাআ গোত্রের। সে সাথে করে নিজ গোত্রের আরও কিছু লোক নিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খুযাআ গোত্র হচ্ছে রাসূল ﷺ এবং

মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ত। এমন বর্ণনা আছে যে, খুযাআ গোত্র মক্কার যাবতীয় তথ্য নবীজিকে ﷺ পাচার করতো।

নবীজির ﷺ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক। কুরাইশরা তার শত্রু হলেও বনু খুযাআর সাথে তার সুসম্পর্ককে তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছেন। যাই হোক, বুদাইল রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'কুরাইশরা এমন উট নিয়ে এসেছে যে দুধ দেয়।' অর্থাৎ, কুরাইশরা দীর্ঘদিন অবস্থানের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। পরিস্থিতি যদি থাকার দাবি করে, তাহলে তারা সেটাই করবে। তারা যুদ্ধের জন্যে তৈরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যুদ্ধ করার তার উদ্দেশ্য নয়, বায়তুল্লাহর যিয়ারত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বুদাইল রাসূলুল্লাহর ﷺ এই বার্তা নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাকে পাত্তাই দিল না, তারা তাকে উপেক্ষা করলো। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনলো, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো। সে তাদের বললো, 'কুরাইশরা, তোমরা মুহাম্মাদের সাথে বাড়াবাড়ি করছো। যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি আসেননি, তিনি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে এসেছেন।'[73] বলা বাহুল্য, এসব কথা কুরাইশদের মোটেও পছন্দ হলো না।

## মিখরাজ ইবন হাফস

বুদাইলের পর কুরাইশরা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। তাকে দেখামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'সে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক!' মিখরাজের স্বভাব সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই জানতেন। দেখা গেল মিখরাজ কুরাইশদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে মুসলিমদের তাঁবুর চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে কাউকে একা পেলে তাকে বন্দী করে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো, মিখরাজের পুরো বাহিনীই মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ল। শুধুমাত্র সে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাই তিনি বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

## হুলাইস ইবন আলকামাহ

এরপর পাঠানো হলো হাবশীদের প্রধান হুলাইস ইবন আলকামাহকে। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'এই লোকটা আন্তরিক। কুরবানির পশুগুলো তার দিকে ঠেলে দাও যেন সে সেগুলো দেখতে পায়।'

মুসলিমদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল এটা প্রমাণ করা যে, তারা শুধু উমরা করতে এসেছেন। একদল লোক কাবাঘরে উমরা করতে এসেছে, তারা কুরবানির পশু নিয়ে

---

[73] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭।

হাজির হয়েছে -- এই দৃশ্য দেখেই তার মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। সে মক্কায় চলে গেল, এমনকি সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করারও প্রয়োজন বোধ করলো না। সে সোজা কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। শোনো, এই লোকগুলোকে মক্কা থেকে দূরে ঠেলে রাখা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না।'

হুলাইস ছিল মুশরিক, একজন কাফের। কিন্তু সে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মতো নীতিহীন ছিল না। মুসলিমদেরকে কা'বাঘরে আসতে বাধা দেওয়া যে অন্যায় হচ্ছে, সেটা সে ঠিকই বুঝতে পারছিল। বললো, 'তোমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের কা'বায় প্রবেশ করতে দেবে না আর লাখাম, জুদাম, হিমইয়ার আর কিন্দার লোকরা কা'বা পরিদর্শন করতে পারবে -- আল্লাহ তাআলা এটা হতে দেবেন না।' এই চারটি গোত্র হলো কাহতানি শাখা, আরবদের ইয়েমেনি শাখা থেকে উদ্ভূত। আর এদের অবস্থান কা'বা থেকে অনেক দূরে -- লাখাম, জুদাম এই দুটোর অবস্থান আরবের একদম উত্তরে, আর হিমইয়ার এবং কিনদার অবস্থান একদম দক্ষিণে, ইয়েমেন সীমান্তের কাছাকাছি। দূরদুরান্তের গোত্ররা কা'বায় তাওয়াফ করছে অথচ বনু মুত্তালিবের কিছু সন্তান মক্কায় বড় হয়েও কা'বায় প্রবেশ করার অধিকার পাচ্ছে না -- কুরাইশদের এই দ্বিমুখী আচরণের সমালোচনা করায় কুরাইশরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে বললো, 'চুপ থাক, কাণ্ডজ্ঞানহীন বেদুইন কোথাকার!'

হুলাইস খুব রেগে গেল। সে বললো, 'দেখো, তোমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করিনি যে, কেউ কা'বাঘর পরিদর্শনে আসবে আর তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে। শপথ সেই সত্তার যার হাতে হুলাইসের প্রাণ, হয় তোমরা মুহাম্মাদকে কাবাঘরে প্রবেশ করতে দিবে, না হলে আমি হাবশিদের নিয়ে আলাদা হয়ে যাবো!' কুরাইশরা তখন অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে বললো, 'আচ্ছা, তুমি শান্ত হও, দেখি কী করা যায়।'

## উরওয়া ইবন মাসউদ

কুরাইশদের সব প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হতে লাগলো। তারা যাকেই পাঠায়, প্রত্যেকেই মুসলিমদের উমরা করতে দেওয়ার পক্ষে মত দিতে থাকে। তাদের মনমতো কাউকে তারা পাচ্ছিল না। বিষয়টি খেয়াল করলেন উরওয়া ইবন মাসউদ। উরওয়া ছিলেন তাইফের বিশিষ্ট কূটনীতিক। সে বুঝতে পেরেছিল জনমত মুসলিমদের পক্ষে, কুরাইশদের একগুঁয়েমিতে কাজ হবে না। অবস্থার হাল ধরতে সে নিজেই এগিয়ে গেল, কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলল,

- তোমরা কি আমার পিতা নও?

- হ্যাঁ।

- আমি কি তোমাদের ছেলে নই? উরওয়া ছিলেন তাইফের কিন্তু তার মা ছিলেন কুরাইশি।

- হ্যাঁ, তুমি আমাদের ছেলে।

- বলো, আমার বিরুদ্ধে কি তোমাদের কোনো অভিযোগ আছে?

- না, নেই।

- উকাযের ঘটনা মনে আছে? আমি কি সে সময় তোমাদের পক্ষ নিইনি?

- হ্যাঁ, নিয়েছো।

এসব কথাবার্তা মনে করিয়ে দিয়ে সে কুরাইশদের কাছে আস্থা অর্জন করে নিলো। কুরাইশরাও দেখলো তাইফের হলেও উরওয়া তো তাদের পক্ষেরই লোক, তার উপর ভরসা করা যায়। এবার তারা তাকেই দূত হিসেবে নিযুক্ত করলো। উরওয়া ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেল। তার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া। বর্তমানের পরিভাষায় যাকে বলে -- *Psychological Warfare* বা *মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ*। রাসূলুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলল,

*'মুহাম্মাদ! ধরে নিলাম তুমি তোমার স্বজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করলে, আচ্ছা, তুমি কি কখনো এমন আরবের কথা শুনেছো যে নিজ জাতিকে ধ্বংস করেছে? আর যদি কুরাইশদের হাতে তুমি পরাজিত হও, তাহলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যে কাপুরুষ লোকগুলোকে জড়ো করেছো, এরা একটাও তোমার পাশে থাকবে না, সবকটা তোমাকে ছেড়ে পালাবে!'*

উরওয়া তার বক্তব্যকে এমনভাবে সাজালো যেন রাসূলুল্লাহই ﷺ হচ্ছেন অপরাধী আর কুরাইশরা সাধু! যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন যুদ্ধ করতে আর কুরাইশরা শান্তি চায়! অথচ ঘটনা ছিল পুরোই উল্টো -- রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন শান্তিপূর্ণভাবে উমরা করতে আর কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিচ্ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা দেখি, পশ্চিমা শক্তি এভাবেই তাদের বক্তব্যকে সাজায়। তাদের ভাবটা এমন যে মুসলিমরা হলো সন্ত্রাসী, তারাই শান্তি বিনষ্ট করছে আর পশ্চিমারা হলো শান্তিকামী। অথচ বাস্তবতা হলো, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে পশ্চিমারাই মুসলিম ভূমিগুলোতে দখলদারিত্ব চালাচ্ছে এবং লুটপাট-সন্ত্রাস-ধ্বংসযজ্ঞ করে চলেছে। আর আমরা অনেক মুসলিমরাও তাদের এই 'পিসফুল' ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে বসে আছি।

যাই হোক, উরওয়া ইবন মাসউদ এর কথা থেকে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট। সে ইসলামকে বিচার করছিল জাহিলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আরবদের সমাজ ছিল গোত্রভিত্তিক, তাদের কাছে গোত্রপরিচয়টাই ছিল সব! অন্যায় করলেও তারা নিজ গোত্রের পক্ষ নেবে, নিজ গোত্রের জন্য তারা জীবন দিতেও রাজি। তাই একজন মানুষ নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে -- এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। আজকের হিসেবে অনেকটা নিজ দেশের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করছিলেন। তিনি কুরাইশ হয়েও কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। দ্বীন বা ধর্মের অবস্থান যে গোত্র বা

জাতিপরিচয়েরও ওপরে -- জাহিল আরবরা সেটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই উরওয়া বলতে চাইছিল, কেমন করে তুমি নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো? এমন নিকৃষ্ট একটা কাজ তুমি কীভাবে করতে পারো?

উরওয়ার জাহিলি দৃষ্টিভঙ্গি আরও একটি ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হলো মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি। সাহাবিরা ছিলেন বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত। সেখানে যেমন সম্মানিত কুরাইশ বংশের লোক ছিল, তেমনি ছিল আওস, খাযরাজ গোত্র, ছিল আসলাম এবং গিফারের মতো নিচু শ্রেণির গোত্র। এই গোত্রগুলোকে উরওয়া তৃতীয় শ্রেণীর গোত্র বলে মনে করতো। তার ধারণা ছিল মানুষ শুধু নিজ গোত্রের জন্যই যুদ্ধ করে। কিন্তু একজন মুসলিম যুদ্ধ করে তার দ্বীনের জন্য, আদর্শের জন্য, গোত্র পরিচয় এখানে মুখ্য নয়। বরং উঁচু-নিচু সকল গোত্রের মানুষকে ইসলাম এক সমতলে আনতে পেরেছে। কারণ এই বন্ধন হলো ঈমানের বন্ধন, জাতীয় বা গোত্রীয় বন্ধন থেকে তা অনেক বেশি শক্তিশালী। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা কত নিখাদ আর গভীর, উরওয়া সেটা তখনো টের পায়নি। তাই সে খোঁচা মেরে বলতে চাইছিল, বিপদে পড়লে তোমার সঙ্গীসাথীরা তোমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে!

বলা বাহুল্য, এই কথাটি ছিল খুবই অপমানজনক। আবু বকর ﵁ পাশেই ছিলেন, এই কথা শুনে তিনি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। উরওয়াকে বললেন, ‘যা ভাগ এখান থেকে! তুই গিয়ে তোদের দেবী আল-লাতের লজ্জাস্থান চোষ! আমরা আল্লাহর রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো? এই আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করবো? হ্যাঁ?’[74]

লজ্জাস্থান চোষার এই কথাটি ছিল আরবের প্রচলিত একটি গালি। আবু বকর ﵁ এমনিতে শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন, কিন্তু উরওয়ার এই কথায় তিনি শান্ত থাকতে পারলেন না। একেবারে গালি দিয়ে বসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন, কিছুই বললেন না। উরওয়া গালি হজম করে নিয়ে বললো, ‘অতীতে তুমি আমাকে একবার উপকার করেছিল আবু বকর, সেটা আমার শোধ করা হয়নি। তা না হলে আজকে তোমার এই কথার উচিত জবাব দিয়ে দিতাম।’

উরওয়াকে একবার একশো উট রক্তপণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু রক্তপণ আদায়ের সামর্থ্য তার ছিল না। আবু বকর ﵁ তখন উরওয়াকে দশটি উট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এটা জাহিলিয়াতের যুগের কথা। এই কারণে উরওয়া আবু বকরকে কিছু বললো না।

উরওয়া ইবন মাসউদ ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। কথার জোরে তিনি প্রতিপক্ষের মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। নিজ গোত্রের সাথে তুমি কীভাবে যুদ্ধ

---

[74] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২।

করছো -- এই কথা বলে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছিলেন। আর সাহাবিদের গোত্রভিন্নতার দিকে আঙুল তুলে, তাদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ আর সাহাবিদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছিলেন। পেশাদার রাজনীতিকের মতো তার কথায় আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু এসবের কিছুই মুসলিমদের টলাতে পারলো না, উল্টো উরওয়াই আবু বকরের আচরণ দেখে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল।

এরপরে ঘটলো আরও একটি ঘটনা। সমঝোতার আলোচনা চলাকালীন সময়ে উরওয়া আল্লাহর রাসূলের ﷺ দাড়ি স্পর্শ করছিলেন। এটা সে যুগের জন্য খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। দেহরক্ষী হিসেবে রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথার কাছে ছিলেন আল মুগীরা ইবন শু'বা ﵁। ব্যাপারটা তার মোটেও পছন্দ হলো না। উরওয়াকে দাড়ি ধরতে দেখে আল-মুগীরা তার সাথে থাকা তলোয়ারের বাট দিয়ে উরওয়ার হাতে আঘাত করে বললেন, 'তোমার ঐ হাত আল্লাহর রাসূলের দাড়ি থেকে সরিয়ে রেখো। বেশি দেরি করলে ঐ হাত আর তোমার কাছে ফেরত যাবে না।'

উরওয়া হতভম্ব হয়ে গেল, কেউ তার সাথে এমন রূঢ় আচরণ করতে পারে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কে এভাবে তার সাথে এভাবে কথা বললো সেটাও বোঝার উপায় নেই কারণ আল-মুগিরা ইবন শু'বা ﵁ ছিলেন আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা। উরওয়া রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই লোক? তোমার বাহিনীতে এত রুক্ষ লোক আর একটিও দেখিনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন, 'এ হচ্ছে তোমার ভাতিজা আল-মুগিরা ইবন শু'বা।'

উরওয়া যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তার ভাতিজা মুগীরাকে ﵁ উদ্দেশ্য করে বললো, 'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তোর অপকর্মের দাগ তো মাত্র সেদিন পরিষ্কার করলাম!'

উরওয়া তার ভাতিজা মুগীরাকে অতীতের একটা ঘটনা নিয়ে খোঁচা দিলেন। একবার মুগীরা তেরো জন মুশরিকের সাথে সফরে বের হন এবং পথিমধ্যে তাদের লুট করে তাদের হত্যা করেন। সাকিফের গোত্রগুলোর মধ্যে তখন সেটা নিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ লাগার মতো অবস্থা তৈরি হয়। উরওয়া নিজের ভাতিজাকে বাঁচানোর জন্য তার হয়ে রক্তমূল্য পরিশোধ করে দেন। ইতিমধ্যে মুগীরা মদীনায় চলে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার মুসলিম হওয়া আমি মেনে নিলাম, কিন্তু যে ধনসম্পদ নিয়ে এসেছো সেটা আমি গ্রহণ করবো না।' যেহেতু মুগীরা অন্যায়ভাবে সফরের মধ্যে তাদের সম্পদ হস্তগত করেছিলেন, তাই সেই সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করেননি। একই সাথে তিনি মুশরিকদের কাছে এ বিষয় নিয়ে কোনো ক্ষমাও চাননি।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, ইসলাম মানুষের চরিত্রকে কী অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়!

জাহিলিয়াতের জীবনে মুগীরা ইবন শু'বা ছিলেন মদখোর, লুটতরাজ আর খুনখারাপি করা একজন মানুষ। ইসলামে এসে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দেহরক্ষক, রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসায় নিবেদিত প্রাণ! আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা যে বাকি সবকিছুর ঊর্ধ্বে তার দৃষ্টান্ত হলেন আল-মুগীরা। মুগীরা ইবন শু'বাকে তার চাচা উরওয়া একটা বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই জন্যে মুগীরা ইবন শু'বার رضي الله عنه উচিত ছিল উরওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কিন্তু না, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি উরওয়াকে এতটুকু ছাড় দেননি।

উরওয়া ফিরে এলেন। উরওয়া গিয়েছিলেন মুসলিমদের মনোবলকে নষ্ট করে দিতে, অথচ নিজেই হার মেনে গেলেন। ইসলাম আর মুসলিমদের ব্যাপারে এক নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে এলেন। কুরাইশদের বললেন,

*"হে কুরাইশ, আমি আমার জীবনে পারস্যের বাদশাহ কিসরাকে দেখেছি। রোমের সম্রাট কায়সারকে দেখেছি, দেখেছি রাজা নাজাশীকে। আল্লাহর কসম করে বলছি, মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে যেভাবে করে সম্মান করে -- এমনটা আমি আর কোথাও দেখিনি। তিনি শুধু একটা কাজের কথা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কাজ করে ফেলে। তিনি যখন থু থু ফেলেন, তাঁর অনুসারীরা হাত বাড়িয়ে সেই থুথু তালুতে নেয়, বরকতের আশায় শরীরে মাখে। তিনি যখন ওযু করেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়, আর প্রত্যেকে সেই পানি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যখন তিনি কোনো কথা বলেন, তাঁর অনুসারীরা চুপ করে তাঁর কথা শোনে, সম্মানের আতিশয্যে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায় পর্যন্ত না।*

*... তোমরা নিশ্চিত থাকো, তোমরা যদি তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চাও, এই লোকগুলো কখনো তাদের নেতাকে ছেড়ে যাবে না। নিজেদের নেতাকে তারা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করে যাবে। তারা কোনোকিছুর তোয়াক্কা করবে না ... এমন একজন মানুষ যখন তোমাদের প্রস্তাব দিয়েছে, আমার পরামর্শ হচ্ছে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা। তোমরা তাদেরকে হারাতে পারবে না। আমি তোমাদের জন্য কোনো আশা দেখছি না। তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই তার প্রস্তাব গ্রহণ করো।"*

উরওয়ার এই চমৎকার কথাগুলো কুরাইশদের মন ভরাতে পারলো না। যদিও তারা ঠিকই জানতো উরওয়া যা বলছেন সত্যিই বলছেন।

উরওয়া ইসলামের ব্যাপারে শুনেছেন, কিন্তু যখন নিজের চোখের সামনে ইসলামকে দেখলেন, তার ধারণা পাল্টে গেল। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ উরওয়ার জন্য এটা ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মুসলিমদের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। এই ঘটনা ছিল উরওয়ার প্রতি ইসলামের দাওয়াহ। এই দাওয়াহ খালি কথার দাওয়াহ ছিল না, এই দাওয়াহ ছিল কাজের মাধ্যমে দাওয়াহ। নিঃসন্দেহে কাজের মাধ্যমে দাওয়াহ অন্তরে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

## সংঘর্ষের ঘটনা

"তিনি মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৪)

কুরাইশদের অনেকেই খুব করে চাচ্ছিল একটা যুদ্ধ বেঁধে যাক। সত্যি বলতে মুসলিমদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ বাঁধার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন মক্কায় যেন কোনো যুদ্ধ না বাঁধে এবং তাই হয়েছে। কুরাইশদের ৮০ জনের একটি অস্ত্রশজ্জিত দল মুসলিমদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা ধরা পড়ে যায় এবং তাদের বন্দী করে রাখা হয়। আরও একটি ঘটনা ঘটে, সালামা ইবন আল-আকওয়াও ﷺ ঘটনাক্রমে চার মুশরিককে বন্দী করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা উপরের আয়াত নাযিল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত বন্দীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনাকে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর রাসূল এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, সন্ধির পথে পা বাড়ানো ছাড়া কুরাইশদের আর কোনো উপায়ই থাকলো না।

## বাইয়াতুর রিদওয়ান

এই ঘটনার সময় উসমান ﷺ ছিলেন মক্কায়। হঠাৎ গুজব উঠলো, উসমানকে ﷺ হত্যা করা হয়েছে। এই কথা শুনামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা আলাদা আলাদা তাঁবুতে অবস্থান করছিল। উম্মে আম্মারা ﷺ নামের বনু নাজ্জারের এক মহিলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, 'আমি নবীজিকে ﷺ আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমি ভাবলাম রাসূলুল্লাহর ﷺ বুঝি কিছুর দরকার হয়েছে।' রাসূল ﷺ এসে বসলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।' এরপর সাহাবিরা একে একে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত করলেন।

কীসের ওপর এই বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে একাধিক বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। অন্য বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার বাইয়াত। তৃতীয় বর্ণনা বলছে এই বাইয়াত ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্তরে যা আছে তার প্রতি বাইয়াত। এই বর্ণনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, সাহাবিরা জানতেন না নবীজি কী চান। কিন্তু তারা সেই না-জানা জিনিসের উপরই বাইয়াত দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই বাইয়াতের অর্থ দাঁড়ায় -- আমরা এই শপথ করছি যে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের যা করতে বলবেন আমরা তা-ই করবো । এই বাইয়াতকে বলা হয় বাইয়াতুর রিদওয়ান। রিদওয়ান মানে সন্তুষ্টি। এই বাইয়াতের পর আল্লাহ মুসলিমদের উপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

এই বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনে। বনু নাজ্জার ছিল আল খাযরাজের অন্তর্ভুক্ত। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের দিকের আত্মীয়। তারা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কাছের। বলা যেতে পারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার সময় প্রথমে মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি ছিলেন বনু আমর ইবন আউফ গোত্রের সাথে। মদীনায় প্রবেশ করার পর তিনি থেকেছেন বনু নাজ্জারদের বাড়িতে। বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে রেখেছিল। তার সুরক্ষার জন্যে তারা সেদিন তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ চারিদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই বাইয়াতে রিদওয়ান নেয়ার জন্যেও তিনি বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনেই গিয়েছিলেন। উম্মে আম্মারার رضي الله عنها বর্ণনায়,

*'আমার স্বামীর বাইয়াত দেওয়ার সময় হাতে তলোয়ার ধরা ছিল, কারণ এটি হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। এই দৃশ্য দেখে আমি আমার কোমরবন্ধনীর সাথে একটি ছুরি বেঁধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন যদি আমার সামনে কোনো লোক যুদ্ধ করতে আসতো তাহলে আমি তার শরীরে ছুরি ঢুকিয়ে দিতাম, ছুরির বাট দিয়ে তাকে আঘাত করতাম।'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ মহিলা সাহাবিরাও এমনই সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যে কাজটি করতে আজকের অনেক পুরুষও আমতা আমতা করবে।

সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন আবু সিনান আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আল-আসদী। সালামাহ ইবন আল-আকওয়া থেকে আল্লাহর রাসূল তিনবার বাইয়াত নেন। শুরুতে, মাঝে এবং শেষে। সেদিন বাইয়াত নেন সব মিলিয়ে চৌদ্দশো সাহাবি।

বাইয়াতে রিদওয়ান প্রসঙ্গে শিয়াদের একটি দাবি নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। শিয়ারা উসমানকে رضي الله عنه পছন্দ করে না। উসমানের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তাই তারা বলে, উসমান رضي الله عنه বদর যুদ্ধে অংশ নেননি, উসমান বাইয়াতে রিদওয়ানের সময়ও ছিলেন না ইত্যাদি। বদরের যুদ্ধে উসমানের رضي الله عنه অংশ না নেওয়ার আগেই বলা হয়েছে, সে মুহূর্তে উসমানের رضي الله عنه স্ত্রী, রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেন এবং স্ত্রীর পাশে থাকার নির্দেশ দেন। আর উসমানের رضي الله عنه বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ না নেয়ার কারণ কী? এই প্রশ্ন একমাত্র বোকারাই করতে পারে। কারণ বাইয়াতে রিদওয়ানের পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছেন উসমান رضي الله عنه। তাঁর মৃত্যুর গুজব শুনেই মুসলিমদের থেকে বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল। আর সত্যি বলতে, তিনি বাইয়াহ দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, 'এইটা হচ্ছে উসমানের বাইয়াত।'[75] উসমান رضي الله عنه নিজের হাতে বাইয়াত দেননি কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ হাত তার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

[75] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ১১১।

# বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের মর্যাদা

১)

> "যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১০)

যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের জন্য এটা একটা বিরাট সম্মান। তারা বাইয়াত করেছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন এই বাইয়াত ছিল আল্লাহর কাছেই। ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবিদের মাঝে একজন প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ যে আনুগত্যের শপথ তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে করেছিলেন, সেটা ছিল আসলে স্বয়ং আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ।'

২)

> "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

আল্লাহ সেই চৌদ্দশো সাহাবির উপরে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দিলেন। এর থেকে বিশাল ঘটনা আর কী হতে পারে! দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহ তাআলা এই মানুষগুলোকে সবচাইতে বড় সুখবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই লোকগুলোর অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন। অর্থাৎ এই সাহাবিদের আন্তরিকতা আর ঈমান নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। একই সাথে আল্লাহ তাআলা তাদের আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এটি হলো খাইবারের বিজয়ের সুসংবাদ, এই আলোচনা পরবর্তীতে আসবে ইনশা আল্লাহ।

৩) বাইয়াতে রিদওয়ানের সাহাবিরা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসাকে رضي الله عنها বলেছেন, 'ইনশা আল্লাহ, গাছের নিচে যারা বাইয়াত করেছিল, তারা কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।' ইমাম নববীর মতে, এখানে ইনশা আল্লাহ বলার অর্থ আল্লাহর বরকতের আশা করা, সন্দেহ পোষণ করা নয়।

৪) অন্য একটি হাদীসে আছে যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র লাল উটের মালিককে ছাড়া। এই লাল

উটের মালিক হচ্ছে জাদ ইবন কায়েস। বাইয়াত দেওয়ার ভয়ে সে নিজেকে রাসূল ﷺ থেকে আড়াল করে রেখেছিল। মর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করা হলে প্রথমেই আসবে সেই দশজন সাহাবি যাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছেন সেইসব সাহাবি যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আর তারপর হচ্ছেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা। তারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

৫) বাইয়াতে রিদওয়ানের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা তাদের শুধুমাত্র একজন সাথীর জন্যেও যুদ্ধ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে একতাবদ্ধ। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত। শরীরের একটি অংশ ব্যথা পেলে সমস্ত শরীরেই সেই ব্যথা সংক্রমিত হয়। সেই জন্যেই পুরো ১৪০০ লোকের মুসলিম বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র একজন মানুষের জন্যে।

পরবর্তীতে জানা যায় যে, উসমান ﷺ জীবিত আছেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল গুজবমাত্র। কিন্তু তারপরও এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা হয়ে আছে। এই বাইয়াতের ঘটনা অনন্যসাধারণ এই কারণে যে, এর মাধ্যমে ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যে সাহাবিরা মৃত্যুর শপথ নিয়েছিলেন। তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। বাইয়াতের ঘটনা মক্কার মুশরিকদের অন্তরে প্রবল ভীতির সৃষ্টি করেছিল। তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাইয়াত দেওয়া শেষ হলে রাসূল ﷺ সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা হচ্ছো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।'[76]

## সমঝোতার পথ

কুরাইশের লোকেরা শেষ পর্যন্ত চুক্তি করতে রাজি হলো। এদিকে উসমানও ﷺ ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। কুরাইশরা মুসলিমদের কাছে মুখপাত্র হিসেবে পাঠালো সুহাইল ইবন আমরকে ﷺ। সুহাইল তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন একজন কুশলী কূটনীতিক। বাক্যবাগীশ, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। সুহাইলের দায়িত্ব ছিল চুক্তির শর্তগুলো নিয়ে মুসলিমদের সাথে বোঝাপড়া করা। সুহাইলকে দেখামাত্র নবীজি ﷺ সাহাবিদের বলে উঠলেন, 'তোমাদের কাজ এবার সহজ হয়ে যাবে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সুহাইল ইবন আমর বেশ খানিকক্ষণ ধরে সন্ধির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করলেন। তবে মুসলিমরা যাতে সে বছর মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে -- সে ব্যাপারে কাফিররা ছিল বদ্ধপরিকর। এই একটা জায়গাতে তারা কিছুতেই ছাড় দেবে না। তারা এটা মানতেই পারছিল না যে, লোকে বলাবলি করবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ওপর জোর খাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পেরেছে। এটা ছিল তাদের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন। নবীজি ﷺ এই বিষয়ে তাদের সাথে আপস করার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু

---

[76] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ১৯৮।

কিছুতেই কিছু লাভ হলো না।

নবীজি ﷺ চেষ্টা করেছেন যতটুকু সম্ভব ছাড় দিয়ে হলেও একটা মীমাংসা হোক। তিনি আগেই বলেছিলেন, 'তারা যদি আমাকে এমন কোনো চুক্তিতে আহ্বান করে যাতে ইসলামের পবিত্রতা লঙ্ঘিত না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে তাদের প্রস্তাব কবুল করবো।'

শান্তিচুক্তির শর্তাবলি এতক্ষণ পর্যন্ত মুখে মুখে আলোচনা করা হয়েছে। বাকি ছিল খালি লিখিত করা। উমার ইবন খাত্তাব চুক্তির শর্তগুলো শুনে খুবই আহত হলেন। নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললেন,

- আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

- হ্যাঁ।

- আমরা কি মুসলিম নই?

- হ্যাঁ।

- ওরা কি কুফফার নয়?

- হ্যাঁ।

- তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনকে কেন ছোট করবো?

উমার ইবন খাত্তাবের চোখে মনে হচ্ছিল এই ধরনের একটি চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তার বক্তব্য ছিল অনেকটা এমন -- আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল, আপনি হক্বের ওপরে আছেন। আমরা মুসলিমরা সত্যের অনুসারী। আর তারা হলো মুশরিক, তারা আছে বাতিলের ওপরে। তাদের সাথে কেন আমাদের এমন চুক্তি করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের অবস্থান নিচু হয়ে যাবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'শোনো, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হবো না, আর তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করবেন না।'

উমার তার কথা বোঝাতে না পেরে মরিয়া হয়ে আবু বকরের رضي الله عنه কাছে গেলেন।

- আবু বকর, আমাকে বলুন, তিনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ নন?

- হ্যাঁ।

- আমরা কি মুসলিম নই?

- হ্যাঁ।

- ওরা কি কুফফার নয়?

- হ্যাঁ।

- তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনকে ছোট করছি?

আবু বকর ﷺ শক্তভাবে বললেন, 'তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর অনুসরণ করো। আল্লাহ কক্ষণো তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।'

এরপর আর উমার কিছু বললেন না। পরবর্তীতে এই আচরণের জন্যই উমার ইবন খাত্তাব অনেক অনুশোচনা করেছিলেন। যদিও ভালো নিয়তেই তর্ক করেছিলেন। আসলে উমার ইবন খাত্তাব হক্বের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন, তাকে বলা হতো আল ফারুক। তিনি ছিলেন একজন সতর্ক ব্যক্তি। হক্ব-বাতিলের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতেন, নফসের ধোঁকায় পড়তেন না, কেউ তাকে ধোঁকা দিতে পারতো না, এমনকি শয়তান পর্যন্ত তাকে ভয় পেতো! তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। এখানে তিনি চুক্তির শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কারণ তিনি চাচ্ছিলেন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হোক। চুক্তির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে তার কাছে অপমানজনক মনে হচ্ছিল, তাই কাফিরদের সাথে বোঝাপড়া করে চুক্তি করাটা তিনি মানতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন -- ব্যাপারটি নবুওয়াতের মাধ্যমে ফায়সালা করা হয়েছে, নবীজি নিজে থেকে কিছুই করেননি -- তখন উমার চুপ হয়ে গেলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পরবর্তীতে এই ঘটনার কথা স্মরণ করে উমার ইবন খাত্তাব বলতেন, 'সেই দিনে আমি যা বলেছি আর যা ভুল করেছি, সেই ভয়ে আমি নিয়মিত (নফল) সালাহ, সাওম, দান-সাদাকাহ আর দাস আযাদ করতে থাকি।' কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ভালো কাজ খারাপ কাজকে মুছে দেয়।' কাজেই আমাদের উচিত কোনো ভুল করলে, বেশি বেশি ভালো কাজ করা, যেমনটা উমার ﷺ করেছিলেন।

## সন্ধির শর্তাবলি

সন্ধির শর্তগুলো মৌখিকভাবে ঠিকঠাক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে ﷺ ডাকলেন শর্তগুলো লেখার জন্য। তাকে বললেন, 'লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম...'

বাগড়া বাঁধালেন সুহাইল। তিনি বলে বসলেন, 'আর-রাহমান? আর-রাহমানকে তো আমরা চিনি না। আপনি লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা (অর্থাৎ, আপনার নামে হে আল্লাহ)

সাহাবিরা প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা -- এটাই লেখো।'

সাহাবিরা চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, 'এরপর লেখো, নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপরে আল্লাহর রাসূল চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন...'

আবারও আপত্তি জানালেন সুহাইল। বললেন, 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে জানতাম, তাহলে তো আপনার সাথে যুদ্ধ না করে আপনার অনুসরণ করতাম। আপনি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখতে বলুন।'

সুহাইলের এই কথা সাহাবিদের মোটেও পছন্দ হলো না। কিন্তু এবারও তাদের থামিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ আলীকে বললেন, 'মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখে দাও আর রাসূলুল্লাহ শব্দটা মুছে দাও।' আলী ইতস্তত করছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'লেখাটা কোথায় আমাকে বলো,' তিনি নিজ হাতে সেটা মুছে দিলেন। এরপর সন্ধির শর্তগুলো লেখা হলো।

সন্ধির মূল ধারাগুলো নিম্নরূপ।

- উভয় পক্ষ দশ বছরের শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে। এই দশ বছরের মধ্যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

- যদি কুরাইশদের কেউ তার গোত্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদের ﷺ দলে যোগ দেয়, তাহলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

- যদি মুহাম্মাদের ﷺ দলের কেউ কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

- উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি ভালো নিয়ত রাখবে।

- কোনো প্রকার চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

- যার ইচ্ছা সে মুহাম্মাদের সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।

- মুহাম্মাদ ﷺ এবং সাহাবিরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছরে কুরাইশরা মক্কা খালি করে চলে যাবে, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন এবং তারা তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। এই সময়টায় ততটুকু অস্ত্রশস্ত্র রাখা সংগত হবে, যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত একজন মুসাফির তার সাথে রাখে, এর বেশি নয়।

## আবু জান্দালের ؓ আগমন

চুক্তি লেখা শেষ, স্বাক্ষর দেওয়ার পালা। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সেই মুহূর্তে আগমন ঘটলো আবু জান্দালের ؓ। তিনি সুহাইল ইবন আমরের আপন ছেলে। বাবা স্বয়ং কাফিরদের মুখপাত্র, আর ছেলে কিনা মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছেন নবীজির ﷺ সাথে যোগ দিতে! আবু জান্দালকে মক্কায় কারাবন্দী ছিলেন বেশ কয়েক বছর। মুসলিমরা উমরা করতে এসেছে শুনে তিনি পালিয়ে এসেছেন। তার শরীরে তখনও শিকল বাঁধা। সে অবস্থাতেই পাহাড়ি পথ, উপত্যকা সবকিছু ডিঙিয়ে মুসলিমদের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেছেন। আজ তার মুক্তির দিন! কিন্তু বাধ সাধলেন তার বাবা। সুহাইল তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলে উঠলেন,

- চুক্তির আওতায় এই হলো আমার প্রথম ব্যক্তি। একে আমার কাছে ফেরত দিন।

- তাকে তুমি আমার কাছেই থাকতে দাও।

- না না! হয় আপনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, না হলে কোনো সন্ধিই করবো না।

নবীজি ﷺ তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন বললেন, 'দেখো, আমরা কিন্তু এখনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করিনি।'

কিন্তু সুহাইল নাছোড়বান্দা, কিছুতেই রাজি হলেন না। শেষমেশ আবু জান্দালের দিকে ফিরে নবীজি ﷺ বললেন, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।'

আবু জান্দালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! এমন পরিস্থিতির জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কী করে আমাকে কাফিরদের মাঝে ফিরে যেতে বলছেন? ওদের মাঝে থাকলে আমি ফিতনায় পড়ে যাবো...'

নবীজি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ধৈর্য ধরো আবু জান্দাল। আল্লাহর জন্য তোমার কষ্টগুলো সহ্য করে যাও। নিশ্চয়ই তোমার এবং তোমার মতো আরও যারা কষ্টভোগ করছে, তিনি তাদের সবার কষ্ট দূর করবেন। আমরা এই লোকদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। চুক্তির প্রতিটি শর্ত রক্ষা করবো বলে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছি। আমরা আমাদের অঙ্গীকার ভাঙতে পারি না।'

আবু জান্দালকে মারধোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উমার رضي الله عنه তখন ইচ্ছা করেই নিজের তরবারিটার হাতলটা আবু জান্দালের পাশে ঝুলিয়ে রেখে হাঁটছেন আর আবু জান্দালের কানে কানে ফিসফিস করে বলছেন, 'এরা কাফের। এদের জীবনের কোনো দাম নেই। এদের রক্তের দাম কুকুরের রক্তের দামের সমান!'[77] তিনি চাচ্ছিলেন আবু জান্দাল যেন তাঁর তরবারিটা কেড়ে নিয়ে তাঁর বাবাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলুক। কিন্তু আবু জান্দাল পর্বতসমান ধৈর্য নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু সহ্য করে নিলেন।

এই দৃশ্য দেখে সাহাবিদের হৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি হয়, চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। তাদের একজন দ্বীনি ভাইকে তাদেরই চোখের সামনে এভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা চুপচাপ দেখছেন -- এটা তারা মানতেই পারছিলেন না। সাহাবিরা ছিলেন মর্যাদাবান লোক। এই ঘটনা মেনে নেওয়া তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। তাদের চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে থাকে।

চুক্তি লেখা শেষ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে আদেশ করলেন পশু কুরবানি করতে আর মাথা মুড়িয়ে নিতে। কিন্তু সাহাবিরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনবার আদেশ করার

---

[77] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬।

পরেও সবাই একদম নিথর দাঁড়িয়ে আছেন । অন্য সময় নবীজি ﷺ আদেশ করলে সবাই ছুটে গিয়ে তা পালন করতেন। এবার যেন কারো মধ্যে কোনো ভাবাবেগ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের এ আচরণে মর্মাহত হলেন। সাহাবিরা হলেন মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহর ﷺ অবাধ্যতা করলে জান্নাতে কেউ ঠাঁই পাবে না, জাহান্নামের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। সাহাবিদের ওপর রাগ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রী উম্ম সালামাকে ﷺ বললেন, 'মুসলিমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলছে! আমি তাদেরকে একটা আদেশ দিলাম আর তারা অবাধ্যতা করছে!' উম্মুল মু'মিনীন উম্ম সালামাহ ﷺ ছিলেন বিচক্ষণ নারী। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি এই বিষয়টা নিয়ে কারো সাথে আর কোনো কথা তুলবেন না। আপনি আগে নিজে যান, পশু জবাই করুন আর নাপিত ডেকে নিজের চুল মুড়িয়ে নিন।'

এই শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে গিয়ে সাহাবিরা অনেক চাপের মধ্য দিয়ে গেছেন। তাদের কাছে মনে হচ্ছিল তারা কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তারা নবীজির ﷺ অবাধ্য হয়েছিলেন, এটা ভাবা ঠিক হবে না। বরং তারা আদেশ পালনে কিছুটা বিলম্ব করছিলেন। তাদের ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো নবীজির কাছে ওয়াহী আসবে। হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে, আর তারা মক্কায় ঢোকার অনুমতি পাবেন। তারা এসেছিলেন কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে, খালি হাতে ফিরে যেতে তারা আসেননি।

কিন্তু উম্ম সালামার বিচক্ষণতায় পরিস্থিতি সহজ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নবীজি ﷺ যদি নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে কাজগুলো করেন তাহলে তাঁর দেখাদেখি সাহাবিরাও সেসব করবেন। নবীজি ﷺ বেরোলেন, তাঁর নাপিতকে ডাকিয়ে নিজের মাথা মুড়িয়ে নিলেন এবং পশু জবাই করলেন। এরপর তাঁর দেখাদেখি সব সাহাবি তৎক্ষণাৎ নবীজির আদেশ পালন করলেন। অবশ্য তখনও সবাই বেশ বিমর্ষ হয়ে ছিলেন।

মুসলিমরা মদীনায় ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। উমার ﷺ ভণিতা করার মানুষ নন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ অকপটে জিজ্ঞেস করলেন,

- আচ্ছা রাসূলুল্লাহ, আমাদের ওয়াদা করা হয়েছিল আমরা তাওয়াফ করতে পারবো। সেটা কেন হলো না?

- আমি কি তোমাকে বলেছি যে আমরা এই বছর তাওয়াফ করবো?

- না।

- তাহলে তোমরা অবশ্যই তাওয়াফ করবে।

নবীজির আশ্বাসে সাহাবিরা আশ্বস্ত হলেন। সাহাবিরা দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে

ভুগছিলেন তা হলো আবু জান্দালকে কুরাইশদের কাছে ছেড়ে দেওয়া। তারা খোলাখুলিভাবে বিষয়টি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বুঝিয়ে বললেন আবু জান্দাল এবং তার মতো যারা আছে, তাদের নিষ্কৃতির পথ শীঘ্রই উন্মুক্ত হবে -- আল্লাহ তাকে এমনটাই ওয়াদা করেছেন। সাহাবিরা তাদের খটকা নিয়ে খোলাখুলিভাবে নবীজির সাথে আলোচনা করলেন এবং নবীজি ﷺ তাদের কথা শুনে বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। বরং তাদের শান্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন যেন তাদের খটকাগুলো দূর হয়ে যায়।

তবে এখানে দুটো ব্যাপার উল্লেখ্য, মক্কার কেউ মুসলিম হয়ে মদীনায় আসলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া -- এই নিয়মটি মুসলিম নারীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়নি। আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন,

> "মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা নিশ্চিত জানো যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না..." (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১০)

তবে এই আয়াত দিয়ে মুসলিম নারীদের ব্যাপারে মূল চুক্তির শর্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, নাকি মূল চুক্তির শর্তে কিছুই উল্লেখ না থাকায় আল্লাহ তাআলা আয়াত পাঠিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছেন--সেটা নিশ্চিত নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

## ইসলামের প্রথম গেরিলা যোদ্ধা: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুসলিমরা মদীনায় ফিরে যাবার কিছুদিন পরের ঘটনা। আবু বাসীর উতবাহ ইবন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের এক মুসলিম লোক মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে চলে এলেন। তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনতে দুই মুশরিক মদীনায় এল। এদের একজন বনু আমীর গোত্রের, আরেকজন ছিল আযাদকৃত দাস। তারা দাবি করলো আবু বাসীরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু যেন তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কেননা হুদাইবিয়ার সন্ধি মতে মক্কা থেকে কেউ মদীনায় আসলে তাকে মক্কার হাতে হস্তান্তর করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বাধ্য থাকবেন।

নবীজি ﷺ আবু বাসীরকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।'

আবু বাসীর বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে মুশরিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এদের মাঝে থাকলে তো আমি দ্বীন নিয়ে ফিতনায় পড়ে যাবো!'

একজন মুসলিমকে কাফিরদের হাতে এভাবে তুলে দেওয়ার চাইতে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

একটি বিষয়। প্রতারণা করা ইসলামে বৈধ নয়। নবীজি ﷺ আবু বাসীরকে তাই বললেন, 'দেখো, এই লোকগুলোর সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ। আমাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা শোভা পায় না। তুমি ফিরে যাও, নিশ্চয়ই তুমি এবং তোমার সাথে যারা আছে -- আল্লাহ তোমাদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।'

নবীজি ﷺ কাফিরদের হয়ে কাজ করছিলেন না। কিংবা তাদেরকে খুশি করার জন্য মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন না। শুধুমাত্র একটি কারণে তিনি আবু বাসীরকে ؓ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তা হলো চুক্তি রক্ষা করা। আর আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াদা পাওয়ার পরেই এমন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতেই হবে, সে চুক্তি মুসলিমদের সাথে হোক বা কাফিরদের সাথে হোক।

আবু বাসীরকে ؓ কুরাইশদের সেই দুই ব্যক্তির সাথে ফিরে যেতে হলো। মক্কায় যাওয়ার পথে যুল হুলাইফা নামক স্থানে জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে যুহরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আবু বাসীর ؓ সালাত আদায় করলেন। এরপর কিছু খেজুর নিয়ে বাকি দু'জনের সাথে একসাথে খেতে বসে গল্পগুজব করতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আবু বাসীর জিজ্ঞেস করলেন,

- 'বনু আমীরের ভাই, তোমার তলোয়ারটা তো বেশ!'

- 'হ্যাঁ! আসলেই তাই!' নিজের তরবারির প্রশংসা পেয়ে লোকটাও বেশ গদগদ হয়ে উত্তর দিলো।

- আমাকে একটু দাও তো, আমি একটু পরখ করে দেখি!

আবু বাসীরের হাতে তরবারি আসামাত্র মুহূর্তের মাঝে বনু আমীরের লোকটির লাশ পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তি আতঙ্কে দিল ভোঁ দৌড়। একেবারে জান হাতে নিয়ে পালানো যাকে বলে! দৌড়াতে দৌড়াতে নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। এক দৌড়ে সে মদীনায় চলে এল। তাকে ওভাবে দৌড়াতে দেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন মারাত্মক কিছু ঘটেছে। সে রাসূলুল্লাহকে জানালো, 'আমার সাথীকে ঐ লোক হত্যা করেছে! সে পেলে আমাকেও মেরে ফেলবে!'

ততক্ষণে আবু বাসীরও তরবারি হাতে মদীনায় ঢুকলেন। নবীজিকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'

নবীজি ﷺ বললেন,

> *'ওয়াইলুই উম্মিহি! সাথে আর কয়জন লোক থাকলে তো এই ছেলে রীতিমতো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারতো!'*

কথাটা ছিল প্রশংসাসূচক। আবু বাসীর ছিলেন একজন টগবগে যুবক, সাথে কিছু লোকবল থাকলে তিনি একাই কুরাইশদের নাস্তানাবুদ করার ক্ষমতা রাখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু চুক্তিমতে তিনি আবু বাসীরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। এই কথা শুনে আবু বাসীর মদীনা ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ কুরাইশদের কেউ তাকে ফেরত চাইলে নবীজি ﷺ আবারো তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবেন। তাই তিনি চলে গেলেন সাইফুল বাহরে।

ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, আবু বাসীর নবীজির কাছে বনু আমীরের লোকটির জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু নবীজি সেগুলো নিতে রাজি হননি, কারণ সেক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হয়ে যায়। যা-ই হোক, সাইফুল বাহরে আবু বাসীরের ﷺ নতুন জীবন শুরু হলো। সমুদ্রতীরে তিনি একাকী দিন কাটাতে লাগলেন, কোনো সঙ্গীসাথী নেই। ওদিকে কুরাইশরা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্বল বলতে তার কাছে ছিল কয়েকটা খেজুর। খেজুর শেষ হয়ে গেলে সমুদ্রতীরে ভেসে ওঠা মাছ খেয়ে সারাদিন পার করে দিতেন। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

এত বড় খবর তো চাপা থাকে না। আবু বাসীরের ঘটনা মক্কায় জানাজানি হয়ে গেল। আবু জান্দালের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো মক্কা থেকে পালিয়ে গেলেন। এবার গিয়ে আবু বাসীরের সাথে যোগ দিলেন। জুলুমের শিকার মক্কার আরও কিছু মুসলিমও আবু বাসীরের সাথে যোগ দিলেন এবং শুরু করলেন একের পর এক গেরিলা অপারেশন। এভাবেই আবু বাসীরের নেতৃত্বে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়। আজ পর্যন্ত আবু বাসীরের ﷺ নাম মুসলিমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে।

আবু বাসীর ﷺ আর তাঁর সঙ্গীরা মিলে কুরাইশদের অতর্কিতে হামলা করা শুরু করলেন। তারা অবস্থান করছিলেন 'ঈস' নামক স্থানে। জায়গাটা ছিল কুরাইশদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক রুটের একেবারে কাছেই। তারা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকতেন আর কুরাইশদের কোনো কাফেলাকে অতিক্রম করতে দেখলে সেটাকে আক্রমণ করে কাফেলার সবাইকে হত্যা করে কাফেলার সম্পদ লুট করতেন। কুরাইশদের জীবন রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে গেল। এই অপারেশনগুলোর কথা দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়াতে লাগলো আর অনেক মুসলিম সেই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করল। এভাবে প্রায় সত্তর জনের একটি দল কুরাইশদের পর্যুদস্ত করে দিল।[78]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুই জানতেন কিন্তু তিনি কিছুই বলছিলেন না। তিনি এসবের সাথে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু তিনি এসব ঘটনার প্রতি 'তীব্র নিন্দা'ও জ্ঞাপন করেননি। চুক্তির কারণে আবু বাসীরকে তিনি মদীনায় আশ্রয় দেননি, আবার তাকে থামানোরও কোনো চেষ্টা করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল দায়িত্বশীল ছিলেন মদীনার

---

[78] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৮।

অভ্যন্তরে মুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে। মক্কার মুসলিমরা মদীনার বাইরে সমুদ্রতীরে কী করছে -- সেসবের ব্যাপারে তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই নবীজি ﷺ এসব থামানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নিলেন না।

বনু আমীরের লোকটির হত্যার খবর যখন মক্কায় পৌঁছলো তখন সুহাইল ইবন আমর খুব দুঃখ পেলেন। কারণ সেই লোকটি ছিল তার গোত্রের লোক। কাবাঘরে পিঠ ঠেকিয়ে সুহাইল মরিয়া হয়ে বলতে লাগলো, 'এই লোকের রক্তপণ আদায় করার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হচ্ছি না, ঠিক এইভাবে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো! মুহাম্মাদকে এই অর্থ দিতেই হবে!' আবু সুফিয়ান বলে উঠলো, 'পুরোই পাগলামি! মুহাম্মাদ এই টাকা কেন দিতে যাবে? সে তার কাজ করেছে। সে তো আবু বাসীরকে ফিরিয়ে দিয়েছেই।'

যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে চিঠি লিখে তাকে মদীনায় পাঠিয়েছিল, তারাও এই মৃত্যুর ব্যাপারে দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালো। এভাবে বনু আমীরের সেই লোকের রক্তপণ হারিয়ে গেল। সুহাইল ইবন আমর তার বংশের লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে কোনো টাকাই পেলেন না। আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্বদর অনুযায়ী সবকিছুই মুসলিমদের পক্ষে কাজ করছিল।

আবু বাসীরের গেরিলা আক্রমণে কুরাইশদের নাকানি-চুবানি খেয়ে দমবন্ধ হবার মতো অবস্থা। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি করা হলো, কুরাইশরা ভেবেছিল যেন তাদেরই বিজয় হচ্ছে। কোনো মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে আসলে তাকে মদীনায় ফিরিয়ে দেওয়া -- চুক্তির এই ধারার জন্য তারাই চাপাচাপি করেছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক বছর মুসলিমদের সাথে টানা যুদ্ধের পর হুদাইবিয়ার সন্ধি কেবলই তাদের একটু দম নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এর আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনীর ক্রমাগত হামলায় তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শান্তিচুক্তি করার পর তারা ভেবেছিল তারা আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করতে পারবে। কিন্তু তারা ভাবতেই পারেনি আবু বাসীরের কারণে তাদের এভাবে নাস্তানাবুদ হতে হবে। এই পরিস্থিতির কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তারা নবীজির ﷺ শরণাপন্ন হলো।

আল্লাহ এভাবেই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেন। যে শর্ত ছাড়া কুরাইশরা সন্ধি করতেই রাজি হচ্ছিল না, সেগুলোই বদলাবার জন্যে তারা এবার নবীজিকে চিঠি পাঠিয়ে মিনতি করতে লাগলো। সে চিঠির ভাষা ছিল অনেকটা এমন,

*'আপনার ও আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই লাগে, দয়া করে এই লোকদেরকে ডেকে আপনি মদীনায় স্থান দিন।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুরোধ রাখলেন। তিনি চিঠি পাঠিয়ে আবু বাসীর এবং

অন্যান্যদের মদীনায় চলে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠি যখন আবু বাসীরের হাতে পৌঁছালো, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দ্বীন ইসলামের ছায়ার নিচে থাকার জন্য যার এত প্রয়াস, রাসূলের শহর মদীনায় ঢোকার জন্য যার এত আকুতি, সেই স্বপ্ন সত্য হতে হতেও যেন হলো না। তার এই ব্যাকুলতার সমস্ত প্রতিদান অপেক্ষা করে ছিল তার জান্নাতের বাড়িতে। যে আবু বাসীরের আক্রমণের সূত্র ধরে মক্কার নিপীড়িত মুসলিমরা মদীনায় আসার সুযোগ পেলেন, সেই আবু বাসীর আল্লাহর রাসূলের চিঠি বুকে চেপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার আর মদীনায় আসা হলো না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মযলুম মুসলিমদের অবস্থার উত্তরণ ঘটাবেন, আল্লাহ তাই করেছেন। এই মযলুম মুসলিমরা কুরাইশদের মনে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে উঁচু নাক নিয়ে কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি করেছিল, আল্লাহ তাআলা এই দুর্বল মুসলিমদের মাধ্যমে কুরাইশদের উঁচু নাককে ভোঁতা করে দিয়েছেন। তাদের সমস্ত হম্বিতম্বিকে ধূলিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। করজোড়ে তাদের দিয়ে নতি স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে আবু জান্দাল এবং অন্যান্য নও মুসলিমদের মদীনায় চলে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সত্য -- মুসলিমরা যখন আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কথা মেনে চলে, আল্লাহ তাআলা তাদের মুক্তির পথ বের করে দেন।

# হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা

## ১) হুদাইবিয়া ছিল ইসলামের বিজয়

এ বিষয়ে আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারকে ডেকে পাঠালেন। উমার ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারকে বললেন,

- আমি এমন কিছু আয়াত পেয়েছি যেগুলো এই দুনিয়ার সবকিছু থেকেও উত্তম।

- এখানে কি মুক্তির কথা বলা হচ্ছে?

- সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এখানে মুক্তির কথাই বলছে!

বিজয় বা মুক্তি বলতে কুরআনে 'ফাতহ' এবং 'নাসর' দুটো শব্দ এসেছে। ফাতহ শব্দের অর্থ খোলা। বন্ধ কিছু খোলা বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হতো। আর কোনো একটি যুদ্ধে জয়ের কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে নাসর শব্দটি। যেমন, বদরের বিজয়ের কথা বোঝাতে নাসর কথাটি আসে। ফাতহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না, কেননা বদর একটা ময়দান মাত্র, একে মুক্ত করার কিছু নেই। অন্যদিকে মক্কা হলো একটি ভূমি, তাই বলা হয় ফাতহে মক্কা।

হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বলা হয়েছে ফাতহ, কারণ এই চুক্তির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের পথ

উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবীজি সেবার চৌদ্দশো সাহাবি নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর লোকেরা খোলামেলাভাবে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। আরবের মুসলিমরা প্রথমবারের মতো স্বাধীনভাবে লোকেদের সাথে কথা বলার অবকাশ পেল আর লোকেরাও নির্ভয়ে ইসলামের কথা শোনার সুযোগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। কুরাইশদের চাপের কারণে এতদিন মুসলিম হবার পথে মানুষের মনে ভয় বা বাধা কাজ করতো। এই চুক্তির মাত্র দু'বছর পর যখন মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে, তখন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে হয় দশ হাজার। অথচ এর আগের বিশ বছরে এত মুসলিমের কথা কল্পনাও করা যায়নি -- নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুলহুল হুদাইবিয়ার (হুদাইবিয়ার সন্ধি) একটা বড় অর্জন।

## ২) কুরাইশদের নিষ্ক্রিয়করণ

ইসলামের উত্থানে কুরাইশরা ছিল সবচাইতে বড় হুমকি। মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার মাধ্যমে তারা দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আরব জয়ের পথে কোনো বাধা আর অবশিষ্ট থাকলো না। এই চুক্তি করতে কুরাইশরা যতই হামবড়া ভাব দেখাক না কেন, এই চুক্তির মাধ্যমে তারা কার্যত মুসলিমদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। যদিও কাফিরদের কাছে মুসলিমরা স্বীকৃতি খোঁজে না। কিন্তু এটা দেখিয়ে দেয় যে, মক্কা থেকে প্রায় বিতাড়িত হাতে গোনা কয়েকজন মুসলিম মদীনায় আশ্রয় নিয়ে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, তা কয়েক বছরের মধ্যে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, একে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কাফির শক্তির আর কোনো পথ থাকে না।

এই স্বীকৃতি ছিল সমীহের স্বীকৃতি, দয়া-দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ কাফিরদের কাছে স্বীকৃতির জন্য ধর্ণা দেননি, তিনি তাদের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবদারও করেননি। বরং তিনি তরবারি ব্যবহার করেছেন আর তারা নিজেদের তাগিদেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এমন একটা অবস্থায় চুক্তি করেছিলেন যখন তিনি ছিলেন শক্তিশালী। ছয় বছর ধরে জিহাদ করে তখন তিনি কুরাইশদের যথেষ্ট কোণঠাসা করে রেখেছেন। কুরাইশরা তাদের নিজেদের লাঞ্ছনা ঠেকাতে চুক্তি করে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজকের বিশ্বে ঠিক উল্টোটা ঘটছে। কাফিরদের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়ে মুসলিমরা তাদের খুশি করতে চাইছে এবং স্বীকৃতির আশা করছে। এটা 'স্বীকৃতি' নয়, বরং এটা হলো লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

## ৩) সাহাবিদের আপত্তি এবং আল্লাহর রাসূলের ﷺ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি

উমার ﷺ এবং অন্য মুসলিমরা বেশ কিছু কারণে প্রথমে এই চুক্তি নিয়ে খুশি হতে পারেননি। দলিল থেকে আর-রাহমান মুছে ফেলা, রাসূলুল্লাহ মুছে ফেলা -- এই বিষয়গুলো হজম করতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। কুরাইশদের কেউ মদীনায় আসলে তাকে ফিরিয়ে দিতে মুসলিমরা বাধ্য থাকবে, কিন্তু মুসলিমদের কেউ মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দিতে কুরাইশরা বাধ্য থাকবে না -- চুক্তির এই শর্তগুলোও ছিল তাদের অসন্তোষের কারণ।

প্রথমত, আর-রাহমান মুছে ফেলার বিষয়টা অপছন্দ করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি নেই কিংবা এখানে ইসলামের কোনো হুকুম নিয়ে আপস করা হচ্ছে না। কাফিররা আল্লাহ তাআলাকে আর-রাহমান বলে বিশ্বাস না করলেও কার্যত এই চুক্তি আল্লাহর নামেই করা হচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা, দেবতা, মানুষ বা মানবরচিত আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই সুহাইলকে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস না করলেও আমি আল্লাহর রাসূল।' কাফিররা মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেবে -- সেটা জরুরি নয়। তাই এখানে সুহাইলের দাবি নবীজি মেনে নিয়েছেন। তবে সুহাইল যদি এই চুক্তিতে তাদের কোনো দেবতার নাম অন্তর্ভুক্ত করতো কিংবা তাদের প্রশংসা করতো, তাহলে সেটা কখনই মেনে নেওয়া হতো না। তাই এই ব্যাপারটিকে আপস বা সমঝোতা ভাবাটা ভুল হবে।

তৃতীয় বিষয়টিও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কেউ মদীনা থেকে মক্কায় চলে যেতে চায়, তাহলে মুসলিমদের তাকে প্রয়োজনও নেই, কেননা একমাত্র মুরতাদ হলেই কেউ মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যাবে আর একজন মুরতাদকে মদীনায় ধরে রাখার কোনো দরকার নেই। অন্য দিকে, মক্কার কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে মদীনায় আসতে পারবে সত্য, কিন্তু আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। সে অন্য যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। এমন লোকের মুক্তির ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন।

## আবু বাসীরের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

আবু বাসীরের ঘটনা থেকে এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, একজন মুসলিমকে কাফিরের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। এটা জায়েয নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না।'[79]

প্রথমত, মক্কার মযলুম মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তাআলা উপায় বাতলে দেবেন -- এমন ওয়াদার ভিত্তিতে আল্লাহ রাসূল ﷺ চুক্তিতে এই শর্তটি রেখেছিলেন। এটা ছিল ওয়াহী। এটা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য জায়েয ছিল কারণ তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন।'

দ্বিতীয়ত, 'ওয়াইলুহু উম্মিহী, তার সাথে যদি আরও লোক থাকতো...' রাসূলুল্লাহর এই কথা থেকে প্রতীয়মান হয় আবু বাসীরের কাজে তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। ইবন হাজার

---

[79] রিয়াদুস স্বলেহীন, পরিচ্ছেদ ২৭, হাদীস ১২/২৩৮।

আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারী কিতাবে এমনটাই মত দিয়েছেন। ওয়াইলুই উম্মিহী -- এই কথার কারণে অনেকে মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাসীরের কাজটির অনুমোদন দেননি। ওয়াইলুই উম্মিহী -- এই কথাটি আরবিতে বহুল প্রচলিত। এর আক্ষরিক অর্থ অনেকটা এমন -- তার মায়ের সর্বনাশ হোক। আক্ষরিক অর্থে এটাকে নেতিবাচক মনে হলেও আরবরা প্রশংসা করতে এই কথাটি ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাসীরের অপারেশনগুলোর কোনো সমালোচনা করেননি বা নিন্দা জানাননি। যদি আবু বাসীরের ﷺ কাজগুলো ভুল হতো, একজন নবী ﷺ হিসেবে আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এই বিষয়টি উম্মাহর কাছে জানিয়ে দিতেন। শাসক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তাই আবু বাসীরকে তিনি এইসব অপারেশন করার আদেশ দেননি। একই সাথে শাসক হিসেবে তিনি তার ব্যাপারে দায়বদ্ধ ছিলেন না, কারণ আবু বাসীর মদীনা প্রশাসনের অধীনে ছিলেন না।

চতুর্থত, আবু বাসীর ﷺ যখন দ্বিতীয়বার মদীনায় এলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বন্দী করে কুরাইশদের হাতে তুলে দেননি। কাফিরদের খুশি করার বা তাদের মন যুগিয়ে চলার কোনো উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না।

পঞ্চমত, আবু বাসীরের কাজে রাসূলুল্লাহর ﷺ নীরবতা এটাই প্রমাণ করে যে, জিহাদের জন্য শাসক বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

## বিবিধ শিক্ষা

### ১) ইসলামে বস্তুগত প্রতীকের কোনো স্থান নেই

উমারের ﷺ খিলাফতের সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। যে গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিছু মুসলিম সে গাছের নিচে গিয়ে সালাত আদায় করা শুরু করে। তারা ভাবছিল, যেহেতু এই গাছের নিচে এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে আর কুরআনেও এই গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে -- তার মানে এই গাছটি বিশেষ কিছু। মুসলিমদের এই কাজ করতে দেখে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ সোজা গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। এই গাছের নিচে ইবাদত করা এক সময় শিরকে পরিণত হতে পারে, মানুষ হয়তো গাছটিকে 'কল্যাণকর' কিছু ভেবে বসতে পারে -- এই আশঙ্কায় উমার গাছটি কেটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ গাছের নিচে বসেছেন। কুরআনে এর কথা উল্লেখ হয়েছে সত্য, কিন্তু ইসলামে বস্তুগত প্রতীকের কোনো স্থান নেই।

### ২) শত্রুদের সাথে চুক্তির সময়কাল

যেহেতু আল্লাহর রাসূল ﷺ শত্রুদের সাথে দশ বছরের শান্তিচুক্তি করেছেন, সে হিসেবে ইমাম শাফী, ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য আলিমরা মত দিয়েছেন শত্রুরাষ্ট্রের সাথে সর্বোচ্চ দশ বছরের চুক্তি করা জায়েয, এর বেশি নয়। দশ বছরের পর চুক্তি নবায়ন করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এবং অন্য কিছু আলিম মনে করেন, পরিস্থিতি

প্রেক্ষিতে দশ বছরের বেশি সময়ের জন্যেও চুক্তি করা যেতে পারে। তবে আগেকার আলিমদের সবাই একমত যে শত্রুরাষ্ট্রের সাথে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চিরস্থায়ী চুক্তি করা জায়েয নয়।

## কুরআনের চোখে হুদাইবিয়ার সন্ধি: সূরা ফাতহ

সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয় হুদাইবিয়া সন্ধির সময়ে। এই সূরা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সে উদ্দেশ্যে এর কয়েকটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হলো।

### মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি

> "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ আপনাকে আগে পরের যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন, আপনার ওপর তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে পারেন, আর আপনাকে পরিচালিত করতে পারেন সহজ-সঠিক পথে।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১-২)

হুদাইবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ বিজয় দান করেছেন এবং এই বিজয়ের মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা নবীজির ﷺ সমস্ত গুনাহ মুছে দিবেন। এর মানে কি নবীজি ﷺ গুনাহের কাজ করেছেন? না, আসলে একজন রাসূলের পদমর্যাদা অনেক ওপরে, তাই তাদের ভুল বা দুর্বলতাগুলোকে এখানে গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, আক্ষরিক অর্থে গুনাহ বোঝানো হচ্ছে না। আর হিদায়াহ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে দিক-নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিলেন, এখানে বলা হচ্ছে, পরবর্তীতে তাঁর কাছে শরীয়াহর আরও আইন অবতীর্ণ হবে, এটাই হলো হিদায়াহ বা সরল পথ প্রদর্শন।

> "এবং যেন আল্লাহ আপনাকে দান করেন মহা-বিজয়। তিনিই সেই সত্তা যিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন, যাতে তাদের (বর্তমান) ঈমানের সাথে সাথে ঈমান আরও বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৩-৪)

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মুসলিমদের জন্য রহমত-স্বরূপ। এই সন্ধির সূত্র ধরে পরবর্তীতে মক্কা বিজয় সহ মুসলিমদের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাকেই এখানে 'মহাবিজয়' বলা হচ্ছে। মুসলিমরা এসেছিল উমরা করার আশায়। কিন্তু তাদের মক্কায় ঢুকতেই দেওয়া হলো না। ঘটনাচক্রে মুসলিমরা মৃত্যুর শপথ করলো -- হয় লড়বো নাহয় মরবো। পরিস্থিতি বার বার নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। একের পর এক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা সাহাবিরা নিশ্চয়ই চাননি। আল্লাহ তাই বলছেন, অন্তরের এই অনিশ্চিত ও অশান্ত অবস্থানকে তিনি সুকুন বা প্রশান্তি দিয়ে মুছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বিজয়ের ওয়াদা তাদের অন্তরকে শান্ত করে দেয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলির সমস্ত শক্তির মালিক তিনিই। তাঁর ইচ্ছাতে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুও আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হতে পারে। বদরের যুদ্ধে বৃষ্টি আর ফেরেশতারা ছিল আল্লাহর সৈনিক, খন্দকের যুদ্ধে বাতাস ছিল আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর সৈনিক কে বা কারা, তা আমরা জানিনা, শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন।

## সুসংবাদ মু'মিনাহদের জন্য

সূরা ফাতহের প্রথম আয়াত শুনে মুসলিমরা খুব খুশি হলো। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে জানতে চাইলেন, 'আর আমাদের জন্য কী আছে?' আল্লাহ তাআলা বললেন,

> "যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের গুনাহগুলো মুছে দেবেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৫)

এ আয়াতে মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারী উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে নারীদের কথা কেন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো যেখানে সুলহুল হুদায়বিয়্যাতে কেবল পুরুষরা ছিল? পুরুষদের সাথে নারীরাও পুরস্কার পাবে কারণ যখন তাদের স্বামী যুদ্ধে গেছে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে -- তখন তারা সবর করেছে, পরিবারকে আগলে রেখেছে। তাই মুসলিম নারীরাও পুরুষদের সাথে সাথে সর্বোচ্চ মর্যাদার অংশীদার হবে।

> "আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক্ব পুরুষদের ও মুনাফিক্ব নারীদের এবং মুশরিক পুরুষদের ও মুশরিক নারীদের--যারা আল্লাহ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা ধারণ করে থাকে। তাদের পরিণাম মন্দ। তাদের ওপর আছে আল্লাহর ক্ষোভ। তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, আর তাদের জন্য তিনি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ৬)

এবার আল্লাহ তাআলা শত্রুদের পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও নারীদেরকে কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তারা ছিল পুরুষদের সহযোগী। তাই শাস্তির বেলায় পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরকেও এর ভাগ বহন করতে হবে।

## সাহাবিদের বিশেষ মর্যাদা

> "নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে (হে মুহাম্মাদ), তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; তাহলে এর ভয়াবহ পরিণাম তার

নিজের ওপরই এসে পড়বে। যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।” (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১০)

আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের বলছেন -- তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেই অঙ্গীকার দিয়েছো! নিশ্চয়ই এটা ছিল সেই চৌদ্দশো সাহাবির জন্য এক বড় মর্যাদা। এই সাহাবিদের কেউই সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি।

## মুনাফিক চিহ্নিতকরণ

“বেদুইনদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা শীঘ্রই আপনাকে বলবে--আমাদের ধনসম্পত্তি ও আমাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা আমাদের মশগুল করে রেখেছিল, তাই আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের জিহবা দিয়ে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, কে তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করবার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা তোমাদের উপকার করতে চান? বস্তুত তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকেবহাল।” (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১১)

মরুবাসীদের অনেকেই কুরাইশদের শক্তিমত্তার ভয়ে হুদাইবিয়ায় যোগ দেয়নি। তারা ভাবছিল মুসলিমরা নির্ঘাৎ তাদের হাতে মারা পড়বে। তারা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদের দেখাশোনা করতে গিয়ে তারা আসতে পারেনি। আল্লাহ তাদের এই অজুহাত গ্রহণ করেননি। পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদ বাকিদেরও ছিল, তারা এই অজুহাতে পেছনে পড়ে থাকেননি। পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরির অজুহাতে জিহাদ থেকে মাফ পাওয়া যাবে না।

“না, বরং তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল ও মু’মিনগণ তাদের বাড়ি-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না। আর এই ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লাগছিল। তোমরা তাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ জাতি!

আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে না, আমরা তো অবশ্যই সেসব কাফিরদের জন্য তৈরি করেছি জ্বলন্ত আগুন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে আসতে দাও। এভাবে তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়। বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ আগে থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং

> তোমরাই আমাদের ঈর্ষা করছো। না! বস্তুত তারা এসব বিষয়ের সামান্যই বোঝে।" (সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: ১২-১৫)

মুনাফিকরা হুদাইবিয়ার সময় যেতে চায়নি, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল মুসলিমরা পরাজিত হবে। যখন তারা আবিষ্কার করলো মুসলিমদের কিছুই হয়নি, উল্টো আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য গনিমতের সম্পদের ওয়াদা করেছেন, তখন তারা যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠলো! এরা আসলে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে চায়নি, তারা বের হতে চেয়েছে দুনিয়ার সন্ধানে। তাদের এই হঠকারী আচরণের শাস্তি স্বরূপ পরবর্তী যুদ্ধে অর্থাৎ খাইবারের সময় তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়।

তখন তারা বলাবলি করতে থাকে, 'তোমরা আমাদেরকে হিংসে করছো! তোমরা গনিমতের মাল সব নিজেরা ভোগ করতে চাও!' আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন -- এদের বোধশক্তি নেই। দুনিয়া ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। সবকিছুকে কেবল টাকার অঙ্কে বিচার করে। দুনিয়াই তাদের সব, আল্লাহ বা আখিরাতের জন্য তাদের চিন্তা নেই। এটাই হচ্ছে সেকুলারিজম।

## সন্ধির পেছনে হিকমাহ

> "যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকতো, যাদের কথা তোমরা জানতে না, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা যদি না থাকতো, অতঃপর সে কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা মক্কায় শক্তির সাথে প্রবেশের অনুমতি পেতে। কিন্তু তোমাদের হাতকে আল্লাহ বিরত রাখলেন যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার মাঝে নিয়ে আসতে পারেন। তারা যদি আলাদা থাকতো (অর্থাৎ মক্কার মু'মিনরা যদি কাফিরদের থেকে আলাদা থাকতো), তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে শাস্তি দিতাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৫)

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুদ্ধ বাধার অনুকূল পরিস্থিতি বারবারই তৈরি হয়েছে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা হয়নি। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন মক্কার মু'মিনরা যেন হেফাযতে থাকে। মুসলিম বাহিনী যদি যুদ্ধ করে মক্কায় প্রবেশ করতো, তাহলে মক্কার মুসলিম নারী-পুরুষ নিহত হতো। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মুসলিম ও কাফির উভয় বাহিনীকেই যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। আর যুদ্ধ না হওয়ার ফলে মক্কার বহু লোক ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেল। মুসলিম হয়ে গেল। এ সবই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার অংশ। যুদ্ধ করা যাবে না--এমন কোনো হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফয়সালা এসেছিল। মুসলিম বাহিনী যদি তাড়াহুড়ো করতো, তাহলে যুদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সংযমের ওপর দাখিল রাখেন, আর এটাই মুসলিমদের জন্য পরবর্তীতে সুফল বয়ে আনে।

## রাসূলুল্লাহর ﷺ সত্য স্বপ্ন

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, নিরাপদে, মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়, তখন তোমাদের মাঝে কারো প্রতি কোনো ভয় থাকবে না। তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এবং তিনি তোমাদের জন্য আয়োজন করেছেন একটি আসন্ন বিজয়।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৭)

আল্লাহ বলছেন হুদাইবিয়ার আগে যে স্বপ্ন তিনি নবীজিকে ﷺ দেখিয়েছেন সেটা একদিন অবশ্যই সত্য হবে। সত্যিই তা-ই হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ও সাহাবিরা হজ্জ করেছিলেন, যা ইতিহাসে 'বিদায় হজ্জ' নামে পরিচিত। সেদিন কারো মনে কোনো ভয় ছিল না।

## সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য

> "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, আপনি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবেন। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের কিছু গুণাবলির কথা বলেছেন।

১. তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর।

২. তারা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলিমদের প্রতি কোমল। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বর্তমানে এমন কিছু মুসলিম আছে যারা এই কুরআনের এই বিবরণ থেকে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত। তারা মুসলিমদের প্রতি শক্ত আর কাফিরদের প্রতি দরদে বিগলিত।

৩. তাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সালাত। তারা আল্লাহর করুণার আশায় সালাত আদায় করবে।

৪. সিজদা তাদের চেহারায় চিহ্ন তৈরি করেছে। এখানে সিজদার ফলে কপালে যে কালো দাগ পড়ে, সেটার কথা বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে সিজদার কারণে চেহারা দিয়ে যে নূর বের হয় তার কথা।

৫. মু'মিনদের মাঝে দৃঢ়তা থাকবে। তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি গভীর শেকড়যুক্ত মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মতো। জীবনের বিপদ আপদ বা পরীক্ষা তাদের টলাতে পারে না। তাদের এই দৃঢ়তা কাফিরদের ক্ষোভের কারণ হবে। তারা হবে কাফিরদের চক্ষুশূল।

# খাইবারের যুদ্ধ

## প্রেক্ষাপট

খাইবারের ইহুদিরা মাক্কী যুগে কিংবা মদীনার প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেনি। কিন্তু বনু নাযিরের নেতাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব বদলে যেতে থাকে। বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা -- এই তিনটি গোত্রকেই পর্যায়ক্রমে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু নাযিরকে বের করে দেওয়া হলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। আর এরপর থেকেই খাইবারের ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করলো। কেননা বনু নাযিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবন আবি আল-হুকাইক, কিনানাহ ইবন আবি আল-হুকাইক, হুয়াই ইবন আখতাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খাইবারের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে উসকে দেয়। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং গাতফানকে এক করে সম্মিলিত সামরিক জোট গঠন করে এবং গাতফানকে বিপুল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এভাবেই নিরপেক্ষ খাইবার হঠাৎ করেই মুসলিমদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের সময়টা ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার সবচাইতে উপযুক্ত সময়। কেননা ততদিনে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশদের দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই খাইবার আক্রমণ করা হলে কুরাইশদের থেকে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

## অভিযানের সূচনা

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিশ দিনের মাথায় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। গোটা আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল খাইবারে। মুসলিমরা জানতেন খাইবারে তাদের বিজয় হবেই। কারণ কয়েকদিন আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাইবারে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

> “...তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে...” (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

সাহাবিরা উদ্যমের সাথে পথ চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে আমীর ইবন আল-আকওয়াকে ﷺ বলা হলো নাশীদ তৈরি করতে। আমীর ইবন আল-আকওয়া ছিলেন সালামা ইবন আল-আকওয়ার চাচা। বেদুইনদের গান গাওয়ার বিশেষ একটা ভঙ্গি

ছিল। তাদের নাশীদ উটের উপর অন্যরকম প্রভাব ফেলত। উটগুলো চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন নাশীদগুলো অনেকটা গরমের দিনের এক গ্লাস লেবুর শরবতের মতো কাজ করতো। নাশিদ শুনে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠত।

আমীর ইবন আল-আকওয়া নাশিদ ধরলেন, নাশীদটির অর্থ বাংলায় অনেকটা এমন,

*ও আল্লাহ! তুমি ছাড়া কীভাবে আমরা পথের দিশা পেতাম--*
*কীভাবে জানতাম সালাতের কথা, দান-সাদাকাই বা কীভাবে করতাম?*
*ও আল্লাহ, তোমার কাছেই আমাদের আর্তি*
*আমাদের ক্ষমা করে দাও, যত ভুল আমাদের সব মুছে দাও*
*তোমার জন্য আমাদের কুরবান হয়ে যেতে দাও*
*আমাদের আর্তি শুনে নাও ইয়া রব!*
*তোমার শান্তির ঝর্ণা ঝরিয়ে দাও,*
*শত্রুর মুখে আমাদের পাগুলো যেন ইস্পাতের চেয়েও দৃঢ় হয়ে যায়*
*ওরা আর কত ভয় দেখাবে আমাদের?*
*যতোই ভয় দেখাক, আমরা দমব না।*
*ওরা তো সেই কবেই আমাদের বিরুদ্ধে বুনো নেকড়ের দলকে হন্যে হয়ে ডেকে চলেছে।*

গানের কথাগুলো রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব মনে ধরল। তিনি মুগ্ধ হয়ে জানতে চাইলেন, কে এই নাশীদ গাইছে? সাহাবিরা আমীর ইবন আল-আকওয়ার নাম বললেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর জন্য দুআ করলেন, 'ইয়ারহামুহুল্লাহ' -- আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুক।

এ কথা শোনামাত্র সাহাবিরা বুঝে গেলেন, আমীর ইবন আল-আকওয়ার জন্য শাহাদাত অপেক্ষা করে আছে। শাহাদাত আর ক্ষমা -- এই দুই বস্তু যে আলো আর ছায়ার মতো একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা সাহাবিরা ভালোভাবেই জানতেন। আলো থাকলে যেমন ছায়া হবেই, আল্লাহর পথে শহীদ হলেও তেমনি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে ইয়ারহামুহুল্লাহ শুনে উমার ইবন খাত্তাব উতলা হয়ে নবীজিকে ﷺ বলে উঠলেন 'আল্লাহর রাসূল! শাহাদাত তো আমীর ইবন আল-আকওয়ার জন্য অবধারিত হয়ে গেল! ইশ, আল্লাহ যদি আমাদেরও তা দিয়ে ধন্য করতেন!'

আব্বাদ ইবন বিশরকে পাঠানো হলো ইহুদিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে। এখনকার মতো সেই সময়েও যুদ্ধকে ঘিরে প্রোপাগান্ডা চলতো। মদীনায় ইহুদিদের পরিণতি দেখে খাইবারের ইহুদিরাও বেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। কিন্তু তারা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগলো এই বলে যে, তাদের বাহিনী ভীষণ শক্তিশালী, অবরোধের মধ্যেও তারা কয়েক বছর টিকে থাকার সামর্থ্য রাখে ইত্যাদি। অবশ্য এসব প্রোপাগান্ডায় মুসলিমরা মোটেও দমলেন না, তারা খাইবারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এরপর দুআ করলেন।

*'হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও তার ছায়াতলে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক! আপনি জমিনে যা কিছু হয় তার প্রতিপালক! আপনি শয়তান ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রতিপালক! আপনি বাতাস ও যা কিছু সে বাতাস উড়িয়ে নেয় সেসবের প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে এই জনপদ এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করছি। এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে, সেসবের প্রার্থনা আপনার কাছে করছি। এই জনপদের বাসিন্দা এবং তাদের যত অকল্যাণ, সেসব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।'*

এই বলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও!'

রাতের বেলা মুসলিম বাহিনী আর-রাযী উপত্যকায় তাঁবু ফেললেন। জায়গাটি ছিল খাইবার এবং গাতফানের মাঝে, যেন গাতফান থেকে খাইবারে কোনো প্রকার সাহায্য আসতে না পারে। পরদিন সকালে খাইবারের ইহুদিরা নিত্যদিনের কাজকর্ম করার জন্যে সকাল বেলা দুর্গ থেকে বাইরে বেরোচ্ছিল। হঠাৎ তারা আবিষ্কার করলো দিগন্ত জুড়ে মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের ঘিরে রেখেছে। আতঙ্কিত ইহুদিরা 'মুহাম্মাদের বাহিনী, মুহাম্মাদের বাহিনী' বলে চিৎকার করতে করতে দুর্গের ভিতরে ঢুকে গেল। মুসলিমরা দুর্গ অবরোধ করলেন। অথচ খাইবারের এই ইহুদিরা কিছুদিন আগেও গর্ব করে বলে বেড়াত, 'আমরা অন্যদের মতো নই। আমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্য আরবদের সাথে করা যুদ্ধের মতো চাট্টিখানি কথা নয়।' শক্তিশালী দুর্গ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক শক্তিমত্তা আর তাদের বিখ্যাত যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের বড়াইয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু যেই মাত্র তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহিনী দেখলো, তাদের যাবতীয় আস্ফালন ফুটো বেলুনের মতো চুপসে তো গেলই, ভয়ে যেন তারা আধমরা হয়ে গেল। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'শত্রুর মনে ভীতি তৈরির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করেন।'

## মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা

খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমাহার। এই দুর্গগুলো খাইবারের বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ কারণে খাইবার যুদ্ধ ইহুদিদের সাথে আগের সব যুদ্ধগুলোর তুলনায় বেশ জটিল ছিল। অবস্থানগত দিক থেকেও খাইবার ছিল সুরক্ষিত একটি এলাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এক করে সবগুলো দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বেরিয়ে এল, তার নাম মারহাব। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে এগিয়ে গেলেন আমীর ইবন আল-আকওয়া ﷺ, যার কথা একটু আগেই এসেছে। তিনি খাইবারের যাত্রাপথে নাশীদ

গেয়ে সবাইকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করে কাবু করতে চাইলেন। এক পর্যায়ে মারহাব তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চাইলে সেই তলোয়ার আমীরের ঢালে আটকে যায়। সেই সুযোগে আমীর মারহাবের উরুতে আঘাত করে তাকে শেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর তলোয়ার ছোট হবার কারণে আঘাত করতে গিয়ে তলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তার নিজের হাঁটুতে লাগে। এই আঘাত থেকে শুরু হয় রক্তক্ষরণ আর সেই রক্তক্ষরণ থেকে মৃত্যু। এভাবেই আমীর শহীদ হয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ কবুল হলো। এরপর আমীরের জায়গায় আসলেন আলী। এসেই মারহাবকে হত্যা করলেন। অবশ্য অন্য বর্ণনামতে মারহাবকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ।

জীবন সবসময় মানুষের পরিকল্পনামাফিক চলে না। আমীর বীরের মতো শত্রুর দিকে আঘাত হানতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে নিজেই নিজের তরবারিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো আমীরের সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। চাচার ব্যাপারে এই কথা শুনে সালামা ইবন আল আকওয়ার ﷺ খুব মন খারাপ হলো। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। সালামা ﷺ জানতে চাইলেন, 'আমার চাচার সকল আমল কি ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ? রাসূল ﷺ তাকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যে এই কথা বলেছে সে মিথ্যে বলেছে। আমীর দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে!'

ইহুদিদের এই নাঈম দুর্গ মুসলিমদের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবরোধের প্রথম কিছুদিন আবু বকরের ﷺ হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে বিজয় আসছিল না। সবাই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন,

> *'আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দান করবো যার জন্যে আল্লাহ দুর্গের দরজা খুলে দিবেন। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এবং আল্লাহ আর তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসে।'*

এই ঘোষণা যেন টনিকের মতো কাজে দিল। সবার ক্লান্তি নিমিষে কোথায় চলে গেল। কার হাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ পতাকা তুলে দেবেন সেটা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগলেন। পরদিন সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর কাছে জড়ো হলেন। মনে মনে সবাই আশা করছিলেন -- ইশ! আল্লাহর রাসূল যদি আমার হাতে পতাকা তুলে দিতেন! উমার ইবন খাত্তাব নিজেই বলেছেন তার মনে সেদিন কী ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি কোনোদিন নেতৃত্ব বা পদের আকাঙ্ক্ষা করিনি। তবে খাইবারের সেই দিনে আমার মনে নেতৃত্বের আশা জেগেছিল।'

সবাইকে ছাপিয়ে সেদিন যিনি পতাকা লাভ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ। কিন্তু যিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হলেন, তিনি নিজেই ছিলেন

অনুপস্থিত। সকাল বেলা আলী সেখানে ছিলেন না। সাহাবিরা জানালেন আলী চোখের সমস্যায় ভুগছেন। রাসূল ﷺ আলীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর মুখের কিছু লালা আলীর ﷺ চোখে লাগিয়ে দিলেন আর সাথে সাথে আলী সুস্থ হয়ে উঠলেন। আল্লাহর রাসূলের আরও একটি মু'জিযা। এরপর তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও! আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত পিছু হটো না।' আলী ﷺ জানতে চাইলেন, 'কোন কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে -- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই তাদের জান-মাল তোমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে (আইনগত) অধিকারের কথা হলে ভিন্ন। আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর কাছে।'[৪০]

আলী হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সাহাবিরাও তার পিছু পিছু ছুটছেন। দুর্গের সামনে এসে পতাকাটি পাথরের মধ্যে গেঁথে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি আলী ইবন আবি তালিব।

- তাওরাতের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছো!

দশ দিনের মাথায় শেষ পর্যন্ত আলীর নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা সত্য হলো। এরপর মুসলিমরা অগ্রসর হলেন আস-সা'ব দুর্গের দিকে। তিন দিনের মাথায় আস-সা'ব দুর্গ জয় হলো। এ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির ﷺ। এই দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা অনেক খাদ্যের সন্ধান পেলেন। এরপর তারা অগ্রসর হলেন আয-যুবাইর দুর্গের দিকে। সেখানে তাদের অবরোধ করে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার তিন দিনের মাথায় তারা যুদ্ধ করতে নেমে আসলো এবং পরাজিত হলো।

এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযান চালালো উবাই দুর্গে। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খুব সহজে উবাই দুর্গ আয়ত্তে চলে আসলো। এরপর মুসলিমরা একে একে জয় করলেন আল-কামূস, আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালাম দুর্গ। চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই দুর্গের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। এভাবেই বিজয় হলো সমগ্র খাইবার। এরপর ইহুদিরা অস্ত্র ছেড়ে সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে। এ যুদ্ধে নিহত হয় তিরানব্বই জন ইহুদি। আর মুসলিমদের থেকে শহীদ হন পনেরো থেকে বিশ জন, আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৪০] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৫০।

# খাইবারের কিছু ঘটনা

## ১) আল্লাহর সাথে সততা: নাম-না-জানা এক বেদুইনের গল্প

খাইবার যুদ্ধের আগে এক বেদুইন মুসলিম হন এবং যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ জয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের মধ্যে গনিমতের সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন। দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্যের পর মুসলিমরা কিছু সম্পদ লাভ করেছে। সেই বেদুইনের ভাগেও গনিমতের কিছু সম্পদ পড়ল। রাসূল ﷺ সেগুলো এক সাহাবিকে দিয়ে বললেন সেই বেদুইনের কাছে তার প্রাপ্য ভাগ বুঝিয়ে দিতে। সেই সাহাবি বেদুইনের কাছে সম্পদ নিয়ে এলে বেদুইন লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- এগুলো কী?

- এগুলো হচ্ছে তোমার গনিমতের অংশ।

উত্তরটা শুনে বেদুইন সাহাবির যেন মন ভরলো না। তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গেলেন। জানতে চাইলেন,

- এগুলো কী?

- এগুলো হলো তোমার গনিমতের অংশ।

- ও আল্লাহর রাসূল, আমি তো গনিমতের আশায় মুসলিম হইনি! আমি তো আপনার অনুসরণ করেছি এজন্যে যে আমার এইখানে আঘাত লাগবে, আমি শহীদ হবো আর জান্নাত লাভ করবো!

কথাগুলো সে বললো নিজের ঘাড়ের দিকে হাত ঠেকিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি যদি আল্লাহর সাথে সৎ হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তোমার এই কথাকে সত্যি করবেন।'

কিছুকাল পরের কথা, অন্য আরেকটি যুদ্ধে সেই বেদুইন মারা গেলেন। অবাক করা বিষয় হলো খাইবার বিজয়ের দিনে তিনি শরীরের যে দিকে নির্দেশ করেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান। তার মৃতদেহ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে আনা হলে তিনি জানতে চাইলেন, 'এই কি সেই লোক?' সাহাবিরা বললেন, 'হ্যাঁ, এই সেই লোক।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ের চাদর খুলে সেই বেদুইনের গায়ে জড়িয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চাদর জড়ানো অবস্থাতেই তাকে দাফন করা হয়। নাম-না-জানা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাদরকে নিজের কাফন হিসেবে পেয়ে গেলেন! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং শহীদ হয়েছে। আমি এর সাক্ষী থাকলাম।'[৪১]

---

[৪১] সুনান নাসাঈ, অধ্যায় জানাযা, হাদীস ১৩৭।

## ২) নাম-না-জানা এক আবিসিনিয়ান রাখালের গল্প

খাইবারের যুদ্ধের খানিক আগের কথা, খাইবারের এক আবিসিনিয়ান রাখাল দেখলো সেখানকার অধিবাসীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে জানতে চাইলো তারা কার সাথে যুদ্ধ করবে। তারা উত্তর দিলো, 'আমরা এমন লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যে দাবি করে সে আল্লাহর নবী।' এ কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল নবীজির কথা। তাঁর কথা সে আগেও শুনেছে। সে সোজা চলে গেল মুসলিমদের ক্যাম্পে, দেখা করলো আল্লাহর রাসূলের সাথে, জানতে চাইলো ইসলাম সম্পর্কে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন,

- আমি মানুষকে আহবান করি ইসলামের দিকে, যেন মানুষ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি হচ্ছি আল্লাহর রাসূল এবং মানুষ যেন কেবল আল্লাহর ইবাদাত করে।

- যদি আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহর উপর ঈমান আনি, তাহলে আমি বিনিময়ে কী পাবো?

- তুমি পাবে জান্নাত।

সেই আবিসিনিয়ান রাখালের জন্য এতটুকুই ছিল যথেষ্ট। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং জিহাদে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। জিহাদে কেন যেতে হবে, কবে যেতে হবে, সালাতের আহকাম কী -- এসব নিয়ে সে কোনো তর্ক করলো না। শুধু এতটুকুই জানতে চাইলো, তার সাথে যে ভেড়াগুলো আছে সেগুলো সে কী করবে। আসলে এটাই ছিল সময়ের দাবি। সেই আবিসিনিয়ান রাখাল, সে ছিল একজন দাস, সে যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। যুদ্ধের পর তার লাশ আনা হলো, রাসূলুল্লাহ বললেন,

> *'এ হচ্ছে এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন এবং তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে খাইবারের ময়দানের দিকে ধাবিত করেছেন। নিশ্চয়ই আমি তার পাশে দেখেছি জান্নাতের দুই হুরকে, অথচ সে এক ওয়াক্ত সালাতও কখনো আদায় করেনি (অর্থাৎ আদায়ের সুযোগ হয় নি)।'*[82]

## ৩) যুদ্ধের ময়দানের একজন হিরো, আখিরাতের খাতায় যার প্রাপ্তি শূন্য

এই যুদ্ধে এক মুসলিম সৈনিক প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। শত্রুপক্ষের কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। সাহাবিরা তাকে দেখে বলাবলি করছিলেন এই লোকের জান্নাত বুঝি নিশ্চিত! কিন্তু রাসূল ﷺ বলে উঠলেন, 'এই লোক জাহান্নামে যাবে।' সাহাবিরা কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। এমন বীরের মতো যোদ্ধা জাহান্নামে যাবে এটা কারো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! একজন সাহাবি সেই সৈনিকের পিছু নিলেন, তিনি দেখতে চান এই লোকের সাথে কী হতে চলেছে। তিনি দেখলেন, যুদ্ধ করতে

---

[82] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭।

করতে সেই লোকটি একসময় বেশ আঘাত পেল, আর আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেললো। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবি এবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ছুটে গেলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী চোখের সামনে সত্য হতে দেখে দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল!' এরপর রাসূল ﷺ সেই সাহাবিকে বললেন, 'যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, শুধুমাত্র মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাআলা চাইলে একজন ফাসিক্ব লোককেও তাঁর দ্বীনের কাজে লাগাতে পারেন।'[83]

## ৪) আবু ইয়াসার কা'ব ইবন আমরের ﷺ কাহিনী

ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন সাহাবি, খাইবারের যুদ্ধে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

*'খাইবারের এক সন্ধ্যায় আমরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে ছিলাম। এমন সময় দেখলাম এক ইহুদি ভেড়ার পাল নিয়ে দুর্গের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে। সে সময় আমরা দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, কে আমাকে এই ভেড়ার পালগুলো থেকে ভেড়া ধরে এনে খাওয়াতে পারবে? আমি বললাম, আমি পারবো! রাসূল ﷺ তখন বললেন, যাও! নিয়ে এসো!*

*আমি উটপাখির মতো জোরে দৌড়াতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্যে দুআ করলেন এই বলে -- হে আল্লাহ আমাদেরকে তার সঙ্গ দ্বারা উপকৃত করো। আমি যখন ভেড়ার পালকে নাগালে পেলাম তখন পালের প্রথম ভেড়াটি দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাই আমি পালের শেষ দিকের দুটো ভেড়া ধরে বগলদাবা করে এত জোরে দৌড় দিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল আমার সাথে কিছুই নেই! এরপর সেগুলো আল্লাহর রাসূলের কাছে ছুঁড়ে মারলাম। তারপর সেই ভেড়া জবাই করা হলো এবং সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে খেল।'*

ঘটনাটি মজার, কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আবু ইয়াসার কেঁদে দেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহচর্য পাবার দুআ করেছিলেন আর যে কারণে তিনি ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম: তার বন্ধুরা অনেকেই তার আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান, আর তিনি রয়ে যান।

## ৫) আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্য ভালোবাসা: উমাইয়্যা বিনত আবি আস-সালতের ﷺ কাহিনী

তিনি ছিলেন গিফার গোত্রের। খাইবারের সময়ের ঘটনা, গিফারের এক মহিলা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা আপনার সাথে ময়দানে যেতে চাই,

---

[83] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৪২।

যাতে আমরা আহতদের সেবা করতে পারি এবং মুসলিমদের অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করতে পারি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন। গিফার গোত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে, এরা ছিল ডাকাত গোছের একটি কুখ্যাত গোত্র। কিন্তু আবু যার আল গিফারীর رضي الله عنه বদৌলতে এই গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আর ইসলামের আলো তাদের পুরোপুরি বদলে দেয়।

গিফার গোত্রের মহিলারা মুসলিম বাহিনীর সাথে খাইবারের দিকে যাত্রা শুরু করল। সেই দলের এক বাচ্চা মেয়েকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উটের পেছনে তুলে নিলেন। উটের পিঠে অনেক মাল-সামান টাল করে রাখা। বাচ্চা মেয়েটাকে বসানো হলো সেই মালের স্তূপের ওপর।

সকাল বেলা হলে যাত্রাবিরতির সময় হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ উট থেকে নেমে পড়লেন। বাচ্চা মেয়েটি নামতে গিয়ে দেখলো মালামালের ওপরে যেখানে সে বসে ছিল সেখানে কিছু রক্ত লেগে আছে।

মেয়েটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, এ কী হয়ে গেল! এমন কাণ্ড ঘটবে সে তো কল্পনাই করেনি! সে চুপটি করে উটের পাশে বসে রইলো। নবীজি ﷺ এর ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মা যেভাবে করে তার সদ্যজাত শিশুর জন্য প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখে, সাহাবিদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ তার চেয়েও বেশি খেয়াল থাকতো। তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চা মেয়েটা কেমন এক অস্বস্তিতে গুটিসুটি মেরে আছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? হায়েজ হয়েছে?' মেয়েটি সংক্ষেপে বললো, 'হুঁ।' কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে নবীজি তাকে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি পরিষ্কার হয়ে নাও। এরপর একটা জগে পানি আর কিছু লবণ নিয়ে মালামাল থেকে রক্তগুলো পরিষ্কার করে ফেলো। আর এরপর আবার উটের পিঠে বসে পড়ো।'

সেই বাচ্চা মেয়ে নবীজির ﷺ কথামতো সবকিছু করলো। যুদ্ধের পর গনিমাহ ভাগাভাগি করার সময় এল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধে অংশ নিলেও নারী ও শিশুরা গনিমত পায় না। তবে আমীর চাইলে তাদের কিছু অংশ দেওয়ার অধিকার রাখেন। গনিমতের সম্পদ থেকে নবীজি সেই ছোট্ট উমাইয়্যার জন্য একটা গলার হার নিলেন। তারপর নিজ হাতে তাকে সেটা পরিয়ে দিলেন।[84]

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে উমাইয়্যা খুব অল্প কিছু মুহূর্তই কাটিয়েছে। কিন্তু সেই সময়টি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। দেখতে দেখতে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি একদিন বড় হলেন। কিন্তু খাইবারের সেই অসাধারণ মুহূর্তের কথা তিনি আজীবন মনে রেখেছেন। সেদিনের পর থেকে জীবনে যতবার তার ঋতুস্রাব হয়েছে, প্রত্যেক বার তিনি পানি আর লবণ ব্যবহার করে পবিত্র হতেন, একবারের জন্যেও এর অন্যথা

---

[84] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

হয়নি! তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরেও যেন তাকে এভাবেই পরিষ্কার করা হয়। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন, তখন এই হাদীস সংগ্রহকারীর কাছে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যে হার আমার ছোটবেলায় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই হার আমি কখনো খুলিনি!' মৃত্যু এসে তাকে এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, তখনো তার গলায় সেই হার ঝুলছে, যেন আখিরাতের সেই সুদীর্ঘ একাকী সফরে পা বাড়ানোর সময়েও আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্নেহটুকু তিনি বুকে করে যাত্রা শুরু করলেন।

সম্মানিত পাঠক! এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে এর সৌন্দর্য নষ্ট না করাই শ্রেয়। ছোট্ট অথচ অনন্যসাধারণ এই গল্পটা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক। আল্লাহর রাসূলকে তাঁর সাহাবি আর সাহাবিয়াতরা কতটা ভালোবাসতেন তা আসলে লিখে বা বলে কখনই বোঝানো যাবে না। তাদের ভালোবাসার গভীরতা হয়তো আমরা কিছুটা আঁচ করতে পারবো যখন এই গল্পগুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আল্লাহর রাসূল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে বলেননি যে নিজেকে পবিত্র করতে চাইলে সবসময় পানি আর লবণই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তবু তিনি সারাজীবন ধরে রাসূলের কথাটা মান্য করেছেন --- এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। কাউকে ভালোবাসলে মানুষ তাকে মনে রাখে. তার ছোট ছোট কথাগুলিও যত্ন করে স্মরণ করে, তার বলা কাজগুলো মমতা নিয়ে আগ্রহের সাথে করে যায়। সাহাবিদের কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্থান ছিল তাদের অন্তরের গভীরে। তাঁরা তাঁকে শুনতেন আর একবাক্যে মেনে নিতেন। শুধু তাহারাতের ফিক্বহ পড়ে এই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করা যাবে না।

সেই বেদুইন নারীর নাম কী ছিল সেটাও আসলে নিশ্চিত নয়, কেউ বলেন উমাইয়্যা, কেউ বলেন আমীনাহ, আল্লাহই ভালো জানেন। তার নাম যা-ই হোক, তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তার ছেলেবেলার সেই অল্প কিছু মুহূর্ত মনে রেখেছিলেন সারাটি জীবন ধরে। সেই ছোট্ট বয়সে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ বাহিনীর সাথে যাবেন বলে, তাদের সাহায্য করবেন বলে। কী অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষা আর ভালোবাসাই দেখিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূলের চারপাশের মানুষগুলো। পাঠক, আজকে আমাদের অবস্থা কোথায়, আমরা কী তা ভেবে দেখেছি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন তার চারপাশের মানুষগুলো। কোথাকার এক বেদুইন মেয়ে, নিতান্ত সাধারণ এক গোত্রের অতি সাধারণ এক বালিকা। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ কত যত্ন আর আদরভরেই না তার সাথে কথা বলেছেন! যুদ্ধের পর এত এত সৈনিকের মাঝে আলাদা করে তার নাম ধরে তাকে ডেকেছেন, নিজ হাতে তার গলায় হার পরিয়ে দিয়েছেন! সত্যিই তিনি ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তাঁর আচরণ ছিল অভাবনীয় রকমের সুন্দর, আর উম্মাতের প্রতি তাঁর মায়া এবং ভালোবাসা ছিল নিখাদ। যে মানুষগুলো তাঁর জন্য সবর্স্ব বিলিয়ে দিতে উন্মুখ হয়ে থাকতো, তাদের তিনি কখনো ভুলে যাননি। স্নেহের চাদরে মুড়ে সবসময় তাদের আগলে রেখেছেন।

## ৬) আল্লাহর রাসূলকে ﷺ হত্যার চেষ্টা

খাইবারের ইহুদিরা পরাজিত হবার পর নবীজি ﷺ এবং তাঁর কিছু সাহাবিদের দাওয়াত করেন। সাহাবিদের জন্য তারা ভেড়ার মাংস রান্না করে দিলো। আপ্যায়ন করা আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবীজিকে হত্যা করা। যাইনাব বিনতে আল-হারিস নামের এক ইহুদি মহিলা এজন্য সেই মাংসে বিষ মিশিয়ে দেয়। রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে খেতে বসলেন। তারা কেউ ভাবতে পারেনি দাওয়াতের খাবারে বিষ মেশানো থাকতে পারে। বিশর ইবন আল-বারা রাঃ নিশ্চিন্ত মনে মাংস মুখে নিলেন। নবীজিও ﷺ মাংস মুখে নিলেন কিন্তু গিলে ফেলার আগেই মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন এই খাবারে বিষ মেশানো আছে। ওদিকে বিশর ইবন আল-বারা ততক্ষণে মাংস গিলে ফেলেছেন।

সেই মহিলাকে ডাকা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো সে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ মিশিয়েছে কিনা। সে স্বীকার করলো। নবীজি ﷺ তার এই কাজের কারণ জানতে চাইলেন। মহিলা উত্তর দিল, 'আপনি যদি মিথ্যা নবী হন তাহলে এই বিষে আপনি মারা যাবেন। আর যদি আপনি সত্য নবী হন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে তা জানিয়ে দেবেন।'[85] রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি আল্লাহ্ তোমাকে দেননি।'

রাসূল ﷺ মহিলাকে তখন ছেড়ে দিলেন। এই বিষের কারণে বিশর ইবন আল-বারা মারা যান। কিছু বর্ণনামতে সেই মহিলাকে তখন হত্যা করা হয়।[86] এই ঘটনার পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও তিন বছর বেঁচে ছিলেন। নবীজির ﷺ শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন তখন আইশাকে রাঃ বলেছিলেন, 'আইশা, আমি এখনো সেই খাবারের স্বাদ[87] পাই যা আমাকে খাইবারে খাওয়ানো হয়েছিল।'

# খাইবারের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

### ১) নেতৃত্বের প্রতি লোভের ভয়াবহতা

নেতৃত্বের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকে। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা হওয়া সত্ত্বেও আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাঃ যখন নেতৃস্থানীয় পদ চেয়েছিলেন রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'আমরা তাকে এই পদ দেবো না, যে এই পদের জন্যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।' এটাই ইসলামের শিক্ষা। উমারের রাঃ ঈমানের উচ্চতা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই ছিল না। কিন্তু খাইবারের সেইদিন উমারের মতো মানুষের মনেও নেতৃত্ব পাবার ইচ্ছে কাজ করছিল। এর কারণ হলো সেদিন

---

[85] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিযিয়া এবং সন্ধি স্থাপন, হাদীস ১১।
[86] যাদুল মা'আদ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০।
[87] এখানে বিষাক্ততার কথা বলা হচ্ছে।

এমন এক লোককে নেতৃত্ব দেওয়া হবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালোবাসেন এবং সেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ ভালোবাসে। নিঃসন্দেহে এত বড় সম্মান পেতে কার না ইচ্ছে করবে!

নেতৃত্বের প্রতি লোভ কতটা খারাপ সেটা আমরা বুঝতে পারি তিরমিযীর একটি হাদীসে, রাসূল ﷺ বলেন 'যদি দুটি নেকড়েকে একপাল ভেড়ার নিকট পাঠানো হয় তাহলে নেকড়েদের দ্বারা ভেড়াগুলো যতটা না ক্ষতির সমুখীন হবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতির সমুখীন হয় একজন মানুষ যখন সে সম্পদ এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করে।' কাজেই নেতৃত্বের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা নির্মূল করা চাই, কারণ এই নেতৃত্বের বোঝা একদিন আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

## ২) জিহাদের উদ্দেশ্য

আলীর ؓ হাতে যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ পতাকা তুলে দিচ্ছিলেন তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন,

> *'...তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। আল্লাহর যে হক্ব তাদের আদায় করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের অবহিত করবে। আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও মূল্যবান।'*

এই হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা পাই, কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদের একটি উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত দেয়া। মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা, ইসলামের ছায়াতলে মানুষকে প্রবেশ করানো। জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাহিলিয়াতের প্রভাব এবং কুফর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা -- যেন ইসলাম গ্রহণের পথে মানুষের কোনো বাধা না থাকে।

জিহাদের সাথে অন্য যেকোনো যুদ্ধের পার্থক্য এখানেই। অন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদ অর্জন, ক্ষুধার তাড়না, কিংবা ক্ষমতার লোভ। কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধ করে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে, তা হলো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দেওয়া। রাসূল ﷺ বলেছেন 'আমি কিছু মানুষকে জান্নাতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখেছি।' এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা এক সময় মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছে। রাসূল ﷺ আলীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর উচিত হবে আগে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। এই দাওয়াতের ফলে যদি একজন লোকও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটাই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গনিমাহ।

## ৩) অন্তরের আন্তরিকতা

বেদুইন এবং আবিসিনিয়ান সেই রাখালের গল্প থেকে শিক্ষা হলো, কেউ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। সেই বেদুইন যেমন মৃত্যু

চেয়েছেন, আল্লাহ তাকে ঠিক সেভাবে মৃত্যু দিয়েছেন। এর কারণ হলো তিনি ছিলেন সৎ এবং আন্তরিক। জিহাদের নিয়ত তার এতটা বিশুদ্ধ ছিল যে তিনি গনিমাহ পর্যন্ত চাননি। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমাকে তরবারি সহ পাঠানো হয়েছে এবং আমার রিযিক তরবারির ছায়াতলে।' এ কারণে আলিমরা বলেন গনিমতের রিযিক হলো শ্রেষ্ঠ রিযিক। কিন্তু এই বেদুইন সাহাবি ঈমানের এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে তিনি জান্নাত ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। এবং তার এই চাওয়ার মাঝে কোনো খাদ ছিল না। তাই তিনি লাভ করেছিলেন এক বিরল সম্মান, আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাদর। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওযুর পানির জন্য সাহাবিরা কাড়াকাড়ি করতেন। আর এই বেদুইন সাহাবি কোনো কাড়াকাড়ি ছাড়াই শুধুমাত্র নিয়তের বিশুদ্ধতার জোরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাদর গায়ে জড়িয়ে কবরে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ এক বিরল সম্মান।

### ৪) গনিমতের সম্পদ চুরির ভয়াবহতা

ঘটনাটি ঘটে খাইবার অথবা খাইবার পরবর্তী ওয়াদী আল-কুরা অভিযানে। রাসূলুল্লাহর ﷺ এক সাহাবি ইহুদিদের তীরের আঘাতে মারা যান। একদল সাহাবি বলতে থাকেন, 'অমুক শহীদ হয়েছে! অমুক শহীদ হয়েছে!' কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কিছুতেই না। গনিমতের মাল থেকে যে চাদর সে চুরি করেছে, আমি দেখেছি সেই চাদর তাকে আগুন হয়ে ঘিরে রেখেছে।'[৪৪] এই লোকটি ছিলেন একজন মুসলিম, একজন মুজাহিদ। কিন্তু গনিমতের সম্পদ চুরি করা এতই ভয়াবহ অপরাধ যে, এজন্য একজন মানুষকে জাহান্নামের আগুনে যেতে হয়।

## খাইবার যুদ্ধের ফলাফল

খাইবারের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে তাদের এই মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা পরনের কাপড় পরে খাইবার ছেড়ে চলে যাবে এবং যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, জায়গা-জমি, সোনা-রুপা, ঘোড়া, বর্ম সবকিছু রেখে যাবে। রাসূল ﷺ তাদেরকে বলে দিলেন যদি তারা কোনো অর্থ-সম্পদ লুকানোর চেষ্টা করে তাহলে এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। ইহুদিদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই জাতিটি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে।

চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে খাইবারের ইহুদিরা এবার কিছু সম্পদ লুকিয়ে ফেললো। এই সম্পদগুলো ছিল বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের। বনু কুরায়যার ঘটনায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। বনু নাযিরকে যখন বের করে দেওয়া হয়, তখন হুয়াই ইবন আখতাব বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার একটি চামড়ার মাঝে লুকিয়ে খাইবারে রেখে এসেছিল। তার সেই অঢেল সম্পদ তখনও খাইবারে ছিল। বিষয়টা আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতেন। কিনানা ইবন আর-রাবীকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো,

---

[৪৪] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ২১৭।

- হুয়াইয়ের সেই সম্পদ কোথায়?

- সেই সম্পদ তো যুদ্ধ আর আমাদের থাকা খাওয়ায় খরচ হয়ে গেছে।

- না, সেটা হতে পারে না। যুদ্ধ তো মাত্র সেদিন হলো। এই অল্প ক'দিনের মাঝে এই পরিমাণ সম্পদ খরচ হয়ে যাবার কথা না।

কিনানা তবু অস্বীকার করতে থাকলো। ইহুদিরা কত সাবলীলভাবে মিথ্যা বলতে পারে এই তার একটা নমুনা। পরে এক বুড়ো ইহুদি বললো, 'আমি হুয়াই ইবন আখতাবকে প্রায়ই অমুক জায়গায় ঘুরঘুর করতে দেখতাম।' সাহাবিরা তখন সে জায়গায় গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে সেই সম্পদের কিছু অংশের সন্ধান পেলেন। কিনানাকে জিজ্ঞেস করা হলো বাকি সম্পদ কোথায়। সে আবারও বললো সে কিছুই জানেনা। তাকে আল যুবাইর ইবন আওয়্যামের হাতে তুলে দেওয়া হলো। সোজা আঙুলে যখন ঘি ওঠে না, তখন তাকে বাঁকা করতেই হয়। তিনি তাকে মারধোর করে বাকি সম্পদের ব্যাপারে তথ্য বের করলেন। এরপর কিনানাকে তুলে দেওয়া হয় মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার ﷺ হাতে। এই সেই কিনানা যে তার ভাই মাহমুদ ইবন মাসলামাকে হত্যা করেছে। আজ সে তার হাতের মুঠোয়! তিনি কিনানাকে হত্যা করে ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেন।[89]

দুর্গ থেকে বের হয়ে ইহুদিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করলো যেন তাদেরকে খাইবারে থাকতে দেওয়া হয়। তারা বললো, 'আমরা আপনাদের চাইতে এই ভূমি চাষাবাদে বেশি দক্ষ ।' এই কথা বলে আসলে তারা খাইবারে তাদের থাকতে দেওয়ার জন্য নবীজিকে মানানোর চেষ্টা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক ইহুদিরা পাবে -- এই শর্তে ইহুদিরা খাইবারে থেকে যাওয়ার অনুমতি পেল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শর্ত আরোপ করে দিলেন। তা হলো -- মুসলিমরা যখন চাইবে, তখনই তাদেরকে খাইবার থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

ইহুদিদের খাইবারে চাষাবাদ করতে দেওয়াটা মুসলিমদের জন্য লাভজনক ছিল। কেননা সাহাবিদের হাতে জমি দেখাশোনা করার সময় ছিল না। তারা ব্যস্ত ছিলেন ইলম, দাওয়াহ আর জিহাদ নিয়ে। উপরন্তু ইহুদিরা ছিল খাইবারের জমি চাষাবাদে দক্ষ।

ইহুদিদের সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। এ পর্যন্ত প্রতিটি ইহুদি গোত্র মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেছে। তাই যেকোনো মুহূর্তে তাদের খাইবার থেকে বের করে দেওয়ার শর্তারোপ করে তাদের সার্বক্ষণিক চাপের মুখে রাখলেন। এতকিছুর পরেও তাদের চরিত্র বদলায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে খাইবারের উৎপাদিত শস্যের পরিমাপ করে আনতে পাঠাতেন। প্রথমে তারা তার পরিমাপ করার পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানায়, পরে তারা তাকে ঘুষ দিয়ে

---

[89] সীরাহ ইবন হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪।

কিনে নিতে চায়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﵁ খুব রেগে যান। তাদের বলেন, 'আল্লাহর দুশমন কোথাকার! তোরা আমাকে ঘুষ দিতে চাস? তোরা জেনে রাখ, তোদের প্রতি ঘৃণা আর আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি আমার ভালোবাসা আমাকে তোদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার পথে কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না!'

পরে অবশ্য তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণই করেছিলেন। পরবর্তীতে খাইবারের ইহুদিরা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। উমারের ﵁ খিলাফতকালে তারা আবদুল্লাহ ইবন উমারকে ﵁ ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে দুই হাত ভেঙে দেয়। এর আগে আল্লাহর রাসূলের ﷺ যুগেই এক সাহাবিকে হত্যা করেছিল কিন্তু সেবার শক্ত প্রমাণ ছিল না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমারের সাথে তারা যা করেছিল সেটা ছিল সন্দেহাতীত। তাই উমার ﵁ তাদেরকে আর সুযোগ দেননি, খাইবার থেকে বের করে দেন। এরপর তারা শামে চলে যায়।

খাইবার বিজয়ের মাধ্যমে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা বেশ সচল হয়। কারণ খাইবার থেকে মুসলিমরা বিপুল গনিমাহ অর্জন করে। আবদুল্লাহ ইবন উমারের ﵁ একটি কথাতেই বোঝা যায় খাইবারের বিজয় তাদের জীবনে কতটা পরিবর্তন এনেছিল। তিনি বলেন, 'খাইবার বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমাদের পেট ভরে এক বেলা খাওয়া হতো না।' মুহাজিররা খেজুর বাগানগুলো আনসারদের ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। খাইবারের যখন পতন হচ্ছিল তখন ফাদাকের অধিবাসীরা আগেভাগেই আত্মসমর্পণ করে ফেলে। তাদের সাথেও অর্ধেক ফসল ভাগাভাগির চুক্তি হয়। তবে এই ফসলের মালিক হন কেবল আল্লাহর রাসূল কেননা, তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ছিল ফাঈ, গনিমাহ নয়। কারণ ফাদাক সামরিক শক্তির জোরে বিজয় হয়নি। এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আর্থিক অবস্থা সহজ হয়ে যায়।

খাইবারের সাথে আরও দুটি অঞ্চল বিজয় হয়। সেগুলো হলো ওয়াদী আল-কুরা এবং তাইমা। ওয়াদী আল-কুরার ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের সাথে খাইবারের অনুরূপ চুক্তি করা হয়। আর তাইমার অধিবাসীরা ফাদাকের মতো যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে।

মুসলিমদের হাতে খাইবার, ফাদাক, ওয়াদী আল-কুরা এবং তাইমার পতন নিয়ে গোটা আরব আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। কুরাইশরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না দুর্ভেদ্য দুর্গ, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর দীর্ঘকালীন রসদ সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও খাইবারের পতন হয়েছে। এই পরাজয়ের মাধ্যমে কুরাইশরা একটি বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকলো। আরব উপদ্বীপের দরজা ইসলামের জন্য আরও উন্মুক্ত হয়ে গেল।

# সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের ﵁ সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে

সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের ﵁ সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিয়ের কাহিনী জানার আগে একটু পেছনে তাকানো যাক। এই সাফিয়া হচ্ছেন ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা। এ হচ্ছে সেই হুয়াই, যে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পর থেকেই তাঁর সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিল। এটি সাফিয়ার ছোটবেলার একটি ঘটনা। এই প্রতিজ্ঞার ঘটনাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই হুয়াই-ই খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্রের বিদ্রোহের পেছনে অন্যতম হোতা। তাকে বনু কুরায়যার ঘটনায় হত্যা করা হয়। তার ভাইও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাকেও হত্যা করা হয়। সাফিয়ার স্বামী ছিলেন কিনানা ইবন আর-রাবী। সে ছিল বনু নাযিরের কোষাধ্যক্ষ। তার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাফিয়া যেনতেন কোনো পরিবারের কন্যা ছিলেন না। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় একটি পরিবারের মেয়ে। বলা যেতে পারে তাঁর গোত্রের 'ফার্স্ট লেডি'।

খাইবারের যুদ্ধে তাঁর বাবা, ভাই এবং স্বামী -- প্রত্যেকে মুসলিমদের হাতে মারা যায়। সাফিয়া ﵁ দাসী হিসেবে বন্দী হলেন। গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগি হওয়ার পর তিনি পড়লেন দাহিয়া আল-কালবির ﵁ ভাগে। তখন কেউ একজন আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন, 'সাফিয়া তো ইহুদিদের মধ্যে উঁচু বংশের সন্তান। তিনি দাহিয়ার ভাগে পড়েছেন, কিন্তু সত্যি বলতে, তার জন্য উপযুক্ত পাত্র কেবল একজনই আছে। তিনি হচ্ছেন আপনি।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন দাহিয়াকে ডেকে বললেন সাফিয়াকে ﵁ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে বেছে নিতে। দাহিয়া তাই করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সাফিয়াকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। সেক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করে নেবেন এবং তার দাসমুক্তি হবে বিয়ের মোহর। দ্বিতীয় আরেকটি প্রস্তাব দিলেন, সাফিয়া চাইলে ইহুদি হিসেবে থেকে যেতে পারেন। সাফিয়া বেছে নিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের বিয়ে হলো। এই বিয়ে হয়েছিল সাফিয়ার মাসিক সম্পন্ন হওয়ার পর। সে পর্যন্ত তারা খাইবারেই ছিলেন।

এবার খাইবার থেকে ফেরার পেলা। সাফিয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পেছনে বসালেন। ফিরতি পথে ছয় মাইল গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতি নিতে চাইলেন যেন স্ত্রীর সাথে থেকে বিয়ে পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু সাফিয়া ﵁ রাজি হলেন না। বিষয়টা রাসূলুল্লাহকে ﷺ একটু অসুবিধায় ফেলে দিল, কিন্তু তিনি সাফিয়াকে কিছুই বললেন না। পরে তারা আস-সাহবায় থামলেন এবং সেখানেই ওয়ালিমা অনুষ্ঠিত হলো। বিয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়ার ﵁ কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি প্রথমবার থামতে রাজি হলেন না। তখন সাফিয়া ব্যাখ্যা করলেন, 'ঐ এলাকাটা ছিল ইহুদিদের কাছে, তাই আমি আপনার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন। সাফিয়ার উত্তর সাফিয়ার অন্তরের কথাকে

প্রকাশ করে। তিনি যদি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ না করতেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তা নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন হতেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে নারীর স্বামী, ভাই, বাবা সবাই মুসলিমের হাতে মারা গিয়েছে, সেই নারী কীভাবে সেই মুসলিমদের নেতাকে ভালোবাসতে পারে? কীভাবে সে সেই ইসলামকে দ্বীন হিসেবে বেছে নেয়, যার অনুসারীরা তার সবচেয়ে আপনজনদের হত্যা করেছে? সেই প্রশ্নে একটু পরেই আসা যাক।

ওয়ালিমা শেষে যখন তারা ফিরে আসবেন, তখনকার ছোট্ট একটা ঘটনা রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বড় একটা ধারণা দেয়। তারা মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন, সাফিয়া উটের পিঠে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ের চাদর খুলে সাফিয়ার বসার জন্য বালিশ বানিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিলেন। এরপর নিজের হাঁটু উঁচু করে তুলে ধরলেন যেন সেই হাঁটুর উপর ভর করে সাফিয়া উটের পিঠে উঠতে পারেন।[90]

ইহুদিদের চোখে যিনি আরবদের নেতা, মুসলিমদের কাছে যিনি আল্লাহর রাসূল, সদ্য যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আসা সেই বীর মানুষটি তাঁর স্ত্রীর জন্য মাটিতে বসে পড়েছেন। সবার সামনে স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। এত বিনয়, দয়া আর মমতা যে মানুষটির তাঁকে ভালো না বেসে কি থাকা যায়?

সাফিয়া ছোটবেলাতেই জেনেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সত্য নবী। তার বাবার মুখেই তিনি তা জেনেছেন। কিন্তু এটাই ছিল তার জন্য দুঃখজনক বাস্তবতা যে তার বাবা, স্বামী, ভাই -- সবাই আল্লাহর রাসূলের বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। তার গোত্রের লোকদের আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনা থেকে বের করে দিয়েছেন। এসব কিছুই ঘটেছে তার চোখের সামনে। তিনি তখন একজন কমবয়সী নারী। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি তার একটা ক্ষোভ কাজ করার কথা। আল্লাহর রাসূল ﷺ কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সাফিয়ার আবেগগুলোকে উপেক্ষা করেননি, বরং নিজের আবেগটাও প্রকাশ করেছেন। তিনি সাফিয়ার কাছে তার বাবা আর স্বামীর মারা যাবার বিষয়টা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন। তাকে বুঝিয়ে বলতেন তার বাবা হুয়াইয়ের কী অপরাধ ছিল। এভাবে বোঝাতে বোঝাতে একসময় সাফিয়ার মন থেকে সব রাগ-ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। দুঃখের যে ভারী বোঝাটা তার মনে পাথরের মতো চেপে ছিল, সেটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেল। পিতা, স্বামী আর আপনজনদের হারালেন সত্যি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে সাফিয়ার নতুন জীবন শুরু হলো।

বিয়ের পরের ঘটনা, আল্লাহর রাসূল দেখলেন সাফিয়ার মুখে নীল দাগ। তিনি জানতে চাইলেন এই দাগ কীভাবে হলো। সাফিয়া বলতে শুরু করলেন, 'একদিন আমি

---

[90] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয়, হাদীস ১৮১।

ঘুমাচ্ছিলাম। আমার মাথা ছিল আমার স্বামীর কোলে, তখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার কোলের উপর চাঁদ এসে পড়লো। জেগে উঠে স্বামীকে স্বপ্নের কথা বললাম। আমার স্বামী আমাকে থাপ্পড় মেরে বললো, তুই আরবের বাদশাহকে পেতে চাস!'[৭]

সেদিন হয়তো সাফিয়া সেই ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্নই পরবর্তীতে কত চমৎকারভাবে সাফিয়ার জীবনকে পাল্টে দিলো। এই স্বপ্ন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সাফিয়ার বিয়ে হবে। কিনানা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে সাফিয়া আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বিয়ে করতে চান। আসলে এটা তার চাওয়া ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে একটি সত্য স্বপ্ন, ভবিষ্যতে কী হবে তার ব্যাপারে ইঙ্গিত।

আগের সেই প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক, কীভাবে একজন নারীর পক্ষে তার স্বামী আর পিতার হত্যাকারীকে বিয়ে করা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে দেওয়া সম্ভব, তা হচ্ছে ঈমান। সাফিয়া তাঁর স্বামী আর বাবার সাথে বন্ধন থেকে ঈমানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ঈমানকে সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আর তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ হয়ে যান তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ! রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের কথা তিনি সেই ছোটবেলা থেকেই জানতেন। আর যখন সেই প্রতীক্ষিত নবী তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তিনি স্বেচ্ছায়, আগ্রহের সাথে এই বিয়েতে সম্মত হলেন। যার অন্তরে ঈমান নেই, সে কখনো সাফিয়ার এই সিদ্ধান্তকে কদর করতে পারবে না।

সত্যি বলতে এই বিয়ে ছিল সাফিয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। এই বিয়ের মাধ্যমে সাফিয়া জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে হয়ে শুধু যে জান্নাতী হলেন তা-ই না, তিনি হয়ে গেলেন সেরা নারীদের একজন -- উম্মুল মুমিনীন। সাফিয়ার পরবর্তী জীবন থেকে এটা স্পষ্ট যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ কতটা ভালোবাসতেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিজের জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন, তখন সাফিয়া বলে উঠেন, 'ইশ! আজ যদি আপনার জায়গায় আমি থাকতাম!' ঈমান এভাবেই মানুষের অন্তরকে বদলে দেয়। আল্লাহ তাআলা উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়ার رضي الله عنها ওপর সন্তুষ্ট হোন।

এ প্রসঙ্গে আবু আইয়ুব আল আনসারীর رضي الله عنه একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। সাফিয়ার رضي الله عنها সাথে বিয়ে হওয়ার পর যে রাতে আল্লাহর রাসূল তার সাথে থাকলেন, সে রাতে আবু আইয়ুব আল আনসারী সারা রাত সেই তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নবীজিকে ﷺ পাহারা দেন। সকাল বেলা উঠে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু আইয়ুবকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার আবু আইয়ুব! তুমি এখানে কেন?' আবু আইয়ুব তখন উত্তর দিলেন, 'আমি এই মহিলাকে নিয়ে আপনার জীবনের ব্যাপারে

---

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

আশঙ্কাবোধ করছিলাম আল্লাহর রাসূল। এই মহিলার বাবা, স্বামী আর আপনজনেরা নিহত হয়েছে। আর কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন একজন কাফির। আমি আশঙ্কা করছিলাম যদি প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে তিনি আপনার কোনো ক্ষতি করতে চান -- তাই আমি সারারাত আপনাকে পাহারা দিয়েছি।' আবু আইয়ুবের এই সন্দেহ যদিও অমূলক ছিল, তবু তার দুশ্চিন্তা বলে দেয় তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ কতটা ভালোবাসতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ওপর খুশি হয়ে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ আবু আইয়ুব, আমাকে সারারাত যেভাবে পাহারা দিয়েছে, আপনি সেভাবে তাকে রক্ষা করুন।'

# মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

*'আমি জানি না আজ আমি কেন এত খুশি ... খাইবার বিজয় নাকি জাফর ইবন আবি তালিবের ফিরে আসা... '*

আবিসিনিয়ার মুহাজিররা যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন এভাবেই আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব ছিলেন আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই। দীর্ঘদিন পরে তাকে ফিরে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেন। জাফর ইবন আবি তালিবকে কাছে পাওয়া ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনে অত্যন্ত আনন্দের একটা ঘটনা। জাফর ইবন আবি তালিব ছিলেন আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের আমীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে নাজাশির কাছে পাঠান যেন তিনি মুহাজিরদের মদীনায় পাঠিয়ে দেন। নাজাশি সানন্দে দুটো জাহাজে করে সবাইকে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। এই দলের সাথে আরও একটি দল ছিল। সেটি হচ্ছে আশআরী গোত্র থেকে আগত ৫৩ থেকে ৫৯ জনের একটি দল। সেই দলে ছিলেন রাসূলুল্লাহর সাহাবি আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ। তারা যখন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা শুনলেন, তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে হিজরত করে চলে আসবেন। তারা জাহাজে উঠে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণে তাদের জাহাজ মদীনায় না পৌঁছে আবিসিনিয়ার তীরে ভিড়ে। তখন তারা জাফর ইবন আবি তালিবের সন্ধান পেলেন এবং সেখানেই থাকতে শুরু করলেন।

জাফর ইবন আবি তালিবের নেতৃত্বে মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় ছিলেন প্রায় দশ বছর। এই দশ বছরে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে যায়। আল্লাহর রাসূলের হিজরত, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি। এ কারণে মদীনার কেউ কেউ মনে করেন তারা বুঝি আবিসিনিয়ার মুসলিমদের থেকে এগিয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে মদীনার মুসলিম উমার ইবন খাত্তাব ﷺ এবং আবিসিনিয়া ফেরত সাহাবিয়াত আসমা বিনত উমাইসের ﷺ একটি কথোপকথন আছে, যা প্রথম খণ্ডে ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঘটনাটি আবার উল্লেখ করা হলো।

আসমা ছিলেন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রী। তিনি একদিন উমারের বাসায় হাফসার সাথে দেখা করতে আসলেন। আসমাকে দেখে উমার বললেন, 'ইনি কি সেই আবিসিনিয়া থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে আসা মহিলা?' হাফসা বললেন, 'হ্যাঁ, ইনিই সেই।' উমার তখন আসমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা আপনাদের আগে হিজরত করেছি তাই আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আপনাদের থেকে বেশি হক্বদার।'

এই কথায় আসমা কিছুটা রেগে গেলেন। পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, 'না, তা হতে পারে না, আপনারা আমাদের চাইতে রাসূলের ﷺ বেশি ঘনিষ্ঠ নন। আপনারা তো আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকতেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়ে দিতেন, মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে, অপ্রিয় এক রাজ্যে। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাচ্ছি। আপনি যে কথা বললেন, সেটা তাঁকে বলবো। বাড়িয়ে-চড়িয়ে কিছুই বলব না, এরপর দেখি উনি কী বলেন।'

আসমার অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন, 'তুমি উত্তরে কী বলেছো?' আসমা তাঁর দেওয়া উত্তরটি রাসূলুল্লাহকে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো আসমা, আমার প্রতি উমার আর তার সঙ্গীদের হক্ব তোমাদের চেয়ে বেশি তো নয়। তারা একটি হিজরতের পুরস্কার পাবে আর তোমরা পাবে দুটি হিজরতের পুরস্কার।'

এ কথা শুনে আসমার মন খুশিতে ভরে উঠলো! এতদিন তারা আল্লাহর রাসূলের থেকে দূরে ছিলেন, সেই শূন্যতার যে নিদারুণ কষ্ট তা যেন এই অসামান্য প্রাপ্তির জন্য নিমিষেই মিলিয়ে গেল। এই হাদীস ছিল আবিসিনিয়া ফেরত সাহাবিদের প্রিয় হাদীস। তারা ঘুরেফিরে বারবার এই হাদীসটা শুনতে চাইতেন। দল বেঁধে আসমার কাছে আসতেন এই কথাগুলো শুনতে, এই হাদীস শুনে তাদের মন ভরে যেতো। আসমার ভাষায়, 'গোটা দুনিয়ায় এ হাদীসের চাইতে প্রিয় তাদের আর কিছু ছিল না।'

একই সময়ে আরও দুটো দল আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আসে। এর মধ্যে একটি হলো শাম অঞ্চলের আদ-দারিঈন থেকে আগত আল-লাখাম গোত্রের লোক। সেখানে ছিলেন তামিম আদ-দারী ﷺ। তিনি দাজ্জালের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরেকটি দলের আগমন ঘটে ইয়েমেন থেকে, তারা ছিল ইয়েমেনের দাউস গোত্রের। এই দলে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা ﷺ। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার মদীনায় হিজরত করে। মদীনায় এসে তারা জানতে পারেন আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবারে অবস্থান করছেন। তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলিত হতে এত আগ্রহী ছিলেন যে তারা মদীনায় অপেক্ষা না করে খাইবারে চলে যান। সেখানে আল্লাহর রাসূলের দেখা পান।

খাইবার থেকে ফিরে আসার পথে একটি ছোট্ট শিক্ষণীয় ঘটনা আছে। খাইবার থেকে ফেরার পথে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে ﷺ বলেন তিনি যেন ফজরের সময় সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু বিলাল ঘুম থেকে উঠতে না পারায় সবারই ফজরের

সালাত ছুটে যায়। সূর্যের তাপে সবার ঘুম ভাঙে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা যদি কখনো সালাতের কথা ভুলে যাও, তাহলে যখনই সালাতের কথা মনে পড়বে, সাথে সাথে আদায় করবে।' এই বিষয়টা অনেকেই ভুল করে। অনেককে দেখা যায়, ফজরের সালাত ছুটে গেলে সাথে সাথে আদায় না করে যুহরের ওয়াক্তের জন্য জমা করে রাখছে। এটা ঠিক নয়। ঘুমের কারণে বা ভুলে গিয়ে কোনো সালাত অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে সেটা আদায় করে নিতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না।

## আল-হাজ্জাজ ইবন ইলাত আস-সালামির رضي الله عنه ঘটনা

আল-হাজ্জাজ ছিলেন বনু সুলাইম গোত্রের ধনী ব্যবসায়ী। মক্কায় তার অনেক সম্পত্তি ছিল। তার স্ত্রীও থাকতেন মক্কায়। তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন এই খবর শুনলে কুরাইশরা তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমার পরিবার আর সম্পদ মক্কায় ফেলে এসেছি। আমি এসব ফিরে পেতে চাই। এগুলো উদ্ধার করার জন্য কি আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি?' আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আল-হাজ্জাজের পরিকল্পনা ছিল কুরাইশদের কাছে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে তাদের আস্থাভাজন হয়ে তাদের কাছ থেকে তার সম্পদ নিয়ে মদীনায় চলে আসা।

আল-হাজ্জাজ মক্কায় গিয়ে গুজব ছড়ালেন -- মুসলিমরা খাইবারে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। খাইবারের ইহুদিদের পরাজয়ের খবর তখনো কুরাইশদের কানে পৌঁছায়নি। আল-হাজ্জাজের এই গুজব দাবানলের মতো মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। কুরাইশরা খুশিতে আটখানা হয়ে গেল। আল-হাজ্জাজ সেই সুযোগে বললেন, 'আমি এসেছি আমার সম্পদ নিয়ে যেতে।' কুরাইশরা খুশি মনে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলো। আল-হাজ্জাজ যে তাদের এভাবে বোকা বানাবে সেটা তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি।

এদিকে মক্কার মুসলিমদের যেন শোকের কালো ছায়া গ্রাস করলো। কষ্টে-দুঃখে তারা একেবারে ভেঙে পড়লেন। আল-আব্বাস এই গুজব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও পাচ্ছিলেন না। তিনি আল-হাজ্জাজের কাছে তার দাসকে পাঠালেন। আল-হাজ্জাজ সেই দাসকে বললেন, 'আব্বাসকে বলবে সে যেন আমার সাথে গোপনে দেখা করে।' আব্বাস এই কথা শুনে সাথে সাথে বুঝে ফেললেন এই খবর আসলে একটা গুজব। খুশির চোটে তিনি তার সেই দাসটিকে আযাদ-ই করে দিলেন।

আল-হাজ্জাজ এরপর আল-আব্বাসের সাথে সরাসরি দেখা করলেন। বললেন, 'শোনো, তুমি যেটা শুনেছো, সেটা সত্য নয়। আসল খবর হচ্ছে, মুহাম্মাদ ﷺ ইহুদিদের

পরাজিত করেছেন। তাদের জায়গা দখল করেছেন এবং তাদের গনিমত বণ্টন করেছেন। আর তাদের রাজার মেয়েকে মুহাম্মাদ ﷺ বিয়ে করে নিয়েছেন। আমি গুজব ছড়িয়েছি যেন আমি আমার সম্পদ উদ্ধার করে নিতে পারি। আমি মুসলিম হয়েছি জানলে কুরাইশরা আমার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিতে পারে। আব্বাস, তুমি আমাকে তিন দিন সময় দাও। এই কথাগুলো তুমি তিন দিনের জন্য গোপন রাখবে, এরপর যা খুশি তা করো।'

তিন দিন পর আব্বাস গেলেন আল-হাজ্জাজের স্ত্রীর কাছে। আল-হাজ্জাজ ততক্ষণে চলে গেছেন। আল-হাজ্জাজ তার স্ত্রীকেও জানাননি তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল। আল-হাজ্জাজের স্ত্রী তাই আব্বাসকে মুসলিমদের পরাজয়ের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আব্বাস তখন আসল কথা জানালেন, বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, সেই ঘটনাই ঘটেছে যা আমরা শুনতে ভালোবাসি! আল্লাহ নবীজিকে ﷺ খাইবারের বিজয়ের বরকত দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফিয়াকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তুমি যদি তোমার স্বামীকে চাও, তাহলে তুমি বরং তার সাথে যোগ দাও।' আল-হাজ্জাজের স্ত্রী তখন স্বামীর কাছে চলে গেলেন।

এরপর আল-আব্বাস ভালো পোশাক পরে কুরাইশদের আড্ডাখানায় গেলেন। আব্বাসের কুনিয়া নাম ছিল আবুল ফাদল। কুরাইশরা তাকে দেখে বললো, 'তোমার কল্যাণ হোক আবুল ফাদল!' আব্বাস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আমার উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে। হাজ্জাজ আমাকে জানিয়েছে আল্লাহ মুহাম্মাদকে ﷺ খাইবারের বিজয় দিয়েছেন। মুসলিমরা খাইবার জয় করেছে আর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফিয়াকে বিয়ে করেছেন। সে আমাকে বলেছে এই খবর যেন আমি তিন দিন গোপন রাখি। কারণ সে এসেছে কেবল তার সম্পদ ফিরিয়ে নিতে এবং সেটা সে করে চলে গেছে।'[92]

মক্কার আবহাওয়া মুহূর্তের মাঝে একশো আশি ডিগ্রী মোড় নিল। মুসলিমদের তিনদিনের কষ্ট উবে গিয়ে উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গেল! আর কুরাইশদের ছেঁকে ধরলো হতাশা আর গ্লানি।

### শিক্ষা

মক্কার মুসলিমরা মক্কায় থাকতেন ঠিকই, কিন্তু তারা নিজেদের মুসলিমদের মূলধারার অংশ হিসেবে দেখতেন এবং তারা বিশ্বস্ত ছিলেন মদীনার প্রতি। তারা নিজেদেরকে "মক্কার নাগরিক" হিসেবে নয়, বরং একজন মুসলিম হিসেবে দেখতেন। তারা নিজের দেশের স্বার্থ দেখতেন না, তারা দেখতেন মুসলিমদের স্বার্থ। মদীনার মুসলিমদের কষ্টে তারা কষ্ট পেতেন, তাদের আনন্দে খুশি হতেন। তারা মক্কার অধিবাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু মক্কার কুরাইশদের প্রতি তাদের কোনো সমর্থন ছিল না। তাদের অন্তর ছিল

---

[92] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০।

আল্লাহর রাসূল আর মুসলিমদের সাথে একাত্ম। কুরাইশদের চাপ থাকা সত্ত্বেও তারা মদীনাকে সমর্থন করে গেছেন। তারা আত্মপরিচয় সংকটে ভোগেননি, যেমনটা আজ কিছু পশ্চিমা মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। মক্কার মুসলিমদের উপর অনেক জুলুম-নির্যাতন হয়েছিল। কিন্তু সবার কথা ভেবে তারা সেসব সয়ে নিয়েছেন, সেজন্য তারা জিহাদের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় এর বিপরীতটা দেখা যায়।

# খাইবার পরবর্তী সামরিক অভিযান

## ১) বনু ফাজারার বিরুদ্ধে সারিয়া

এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু বকর আস-সিদ্দীক ﵁। মুসলিমদের আক্রমণের মুখে তারা তাদের নারী-শিশু সহ পাহাড়ের দিকে পালাতে থাকে। তাদের পিছু নেন সালামাহ ইবন আল-আকওয়া ﵁, তিনি তাদের পালাবার পথে এমনভাবে তীর ছুঁড়তে থাকেন যে তারা থামতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি তাদের বন্দী করে আবু বকরের ﵁ কাছে নিয়ে আসেন। বন্দীদের মধ্যে একজন নারীকে সালামাহর খুব পছন্দ হয়ে যায়। তিনি তাকে দাসী হিসেবে রাখতে চাইলেন। আবু বকর সেই সুন্দরী নারীকে দাসী হিসেবে সালামাহকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সালামাহকে বলেন যেন তিনি এই নারীকে ফিরিয়ে দেন। সালামাহ কিছুটা অনিচ্ছার সাথে সেই নারীকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ হাতে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন সেই নারীকে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দেন যেন তার বিনিময়ে কুরাইশদের হাত থেকে কিছু বন্দী মুসলিমদের ছাড়িয়ে আনা যায়।[93]

এই সারিয়া থেকে শিক্ষা হলো মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার গুরুত্ব। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'বন্দীকে মুক্ত করো।' মুসলিম বন্দীদের কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করা একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। এই ঘটনায় আমরা দেখি একজন নারীকে একজন সাহাবির পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন যেন তার বিনিময়ে কিছু মুসলিমদের ছাড়িয়ে আনা যায়।

## ২) গালিব ইবন আবদুল্লাহর ﵁ সারিয়াহ

ত্রিশ জন মুসলিমকে পাঠানো হয় বনু মুলাউয়ি গোত্রের বিরুদ্ধে। এরা ছিল গাতফানের একটি গোত্র। অভিযান করতে গিয়ে তারা শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়েন এবং তাদের প্রায় সবাই শহীদ হয়ে যান। অভিযানের নেতা বাশির ইবন সাদ আহত হন, জান নিয়ে কোনোরকমে মদীনায় ফেরত আসেন। এই আক্রমণের জবাব দিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকটি সারিয়া প্রেরণ করেন। এই সারিয়ার কমান্ডার ছিলেন গালিব ইবন আবদুল্লাহ ﵁। যাত্রাপথে বনু মুলাউয়ির এক লোককে গুপ্তচর মনে করে গ্রেপ্তার করেন।

---

[93] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৫৪।

লোকটির নাম হারিস ইবন মালিক। সে বললো, 'আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করলে? আমি তো মুসলিম হতে এসেছি।' গালিব তাকে বললেন, 'তুমি যদি সত্য বলে থাকো, তাহলে একদিন একরাত বন্দী হয়ে থাকলে এমন কিছু যায় আসে না।' গালিব তাকে একদিনের জন্য বন্দী রাখতে চাচ্ছিলেন কারণ সে যদি গুপ্তচর হয়ে থাকে তাহলে সে শত্রুদের কাছে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। সমস্যা হচ্ছে লোকটি দাবি করেছে সে মুসলিম হতে চেয়েছে আর একজন মুসলিমকে বন্দী করে রাখা যায় না। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে তাকে একদিনের জন্য বন্দী না রাখলে পুরো বাহিনীই বিপদের মুখে পড়তে পারে।

যা-ই হোক, শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি করার জন্য জুনদুব ইবন মাকিস একটা পাহাড়ে ওঠেন। পাহাড়ে উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন যেন শত্রুরা তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু তবুও কীভাবে কীভাবে যেন শত্রুপক্ষের একজন তাকে দেখে ফেলে, তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীর এসে জুনদুবের শরীরে বিদ্ধ হয়। প্রচণ্ড ব্যথায় তার শরীর যেন বিষিয়ে উঠলো। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার উপর পুরো বাহিনীর নিরাপত্তা নির্ভর করছে। টুঁ শব্দটি করলেও মুসলিমদের অবস্থান শত্রুদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে।

জুনদুব সেই ভয়ঙ্কর ব্যথা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিলেন। শত্রুরা যেন তার উপস্থিতি টের না পায়, তার জন্য যেন মুসলিমদের অভিযান ভণ্ডুল না হয়ে যায়। এরপর আস্তে করে তীরটি খুলে ফেলেন। এই কঠিন মুহূর্তে কীভাবে একটা মানুষ এতটা সবর করতে পারে? যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, তবু জুনদুব নিজের শরীরকে স্থির ধরে রেখেছেন। এই অধ্যবসায়, এই ধৈর্য কোথা থেকে এল? এটা ছিল তাদের ঈমানের ফল। আল্লাহর ওপর তাদের বিশ্বাস কতটা জোরালো ছিল আর জিহাদের ব্যাপারে তারা কতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন -- এই ঘটনা তার একটি চমৎকার উদাহরণ।

এরপর আরও একটি তীর জুনদুবের গায়ে বিঁধে। এবারো তিনি নড়াচড়া না করে তীরটি আস্তে করে খুলে ফেলেন। কোনোকিছুর নড়াচড়া না দেখে সেই তীর নিক্ষেপকারী লোকটি চলে যায়। সে ভাবলো কেউ বুঝি নেই। পরবর্তীতে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে তাদের উট এবং অন্য সম্পদ দখল করে নেন। শত্রুরাও তাদের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ধাওয়া করা শুরু করে। এই পর্যায়ে তাদের মোকাবেলা করার মতো অবস্থা মুসলিম বাহিনীর ছিল না। তারা পিছু হটতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা সেই স্থানে বৃষ্টিবর্ষণ করে প্লাবন ঘটান যার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

গালিব ইবন আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন আরেকটি সারিয়া ছিল বনু আউয়াল এবং বনু আবদ ইবন সালাবার উদ্দেশ্যে। এই অভিযানে উসামা ইবন যাইদের ﷺ একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। তিনি এই অভিযানে এক লোককে গ্রেপ্তার করেন। সে তখন বলে

উঠে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' কিন্তু উসামা তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার যুক্তি ছিল নিশ্চয়ই লোকটা জান বাঁচানোর জন্য কালিমা পড়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ঘটনা শুনে প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উসামাকে বললেন,

> *'তুমি কি লোকটার বুক চিরে দেখেছো সে সত্যি বলছে না মিথ্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছো?'*[94]

এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বাহ্যিক অবস্থার উপর একজন মানুষকে বিচার করতে হবে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছো যে সত্যি বলছে নাকি মিথ্যা? একজন মানুষ যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, তখন তাকে ঈমানদার ধরতে হবে, নিছক সন্দেহের কারণে তাকে কাফির ভাবা যাবে না। তবে ঈমান আনার দাবি করার পরেও যদি তার কাছ থেকে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও প্রকাশ্য কুফরির দিকটাই নিতে হবে। অন্তর ফেঁড়ে দেখা আমাদের দায়িত্ব নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো মুসলিম রক্তের পবিত্রতা। বিনা কারণে একজন মুসলিমকে হত্যা করা ভয়াবহ একটি পাপ। আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা যায় এটা মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ। একজন মুসলিমের রক্ত পবিত্র, এবং হাদীসে এসেছে কাবাঘর থেকেও মুসলিমদের রক্ত দামি।

### ৩) আবু হাদরাদের ﷺ সারিয়াহ

আবু হাদরাদ ﷺ দুইশো দিরহাম মোহরের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মোহর আদায় করার সামর্থ্য তার ছিল না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। এত মোটা অংকের মোহর রাসূলুল্লাহর ﷺ পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'সুবহানআল্লাহ! টাকা যদি স্রোতের মতো ভেসে আসতো তবুও তো এত মোহর ধরা ঠিক হতো না। তোমাকে সাহায্য করার মতো কিছুই আমার কাছে নেই।'[95]

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু হাদরাদ সহ আরও দুজনকে পাঠালেন কায়েস নামের এক লোককে শায়েস্তা করার জন্য। সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করছিল। এই অভিযানে দেওয়ার মতো রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছিল একটি দুবলা পাতলা উট। সেই উটকে সম্বল করে তারা তিনজন বের হলেন। তারা সেই লোককে হত্যা করতে সমর্থ হন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু হাদরাদকে তেরোটি উট দেন। এই উট দিয়ে তিনি মোহর পরিশোধ করেন।

---

[94] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ১৮৩।

[95] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

ইয়াসির ইবন রাজাম নামের এক ইহুদি গাতফানের লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক করার চেষ্টা করছিল। তার কাছে ত্রিশ সৈনিক সহ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠানো হয়। তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, তাকে খাইবারের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। তখন ইয়াসির তার ত্রিশ সঙ্গীসহ মদীনায় যেতে রাজি হয়। কিন্তু পথিমধ্যে সে তার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আফসোস করতে থাকে। তখন সে আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে ﵁ হত্যা করার চেষ্টা করে। আবদুল্লাহ ইবন উনাইস আহত হন কিন্তু নিজেকে সামলে নেন। দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হয় এবং ইহুদিদের একজন ছাড়া সবাই মারা পড়ে।

## ৫) বাতনু ইদামের সারিয়াহ

এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল ইদামে, নেতৃত্বে ছিলেন আবু হাদরাদ ﵁ অথবা আবু কাতাদা ﵁। এই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিযানে অংশ নেওয়া মুহাল্লিম ইবন জাসসামার কাহিনী। অভিযান চলাকালীন সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আমর ইবন ইদবাত আশযায়ী। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। মুসলিম হিসেবে তিনি সেই বাহিনীকে সালাম দেন। বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' সেই সুযোগে মুহাল্লিম ইবন জাসসামা তাকে সেখানেই খুন করে ফেলে। জাহিলিয়াতের সময় মুহাল্লিমের সাথে সেই লোকের কোনোকিছু নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। তার জের ধরে মুহাল্লিম তাকে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করে।

এই ঘটনার পরে হুনাইনের সময়ে গাতফানের নেতা উয়াইনা ইবন হিসন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে এই হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ রক্তের বদলে রক্ত দাবি করলো। আর মুহাল্লিমের পক্ষের লোকেরা রক্তপণ দিতে অস্বীকার করলো। ফিতনা এড়ানোর জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে রক্তপণ হিসেবে একশোটি উট দিতে চাইলেন। উয়াইনা তখন বললো, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাকে ছাড়বো না, যতক্ষণ না তার পরিবার সেই কষ্ট পাবে, যে কষ্ট আমার পরিবার পেয়েছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বারের মতো রক্তপণ নিতে প্রস্তাব করলেন। শেষপর্যন্ত তারা রাজি হলো এবং রক্তপণ গ্রহণ করলো।[96]

মুহাল্লিমের লোকেরা মুহাল্লিমকে বললো, 'তুমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাও এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।' লম্বা সুঠামদেহী মুহাল্লিম আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আসলো। পরনে ছিল মৃত্যুর পোশাক। বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুহাল্লিম, আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাল্লিমকে ক্ষমা করবেন না।' মুহাল্লিম চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

---

[96] ইবন মাজাহ, অধ্যায় রক্তপণ, হাদীস ২৭২৬ (আরবি রেফারেন্স)।

এই ঘটনার পর মুহাল্লিম আর এক মাস বেঁচে ছিল। তাকে দাফন করা হয়, কিন্তু কবরের মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। তাকে ছুঁড়ে ফেলে, বারবার। এরপর তার লাশ দুই পাহাড়ের মাঝে পাথরচাপা দিয়ে দাফন করা হয়। এই ঘটনা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম! মুহাল্লিমের চাইতে নিকৃষ্ট লোককেও মাটি গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ এই ঘটনার মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক জানমালের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সতর্ক করতে চেয়েছেন।' মুসলিমের রক্তের পবিত্রতার বিষয়ে এই ঘটনা আরেকটি শিক্ষা। [97]

### ৬) আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীর ﷺ সারিয়ার কাহিনী

এই সারিয়াহর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা। অভিযান চলাকালীন সময়ে তার অধীনস্থ সৈনিকরা এমন কিছু একটা করে বসে যে কারণে তিনি খুব রেগে যান। রেগে গিয়ে তাদের বলেন, 'তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও।' সৈনিকরা উত্তর দিল, 'এই আগুন থেকে রক্ষা পেতেই তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি!' তখন আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা বললেন, 'আমি হচ্ছি আমীর এবং আমীরকে মান্য করা ওয়াজিব!' সৈনিকরা তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। পরে তার রাগ পড়ে গেল, আগুনও নিভে গেল। তারা ফিরে এলেন। এ ঘটনা শুনে রাসূলুলাহ ﷺ মন্তব্য করলেন, 'যদি তারা তাদের আমীরের কথামতো আগুনে ঝাঁপ দিতো, তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই আগুনেই থেকে যেত। আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো আনুগত্য চলে না। আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।'[98]

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, আমীরের আনুগত্য তখনই করা উচিত যখন তিনি ভালো কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি তিনি খারাপ কাজের আদেশ করেন তাহলে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। এটা শুধু সামরিক অভিযানের আমীরের ক্ষেত্রে নয়, বরং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন কারো বাবা-মা যদি মেয়েকে বলেন হিজাব পরা যাবে না -- সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আনুগত্য করা যাবে না। যদি পেশাগত জীবনে কর্তৃপক্ষ কোনো হারাম কাজের আদেশ দেয় সেক্ষেত্রে তার কথা শোনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে শাসক যদি জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ নিষিদ্ধ করে দেয় অথবা মুসলিমদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুগত বানিয়ে রাখতে চায় -- তাহলে তার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে ইসলাম পালনের ব্যাপারে সর্বদিক থেকে বাধা আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে -- কারো আদেশ মান্য করতে গিয়ে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা যাবে না।

## উমরাতুল কাযা

দেখতে দেখতে হুদাইবিয়ার সন্ধির এক বছর হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ উমরার

---

[97] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় রক্তপণ, হাদীস ৪৫০৩ (আরবি রেফারেন্স)।

[98] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে দিলেন আগের বছর যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে ছিলেন তাদের কেউ যেন বাদ না পড়ে। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ খাইবার এবং অন্যান্য অভিযানে শহীদ হয়ে গেছেন। তবে নতুন অনেকেই যোগ দিল। নারী এবং শিশু ছাড়াই উমরা যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দুই হাজার। সে এক অসাধারণ দৃশ্য! বিশাল এক বাহিনী আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে এগিয়ে চলেছেন! সবার পরনে একই রকম পোশাক, সাথে কুরবানির জন্য চিহ্নিত পশুর পাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট কাসওয়ার পিঠে বসা, আর তাঁকে ঘিরে রেখেছেন সাহাবিরা। তাদের সবার হাতে কোষবদ্ধ তরবারি উঁচু করে রাখা। সবাই সরবে পড়ছেন,

*লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদ ওয়া নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।*

*আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিআমত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই!*

তাওহীদের এই বাণীতে আকাশ-বাতাস সেদিন মুখরিত হয়ে উঠলো।

## সাবধানতা অবলম্বন

কথা ছিল মুসলিমরা মক্কায় ভারী কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, কেবল তরবারি রাখতে পারবেন। কিন্তু সফরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তীর-ধনুক-বর্শা জাতীয় ভারী অস্ত্র-শস্ত্র আনলেন, সাথে আরও ছিল মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার رضي الله عنه নেতৃত্বে দুইশো ঘোড়সওয়ারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লুকোছাপা রাখলেন না। কুরাইশরা যখন দেখলো তিনি ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মক্কার দিকে আসছেন, তখন তারা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবিরা তখনো মক্কা থেকে আট মাইল দূরে বনু ইয়াজুজে। মিখরাহ আল্লাহর রাসূলকে বললো,

'মুহাম্মাদ! যৌবনে বা বার্ধক্যে কখনো আপনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। আপনি আর আপনার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হারামে প্রবেশ করছেন। অথচ আপনি বলেছেন চুক্তিমতে যেভাবে প্রবেশ করার কথা আপনি সেভাবেই প্রবেশ করবেন। কথা ছিল আপনাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু এখন এসব কী দেখছি?'

মক্কার কুরাইশরা বলাবলি করছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মিখরাজকে আশ্বস্ত করলেন, 'চিন্তা কোরো না, আমাদের যেভাবে প্রবেশ করার কথা ছিল আমরা সেভাবেই প্রবেশ করবো।' এ কথা

শুনে মিখরাজ কুরাইশদের বলে আসলো, 'মুহাম্মাদ অস্ত্র সহকারে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। তিনি চুক্তির শর্ত মেনেই মক্কায় আসবেন।'

লক্ষণীয় হলো, কুফফারদের চোখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন। মক্কার কাফিররাই সাক্ষ্য দিত তিনি একজন সত্যবাদী লোক -- আল আমীন। শত্রুরাও জানতো, তিনি এক কথার মানুষ। তারা তাঁকে অপছন্দ করতো ঠিকই কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি এত অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন যে তাকে কদর না করে উপায় ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভারী অস্ত্রশস্ত্র মক্কার সীমানার ঠিক বাইরে রেখে গেলেন যেন হঠাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। তিনি এগুলো সাথে রেখেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য নয়। এগুলোর দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার উপরে। তাঁর সাথে ছিল দুশো ঘোড়সওয়ারি। তারা মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের সাথে তার শান্তিচুক্তি ছিল সত্যি কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকারের উপর শতভাগ আস্থা রাখেননি, কারণ ইসলামের শত্রুদের কখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

## সাহাবিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ উমরা সম্পাদন

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। সাহাবিরা খাপখোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে ঘিরে রেখে এগোতে লাগলেন। মক্কার লোকেরা অনেকেই আগ্রহভরে মুসলিমদের দেখছিল। কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ে।

মক্কার মুশরিকরা গুজব ছড়ালো মদীনার মুসলিমরা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে। তারা হয়তো এসব কথা বলে মুসলিমদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চাইছিল। তাদের এই গুজবের জবাব দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের আদেশ করলেন যেন তারা নিজেদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে দিয়ে জোরে জোরে তাওয়াফ করেন। তিনি চাইছিলেন কুফফাররা মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতার বিন্দুমাত্র ছাপও যেন খুঁজে না পায়। আর হয়েছিলও তাই, কুফফাররা মুসলিমদের এভাবে তাওয়াফ করতে দেখে বলে, 'ওদেরকে দেখে তো মোটেও দুর্বল মনে হচ্ছে না...'

মুসলিমরা রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি জায়গাটা ছাড়া বাকি অংশে খুব দ্রুত হাঁটলেন। রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে তারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন কেননা সেখানে তাদেরকে কাফিররা দেখতে পাচ্ছিলো না। এভাবে সাতবারের মধ্যে প্রথম তিনবার তারা এভাবেই জোরে হেঁটে তাওয়াফ করলেন।

তারা এসেছিলেন উমরা করতে। কিন্তু একটা চাপা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছিল দুই শিবিরের মাঝে। জোরে জোরে তাওয়াফ, ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা, জোরে জোরে হাঁটা এই সবই তাঁরা করছিলেন কুরাইশদের কাছে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য --

আমাদেরকে দুর্বল ভেবো না। এমনটা উহুদের যুদ্ধেও দেখা গেছে। আবু দুজানাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাথায় লাল পট্টি বেঁধে বীরদর্পে হাঁটার অনুমতি দিয়েছেন যেন কুফফারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মুসলিমরা কুরবানি করার পশু নিয়ে যায়, তখন বেছে বেছে আবু জাহলের একটা উটকেও সাথে রাখা হয় যেন সেটা দেখে কুরাইশরা রাগে-দুঃখে ফুঁসতে পারে। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ইচ্ছে করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কুফফারদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ কেবল মাঠে-ময়দানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই যুদ্ধ মন আর মননের যুদ্ধও বটে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবিরা তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি কিছু সাহাবিকে মক্কার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে, যেন বাকি যারা তাওয়াফ করতে পারেনি তারা মক্কায় এসে তাওয়াফ করে নিতে পারে। এভাবেই মক্কায় আগত সমস্ত মুসলিম উমরা সম্পন্ন করলো।

## মাইমুনা বিনত আল-হারিসের ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে

মাইমুনাহ বিনত আল হারিস ﷺ ছিলেন আল-আব্বাস ইবন মুত্তালিবের স্ত্রী উম্ম ফাদলের বোন। তার আগের স্বামী আবু রুহম মারা গেলে তিনি আরেকটি বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করলেন। আল-আব্বাস তার ভাতিজা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মাইমুনাহর স্বামী হিসেবে পছন্দ করলেন, মোহরানা নির্ধারিত হলো চারশো দিরহাম। আল-আব্বাস নিজের পকেট থেকে চারশো দিরহাম দিয়ে রাসূলুল্লাহর পক্ষে বিয়ের মোহরানা আদায় করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ দ্রুতই বিয়েটি হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন মক্কায় থাকতে থাকতেই এই বিয়ের ওয়ালিমা করে যেতে, কিন্তু ততদিনে তিনদিন পার হয়ে গেছে। হুয়াইতাব ইবন আবদুল উযযাহ, সুহাইল ইবন আমর -- এরা এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কা ছেড়ে যাবার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। 'আপনার সময় শেষ, আপনি চলে যান।' চুক্তিবদ্ধ একটি মানুষের সাথে ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ বজায় রাখার মতো অবস্থাও তাদের ছিল না। বিদ্বেষের বিষাক্ত গরল যেন তাদের অন্তর দিয়ে উপচে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তারা তিনদিনের বেশি একটা দিনও সহ্য করতে পারছিল না, এতটাই ছিল তাদের বিদ্বেষের মাত্রা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'আমি তো তোমাদেরই এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমি যদি এখানেই আমার বিয়েটা সম্পন্ন করি আর তোমাদের জন্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি, তাহলে ক্ষতি কী?' নবীজি চাইছিলেন এই বিয়ের মাধ্যমে কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে। কিন্তু কুরাইশরা গোঁয়ারের মতো বলতেই থাকলো, 'না, আপনার ভোজের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই, আপনি চলে যান।' এই কথার পরে আর মক্কায় থাকা যায় না। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন এবং সারিফে তার ওয়ালিমা সম্পন্ন করলেন। মাইমুনাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সর্বশেষ স্ত্রী। মাইমুনাহ মারা যান সেই সারিফেই, যেখানে তার ওয়ালিমা হয়েছিল।

## হামযা-কন্যাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে চলে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে এক অল্পবয়স্ক বালিকা দৌড়ে এসে বলতে লাগলো, 'চাচা! চাচা! চাচা!' সে মদীনায় যেতে চাচ্ছিল। এই হলো উহুদ যুদ্ধে শহীদ হামযা ইবন আল-মুত্তালিবের ﷺ মেয়ে। আলী ইবন আবু তালিব তাকে খপ করে ধরে এনে স্ত্রী ফাতিমার কাছে দিয়ে বললেন, 'তোমার চাচাতো বোনের যত্ন নাও। তাকে মদীনায় ফিরিয়ে নিতে হবে।' ওদিকে জাফর ইবন আবি তালিব বাধ সাধলেন, বললেন, 'না, ওকে আমি নিতে চাই।' আলী অধিকার দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি ওর চাচাতো ভাই!' জাফরও ছাড়বার পাত্র নন, বললেন, 'আমিও ওর চাচাতো ভাই আর আমার স্ত্রী ওর খালা!'

যেন এই বিবাদ যথেষ্ট ছিল না, তৃতীয় আরও একজন সেখানে উদয় হলেন -- যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। তিনি এসেই বললেন, 'ও তো আমার ভাইয়ের মেয়ে!' হামযার মেয়েকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রিয় চাচার মেয়ের দায়িত্ব বলে কথা-- কেউই এত বড় একটা কাজের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আসলেন তাদের এই মধুর দ্বন্দ্ব মিটমাট করতে। সেই বালিকার দায়িত্ব তুলে দিলেন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রীর হাতে, আর সেই সাথে কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন, বললেন, 'খালার মর্যাদা মায়ের সমতুল্য।' বাকিরা যেন মন খারাপ না করে এজন্যই হয়তো নবীজি এরপর একে একে প্রত্যেকের প্রশংসা করলেন। আলীকে বললেন, 'তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে।' যাইদকে বললেন, 'তুমি হলে আমাদের ভাই এবং আমাদের মাওলা।' আর জাফরকে বললেন, 'চেহারায় আর চরিত্রে আমার সাথে যার সবচাইতে মিল সে হচ্ছো তুমি।'[99]

## অন্ধকার থেকে আলোর পথে

দীর্ঘ শীতের রাতের ঘন জমে থাকা অন্ধকারের পর হঠাৎ করেই যেমন ভোরের আলোর রেখা একটু একটু করে দিগন্ত জুড়ে আলোকিত করে তোলে, ঠিক তেমনি উমরাতুল কাযার মাধ্যমে মক্কার লোকদের অন্তরে ইসলামের আলো প্রবেশ করতে শুরু করলো। দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধ করেও যখন তারা নবীজিকে ﷺ পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা আস্তে আস্তে এটাই বুঝতে শুরু করলো তিনি আসলেই আল্লাহর একজন রাসূল। কুরাইশ নেতাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে থাকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে তারা ইতিমধ্যেই হেরে গেছে, ময়দানের যুদ্ধে পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। এরই হাত ধরে অষ্টম হিজরীতে কুরাইশদের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা হলেন আমর ইবন আল-আস, খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং উসমান ইবন তালহা।

---

[99] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২৮৬।

## আমর ইবন আল আসের ﷺ ইসলাম গ্রহণ

*'আমি বদরের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমি খন্দকের যুদ্ধেও আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছিলেন।'*

কথাগুলো আমর ইবন আল-আস ﷺ বলেছিলেন মুসলিম হওয়ার পর। এই কথাগুলো বলে আমর ﷺ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন এই ভেবে যে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি কত বড় ভুলই না করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ তবু তাকে সুযোগ দিয়েছেন। যদি আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি মারা যেতেন তাহলে তার স্থান হতো নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে, কিন্তু আজ তিনি ইসলামের ছায়ায় এসে নিরাপদ হয়েছেন।

আমর ছিলেন একজন কুশলী রাজনীতিক। তিনি বুঝতে পারছিলেন কুরাইশদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিস্তীর্ণ পৃথিবী কুরাইশদের জন্য দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। যে ইসলামের বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে এতদিন যুদ্ধ করে এসেছেন, আজ সে মুসলিমরাই কুরাইশদের দরজায় কড়া নাড়ছে। হতাশা আর গ্লানিবোধ আমরকে চেপে ধরে। ইসলামের বিজয় তার সহ্য হচ্ছিল না, তিনি সিদ্ধান্ত নেন সবকিছু ছেড়েছুড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যাবেন। সত্যকে গ্রহণ করার মনোবল তার ছিল না। সত্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্য অন্য কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না।

*'আমি মনে করিনা মক্কায় থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বরং আমাদের উচিত আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর কাছে চলে যাওয়া এবং সেখানেই থাকা। যদি মুহাম্মাদ বিজয়ী হয়, তাহলে আমরা নাজ্জাশীর অধীনেই থাকবো। মুহাম্মাদের রাজত্বে থাকার চাইতে নাজ্জাশীর রাজত্বে থাকা ঢের ভালো। আর যদি আমাদের লোকেরা জয়ী হয়, তাহলে তারা আমাদের প্রতি সদয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। তারা তো আমাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে জানেই।'*

আমর আবিসিনিয়ায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। নাজ্জাশীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। আমর আবিসিনিয়ার পথে তার লোকবল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, সাথে উপহার হিসেবে নিয়ে গেলেন একগাদা চামড়া। আবিসিনিয়ায় আরবের চামড়ার খুব কদর ছিল।

নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে আমরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন নাজ্জাশীর দরবার থেকে বের হয়ে আসছেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবি আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরী ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিশেষ কাজে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। বন্ধুদের পেছনে রেখে আমর একাই দরবারে ঢুকে পড়লেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান

জানালেন, তাকে সাদরে বরণ করা হলো। আন-নাজ্জাশী তাঁকে বললেন, 'স্বাগতম বন্ধু! তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কী এনেছো?' আমর বললেন, 'আপনার জন্য কিছু চামড়া নিয়ে এসেছি।'

আমর নাজ্জাশীকে এরপর বললেন, 'হে সম্রাট! আমি একটা লোককে আপনার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছি। এই লোক হলো আমাদের শত্রুর বার্তাবাহক। এরা আমাদের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লোককে হত্যা করেছে। আপনি কি তাকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন যেন আমরা তাকে হত্যা করতে পারি?' এই কথা শুনে আন-নাজ্জাশী প্রচণ্ড রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে আমরের মুখে আঘাত করে বসলেন। বললেন,

*'তুমি আমাকে সেই মানুষটির বার্তাবাহককে তোমার হাতে তুলে দিতে বলছো যার কাছে খোদ আন-নামূস আল-আকবর (জিবরীল) আসা-যাওয়া করেন? এই একই নামূস আল-আকবর আসতেন নবী মূসার কাছে! তুমি চাও তাঁর বার্তাবাহককে আমি তোমার কাছে তুলে দিই? তোমার জন্য দুর্ভোগ! এই আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো আমর! তুমি এই মানুষটিকে মেনে নাও। যারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে, তাদের সবার বিরুদ্ধে তিনি জয়ী হবেন। যেভাবে মূসা বিজয়ী হয়েছিলেন ফিরআউন আর তার সেনাবিহিনির বিরুদ্ধে।'*

লজ্জায়-অপমানে আমরের সেদিন মরে যেতে ইচ্ছে হলো। আর একই সাথে তার হৃদয়ে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনও এল। জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি অনুভব করলেন তিনি আসলে এতদিন ধরে একটা মিথ্যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে আছেন। বুঝতে পারলেন ইসলামই হলো সত্য দ্বীন। এই দ্বীন থেকে এভাবে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। তৎক্ষণাৎ আমর সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম হয়ে যাবেন। নাজ্জাশীকে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূলের হয়ে আমার কাছ থেকে ইসলামের বাইয়াত নেবেন?' নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমর আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। জীবনে অনেক ভুল করেছেন। আর দেরি নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমর কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল গোপনে, আমর তার লোকদের কাছে তখনকার জন্য পুরো ব্যাপারটিই বেমালুম চেপে গেলেন।

বেশ কিছুদিন সেখানে থাকার পর একদিন তিনি আরবের দিকে রওনা হলেন। এবারের উদ্দেশ্য মক্কা নয়, মদীনা। পথিমধ্যে তার সাথে দেখা হলো আরও দু'জনের -- খালিদ ইবন ওয়ালিদ এবং উসমান ইবন তালহা। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' খালিদ ইবন ওয়ালিদ উত্তর দিলেন, 'সত্য পথ আজ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঐ মানুষটি আসলেই আল্লাহর একজন রাসূল। আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি।' আমর বললেন, 'সেই একই কারণে আমিও আজ ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি।'

তাঁরা মদীনার দিকে রওনা হলেন। তাদের আগমনের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই টের পেয়েছিলেন। বিশাল মনের সেই মানুষটি হাসিমুখে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই লোকগুলো কিছুদিন আগেও ছিল তাঁর শত্রু, তাঁকে তারা দেশ বের করে দিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম গ্রহণ করতে এলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ অতীতের সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে সাদরে তাদেরকে গ্রহণ করে নিলেন। কারণ এই বিরোধ কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষি বা ক্ষোভের কারণে ছিল না। বরং এই বিরোধিতা ছিল আদর্শিক বিরোধিতা। তাই যখনই তারা মুসলিম হয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ভেবে খুশি হলেন যে, যারা এতদিন তাগুতের সৈনিক ছিল এখন থেকে সেই দুজনই হবে আল্লাহর সৈনিক।

প্রথমে মুসলিম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ। এরপরে এলেন আমর ﷺ। তার ভাষায়,

*'আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করালেন, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ করতে চাই। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমি বাড়ালাম না। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে আমর? আমি বললাম, আমি এক শর্তে বাইয়াত করতে চাই। তিনি জানতে চাইলেন, কী শর্তে? আমি বললাম, আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এই শর্তে যে, আল্লাহ আমার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তখন বললেন, আমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরত আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় এবং হজ্জ আগের সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়?'*

এভাবে আমর মুসলিম হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল আসকে অনেক কদর করতেন। তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন, অন্য অনেকের চাইতে তাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আবু বকর আর উমারও ﷺ তার ব্যতিক্রম করেননি।

## খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের ﷺ ইসলাম গ্রহণ

*'আল্লাহ যখন আমার ভালো চাইলেন, তখন আমার অন্তরে ইসলামের জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিলেন এবং আমাকে বুঝ দান করলেন। তখন আমি নিজেই নিজেকে বলতাম, আমি মুহাম্মাদের ﷺ বিরুদ্ধে কতবার যুদ্ধ করলাম। কিন্তু প্রতিবারই মনে হতো খালি খালিই এত কষ্ট করছি, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদই বিজয়ী হবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হুদাইবিয়ায় আসলেন, তখন আমি দুইশো মুশরিকের একটি দল নিয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে বেরিয়ে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাহাবিদের দেখা পেলাম উসফানে। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ একেবারে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। তখন তিনি সাহাবিদের নিয়ে যুহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন। আমরা ঠিক করলাম তাঁকে আক্রমণ করবো। কিন্তু কেন যেন আর আক্রমণ করা হয়ে উঠলো না -- আসলে, এটার মাঝেই কল্যাণ ছিল। ওদিকে তিনি আমাদের পরিকল্পনা টের পেয়েছিলেন,*

*তাই আসরের সময় সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। বিষয়টা আমাকে খুব নাড়া দিল। আমার মনে হলো কোনো না কোনোভাবে তিনি আমাদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেনই, আমরা তাঁর কিছুই করতে পারবো না।'*

এরপর হুদাইবিয়ার সন্ধি হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের মাথায় হাজির হলো এক ঝাঁক প্রশ্ন আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব -- 'আমার জীবনে আর কী আছে? আমি কোথায় যাবো? নাজ্জাশীর কাছে? না, সে তো নিজেই মুহাম্মাদের ﷺ অনুসারী হয়ে পড়েছে। তার রাজ্যে মুসলিমরা নিরাপদ। তবে কি আমি হেরাক্লিয়াসের কাছে যাবো? কিন্তু সেখানে গেলে আমাকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান বা ইহুদি হয়ে যেতে হবে। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে জীবন কাটাতে হবে। নাকি আমি নিজের দেশেই থেকে যাব?'

এভাবেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর হতাশার মধ্যে এক একটা দিন কাটতে লাগলো। উমরাতুল কাযার সময় এল। মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীরা উমরা পালন করবেন -- এই দৃশ্য সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি খালিদের ছিল না। তিনি মক্কা থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন। সেবার উমরা করতে এসেছিলেন তারই ভাই আল- ওয়ালিদ ইবন আল- ওয়ালিদ। তিনি যাবার সময়ে ভাইয়ের জন্য একটা চিঠি রেখে গেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

*'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইসলামের প্রতি তোমার বিদ্বেষ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তোমার মতো একটা বুদ্ধিমান লোক কী করে ইসলামের বিরোধিতা করে! মানুষ কেমন করে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে -- আমার বুঝে আসে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার কথা জানতে চেয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন খালিদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাঁকে নিয়ে আসবেন। এরপর তিনি বলেছেন, তার মতো মানুষ ইসলামকে উপেক্ষা করে কীভাবে! সে যদি তার শক্তি আর সাহসকে মুসলিমদের পক্ষে ঢেলে দিতো, তাহলে সেটাই তার জন্য উত্তম হতো আর আমরাও তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতাম। ভাই, নিজেকে তুমি অনেক বঞ্চিত করেছো, আর নিজেকে বঞ্চিত কোরো না।'*

এরপর খালিদ বর্ণনা করেন,

*'চিঠিটি পড়ে আমি এখান থেকে পালাবার শক্তি ফিরে পেলাম। আর ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইচ্ছেও বেড়ে গেল। আমার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মন্তব্য শুনে খুশি খুশি লাগছিল। আরও একটা ব্যাপার ছিল। একটা স্বপ্ন। আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা সংকীর্ণ, আবদ্ধ, খরাপীড়িত দেশে ছিলাম। সেখান থেকে সবুজ, উর্বর আর বিস্তীর্ণ এক দেশে চলে এসেছি। আমার মনে হলো, নিশ্চয়ই এই স্বপ্নের কোনো গূঢ় অর্থ আছে।'*

মদীনায় যাবার পর খালিদ আবু বকরের ﷺ কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। আবু বকর তাকে বলেন, 'এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে তুমি শিরক থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছো।'

খালিদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মুসলিম হয়ে যাবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। তার ইচ্ছে হলো হিজরতের যাত্রাপথে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সমমনা কাউকে সাথে নিতে। প্রথমে গেলেন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার কাছে। সাফওয়ানের কাছে নিজের মুসলিম হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছো। অল্প কিছু লোকই আমাদের ধর্মের উপরে আছে। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের সম্মানই আরবদের সম্মান।' সাফওয়ান তখন সাফ জানিয়ে দিলো, 'সবাই মুসলিম হয়ে গেলেও আমি কোনোদিন মুসলিম হবো না।'

এরপর গেলেন আবু জাহলের ছেলে ইকরিমার কাছে। তাকেও একই কথা বললেন। ইকরিমাও মুসলিম হতে প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর তার সাথে দেখা হলো উসমান ইবন ইবন তালহার সাথে। খালিদ প্রথমে ভাবলেন উসমানের সাথে এই বিষয় নিয়ে কোনো আলাপ করবেন না। কারণ এই উসমান পরিবারের সাত সদস্য উহুদে মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু তারপরেই ভাবলেন, 'আচ্ছা, কী-ই আর এমন হবে এ কথা বললে? আমি তো চলেই যাচ্ছি, কথা বলেই যাই।' কত বিস্ময়কর ঘটনাই তো দুনিয়াতে ঘটে। উসমান ইবন তালহা, যার পরিবারের সাত সাত জন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে, সে-ই তালহাকেই দেখা গেল ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী। তারা দুজনে এবার একসাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে দেখা হলো আমর ইবন আল-আসের সাথে, যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনজন মিলে একসাথে মদীনায় গেলেন।

মদীনার সীমান্তে এসে খালিদ কাপড় বদলে ভালো পোশাক পরে নিলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের জন্য সুন্দর করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সবাই। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা হলো। খালিদকে সেই দূর থেকে দেখার পর থেকেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে এক চিলতে হাসি ঝুলেই আছে। খালিদ কাছে আসলেন, বাইয়াত দিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি তোমার মাঝে বুদ্ধির ছাপ দেখেছি, আর আশা করেছি তোমার বুদ্ধিমত্তা তোমাকে ভালো পথে নিয়ে আসবে।' খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি তো জানেন যে, আমি আপনার বিরোধিতা করেছি। গোঁয়ারের মতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।'

নবীজি ﷺ বললেন, 'ইসলাম তো আগের সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়।' খালিদ বললেন, 'তবুও আপনি আমার জন্য দুআ করে দিন। নবীজি তখন দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে খালিদ যা কিছু করেছে, তার জন্য আপনি খালিদকে ক্ষমা করে দিন।'

খালিদের পর একে একে আমর ইবন আল আস ﷺ এবং উসমান ইবন তালহা ﷺ বাইয়াত করলেন। কুরাইশদের তিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে চলে এল। তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলিমদের বিজয় আর মুশরিকদের পরাজয়।

## শিক্ষা

### ১) হিদায়াহ কোনো নিয়মের ধার ধারে না

হিদায়াহ কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা। আল্লাহ্‌র যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াহ দেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ্‌ করেন। এ কারণে আমরা দেখি, খোদ নবীজির চাচা আবু তালিব, যিনি আমৃত্যু নবীজিকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছেন, তিনি মুসলিম হননি। কিন্তু ডাকাত গোত্র গিফার থেকে আগত আবু যর ﷺ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। নবীজির আরেক চাচা আবু লাহাব, যার পুত্রদ্বয়ের সাথে নবীজির দুই কন্যার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে ছিল, সে মুসলিম হয়নি, হয়েছেন সুদূর পারস্য থেকে আগত সালমান আল-ফারসি ﷺ। আমরা দেখি তুলাইহা আল-আসাদীর ﷺ মতো মানুষকে যিনি কিনা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিনগ্রস্ত ভেবে তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, এরপর নবীজির মুখে স্রেফ দু লাইনের খুতবার দুআ শুনে সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম হয়ে যান। অথচ আমর ইবন আল-আস, যিনি কিনা এত বছর ধরে নবীজিকে কাছ থেকে দেখেছেন, কথা বলেছেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি, শেষমেশ আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কথায় তার অন্তর গলেছে। ইসলামের ঘোরশত্রু উসমান ইবন তালহা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আরবের সেরা কবি ওয়ালিদ ইবন মুগীরা, যে ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণায় অগ্রগামী এক বুদ্ধিজীবী, তার ছেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অমুসলিম অবস্থাতেই মারা গেছেন আল্লাহ্‌র রাসূলকে বছরের পর বছর আগলে রাখা চাচা আবু তালিব।

হিদায়াহ এমন এক জিনিস যা কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে। আমরা যাকে চাই, তাকে হিদায়াত দিতে পারবো না, বরং আল্লাহ্‌ যাকে চান, তাকে হিদায়াত করেন। কিন্তু এই বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে আজকাল অনেক মুসলিম কাফিরদের সামনে ইসলামকে কিছুটা ঘষামাজা করে উপস্থাপন করে। বর্তমান সময়ে 'স্পর্শকাতর' কিছু বিষয় যেমন জিহাদ, বহুবিবাহ, হুদুদ এসবের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তারা এড়িয়ে যেতে চায় বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অথবা কাটছাঁট করে উপস্থাপন করে। তারা মনে করে এভাবে তুলে ধরলে কাফির ও জাহিল মুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে কাফিরদের সামনে গ্রহণযোগ্যভাবে তুলে ধরা।

কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো হলেও এটা অন্যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা যে দ্বীন আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাকে কাটছাঁট করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। দাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর উপস্থাপনা এবং উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা জরুরি তবে তার মানে এই নয় যে, ইসলামকে বদলে ফেলতে হবে বা ইসলামের সত্যকে গোপন করতে হবে। কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করাটা হতে হবে আমাদের মূল

উদ্দেশ্য, তাদেরকে খুশি করা নয়। হিদায়াত আল্লাহর হাতে, কারো ইসলাম গ্রহণের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট, আর কাউকে কুফরি থেকে ফেরানোর জন্য একশোটি নিদর্শনও যথেষ্ট হয় না।

আরও একটি ব্যাপার হলো, মানুষ সম্পর্কে আগেভাগে খুব বেশি বিচার করা উচিত না। খালিদ ইবন ওয়ালিদের কাছে মনে হয়েছিল উসমান ইবন তালহা ইসলাম গ্রহণ করবেন না, কিন্তু তিনি সেটা করেছেন। কাজেই কারো ব্যাপারে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। আমাদের দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া, কথার ভেলকিবাজি বা চমৎকারিত্ব বা ইসলামের মিষ্টিমধুর পশ্চিমা ভার্সন মানুষের অন্তরকে বদলাতে পারে না। মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালের হাতে।

## ২) যোগ্যতার কদর করা

ভালো নেতার একটা গুণ হলো তার অধীনস্থদের যোগ্যতাকে কদর করা। খালিদ ইবন ওয়ালিদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ মন্তব্য করেছিলেন, 'সে যদি ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে আমরা তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতাম।' সাহাবিদের সময়ে কারো মর্যাদা নির্ণীত হয় কে কত আগে মুসলিম হয়েছে তার ওপর। কিন্তু এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, খালিদ দেরিতে মুসলিম হলেও তাকে অন্য অনেকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। এর কারণ হলো খালিদের এমন কিছু যোগ্যতা আর পারদর্শিতা ছিল যা অন্য কারো মধ্যে ছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে প্রশংসা এবং আশ্বাস পাওয়ার কারণে খালিদের ইসলাম গ্রহণের পথ সহজ হয়ে যায়। মানুষের সক্ষমতা ও দক্ষতাকে চিনতে পারা নেতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সব মানুষ সমান না, একেকজন একেকরকম। কিছু মানুষের এমন গুণ আছে যা অন্যদের নেই। কেউ তেজস্বী, কেউ দুর্বল। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ শক্তিশালী -- আল্লাহ্ তাআলা এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। নেতৃত্ব হলো সঠিক মানুষকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করার সক্ষমতা।

# মু'তার যুদ্ধ

## প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের এই পর্যায় পর্যন্ত যতগুলো জিহাদ হয়েছে সেগুলোর পরিধি মূলত আরবের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তিগুলো দমন করা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। মু'তার যুদ্ধকে বলা যেতে পারে একটি নতুন পর্যায়ের সূচনাবিন্দু, কেননা এর মাধ্যমে মুসলিমরা বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তি বা 'সুপার-পাওয়ার' রোমানদের সাথে সংঘাতে প্রবেশ করে। মু'তার যুদ্ধের মাধ্যমে রোমানদের সাথে মুসলিমদের যে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, তা চলতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। এটি একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোমান বা রুম বলতে হাদীসে মূলত পশ্চিমাদের বোঝানো হয়েছে। আর শাম বলতে বোঝানো হয় বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন এবং জর্ডান এই দেশগুলোকে।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষশক্তি ছিল আরবের গাসসান গোত্র এবং বাইজেন্টাইন বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। গাসসান হলো একদল আরব খ্রিস্টান। সে সময়ে তারা ছিল রোমানদের আশ্রিত বা আজ্ঞাবহ একটি রাজনৈতিক শক্তি। বর্তমানকালের পরিভাষায় বলা যেতে পারে Vassal State।

মু'তার যুদ্ধে মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয় একটি যুদ্ধের ময়দানে। যদিও এই যুদ্ধের সূত্রপাত আরও বেশ ক'বছর আগ থেকেই হয়েছে। এর আগে দুমাতুল জান্দালে দুটো সারিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো ছিল আরব খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবের উত্তরদিকের গোত্রগুলোর সামরিক তৎপরতা বেড়ে যায়। বিষয়টা বেশ গুরুতর পর্যায় ধারণ করে যখন তারা আল-হারিস ইবন উমায়ের আল-আযদীকে ﷺ হত্যা করে। আল-হারিস ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ পক্ষ থেকে রোমান গভর্নরের কাছে প্রেরিত দূত। দামাস্কাসের রাজার কাছে দূত পাঠানো হলে সে কোনো পাত্তা তো দেয়ইনি, উল্টো মদীনা আক্রমণের হুমকি দেয়।

অন্যদিকে যাত-আতলাহ্ নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন আমর ইবন কা'বের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি দলকে। তারা সে অঞ্চলের লোকদের ইসলামের দিকে আহবান করেন কিন্তু তারা এর জবাবে তীর ছুঁড়তে থাকে। আমর ইবন কা'ব ছাড়া সবাই মারা যান। এই ঘটনাগুলো ঘটে মূলত শামে। তৎকালীন শাম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের মদদপুষ্ট। তারা শামের মুসলিমদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। মাআনের গভর্নর মুসলিম হয়েছে এই খবর শুনে তারা তাকেও হত্যা করে। এভাবেই তৈরি হয় মু'তার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।

এই যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং রোমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধ। সীরাতে এটাই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধকে গাযওয়া হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব যুদ্ধে থাকতেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া, আর তিনি না থাকলে সারিয়াহ। তাৎপর্যের দিক থেকে তাই মু'তার যুদ্ধ বদর, উহুদের কাতারে চলে আসে।

## আমীর নির্বাচন

আশ-শামে রোমানদের ভূমি আক্রমণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজার জনের একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণত কোনো অভিযান পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন আমীর নিযুক্ত করে দিতেন। কিন্তু এবারে তার ব্যতিক্রম হলো। তিনি ক্রমানুসারে তিনজন সাহাবিকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। বললেন, 'আমীর হচ্ছে যায়িদ ইবন হারিসা। যদি সে শহীদ হয়, তাহলে জাফর ইবন আবি তালিব। আর যদি সেও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।'

সেদিন ছিল শুক্রবার। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ؓ ভাবলেন, 'আচ্ছা আমি তো একা মানুষ। আমি একটু পরে বেরোলে আর কী এমন হবে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জুমুআ আদায় করে তারপরই বের হই। এরপর মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেবো।'

সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সঙ্গ পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে থাকতেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আল্লাহর রাসূলের সাথে জুমুআ আদায় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইলেন না। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না এই কাজের চেয়ে আরও দামি কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল!

জুমুআর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বিষয়টা খেয়াল করলেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি! তুমি পেছনে পড়ে আছো যে?' আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম আপনার সাথে জুমুআর সালাত আদায় করতে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত টাকাও খরচ করে ফেলো, তবুও তাদের ধরতে পারবে না।'[100]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্ষরিক অর্থে এটা বোঝাননি যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তার বাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারবেন না। তিনি বুঝিয়েছেন -- যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত টাকাও খরচ করো, পুরস্কারের দিক থেকে কখনো তাদের ধরতে পারবে না। তাদের পেছনেই পড়ে থাকবে। অথচ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা খুব অল্প সময়ের জন্যই পেছনে ছিলেন -- ফজর থেকে জুমুআ। কিন্তু ততক্ষণে তার বাহিনী রওনা হয়ে গেছে।

---

[100] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১।

আর তিনি যে ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সেটা আর কিছুতেই ফিরে পাবার নয়। এমনকি যদি তিনি খোদ আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জুমুআ আদায় করেন, তাও সেই ফযিলতের সমান হবে না। আল্লাহর রাসূলের সাথে থেকে তিনি হয়তো আরও জ্ঞান লাভ করতে পারতেন, শিখতে পারতেন আরও অনেক কিছু। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বের হয়ে পড়া ছিল তার থেকেও বেশি ফযিলতপূর্ণ।

যদিও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কাহিনীটি হাদীসের সনদ বিবেচনায় খুব একটা শক্তিশালী নয়। তবে এই প্রসঙ্গে অন্য সহীহ হাদীস আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোনো মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বের হওয়া অথবা তাদের সাথে ফিরে আসা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চাইতে উত্তম।'[101]

জিহাদ যখন ফরয হয়ে যায় তখন অন্য কোনো অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পরিত্যাগ করেননি। তিনি একটু দেরিতে সেই বাহিনীর সাথে যোগ দিতে চেয়েছেন। সেটাও আলস্যের কারণে নয়। তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে আরও কিছু সময় থাকতে। কিন্তু এটাও আল্লাহর রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি। আর যারা জিহাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে, তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে আরও শোচনীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছিলেন, পেছনে বসে থাকার কোনো অজুহাত নেই। আমরা জানি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে পারে নিজের জান দিয়ে, মাল দিয়ে অথবা মুখের কথা দিয়ে। কিন্তু এই হাদীসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অনেকে ময়দানে যেতে চায় না। এটা সঠিক নয়। শুধুমাত্র সম্পদ বা মুখের কথা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে সাহাবিদের মাঝে যারা আলিম বা মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন তারা মদীনায় বসে থাকতে পারতেন। কিন্তু সেটা হয়নি। কুরআনে হাফিয উবাই ইবন কা'ব রাসূলুল্লাহর ﷺ সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতেন। মুআয ইবন জাবালের মতো আলিম, উসমান ইবন আফফান কিংবা আবদুর রাহমান ইবন আওফের মতো ধনী সাহাবি, যারা জিহাদের অর্থায়ন করতেন -- রদ্বিয়াল্লাহ আনহুম -- তাদের সবাই জিহাদের জন্য বের হয়েছিলেন। তাদের জ্ঞান, সম্পদ বা অন্য কাজকর্মে দক্ষতা তাদের পেছনে থাকার কোনো অজুহাত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই ﷺ বলেছিলেন, 'ইশ, আমি যদি প্রতিটা সেনাদলের সাথে যোগ দিতে পারতাম!'

# যুদ্ধের ময়দানে

সেনাবাহিনী আশ-শামে পৌঁছালো, বর্তমান সময়ের জর্ডানে। মাআনের গভর্নরকে হত্যাস্থলে তারা ঘাঁটি গাড়লেন। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন শত্রুপক্ষের এক

---

[101] সহীহ বুখারি, অধ্যায় অন্তর কোমলকারী বিষয়, হাদীস ১৫৬।

বিশাল বাহিনী, দুই লক্ষ! আরবের লাখাম, জুদাম, বাহরা আর বালী গোত্র থেকে এসেছে পুরো এক লক্ষ সৈন্য আর হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে এসেছে আরও এক লক্ষ রোমান খ্রিস্টান সৈন্য। রোমান সৈনিকরা কিন্তু বেদুইনদের মতো নয়, তারা ছিল পেশাদার, প্রশিক্ষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

মুসলিমরা আশা করেনি শত্রুপক্ষের সৈনিক সংখ্যা এত বেশি হবে! মুসলিমরা ছিলেন মাত্র তিন হাজার। আর শত্রুসংখ্যা দুই লাখ, তুলনারও বাইরে! এক মুসলিম সৈনিকের বিপরীতে ৬৬ জন কাফির সৈনিক! এর আগে মুসলিমরা সর্বোচ্চ দশ হাজার সৈন্যের সেনাদলকে সামাল দিয়েছে। কিন্তু দুই লাখ সৈন্যের দলের মুখোমুখি হতে হবে এমনটা হয়তো তারা চিন্তাও করেননি।

তারা দু'দিন ধরে শূরা করলেন কী করা যায়। যা আছে তা দিয়ে লড়বেন নাকি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবেন। কেউ কেউ বললো, 'এক কাজ করি। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে একজন দূত পাঠাই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি কী করা উচিত এবং অপেক্ষা করি। তিনি যদি চান অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাবেন এবং তিনি চাইলে তখন আমরা যুদ্ধ করবো।' কেউ কেউ বললো, 'আমরা বরং চলে যাই, নিরাপত্তাই সবার আগে।'

দুই লাখ সৈনিকের খবর পেয়ে অনেকেই মুষড়ে পড়েছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। পর্বতসম ঈমান বুকে নিয়ে বলে উঠলেন,

*'ভাইয়েরা! তোমরা সেই জিনিসকেই অপছন্দ করছো যেটার সন্ধানে তোমরা বেরিয়ে এসেছো। সেটা কী? শাহাদাহ! আমরা আমাদের সংখ্যা বা শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছি না। আমাদের শক্তি হলো আমাদের দ্বীন! কাজেই এগিয়ে চলো ভাইয়েরা, এগিয়ে চলো! আমাদের জন্য দুটো ভালো পরিণতিই অপেক্ষা করছে -- হয় শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, নয়তো শাহাদাহ!'*

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা খুব ভালো কবিতা লিখতেন। সেই কবির আবেগমাখা শব্দের ঝঙ্কারে সাহাবিরা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন! বহুক্ষণ ধরে শুকনো তীরে পড়ে থাকা ম্রিয়মান মাছেরা হঠাৎ বৃষ্টির তোড়ে নদীর পানিতে গিয়ে পড়লে যেমন প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কথাগুলো ঠিক সেই বৃষ্টির পানির মতন সাহাবিদের হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করলো। তারা প্রত্যেকে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন! ক্লান্তি আর শঙ্কা নিমিষে দূর হয়ে গেল, ভর করলো সাহস আর অনুপ্রেরণা। আবার সবার মাঝে জিহাদের হারিয়ে যাওয়া মেজাজ ফিরে এল। মাত্র তিন হাজার সৈন্যের দল নিয়ে দুই লক্ষ বাহিনীর বিশাল শত্রুসেনার সাথে লড়াই করার মতো প্রায় অসাধ্য কাজটি সাধনের ব্যাপারে সাহাবিরা দৃঢ়চিত্ত হলেন।

মুসলিমরা দাঁড়িয়ে আছে মু'তার ময়দানে। আবু হুরায়রা ؓ তখন সবে মুসলিম হয়েছেন। সেই যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক। ময়দানে দাঁড়িয়ে আবু

হুরায়রা অবাক হয়ে দেখছিলেন দুই লক্ষ সৈন্যের শত্রুবাহিনীকে। তার চোখেমুখে বিস্ময় -- এমন কিছু তার চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছে যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে দুই লক্ষ সৈন্যের মুখোমুখি হওয়া মানে নিশ্চিত পরাজয়। মৃত্যু সেখানে অনিবার্য! সম্ভবত কোনো দেশ বা গোত্রের ঐতিহ্যে এমন নজির নেই। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এত বড় একটা বাহিনীর সাথে তারা লড়তে যাচ্ছেন! অস্ত্রের ঝনঝনানি, শক্তির প্রদর্শনী, সোনা-রূপার ঝলকানি দেখে আবু হুরায়রার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল!

বিষয়টা একজন প্রবীণ সাহাবির নজরে এল। সাবিত ইবন আরকাম ﷺ আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- মনে হচ্ছে, তুমি খুব বিশাল একটা বাহিনী দেখছ!

- হ্যাঁ, অবশ্যই! দেখুন না, আমরা কাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি!

- শোনো, বদরের যুদ্ধে তুমি আমাদের সাথে ছিলে না। সেদিন আমাদের বিজয় সংখ্যার জোরে আসেনি, কথাটা মনে রেখো।

সাবিত ইবন আরকাম অভিজ্ঞ এক সাহাবি। আর আবু হুরায়রা মাত্র কিছুদিন আগে জাহিলিয়াহ ছেড়ে ইসলামে এসেছেন। সাবিত তার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে আবু হুরায়রাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, জাহিলিয়াতের নিয়ম-কানুন ভুলে যাও। তুমি এখন মুসলিম। এটা এক নতুন পৃথিবী। আমরা দুনিয়াকে ভিন্ন চোখে দেখি। এখানে সংখ্যার উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে না। বদরে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। কাজেই সংখ্যা দিয়ে বিচার কোরো না।

বদরের অভিজ্ঞতা থেকে সাবিত জানেন সংখ্যার উপর বিজয় নির্ভরশীল নয়। বদরে তারা জয়ী হয়েছেন তাদের ঈমানের জোরে। আল্লাহ তাদের বিজয়ী করেছেন। জাহিলিয়াতের মানদণ্ডে সংখ্যা আর শক্তিমত্তাই সব। কিন্তু ঈমানের মানদণ্ডে সংখ্যাই শেষ কথা নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্যই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারক।

## যুদ্ধ শুরু হলো

যাইদ ইবন হারিসা ﷺ ছিলেন এই যুদ্ধের প্রথম আমীর। তাঁর হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা পতপত করে উড়ছে। সবাই দেখলো, বীরের মতো যায়িদ ইবন হারিসা সামনের দিকে ছুটে গেলেন। সেই চেহারায় কোনো ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই। শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তাদের বাহিনীতে ঢুকে পড়লেন অকুতোভয় এক যুবক। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শত্রুদের বর্শা আর বল্লমের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাকে আর দেখা গেল না।

চারদিক থেকে তীর আর বর্শা ধেয়ে এল তার দিকে। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না বর্শার আঘাত তাকে থামিয়ে দেয়। শরীরে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, শত্রুদের বর্শা তাঁর রক্তে ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যাইদ ইবন হারিসা ﵁ আল্লাহর পথে শহীদ হলেন। বীরের মতো পতাকা তুলে নিলেন দ্বিতীয় আমীর জাফর ইবন আবি তালিব ﵁।

শত্রুরা এবার ঘিরে ধরলো জাফরকে। সাধারণত সৈনিকরা চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের পতাকাবাহীকে আক্রমণ করতে। রোমান সৈনিকরা জাফরকে চারপাশ থেকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘেরাও করে ফেললো। জাফর এতটুকু ভয় পেলেন না। তিনি জানতেন কী হতে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে থাকার কারণে তার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই তিনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিজের ঘোড়াকে হত্যা করলেন যেন শত্রুরা সেই ঘোড়াকে কাজে লাগাতে না পারে। মুখে কবিতা পড়ছেন আর একের পর এক হামলা সামলে নিচ্ছেন অনায়াসে।

পতাকা ছিল তার ডান হাতে, শত্রুরা ডান হাত কেটে ফেললো। তিনি এবার বাম হাতে পতাকা নিলেন, শত্রুরা বাম হাতও কেটে ফেললো। দুই কাটা হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই কাটা দুই হাত দিয়েই জাফর ইসলামের পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছিল তার শরীর, শাহাদাত তাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জাফর শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর রবের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হলো।

জাফরের শরীরের এখানে-সেখানে কম করে হলেও নব্বইটি জখমের চিহ্ন। সেই জখমগুলোর কোনোটিই তার শরীরের পেছনে না, সবগুলোই সামনে। তিনি পিছু হটার মানুষ ছিলেন না। একত্রিশ বছর বয়সী জাফর এই তো সেদিনই মাত্র আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি। প্রিয় চাচাতো ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে। জাফর আসলেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলেন আর শাহাদাহ বরণ করলেন।

যুদ্ধ তখনও চলছে। এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তৃতীয় আমীর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﵁। পতাকা তুলে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চেপে বসলেন। কবিতার ভাষায় স্বগোতক্তি করলেন,

*'হে আমার আত্মা! তুমি আজ আমার শরীর ছেড়ে চলে যাবে!*
*যেতে তোমাকে হবেই, নয়তো জোর করে তোমাকে আমার শরীর ছাড়াবো!'*

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এক ভাই তাকে এক টুকরো মাংস খেতে দিয়েছিল। খেলে শরীরটা একটু চাঙ্গা হবে। তিনি মাংসে কামড় দিলেন, কিন্তু খাওয়ার মাঝখানে যুদ্ধের কোলাহল শুনে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। নিজেই নিজেকে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি

এখনো বেঁচে আছো!' এই বলে মাংসের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে মেরে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তার স্বপ্ন পূরণ হলো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা হন্যে হয়ে শাহাদাতের সন্ধান করছিলেন। শাহাদাতও তাকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করে নিলো। শত্রুরা তাকে হত্যা করলো। তিনি লাভ করলেন তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান - শাহাদাহ!

## খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ নেতৃত্বগ্রহণ

তিন আমীর একে একে শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু মুসলিমরা ময়দানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে দিনের আলো নিভু নিভু। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার হাত থেকে পড়ে যাওয়া পতাকা হাতে তুলে নিলেন সাবিত ইবন আরকাম ﷺ। পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে আমীর ঘোষণা করেননি, বরং চাচ্ছিলেন একজন যোগ্য লোকের হাতে পতাকাটা তুলে দিতে। সাবিত ইবন আরকাম নিজেও একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি বদরের যুদ্ধ করেছেন, সত্যি বলতে তিনি নিজেই আমীর হবার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কারো হাতে দায়িত্ব দিতে চাইলেন যে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে আনতে পারবে। পতাকা হাতে তুলে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচন করো।' সাহাবিরা বললেন, 'আপনিই এ দায়িত্ব পালন করুন।' সাবিত বললেন, 'না, আমি সেটা করবো না।'

সাহাবিরা এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ, যার রণকৌশল নিয়ে নতুন করে কিছু বলাটাও বাহুল্য, তিনি এর আগে অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেরাদের সেরা এবার আমীর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। আর এটাই ছিল মুসলিমদের পক্ষে লড়া তাঁর প্রথম যুদ্ধ। একজন নও-মুসলিম হিসেবে জিহাদে অংশ নিলেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনার কমতি ছিল না। খাঁটি যোদ্ধার মতো লড়াই করলেন, লড়তে লড়তে নয়টা তলোয়ার ভেঙে গেল। একটা ইয়েমেনি তলোয়ার শুধু শেষমেশ রক্ষা পেল!

মু'তার ময়দানে কী হচ্ছে সেই খবর আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পৌঁছে দিচ্ছিলেন স্বয়ং জিবরীল ﷺ। আর তাঁর কাছ থেকে শুনে সাহাবিদের কাছে সেই যুদ্ধের লাইভ বর্ণনা দিচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। যাইদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের খবর শুনে তিনি কাঁদতে থাকেন। কিন্তু যখনই জানতে পারলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা, তখনই তিনি সবাইকে বিজয়ের সংবাদ দেন। বললেন, 'আল্লাহর তলোয়ারদের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার সেই পতাকা তুলে নিল এবং আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করলেন।'

প্রথম তিনজন আমীরের শুহাদার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তারা এখন যেখানে আছে, সেখানেই বেশি সুখে আছে!' আর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেইদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ একটা নতুন নাম দেন, *সাইফুম মিন সুয়ূফিল্লাহ -- আল্লাহর তলোয়ারদের*

*মধ্যে একটি তলোয়ার!* আল্লাহর রাসূল ﷺ উপযুক্ত নামকরণই করেছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ আর কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি।

রাত নেমে এল, যুদ্ধে বিরতি হলো। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ভাবছেন কীভাবে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি তারা দ্রুত পিছু হটেন, তাহলে শত্রুরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারে। সামরিকবিদ্যায় খালিদ ছিলেন একজন মেধাবি সেনাপতি। তিনি এমন একটা কৌশল বের করলেন যাতে মুসলিমরা পশ্চাদপসরণ করবে ধীরে ধীরে কিন্তু শত্রুরা মুসলিমদের ধরতে পারবে না। তিনি সবাইকে বললেন সবাই যেন আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে। রাতের অন্ধকারে তিনি ডান পাশের সৈনিকদলকে বাম পাশে, আর বাম পাশের সৈনিকদের ডান পাশে স্থানান্তর করলেন। সামনের সৈনিকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন পেছনে, পতাকাগুলোর অবস্থানও বদলে দিলেন।

খালিদের এই কৌশল চমৎকারভাবে কাজ করলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর নতুন চেহারা দেখে ভাবলো নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনীতে অতিরিক্ত সৈন্য যোগ হয়েছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, মুসলিমরা যদি মাত্র তিন হাজার সৈন্য আগের দিন ময়দানে টিকে থাকতে পারে, তাহলে নতুন সৈন্য নিয়ে না জানি তারা কী করবে! এই ভয়ে রোমানরা বেশ মুষড়ে পড়লো এবং পিছিয়ে গেল। খালিদ ঠিক এটাই চাচ্ছিলেন। এই সুযোগে তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মদীনায় নিরাপদে ফিরে এলেন। পুরো মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হতে পারতো, কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের অসাধারণ কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা সেই বাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। দুই লক্ষ সৈনিকের মোকাবেলায় এই যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র দশ জন শহীদ হন।

## মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন

মুসলিম বাহিনী যখন মদীনার কাছাকাছি, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, জাফর ইবন আবি তালিবের বাচ্চাকাচ্চাদের যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জাফরের স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস বাচ্চাদের গোসল করিয়ে, গায়ে তেল মেখে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠান। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দেখে জড়িয়ে ধরেন, তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে থাকে। আসমা বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, জাফর শহীদ হয়েছে। আসমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'এই দুনিয়া এবং আখিরাতে আমিই হবো জাফরের সন্তানদের ওয়ালি।' জাফরের সন্তানদের জন্য এটা ছিল একটা বিশেষ মর্যাদা।

যে তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী দুই লাখ সেনার বিপরীতে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে কৌশলগত কারণে মদীনায় ফিরে এল, সেই বাহিনীই যখন মদীনায় প্রবেশ করলো,

মুসলিমরা তাদের দিকে মাটি ছুঁড়ে মারলো! 'ছি! তোমরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছো!' আল্লাহর রাসূল তাদের ভুল শুধরে দিয়ে বললেন, 'না, তারা পালিয়ে আসেনি। তারা ফিরে এসেছে যেন তারা আবার যুদ্ধ করতে পারে, ইনশা আল্লাহ!'

এই যুদ্ধে নিজেদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনাটাই ছিল বিজয়। তাই যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ খবর পেয়েছিলেন খালিদের হাতে বাহিনীর নেতৃত্ব, তখন সবাইকে বলেছিলেন খালিদের হাতে বিজয় আসবে। এখানে লক্ষণীয় মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসাটা ছিল সাহাবিদের চোখে লজ্জাজনক পরাজয়। মু'তার যুদ্ধ পরাজয় ছিল না, কিন্তু তবু তারা প্রথমে মানতে পারছিলেন না কীভাবে মুসলিম বাহিনী ময়দান ছেড়ে আসে। আসলে সে যুগের মুসলিমরা অনেক ইতিবাচকভাবে জীবনটা দেখতেন, আর আমরা আমাদের পরাজিত অবস্থাকে মেনে নিয়ে জিহাদকেই পরিত্যাগ করে বসেছি।

স্বামীর শোকে শোকাহত আসমা ﷺ অবশ্য খুব দ্রুতই নিজেকে সামলে নেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তিনি আবু বকর সিদ্দীকের ﷺ কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পান এবং রাজি হন। তাদের বিয়ে হলো, ঘর আলো করে এল মুহাম্মাদ নামের এক পুত্র সন্তান। আবু বকর সিদ্দীকের ﷺ মৃত্যুর পর আসমা বিনতে উমাইসকে ﷺ বিয়ে করে নেন আলী ইবন আবু তালিব। মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর আলী ইবন আবু তালিবের ﷺ ঘরে বেড়ে ওঠেন। আগের ঘরের সন্তান হলেও আলী মুহাম্মাদকে খুবই ভালোবেসে বড় করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের এই ভালো সম্পর্ক বজায় ছিল।

প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে কোনো মুসলিম বোনই একা বা অবিবাহিত থাকতেন না। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সহজেই তার বিয়ে হয়ে যেতো। বিধবা হলেও সমস্যা ছিল না, কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করে নিতো। এমনকি বয়স হয়ে গেলেও তাদের বিয়ে হতে কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু আমাদের সমাজে বিষয়টা একেবারে উল্টো। প্রথমত, বহুবিবাহকে বেশিরভাগ মানুষ সহ্য করতে পারে না। এটাকে রীতিমতো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নিজের চাইতে বয়সে বড় এমন কাউকে বিয়ে করতে অনেক ভাই পছন্দ করেন না। তালাকপ্রাপ্ত হওয়াটা যেন কলঙ্ক, আর বিধবা হওয়াটা যেন দোষ। তাদেরও সাধারণত বিয়ের বাজারে পরিহার করা হয়।

বহুবিবাহকে উৎসাহিত ও গ্রহণযোগ্য করা না হলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। একটি পরিবারের অংশ হওয়াটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক জীবনের সাজসজ্জার অংশ হলো পারিবারিক জীবন। সাহাবিরা সে যুগে এটা নিশ্চিত করেছেন যেন কোনো বোন সংসারজীবন থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই তারা বয়স্কা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা -- কাউকেই অবহেলা করতেন না।

# তিন আমীরের মর্যাদা

যাইনাবের সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিয়ের আলোচনায় যাইদ ইবন হারিসাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কীভাবে তিনি তার বাবা-মায়ের ঘর থেকে খাদিজার হাতে আসেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বড় হন আর জিহাদের ময়দানে তার অবদান কী, ইত্যাদি। তবে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি সেটা হচ্ছে তিনি হলেন একমাত্র সাহাবি যার নাম কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন।

> 'এরপর যাইদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব নারীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোনো বিঘ্ন না হয়...' (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৭)

কুরআনে অন্য সাহাবিদের কথা বলা হয়েছে, সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু একমাত্র যাইদ ছাড়া নাম ধরে কারো কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই সম্মান আবু বকর, উমার, উসমান বা আলীও ﷺ লাভ করেননি।

জাফর ইবন আবি তালিব ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই। তিনি আলী ইবন আবি তালিবের আপন বড় ভাই। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিম দলের আমীর। দীর্ঘ দশ বছর পর সেখান থেকে তারা মদীনায় ফিরে আসেন। এই পুরো সময়টায় তিনিই ছিলেন মুসলিম মুহাজিরদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তিনি আবিসিনিয়া ও মদীনা দুই দেশে হিজরতের সাওয়াব লাভ করেছেন।

জাফরের মর্যাদা হলো তার দুই ডানা। মু'তার যুদ্ধে জাফর তার দুটো হাত হারিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বীরত্বের খেতাবস্বরুপ দুটো হাতের পরিবর্তে তাকে দিয়েছিলেন দুটো ডানা। এ ডানা মেলে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াবেন! ইবন উমার ﷺ বলতেন, 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমার উপর, হে দুই ডানাওয়ালা!'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ ছিলেন আকাবার শপথে একজন নাকীব। বারো জনের একজন যারা তাদের গোত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি শুধু মুজাহিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সেই যুগের মিডিয়াকর্মী। ইসলামের সমর্থনে এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রশংসায় তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

একটি হাদীস থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চোখে এই তিন আমীরের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আবু উমামা আল বাহিলী বর্ণনা করেন[102],

---

[102] ইবন হিব্বান, হাদীস ৭৪৯১।

*'আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,*

*একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, দুজন লোক আমার কাছে আসলো আর আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরলো। এরপর আমাকে একটি অসমতল পাহাড়ের কাছে নিয়ে বললো, এটায় চড়ুন! আমি বললাম, আমি এখানে চড়তে পারবো না। তারা বললো, আমরা আপনার জন্যে সহজ করে দেবো। আমি পাহাড়ে চড়লাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে বিকট চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলাম, বললাম, এগুলো কীসের চিৎকার? দুই ফেরেশতা বললো, এগুলো হচ্ছে জাহান্নামীদের আর্তনাদ। এরপর তারা আমাকে নিয়ে আরও এগিয়ে গেল, দেখলাম, একটি দলকে তাদের গ্রীবা ধমনী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষতবিক্ষত চোয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে। বললাম, এরা কারা? উত্তরে তারা বললো, এরা সাওম ভঙ্গ করতো। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল। দেখলাম, একদল লোকের মৃত দেহ ফুলে গিয়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সে দুর্গন্ধ বিষ্ঠার দুর্গন্ধের মতোই অস্বস্তিকর। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললো, এরা তারা যারা কাফিরদের মধ্যে নিহত হয়েছে। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল। সেখানেও কিছু লোককে দেখলাম যাদের দেহ ফুলে গিয়ে বিষ্ঠার মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। জানতে চাইলাম, এরা কারা? ফেরেশতারা উত্তর দিলো, এরা ছিল ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী।*

*আমাকে আরও সামনে নিয়ে গেল তারা। দেখলাম, কিছু মহিলার স্তনে সাপ দংশন করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এদের অবস্থা এমন কেন? ফেরেশতারা উত্তর দিলো, এরা তাদের ছেলেমেয়েদের তাদের দুধ পান করতে দেয়নি। তারপর তারা আমাকে আরও সামনে নিয়ে চললো। দেখলাম, কিছু বালক যারা দুটো সাগরের মধ্যে খেলাধুলা করছে। বললাম, এরা কারা? ফেরেশতারা বললো, এরা মু'মিনদের নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তান। এরপর তারা আমাকে নিয়ে গেল একটি উঁচু জায়গায়, সেখানে তিনজনের একটি দলকে দেখলাম যারা জান্নাতী সুরা পান করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা জবাব দিলো, এরা হচ্ছেন জাফর ইবন আবু তালিব, যাইদ ইবন হারিসা এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ؓ। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানেও দেখলাম তিনজনের একটি দল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?' তারা বলেন, এরা হচ্ছেন ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ؑ; তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'*

## যাতুস সালাসিলের অভিযান

এটি ছিল আমর ইবন আসের ؓ নেতৃত্বে প্রথম সারিয়াহ। মাত্র কিছুদিন আগেই তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদের ؓ সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নেতৃত্বস্থানে বসালেন, কেননা এ দু'জনের মধ্যে

জন্মগতভাবেই নেতৃত্বের গুণ ছিল। এই অভিযানের নাম ছিল যাতুস-সালাসিল, কেননা যাতুস-সালাসিল নামের একটি কূপ বা নদীর উৎসের কাছে এই অভিযান সংঘটিত হয়। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মু'তার যুদ্ধে রোমানদের পক্ষাবলম্বনকারী বনু কুদাআহ গোত্রকে শায়েস্তা করা। আমর ইবন আল আস ﷺ তিনশো মুহাজির ও আনসার সাথে নিয়ে অভিযানে বের হলেন। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি গিয়ে জানতে পারলেন তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে লড়তে এসেছে। তখন আমর আল্লাহর রাসূলের কাছে অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে খবর পাঠালে আল্লাহর রাসূল আবু উবায়দা ইবন আল-যাররাহর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী পাঠান।

অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কারণ শত্রুপক্ষ প্রতিরোধ গড়ার পরিবর্তে পালিয়ে যায়। আরবের উত্তরে মুসলিমদের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়। কিছু গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে আর কিছু গোত্র মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

## শিক্ষা

১) এই অভিযানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ঐক্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু উবায়দাকে ﷺ আমীর নিযুক্ত করে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান, তখন সালাতে ইমামতি কে করাবেন সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক হয়। আমর ইবন আল আস ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের সবার আমীর, কারণ তোমরা এসেছো অতিরিক্ত সৈন্য হিসেবে।' মুহাজিররা প্রতিবাদ করলেন, বললেন, 'আপনি আপনার দলের লোকদের আমীর, আর আবু উবায়দা তার দলের আমীর।'

বিষয়টা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে দেখে আবু উবায়দা ﷺ আমরকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সর্বশেষ নির্দেশে বলেছেন, তোমরা মিলেমিশে থাকবে, একে অপরের সাথে বিরোধ করবে না। কাজেই আমর, তুমি যদি আমাকে মানতে না চাও, তাহলে আমি তোমাকে মানবো।' এরপর আবু উবায়দা ﷺ আমর ইবন আল-আসের ﷺ নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং সবাই এক আমীরের অধীনে সালাত আদায় করলো।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হলো ঐক্য বজায় রাখা। আবু উবায়দা এখানে আমরের অধীনস্থ ছিলেন না, চাইলেই তিনি নিজের মতের ওপরে অটল থাকতে পারতেন। কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে, বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তিনি নিজের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন। আবু উবায়দা ছিলেন খুবই শান্ত মেজাজের সরল মনের মানুষ, তাই বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চাননি। নিজের ক্ষমতার ওপর ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২) আমর ইবন আল-আস ﷺ ছিলেন নও-মুসলিম, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা রপ্ত করতে এবং নিজের যোগ্যতা ইসলামের কাজে লাগাতে সময় নেননি।

ক) অভিযান প্রেরণের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল-আসকে ﷺ বলেন, 'তোমাকে আমি একটি বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ যেন

তোমাকে নিরাপদ রাখেন এবং তোমাকে গনিমতের সম্পদ দান করেন।' জবাবে আমর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি তো গনিমতের আশায় ইসলাম গ্রহণ করিনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, 'শোনো, নেককার লোকের হাতে হালাল সম্পদ হলো বরকতময়।' এ হাদীস থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়, এক, আমর ইবন আল-আস আন্তরিকভাবেই ইসলামের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। গনিমতের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম হননি এবং দুই, টাকা পয়সা থাকাটা খারাপ কোনো ব্যাপার নয়, সে টাকা কীভাবে কামানো হচ্ছে বা কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সেটাই আসল কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, যারা ভালো লোক, তারা যদি বিত্তশালী হয় তাতে খারাপ কিছু নেই কারণ তারা তাদের সম্পদ হালাল উপায়ে আয় করে এবং ভালো কাজে খরচ করে।

খ) অভিযানের পুরো সময় জুড়ে আমর সৈনিকদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখেছেন। দিনের বেলা ভ্রমণ না করে রাতের অন্ধকারে পথ চলেছেন। নিশ্চিত করেছেন কেউ যেন আলো না জ্বালায়। শত্রুরা পালিয়ে যাবার পর তাদের পিছু নেননি, কারণ শত্রুরা অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে হাজির হলে তিনি তার সীমিত সংখ্যক সৈনিক নিয়ে তাদের সাথে পেরে উঠবেন না, তাই তিনি মদীনায় চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।

গ) অভিযানের এক রাতে আমর ইবন আসের ﷺ স্বপ্নদোষ হয়। সে রাতে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাই তিনি গোসল না করে শুধুমাত্র তায়াম্মুম করেন এবং সে অবস্থায় অন্যদের ইমামতি করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বিষয়টি জানানো হয়। আমর ইবন আল আস ﷺ বললেন, 'আমি নিজেকে নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম। যদি আমি সেদিন গোসল করতাম তাহলে নির্ঘাৎ মারা যেতাম! তখন অসম্ভব ঠাণ্ডা ছিল তাই সতর্কতাবশত শুধু তায়াম্মুম করেছি।' রাসূলুল্লাহ শুনে ﷺ হাসলেন, কিছুই বললেন না। অর্থাৎ আমরের এই কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মতি প্রকাশ করেছেন। অনেক আলিম এই ঘটনার ওপরে মত দিয়েছেন, যদি আবহাওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয় এবং পানি খুব ঠাণ্ডা হয় তবে ফরজ গোসলের পরিবর্তে ওযু বা তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। কুরআনের যে আয়াতের ওপর ভিত্তি করে আমর ইবন আল-আস ﷺ ইজতিহাদটি করেন সেটি হলো,

> "...এবং তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা, ৪: ২৯)

এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহর রাসূলের যুগে ইজতিহাদের অনুমোদন ছিল। আর আমর নও-মুসলিম হয়েও এই ইজতিহাদটি করেছেন। এটা প্রমাণ করে আমর কুরআনের জ্ঞান রাখতেন।

# আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি

দ্বীন ইসলাম কেবল আরবদের জন্য আসেনি, বরং ইসলাম এসেছে একটি বৈশ্বিক মিশন নিয়ে। আর ইসলামের এই মিশন বলবৎ থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলো এই মিশনের উদ্দেশ্য।

সে উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু চিঠি পাঠান। চিঠির ভাষাই বলে দেয় এই চিঠিগুলো পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলামকে আরবের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করছিলেন। এই শাসকদের কেউ রাসূলুল্লাহর ﷺ আহবান গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে, কেউ সমীহ দেখিয়েছে, কেউ পাত্তাই দেয়নি। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সাথে পরবর্তী বোঝাপড়ার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন।

## রোমান শাসকের কাছে চিঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মিম্বরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে বাইরের রাজাদের কাছে পাঠাতে চাই। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক কোরো না যেমন করে বনী ইসরাঈলের লোকেরা করেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসার ﷺ ব্যাপারে।' মুহাজিররা প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কখনো কোনো ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করবো না। আপনি আমাদের আদেশ করুন, আমরা এগিয়ে যাবো।'

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠানো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চিঠি ছিল তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই চিঠির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আহবান করেছেন যেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে। তাদের ধর্ম, মানবরচিত বিধান ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। এটি একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ ও বটে। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন ঈসার ﷺ কথা বলে মুসলিমদের সতর্ক করলেন? এর কারণ হলো বনী ইসরাঈলিরা কিছু স্বৈরাচারী রাজার অধীনে বসবাস করতো। এই রাজাদের প্রভাব এবং হস্তক্ষেপের কারণে খ্রিস্টধর্ম বিকৃত হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরা বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তেমনই কিছু রাজার দেশে সাহাবিদের পাঠাচ্ছিলেন। এটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটা ব্যাপার ছিল। এই কারণে তিনি সাহাবিদের সাবধান করে দেন যেন তারা ঈসার অনুসারীদের মতো বিতর্কে লিপ্ত না হয়।

তৎকালীন রোমের সম্রাট হিরাকলের কাছে চিঠি পাঠানোর জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বেছে নিলেন সুদর্শন সাহাবি দাহিয়া আল-কালবীকে ﷺ। হিরাকল বা হিরাক্লিয়াস ছিল সেই সময়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি। এটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান ইতালীর রোম। হিরাকল যখন শাসনক্ষমতা লাভ করে, তখন রোমানরা বেশ কঠিন সময় পার করছিল। সে সময়ে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় হিরাকল নিজেই একটি যুদ্ধের সেনাপতির ভূমিকা পালন করে এবং এরপর থেকে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। রোমানরা পারস্যদের হারিয়ে তাদের হারানো ভূমি ফিরে পেতে শুরু করে। এমনকি সে পারস্য সাম্রাজ্যের অংশবিশেষও দখল করা শুরু করে।

সূরা আর-রুমে এমন একটি যুদ্ধের কথা আগের খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন রোমানরা একটি যুদ্ধে শীঘ্রই পারস্যদের পরাজিত করবে। সেটা এই হিরাকলের সময়ের যুদ্ধ। যা-ই হোক, হিরাকল পারস্যদের পরাজিত করে দামাস্কাস, জেরুসালেম ফিরে পায় এবং 'ট্রু ক্রস' পারস্যদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। ট্রু ক্রস হলো কাঠের তৈরি একটি বিশেষ ক্রস। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে এই ক্রসে ঈসাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ঈসাকে ﷺ আল্লাহ তুলে নিয়েছেন এবং তিনি আবারও দুনিয়াতে ফিরে আসবেন।

ট্রু ক্রস ফিরে পাওয়া ছিল খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দঘন একটি মুহূর্ত। জাঁকজমকপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে হিরাকলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে -- এমনই এক মুহূর্তে হিরাকলের হাতে এসে পড়লো আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি। সে চিঠিতে লেখা:

*'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।*

*এই চিঠিটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের ﷺ পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাকলের উদ্দেশ্যে।*

*শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা সত্য পথের অনুসরণ করে। আমি আপনাদের ইসলামের প্রতি আহবান করছি। আত্মসমর্পণ করুন এবং ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। আর যদি আপনি অস্বীকৃতি জানান, তবে আরিসিয়ীনদের (তার দেশের নাগরিকদের কথা বলা হচ্ছে) দায়ভারও আপনার উপর পড়বে।*

*বলো, 'হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের দিকে আসো -- যা আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সমান -- আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে*

*রব হিসাবে গ্রহণ করি না।' তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।'*

চিঠি পড়ে হিরাকলের ঘাম ঝরতে থাকে। চিঠিটি তার হাতে পৌঁছে দেয় বসরার গভর্নর। চিঠিটি পড়ে সে তার অধীনস্থদের বললো, সে নবীজির ﷺ কোনো অনুসারীর সাথে কথা বলতে চায়। যেভাবেই হোক তারা যেন একজন অনুসারীকে তার কাছে নিয়ে আসে। তারা তন্ন তন্ন করে আশ-শাম খুঁজে বেড়ালো। ঘটনাক্রমে সন্ধান পেল আবু সুফিয়ানের। আবু সুফিয়ানের সাথে তখন একদল কুরাইশ আর একটি কাফেলা। হিরাকলের দরবারে তাদের ডাক পড়লো।

দোভাষী আনা হলো। আবু সুফিয়ান ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ সবচাইতে কাছের আত্মীয়। তাই সে সামনে আর বাকিরা পেছনে দাঁড়িয়ে। হিরাকল আবু সুফিয়ানের কাছে জানতে চাইলো,

- তোমার সাথে তাঁর কেমন আত্মীয়তা?

- তিনি আমার ভাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের সরাসরি ভাই ছিলেন না। তাদের দাদারা পরস্পর ভাই ছিলেন, সে হিসেবে তারা দুজন ভাই ছিলেন। হিরাকল বললো, 'আমি চাই তোমরা বাকিরা তার পেছনে দাঁড়াও। যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে আমাকে ইঙ্গিতে দেখাবে।'

সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে বলেন, 'আমি হিরাকলের মতো বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ কাউকে দেখিনি। আমি যদি মিথ্যা বলতাম, তবু আমার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতো না। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত লোক হিসেবে মিথ্যা বলাটা আমার কাছে খুবই লজ্জাজনক। আমি যদি মিথ্যা বলতাম সেটা মক্কায় ঠিকই জানাজানি হতো, তাই আমি হিরাকলকে মিথ্যা কিছুই বলিনি।' আবু সুফিয়ান তখন একজন কাফির ছিল সত্যি, কিন্তু সে নীতিবান ছিল। হিরাকল জিজ্ঞেস করলো,

- মুহাম্মাদ লোকটা কে?

- তিনি একজন জাদুকর এবং মিথ্যাবাদী।

- কুৎসা শুনতে আমি আগ্রহী নই। আমাকে তাঁর ব্যাপারে জানাও।

হিরাকল রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে চাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো,

- কোন ধরনের বংশ থেকে তাঁর আবির্ভাব?

- সম্ভ্রান্ত বংশ থেকেই তাঁর আবির্ভাব।

- তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা ছিলেন?

- না।

- আচ্ছা, এর আগে তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নবুওয়াতের দাবি নিয়ে এসেছিল?

- নাহ।

- যারা তাঁর অনুসারী, তাদের বেশিরভাগ অভিজাত পরিবারের নাকি গরীব?

-তারা গরীব।

- তাদের সংখ্যা কি দিনে দিনে বাড়ছে না কমছে?

- তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

- আচ্ছা, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এই ধর্ম গ্রহণ করে আবার আগের ধর্মে ফিরে এসেছে?

- নাহ।

- আচ্ছা, তুমি কি তাঁকে এই নতুন ধর্ম প্রচার করার আগে মিথ্যা বলতে শুনেছো?

- না, শুনিনি।

- কখনো সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

- না, আমরা তাঁর সাথে অস্থায়ী সন্ধি করেছি। তবে ভবিষ্যতে তিনি কী করে বসবেন সেটা নিয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

- তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ?

- হ্যাঁ, করেছি।

- কে জিতেছে সেই যুদ্ধে?

- কখনো তিনি জিতেছেন, কখনো আমরা জিতেছি।

- তিনি তোমাদের কী কী কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন?

- তিনি বলেছেন যেন আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি। তিনি আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন, সত্য কথা বলার ও সৎভাবে বাঁচার আদেশ দেন, মানুষের প্রতি দয়াবান হতে বলেন।

আবু সুফিয়ান খুব করে চাইলো রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে খারাপ কিছু বলবে। কিন্তু সে সুযোগই পেল না, শুধু এতটুকুই বলতে পারলো -- তিনি ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে করতেও পারেন!

সব শুনে হিরাকল বললো,

*'তুমি বলেছ মুহাম্মাদ একটি সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে এসেছেন আর সকল নবী ও রাসূলের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। তুমি বলেছ তাঁর আগে কেউ নবী হওয়ার দাবি করেনি, সেক্ষেত্রে এ কথা বলতে পারছি না যে তিনি কারো দেখাদেখি এসব করছেন। তোমার কথা অনুযায়ী তাঁর বংশের কেউ রাজা ছিল না, তার মানে তিনি রাজত্বের দাবিদার নয়। তুমি আরও বলেছ নবী হওয়ার দাবি করার আগে তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, কাজেই আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলা শুরু করবেন না। তুমি স্বীকার করেছ যে তাঁর অনুসারীরা গরীব। আল্লাহর সকল নবীর অনুসারীরা গরীব ছিল। তাদের সংখ্যা বাড়ছে, এর থেকে বোঝা যায় তারা সত্য দ্বীনের উপরে আছে, কেননা সত্য দ্বীন পূর্ণতাপ্রাপ্তির আগে এমনটাই ঘটে। তুমি আরও বলেছ এই ধর্ম গ্রহণের পর কেউ তা থেকে ফিরে আসেনি, আর এটাই ঈমানের বৈশিষ্ট্য যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে। তুমি আরও স্বীকার করেছ তিনি বিশ্বাসঘাতক নন, আল্লাহ তাআলার কোনো নবীই এমন ছিলেন না। তুমি বলেছো তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে আহবান করেন, তাঁর ইবাদত করতে বলেন, সত্যবাদী এবং দয়ালু হতে বলেন। তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাও তিনি জয় করবেন। আমি জানতাম তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি যে তোমাদের মাঝে আসবেন এটা আমি ভাবিনি। যদি আমি পারতাম, শত ঝামেলা সত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতাম এবং নিজ হাতে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।'*

হিরাকলের এই কথাগুলোই বলে দেয় সে কতটা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী একজন মানুষ ছিল। ইতিহাস, সত্য ধর্ম, আল্লাহর রাসূলের পরিচয় -- একজন সম্রাট হিসেবে হিরাকলের এসব ব্যাপারে ভালোই জ্ঞান ছিল। যদিও এই জ্ঞান তার কোনো কাজে আসেনি, কারণ শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। একজন কাফির হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছে।

হিরাকল উপরের কথাগুলো বলার পর তার রাজদরবারে শোরগোল পড়ে যায়। আবু সুফিয়ান আর তার সাথের লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয়। হিরাকলের চেহারায় দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছাপ দেখে আবু সুফিয়ানের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্যিই একদিন রোম সাম্রাজ্য জয় করবেন।

সীরাতের বইতে এ সম্পর্কিত আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। হিরাকল তার মন্ত্রীসভা এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদে ডেকে বললো, 'হে রোমানরা! সাফল্য যদি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি তোমরা সত্য পথের সন্ধান চাও, যদি তোমরা চাও তোমাদের এই সাম্রাজ্য টিকে থাকুক, তাহলে এই নবীর কাছে তোমরা বাইয়াত করো।' এই কথা কারো পছন্দ হলো না, সবাই দৌড়ে চলে যেতে লাগলো। পরে সবাইকে সে আবার ডেকে এনে বললো, 'তোমরা শান্ত হও। আমি আসলে তোমাদের ঈমান কতটা শক্ত সেটা পরখ করেছি মাত্র।'

# পারস্য সম্রাটের কাছে চিঠি

আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীকে ﷺ পাঠানো হয় পারস্যের সম্রাটের কাছে। চিঠিটি দেওয়া হয় তৎকালীন বাহরাইনের রাজার কাছে। সে পারস্যের সম্রাটের কাছে চিঠিটি পৌঁছে দেয়।

> *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম*
>
> *আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের ﷺ এর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান কিসরার প্রতি।*
>
> *শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা সত্য পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে আর সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের আর কোনো যোগ্য সত্তা নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।*
>
> *আমি আপনার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। সকল মানবজাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল হিসেবে জীবিত সকল মানুষকে আমি সতর্ক করছি: যারা আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং ইসলাম গ্রহণ করুন। যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। আর যদি এই আহবান প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে অগ্নিপূজারিদের (সমস্ত নাগরিক) দায়ভারও আপনার উপর বর্তাবে।'*

কিসরা এই চিঠি পড়ে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। সে বলে 'এত বড় সাহস! আমার দাস হয়ে আমাকে এমন চিঠি দেয়!' উদ্ধত কিসরা ইয়েমেনের গভর্নরকে আদেশ দেয় যেন সে দুইজন লোক পাঠিয়ে মুহাম্মাদকে ﷺ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

পারস্যরা আরবদের গোলাম মনে করতো। কারণ পারস্যের সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তিই আরবদের ছিল না। ইয়েমেন ছিল তখন পারস্যের আজ্ঞাবহ একটি দেশ। ইয়েমেনের তৎকালীন গভর্নর বাযান ইবন সাসান দুজন লোককে পাঠায় আল্লাহর রাসূলকে 'ধরে আনা'র জন্য।

বাযান কোনো সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনবোধ করলো না। পারস্যের সম্রাটের আদেশই ছিল যথেষ্ট, সেনা পাঠানোর দরকার নেই। তাইফে পৌঁছে তারা লোকদের সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় আছেন। এই ঘটনা দেখে তায়েফবাসী এবং কুরাইশরা যারপরনাই খুশি হয়ে ওঠে। বলাবলি করতে থাকে, 'আহ! মুসলিমদের সময় শেষ হয়ে এল বলো!'

মদীনাতে গিয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে দেখা করে। তাকে বলে, 'রাজাদের রাজা, শাহেনশাহ কিসরা, ইয়েমেনের রাজা বাযানকে এই মর্মে আদেশ করেছেন যেন আমরা আপনাকে এখান থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই। যদি আপনি রাজি হন তাহলে

বাযান আপনার পক্ষ হয়ে কিসরার সাথে কথা বলবে। আর আপনিও বড় বিপদ থেকে বাঁচবেন। আর আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কিসরার ক্ষমতা কেমন তা নিশ্চয়ই আপনার ভালোই জানা আছে। তিনি নিশ্চিতভাবে আপনার দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করে দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করালেন। পরের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বললেন,

- গতরাতে আমার রব তোমাদের রবকে হত্যা করেছেন।

তারা হতভম্ভ হয়ে গেল, বললো,

- আপনি জানেন আপনি কী বলছেন! এর চাইতেও তুচ্ছ বিষয়ে আপনার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। এরপরও কি আপনি চান যে রাজা বাযানকে আপনার এই কথাগুলো জানাই?

- হ্যাঁ, জানাও। তাকে আমার পক্ষ থেকে এও জানিয়ে দাও যে আমার দ্বীন এবং রাজ্য কিসরার ধর্ম ও রাজ্যকে উৎখাত করবে এবং সবকিছুকে ধুলোয় মিশিয়ে দিবে। তাকে আরও বলে দাও, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাকে তার বর্তমান পদেই বহাল রাখবো এবং সেই অঞ্চলের শাসক বানাবো।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কিছু উপহার দিয়ে বিদায় করে দেন।

লোক দুটো বাযানের কাছে ফিরে গেল। সব শুনে বাযানের মনে হলো, যেনতেন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের ﷺ মাঝে বিশেষ কিছু আছে। সে কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাইলো। কিছু সময় পর তারা খবর পেল কিসরা সে রাতেই মারা গেছে যে রাতের কথা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন। এই ঘটনাই ছিল বাযানের জন্য যথেষ্ট। সে মুসলিম হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে রেখে দেন। এভাবেই ইয়েমেনে ইসলামের দরজা খুলে যায়।

পারস্যের নতুন কিসরা ছিল আগের কিসরারই ছেলে। সে তার বাবাকে খুন করে শাসনক্ষমতা দখল করে। নতুন কিসরা বাযানের কাছে চিঠি লিখে বলে, 'আমি আমার বাবাকে খুন করেছি কারণ সে আমাদের সম্মানিত লোকদের সাথে বিরূপ আচরণ করেছে। আর যে লোককে আমার গ্রেপ্তার করতে আমার বাবা আদেশ করেছিলেন, তার ব্যাপারে আপনার আর কিছু করার প্রয়োজন নেই।'

কিসরা যখন আল্লাহর রাসূলের ﷺ চিঠি পেয়েছিল, তখন সেই চিঠি সে রাগে ঔদ্ধত্যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা তার রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন করে দেবেন।' শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। অল্প ক'বছর পরেই মুসলিমরা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে নেয়।

# আল মুকাওকিসের নিকট চিঠি

**পরবর্তী চিঠিটি পাঠানো হয় মিশরের শাসক আল মুকাওকিসের প্রতি, চিঠিটি পৌঁছে দেন হাতিব ইবন আবি বালতা** ﷺ

*'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম*

*মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহর ﷺ পক্ষ থেকে আল মুকাওকিসের উদ্দেশ্যে।*

*আমি আপনার কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। আর আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে মিশরের খ্রিস্টানদের দায়ভারও আপনার উপর বর্তাবে।*

*বলো, 'হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের দিকে আসো -- যা আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সমান -- আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করি না।' তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।'*

চিঠিটি পড়ে মুকাওকিস হাতিবকে ﷺ বললো,

- যিনি আপনাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন, তিনি কি একজন রাসূল নন?

- অবশ্যই তিনি একজন রাসূল।

- যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে যারা তাকে বের করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস চেয়ে তিনি কেন দুআ করলেন না?

- আপনি মারইয়ামের পুত্র ঈসার ﷺ কথা ভাবুন। তিনিও একজন রাসূল ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সপ্তম আসমানে তুলে নিয়েছিলেন -- তখন কি তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য দুআ করতে পারতেন না?

- হুম! নিশ্চয়ই আপনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাকে আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি পাঠিয়েছেন। আমি আপনার সাথে মুহাম্মাদের ﷺ জন্য কিছু উপহার পাঠাচ্ছি।

মিশরের শাসকের প্রতিক্রিয়া ছিল ভদ্রোচিত, যদিও সে মুসলিম হয়নি। তিনি হাতিবের সাথে দুই বা তিনজন দাসী পাঠিয়ে দেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন মারিয়া। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করে নেন এবং তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহর ﷺ পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই সে মারা যায়। অন্য দাসী দেওয়া হয় হাসান ইবন সাবিতকে। দুলদুল নামে একজন ভৃত্যও রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, আর সেই সাথে কিছু উপহার।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু চিঠি পাঠানো হয়েছিল আরবের রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে। আন নাজাশীকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, পাঠানো হয়েছিল গাসসানের রাজাকে এবং বাহরাইনের শাসককেও। অবশ্য নাজাশীকে যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল সেটি কি মাক্কী জীবনে নাকি হুদাইবিয়ার পরে সেটি নিয়ে দ্বিমত আছে।

# চিঠিগুলোর তাৎপর্য

## ১) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী শক্তির উত্থান

তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো চিঠিগুলোর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই চিঠিগুলোর কাজ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং সম্প্রসারণশীল নীতির ব্যাপারে সবাইকে জানান দেওয়া। চিঠিগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি সবাইকে আভাস দিচ্ছিলেন -- নতুন এই রাষ্ট্রকে সমীহ করেই চলতে হবে, একে হালকাভাবে নেওয়া চলবে না। তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব বিষয়। সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হয় পারস্য নয়তো রোমানদের অধীনস্থ ছিল। বর্তমান সময়ের সাথে এই অবস্থার কিছুটা মিল পাওয়া যায়, গত একশো বছরের উপরে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিভক্ত এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তি যেমন আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠিগুলো ছিল সেই সময়ের পরাশক্তিগুলোর প্রতি চ্যালেঞ্জ। তাদেরকে ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার আহবান করা এবং এই আহবানে সাড়া না দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা। বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় শক্তি এই আহবানে সাড়া দেয়নি, যে কারণে পরবর্তীতে সাহাবিরা সেই সাম্রাজ্য এবং দেশগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন। পারস্যের প্রতিক্রিয়া ছিল সবচাইতে রূঢ়, তাদের পতনও হয়েছে সবচাইতে দ্রুত। নতুন কিসরা মাত্র ছয় মাসের জন্য সিংহাসনে বসার সুযোগ পায়। এর পর আভ্যন্তরীণ কোন্দলে পারস্যের রাজনৈতিক কাঠামো একেবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। পরবর্তী মাত্র চার বছরে দশবার ক্ষমতার রদবদল হয়। শেষ পর্যন্ত ৬৩৭ সালে মুসলিমদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ কবুল হয়। পারস্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে রোমান সম্রাট হিরাকল সম্মান দেখিয়েছিল আর তার সাম্রাজ্য টিকেছিল প্রায় আটশো বছর। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতহের হাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বাহরাইন, মিশর, ইয়েমেন, শাম, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আবু বকর ﷺ এবং উমারের ﷺ খিলাফতকালেই। রোমান এবং পারস্য -- দুই পরাশক্তির পতন ঘটে, উত্থান হয় নতুন এক পরাশক্তি ইসলামের। ইসলাম পরবর্তী প্রায় তেরোশো বছর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

## ২) কাফির নেতৃবৃন্দের প্রতি মনোভাব

রোমান সম্রাটকে লেখা চিঠিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে রাজা বা নেতা হিসেবে সম্বোধন করেননি। এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার আসকালানি বলেছেন, ইসলাম কোনো কাফিরের কর্তৃত্ব বা রাজত্বকে স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয় না। তবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে পুরোপুরি অসম্মানও করা হয়নি। বলা হয়েছে *আযীম আর-রুম* বা *রোমের মহান ব্যক্তি*। চিঠিতে বলা হয়েছে -- শান্তি বর্ষিত হোক যারা সত্য পথের অনুসারী। হিরাকল বা অন্য কোনো সম্রাটকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ সরাসরি সালাম দেননি। বলেছেন, 'সালাম তাদের জন্য যারা সত্য পথের অনুসরণ করে।'

বর্তমানকালে আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। যেসব কাফির রাষ্ট্রের নেতা সরাসরি ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা এবং মুসলিমদেশের দুর্দশার জন্য দায়ী -- তেমন নেতাকেও মুসলিমরা সম্মান জানাচ্ছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। নিঃসন্দেহে এটা পরাজিত এবং দুর্বল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এটা রাসূলুল্লাহর শিক্ষা নয়, এটা সাহাবিদের পথও নয়। এটা হলো লাঞ্ছনা এবং অবমাননার পথ। তারা শত্রুদের সাথে মাথা উঁচু রেখে কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহর তাঁর চিঠিতে, লেখায়, কথায় শিষ্টাচার অবলম্বন করেছেন কিন্তু 'রাজনৈতিক শিষ্টাচারের' নামে কাফিরদের অপ্রয়োজনীয় সম্মান দেখাননি।

# মক্কা বিজয়

## হুদাইবিয়ার চুক্তিভঙ্গ: প্রেক্ষাপট

জাহেলি যুগে বনু হাদরামির এক লোক বনু বকরের মিত্র ছিল। সে সময়ে দেখা যেতো, এক গোত্রের লোক অন্য একটি গোত্র থেকে নিরাপত্তা লাভ করতো, তাদের মিত্র হিসেবে চলাফেরা করতো, তাদের সাথে থাকতো। বিষয়টিকে অনেকটা অন্য গোত্রের নাগরিকত্ব বা সিটিজেনশিপ লাভ করার মতো। যাই হোক, বনু হাদরামির সেই লোকটি একদিন হিজাজে ভ্রমণ করছিল। ঘটনাক্রমে সে খুযাআ গোত্রের এলাকায় ঢুকে পড়লো এবং খুযাআর লোকেরা তাকে হত্যা করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যেহেতু বনু হাদরামি আর বনু বকর ছিল মিত্র, তাই প্রতিশোধস্বরুপ বনু বকরের লোকেরা খুযাআর এক লোককে হত্যা করে। পাল্টা জবাবে খুযাআ এবার বনু বকরের অন্তর্ভুক্ত বনু আসওয়াদের তিনজনকে হত্যা করে। বনু বকরের অন্তর্ভুক্ত হলেও বনু আসওয়াদের স্থান ছিল অন্যদের চাইতে ওপরে, তাই অন্যদের তুলনায় তারা দ্বিগুণ 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য আদায় করতো।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল জাহিলিয়াতের সময়। সুলহুল হুদাইবিয়ায় চুক্তির একটি শর্ত ছিল -- যার ইচ্ছা সে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।। বনু বকর জোট বাঁধলো কুরাইশদের সাথে আর বনু খুযাআ জোট বাঁধলো মুসলিমদের সাথে। জাহিলি যুগে বনু খুযাআ ছিল বনু হাশেমের মিত্র, তাই বনু হাশেমের সন্তান ও নেতা হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে তারা সন্ধি করে, যদিও তাদের অনেকেই ছিল মুশরিক। এই সন্ধি তারা করেছিল গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে, দ্বীনের কারণে নয়।

যেহেতু মুসলিম এবং কুরাইশরা শান্তিচুক্তিতে আছে, হুদাইবিয়ার শর্তমতে, বনু খুযাআ এবং বনু বকরের মধ্যেও এখন শান্তিচুক্তি বিরাজ করছে। কেননা তাদের একদল মুসলিমদের পক্ষে আরেকদল কুরাইশদের পক্ষে। কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো বনু বকর। তারা বনু আসওয়াদের সেই তিনজনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

এই কাজে নেতৃত্ব দেয় মুআবিয়া ইবন নওফাল। সে ছিল বনু বকরের এক নেতা। তবে সে-ই একমাত্র নেতা ছিল না। সে ছিল একটি শাখাগোত্রের (বনু দাইলি) প্রধান, বনু বকরের সবাই তাকে নেতা হিসেবে মানতো না। তবু সে সবাইকে বনু খুযাআর লোকদের উপর হামলা চালানোর জন্য আহবান করলো । বনু বকরের অন্যেরা রাজি হলো না। তখন মুআবিয়া এবং তার দলবল খুযাআর লোকদের উপর আক্রমণ চালায়। এই লোকদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাও ছিল। বনু খুযাআর বিশজন লোক বনু বকরের হাতে ওয়াতীর কূপের কাছে মারা গেল।

এদিকে কুরাইশরাও এই হামলায় বনু বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করলো। হামলা ঘটেছিল রাতের বেলায়, সেই সুযোগে কুরাইশদের কেউ কেউ এই হামলায় অংশ নেয় এই ভেবে যে রাতের বেলা কিছু বোঝা যাবে না কে হামলায় অংশ নিয়েছে। খুযাআর লোকেরা প্রাণ বাঁচাতে হারামের সীমানার মাঝে ঢুকে পড়লো। তৎকালীন আরবে হারামের সীমার ভেতর বা হারাম মাসে হত্যাকাণ্ডকে খুব খারাপ চোখে দেখা হতো। বনু খুযাআর লোকেরা হারামে ঢুকে মুআবিয়ার কাছে আর্তি জানালো, 'মুআবিয়া! আমরা হারামে ঢুকে পড়েছি! তোমার দেবতাদের দোহাই লাগে!' কিন্তু মুআবিয়া ইবন নাওফালের এতটুকু দয়াও হলো না, সে বললো, 'আজ কোনো ইলাহ নেই। বনু বকরের লোকেরা, তোমরা আজকে আল্লাহর নামে প্রতিশোধ নাও। তোমরা হারাম শরীফে চুরি করতে পারো, তবে কি নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো না?'

এই খুনোখুনির খবর আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছে দিলেন আমর ইবন সালিম আল খুযাই। বনু বকরের হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডে কুরাইশদের হাত এবং নিহত লোকদের ব্যাপারে সে আল্লাহর রাসূলকে জানালো কবিতার ভাষায়। আরবিতে খুবই চমৎকার এবং ছন্দময় একটি কবিতা। দীর্ঘ কবিতাটির অল্প কিছু লাইন উল্লেখ করা হলো,

*হে রব! আমি মুহাম্মাদকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সেই পুরোনো সন্ধির কথা!*
*যে সন্ধি হয়েছিল আমার আর তাঁর পূর্বপুরুষের মাঝে।*
*(হে মুহাম্মাদ!) আপনারা তো আমাদেরই সন্তান, আর আমাদেরই লোক আপনার পিতৃপুরুষ।*
*আর তাই তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।*
*সেই সন্ধি থেকে আমরা হাত গুটিয়ে নেইনি,*
*আপনি আমাদের সাহায্য করুন!*
*আল্লাহ আপনাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করুন!*
*আপনি আহবান করুন আল্লাহর বান্দাদের,*
*যেন তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে!*

তাদের উদাত্ত আহবান শুনে রাসূল ﷺ একটা কথাই বললেন, 'তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে আমর ইবন সালিম। তুমি সাহায্য পাবে।'

এই হামলা ছিল মুসলিমপক্ষের একটি গোত্রের ওপর কুরাইশপক্ষীয়দের হামলা। আর যেহেতু কুরাইশপক্ষীয়রাই এই হামলা করে চুক্তিভঙ্গ করেছে, আল্লাহর রাসূল তাই মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কুরাইশপক্ষের লোকেরা যা করেছিল, তা ছিল সুস্পষ্ট চুক্তি লঙ্ঘন এবং বিশ্বাসঘাতকতা। লক্ষণীয়, কুরাইশপক্ষের সবাই এই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেনি, অল্প কিছু লোকই এই কাজ করেছে যা ছিল চুক্তিভঙ্গের জন্য যথেষ্ট। এমন হতে পারে, কাফিরদেশের বিপুল জনগণ যুদ্ধবিরোধী মিছিল করছে, কিন্তু চুক্তিভঙ্গের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের একটি অংশের আনুষ্ঠানিক সমর্থনই যথেষ্ট, সমস্ত জনগণের সমর্থন থাকা জরুরি নয়।

# কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধি নবায়নের প্রচেষ্টা

সুলহুল হুদাইবিয়া ছিল দশ বছরের জন্য, কিন্তু এক বছরের কিছু বেশি সময় যেতেই কাফিররা চুক্তিভঙ্গ করে। এই ঘটনার পর আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো কুরাইশরা খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। সে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সে বুঝতে পারছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এই চুক্তিভঙ্গের বিষয়টা এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না। তড়িঘড়ি করে সে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করে। মদীনায় গিয়ে প্রথমেই যায় মেয়ে উম্মে হাবিবার ﷺ বাসায়। উম্মে হাবিবা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্ত্রী। বাসায় ঢুকে আবু সুফিয়ান মেঝেতে পাতা মাদুরে বসতে যাবে -- ওমনি উম্মে হাবিবা টান মেরে সেটা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। জন্মদাতা পিতার প্রতি মেয়ের এমন আচরণে আবু সুফিয়ান অবাক হলো, মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো,

- মাদুরটা কেন সরালে? এই মাদুর কি আমার উপযুক্ত নয়? নাকি আমিই এতে বসার যোগ্য নই?

- এই মাদুরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসেন আর আপনি একজন নাপাক মুশরিক। আমি চাই না আপনি সেই মাদুরে বসেন যে মাদুরে রাসূলুল্লাহ্ বসেন।

আবু সুফিয়ান এবার তাজ্জব হয়ে গেল, সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না তার আপন মেয়ে তাকে এভাবে উপেক্ষা করতে পারে! উম্মে হাবিবার কথায় স্পষ্ট আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাঁদের কেমন ভক্তি ছিল! উম্মে হাবিবা নিজের বাবাকেও রাসূলুল্লাহর মাদুরে বসতে দেননি -- এটাই হলো আল-ওয়াল আল-বারা -- মুসলিমদের আপন ভাবা আর কাফিরদের পর। উম্মে হাবিবা ছিলেন আবিসিনিয়া এবং মদীনায় হিজরতকারী একজন নারী। বহু বছর আগেই তিনি মুশরিক এবং শিরকের সাথে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। ষোলো বছর পরে যখন তার সাথে তার বাবার দেখা হলো, তখনও তিনি বাবার প্রতি এতটুকু সম্মান দেখাননি। কারণ তার বাবা আবু সুফিয়ান হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। উম্মে হাবিবার কাছে পিতা-কন্যার সম্পর্ক বা সামাজিক শিষ্টাচার প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে ঈমান।

'তোর উপর শয়তানি ভর করেছে!' - মেয়েকে এই কথা শুনিয়ে আবু সুফিয়ান গেল আল্লাহর রাসূলের কাছে। আল্লাহর রাসূল তাকে গ্রাহ্য করলেন না। এরপর সে গেল আবু বকরের ﷺ কাছে। আবু বকরও তার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন না। এরপর সে গেল উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ কাছে। উমারের স্বভাব ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি রাখঢাক করে কথা বলার মানুষ নন। মুখের ওপর বলে দিলেন, 'তুমি আশা করছো আমি আল্লাহর রাসূলের হয়ে তোমার সাথে দর কষাকষি করবো! আমার সাথে যদি খালি এক টুকরো কাঠও বাকি থাকে, সেটা দিয়েও আমি তোমাদের সাথে জিহাদ করবো!'

কোনো সুবিধা করতে না পারে আবু সুফিয়ান গেল আলী ইবন আবু তালিবের ﷺ কাছে। আলী বললেন, 'দেখো আবু সুফিয়ান, আমাদের কিছুই করার নেই। আল্লাহর রাসূলের কথার ওপরে তো আর কোনো কথা চলে না।' আবু সুফিয়ান তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে ফাতিমাকে ﷺ অনুরোধ করলো, 'মুহাম্মাদের কন্যা! তোমার এই ছেলেটাকে (হাসান) একটু বলো না লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে দিক, যদি সে করে তাহলে সারাজীবন আরবদের নেতা হয়ে থাকবে।' ফাতিমা সাফ জবাব দিলেন, 'আমার ছেলে এ কাজের জন্য খুব ছোট। আর আল্লাহর রাসূল যদি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহলে তাঁর মতের বিপরীতে গিয়ে মীমাংসা করার আমরা কেউ নই।' আবু সুফিয়ান হতাশ হয়ে আলীকে বললো,

- আবুল হাসান, পরিস্থিতি তো কঠিন হয়ে পড়েছে। কী করা যায় বলো তো, একটা বুদ্ধি দাও।

- আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি তো বনু কিনানার নেতা। এক কাজ করো, তুমি নিজেই মসজিদে গিয়ে বিষয়টা মীমাংসা করে দেশে চলে যাও!

- এতে কোনো লাভ হবে?

- মনে হয় না। তবে এর থেকে ভালো কিছু মাথায় আসছে না।

আলী ﷺ দায়সারা কথা বলে তাকে বিদায় করলেন। আবু সুফিয়ান তখন মসজিদে গিয়ে বললো, 'লোকসকল! আমি সবার সামনে চুক্তি নবায়ন করলাম।' এই বলে সে চলে গেল। কেউ তাকে পাত্তাও দিলো না। মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো অবস্থান আবু সুফিয়ানের ছিলও না। সে কুরাইশদের নেতা, মদীনায় আবু সুফিয়ান কেউ নয়, সেখানে কেউ তাকে আমলে নেয় না।

আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে এল। সবাই জানতে চাইলো কী হয়েছে। ঘটনা শুনে তারা বললো, 'তুমি যে মসজিদে ঘোষণা দিয়ে এলে, মুহাম্মাদ ﷺ কি তা অনুমোদন করেছে?' আবু সুফিয়ান বললো, 'না।' তখন তারা বললো, 'দুর্ভাগ্য! আলী তোমাকে বোকা বানিয়েছে! কাজের কাজ তো কিছুই হয়নি অপমানিত হওয়া ছাড়া।'

'কী আর করা? আর তো কিছু করার ছিল না আমার।', আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়লো।

যে কুরাইশরা ক'বছর আগে মুসলিমদের নাম শুনলেই অহংকার আর ঔদ্ধত্যের ভারে নাক-মুখ কুঁচকে ফেলতো, সেই কুরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ান এসে মুসলিমদের কাছে রীতিমতো ভিক্ষা চাইছে! লাঞ্ছিত আর অপমানিত হয়ে দরজায় দরজায় মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। এভাবেই আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করেন এবং দুনিয়ার বুকে তাদের সম্মানিত করেন। কিন্তু সেটা পেতে হলে আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থাকা চাই।

আজ মুসলিমদের মধ্যে একটি ধারণা গেঁথে গেছে যে তারা দুর্বল। তারা মনে করে তারা অক্ষম, শত্রুরা শক্তিশালী, এখন মাক্কী যুগ তাই কিছুই করার নেই। সকল অনাচার-অত্যাচারকে তারা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়। অতি অল্পে হাল ছেড়ে দেয়। কাফিরদের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়ায়। ধৈর্যের সাথে কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা মুসলিমদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হলো মুসলিম। মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তেলের খনি তাদের অধিকারে, পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পানিপথ ও ভূমিগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে -- এরপরেও মুসলিমরা কীভাবে দুর্বল হতে পারে? আসলে এই দুর্বলতা মানসিকতায়। আর্থিক সম্পদ বা ভূমির অভাব কোনো সমস্যা না, মুসলিমদের প্রয়োজন আল্লাহর ওপর ঈমান ও তাওয়াক্কুল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ছিল না, ছিল না পেশাদার সেনাবাহিনী। কিন্তু ঈমানকে পুঁজি করে মুসলিমরা এগিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে মক্কার কুরাইশের নেতা আবু সুফিয়ান করজোড়ে তাদের সামনে হাজির হয়েছে। একজন মু'মিন বাহ্যিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল হলেও মন থেকে কখনো দুর্বল হতে পারে না। পরাজিত মানসিকতা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। মুসলিমরা যদি তাদের দুর্বলতার এই ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতো, তাহলে যেসব জাতি আজ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে, তারাও আবু সুফিয়ানের মতো হাতজোড় করে শান্তি কামনা করতো।

বিজয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো ধৈর্য। যে কুরাইশরা এতদিন দাপটের সাথে এতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে -- তারাও একসময় হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মুসলিমদের অসীম ধৈর্যের কাছে। কয়েক বছর আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি কুরাইশরা মুসলিমদের কাছে ধরনা দেবে। কিন্তু মুসলিমরা তাদের দ্বীনের ওপরে অটল থেকেছে, ধৈর্য ধরেছে, আর ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় কুরাইশদের সাথে পাল্লা দিয়েছে -- আর তাই কুরাইশরা হার মানতে বাধ্য হয়েছে।

## অভিযানের প্রাক্কালে

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা অভিযানের বিষয়টি গোপন রাখলেন। যদিও কুরাইশরা জানতো আজ হোক কাল হোক মক্কা আক্রমণ হবেই। কিন্তু ঠিক কখন হবে এবং কীভাবে হবে -- সে ব্যাপারে নবীজি তাদের কোনো ধারণা দিতে চাননি। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের শ্রবণ আর দৃষ্টি কেড়ে নাও, যেন আমরা তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারি, আমাদের আগমন যেন তারা টের না পায়।'

এই অভিযানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ কাউকে কিছুই জানালেন না, এমনকি আবু বকরকেও ؓ না। আবু বকর ؓ রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে এসে দেখলেন তাঁর মেয়ে আইশা ؓ গম পিষছেন। দেখে বুঝতে পারলেন রাসূল ﷺ লড়াইয়ের প্রস্তুতি

নিচ্ছেন। আইশার কাছে জানতে চাইলেন কোথায় অভিযান হবে, আইশার কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে বাতনু ইদামের দিকে আট জনের একটি দলকে পাঠালেন। বাতনু ইদাম ছিল মদীনা থেকে শামের দিকে, মক্কার দিকে নয়। মক্কা অভিযানের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কারো কাছে আসল গন্তব্য প্রকাশ করেননি। এরপর তিনি মদীনার ভেতরে এবং বাহিরে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতিতে কেউ মদীনা আক্রমণ করতে না পারে।

কিন্তু এত সাবধানতার পরও হাতিব ইবন আবি বালতাহর ﷺ কাজে সমস্যা বাঁধার উপক্রম হলো। তার পরিবার ছিল মক্কায়। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি মক্কায় একটি চিঠি পাঠিয়ে কুরাইশদের এই অভিযানের কথা জানিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তার এই চিঠি পাঠানোর খবর ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল জেনে যান। জানার সাথে সাথে তিনি চিঠির বাহককে ধরে আনার জন্য আলী, যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম আর মিক্বদাদ ইবন আসওয়াদকে ﷺ পাঠিয়ে দেন। চিঠির বাহক ছিল এক নারী। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তারা সেই মহিলাকে ধরে ফেললেন। তারপর সেই মহিলাকে হুমকি দিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করলেন। দেখা গেল, চিঠিটি আল্লাহর রাসূলের সাহাবি হাতিবের লেখা। রাসূল ﷺ চিঠিটি পড়লেন। হাতিবকে ডেকে আনা হলো, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হলো, জানতে চাওয়া হলো কেন তিনি এই কাজ করলেন। হাতিব বললেন,

*'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কথাটা আগে শুনুন। কুরাইশদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে সত্যি, তারা আমার মিত্র, কিন্তু সত্যি বলতে আমি আসলে ওদের কেউ নই। আপনার মুহাজির সঙ্গীদের মক্কায় কেউ না কেউ আত্মীয় আছে। তারা তাদের পরিবার ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি কুরাইশদের একটা উপকার করতে চেয়েছি যাতে এর বিনিময়ে তারা আমার পরিবারের ক্ষতি না করে। দ্বীন ত্যাগ করার নিয়তে আমি এই কাজ করিনি। ইসলাম ছেড়ে ভোগবিলাসে মত্ত হবো -- এটাও আমার ইচ্ছে ছিল না।'*

হাতিব বলতে চাচ্ছিলেন কুরাইশদের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার পরিবার পড়ে আছে মক্কায়। মুসলিমরা যদি মক্কায় অভিযান চালায় তাহলে কুরাইশরা তার পরিবারের ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তাদের রক্ষা করার নেই। অন্যদিকে অন্যান্য মুহাজিরদের পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কেউ না কেউ মক্কায় আছে। তাই হাতিব ভেবেছেন কুরাইশদের যদি তিনি মক্কা অভিযানের কথা জানিয়ে দেন, তাহলে বিনিময়ে তারা তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু হাতিব ঠিকই জানতেন, যে কাজটি তিনি করছেন সেটা ঠিক নয়। সেটা মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার শামিল। কিন্তু কাফিরদের গুপ্তচরবৃত্তি করা বা বেঈমানি করা তার

উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল নিজের পরিবারকে রক্ষা করা। তাই তিনি নিজের এই কাজের কৈফিয়ত আল্লাহর রাসূলের কাছে পেশ করলেন।

তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সে সত্য বলছে।' উমার رضي الله عنه পাশেই ছিলেন। হাতিবের কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এই মুনাফিকের গর্দান কেটে ফেলার অনুমতি দিন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'সে বদরে অংশ নিয়েছে। আর বদরে অংশ নেওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ বলেছেন, বদরের লোকেরা, তোমরা যা খুশি করো। আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি।'

এই ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি নাযিল করলেন,

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন কোরো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও, তাহলে কীভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর) কাজটি করে, তাহলে বুঝতে হবে সে দ্বীনের সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১)

### হাতিব ইবন আবি বালতার কাহিনী থেকে শিক্ষা

১) হাতিব رضي الله عنه দ্বীন ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করেননি। যে শব্দটি তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন তা হলো রিদ্দা। এর অর্থ হলো দ্বীনত্যাগ, মুরতাদ হয়ে যাওয়া। বোঝা যাচ্ছে, হাতিব নিজের কাজকে কুফর হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন -- ধর্মত্যাগ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও আলিমদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে যে শত্রুর হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা কুফর না ফিসক। এই কাজের জন্য উমার رضي الله عنه হাতিবকে মুনাফিক্ব বলেছেন। সেই সাথে কাজটিকে কুফর মনে করে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হত্যার অনুমতিও চেয়েছেন। কাফিরদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি একটি ভয়াবহ অপরাধ। এই অপরাধটি এতই ভয়াবহ যে এটা কুফরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অনেক আলিমের মতে এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আরও একটি মত হলো, গুপ্তচরের শাস্তি কী হবে সেটা ইমামের হাতে।

২) হাতিবের رضي الله عنه বেঁচে যাওয়াটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র বদরে অংশ নেওয়ার সুবাদে। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় দুটো জিনিস বোঝা যায়। প্রথমত, বদরের যোদ্ধাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। দ্বিতীয়ত, উমারের رضي الله عنه প্রস্তাবকে আল্লাহর রাসূল নাকচ করেননি। হাতিবকে মুনাফিক্ব ডাকার জন্য উমারকে নিন্দা করেননি, কিংবা এ কথা বলেননি যে, হাতিবের অপরাধ হত্যাযোগ্য নয়। আল্লাহর রাসূলের সামনে কোনো ভুল কথা বা কাজ করা হলে আল্লাহর রাসূল সেটা

শুধরে দিতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি উমারকে কিছুই বলেননি, কাজেই এর অর্থ দাঁড়ায় উমারও এখানে কোনো ভুল করেননি। তিনি বাহ্যিক কাজের বিচারে হাতিবকে বিচার করেছেন এবং এটাই নিয়ম। কিন্তু হাতিবকে শাস্তি না দেওয়ার বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন বদরে অংশ নেওয়া সাহাবি। তবে আজকের দিনে কেউ যদি হাতিবের মতো একই কাজ করে বসে তাহলে সে হাতিবের মতো এভাবে ক্ষমা পেয়ে যাবে না। কারণ হাতিব ছিলেন একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত। বদরে অংশ নেওয়া এই মুবারক দলটির ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ওয়াহীর মাধ্যমে জেনেছেন।

৩) আল্লাহর রাসূল যখন কাউকে বিচার করেছেন, তখন শুধুমাত্র একটি কাজের ওপর তাকে বিচার করেননি। বরং তার অতীতের চরিত্র এবং কাজকর্ম বিবেচনায় এনেছেন। হাতিবের অতীত থেকে এমন কিছুই প্রমাণিত হয় না যে তিনি কাফিরদের চর বা তাদের পক্ষের লোক, বরং তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু মক্কা অভিযানের কথা জানিয়ে দিয়ে তিনি একটি মানবীয় ভুল করেছিলেন। তার একটি ভুলের কারণে তার সমস্ত অতীতকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো, একজন আলিম, যিনি সবসময় সত্য কথা বলে এসেছেন, দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তিনিও একটি দুটি বিষয়ে ভুল করে বসতে পারেন, কিন্তু এ কারণে তার সমস্ত কাজ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। একজন মানুষের আন্তরিকতার কথা মাথায় রেখে তাকে বিচার করা উচিত। এটাই ইনসাফের দাবি।

৪) সূরা মুমতাহিনার আয়াত থেকে শিক্ষা হলো আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। এই শিক্ষা মুসলিমরা আজ ভুলতে বসেছে। ইমাম কুরতুবির ﵀ মতে, এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করেছেন। যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদেরকে আপন ভাবা বা বিশ্বস্ত মনে করার কোনো সুযোগ নেই। মুহাম্মাদ ইবন বাকর আল-আবিদের মতে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে তারা যেন কুরাইশদের আপন মনে না করে। বরং কুরাইশরা হলো কাফির আর কাফিরদের শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। সায়্যিদ কুতুব ﵀ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কুরাইশদের হাতে এত অত্যাচারিত হওয়ার পরেও কিছু মুসলিম সরলমনে ভেবেছে মক্কার কুরাইশদের সাথে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেই ধারণাকে মুছে দিয়েছেন। মুসলিমদের দৃষ্টিকে আত্মীয়তার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এনে কেবল ঈমান এবং দ্বীনের ওপরের নিবদ্ধ করেছেন।

## মক্কার অভিমুখে অগ্রযাত্রা

বরকতময় রমাদান মাসে যাত্রা শুরু করে বরকতময় এই বিজয়ের কাফেলা। মাসের প্রথম দিকে তাঁরা সাওম রাখলেন কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সাওম ভাঙতে নির্দেশ দিলেন। এই সেনাবাহিনীতে দশহাজার সেনা ছিল।

এ পর্যন্ত এটাই ছিল মুসলিমদের সবচাইতে বড় বাহিনী। এই বাহিনীতে সব মুহাজির আর আনসাররা ছিলেন। মদীনার আশপাশের অনেক গোত্র যেমন সুলাইম, আসলাম, গিফার ও যাইনা এতে যোগ দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ হাজার সৈনিক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আবু রুহম ইবন হুসাইন আল-গিফারীকে ؓ মদীনায় অস্থায়ী গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো। দশ হাজার সৈনিক নিয়ে আল্লাহর রাসূল পৌঁছলেন যোহফায়। সেখানে পৌঁছে আল-আব্বাস ইবন আল-মুত্তালিবের ؓ সাথে দেখা হয়ে যায়। মক্কায় গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব ছিল তার উপর ছিল, তা শেষ করে তিনি সপরিবারে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন। এরপর আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা হলো দুই কুরাইশের, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিস এবং আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়্যা।

এই দুজনই ছিল ইসলামের দুই শত্রু। আবু সুফিয়ান আল-হারিস আল্লাহর রাসূলকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতো। আর আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়্যা হলো সেই লোক যে মাক্কী জীবনে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি একটা মই নিয়ে আসো যেটা সরাসরি ঐ আকাশ পর্যন্ত যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে আসবে। আর সেই চিঠিতে চারজন ফেরেশতা তোমার নবুওয়্যাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। তবে সত্যি বলতে কী, এসব করলেও আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো বলে মনে হয় না।'

এই লোক পর্যন্ত ইসলাম কবুল করতে রাজি হয়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আবু সুফিয়ান মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান নয়। আল্লাহর রাসূল প্রথমে তাদের ক্ষমা করতে রাজি হলেন না, কিন্তু তাদের কাকুতি মিনতিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। ফলে তারা মুসলিম হয়ে গেল।

এগোতে এগোতে এরপর মুজাহিদ বাহিনী মার আদ-দাহরানে পৌঁছে গেল। সেখানে তাঁবু গাড়া হলো। জায়গাটি ছিল মক্কা থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু চারপাশের মরুভূমি বেশ খোলামেলা হওয়ার কারণে মক্কা থেকে পরিষ্কার তাদের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর উপস্থিতি জানান দিতে চাচ্ছিলেন। সেদিন রাতে মুসলিম শিবিরে দশ হাজার আগুন জ্বালানো হলো। দশ হাজার আগুনের দপদপে আলোর রেখারা জানান দিচ্ছিলো বিশাল সেই বাহিনীর সমাগম।

বিষয়টা আবু সুফিয়ানের নজর এড়ালো না। সে বুদাইল ইবন ওয়ারকা এবং হাকিম ইবন হিযামকে সাথে নিয়ে পরিস্থিতি বোঝার জন্য বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করলো,

- কারা এরা? এত আগুন আর এত বড় শিবির তো আগে কখনো দেখিনি।

- এরা নিশ্চয়ই খুযাআ গোত্রের লোক হবে। হয়তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে, বুদাইল

জবাব দিলো।

- নাহ, এরা খুযাআ হতে পারে না। এদের শক্তি এত বেশি নয় যে এরকম বড় শিবির করে আগুন জ্বালাবে।

আবু সুফিয়ানের ভেতরকার উদ্বেগ চাপা থাকলো না। রাস্তায় আল-আব্বাসের সাথে তাদের দেখা হলো। আব্বাসকে আবু সুফিয়ান বললো,

- এই অবস্থায় কী করি বলো তো?

- আল্লাহর শপথ, আগামী সকাল হবে কুরাইশদের জন্য এক কঠিন সকাল। আল্লাহর রাসূল তোমাকে পেলে ছাড়বেন না। তুমি বরং এই গাধার পিঠে চড়ে বসো, আমার সাথে চলো। আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। দেখি তোমাকে কোনোভাবে বাঁচানো যায় কি না।

আবু সুফিয়ান রাজি হলো। অন্য একটি বর্ণনামতে, এই তিনজন মুসলিমদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক, তারা তিনজনই মুসলিমদের ক্যাম্পে এল। সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু আব্বাসকে সাথে দেখতে পেয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

সবাই ছেড়ে দিলেও একজন কিন্তু এত সহজে ছাড়তে চাইলেন না। তিনি আর কেউ নন, উমার ইবন খাত্তাব ﷺ। উমার চাইলেন আবু সুফিয়ানকে সেখানেই মেরে ফেলবেন। এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র তিনি নন। বিষয়টা নিয়ে উমারের সাথে আব্বাসের তর্কাতর্কি লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তির জন্য তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলেন।

আল আব্বাস চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল যেন আবু সুফিয়ানকে প্রাণ ভিক্ষা দেন। অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল তাকে যেন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতি দেন। এক পর্যায়ে আব্বাস ﷺ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'উমার! আজ যদি আবু সুফিয়ান তোমার গোত্র বনু আদীর লোক হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না! সে বনু আব্দুল মানাফের লোক বলেই তুমি তাকে হত্যা করতে চাইছো।'

উমার ﷺ সম্পর্কে আব্বাসের ধারণা ভুল ছিল। তিনি ভাবছিলেন ভিন্ন গোত্রের বলেই উমার আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে চাইছে। কিন্তু ছায়ার মতো আল্লাহর রাসূলের সাথে লেগে থাকতেন যিনি, হক আর বাতিলের মাঝে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যেতেন যেই আল-ফারুক, সেই উমার নিঃসন্দেহে এমন ছিলেন না। উমার গম্ভীর স্বরে বললেন,

*'শান্ত হও, আব্বাস, শান্ত হও! তোমার ইসলাম আমার কাছে আমার বাবা আল খাত্তাবের ইসলামের চাইতে বেশি প্রিয়। এটা শুধু এই কারণে যে আমার বাবা ইসলাম*

*গ্রহণ করলে সে খবরে আল্লাহর রাসূল যত খুশি হতেন, তার চাইতে তোমার ইসলাম গ্রহণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি খুশি হয়েছেন।'*

আল্লাহর রাসূলকে কত ভালোবাসলে নিজের বাবার ইসলাম গ্রহণের চেয়েও প্রিয় হয়ে যায়, রাসূলের প্রিয় চাচার ইসলাম-গ্রহণ? উমারের কথা থেকে শিক্ষণীয় হলো, কারো জাতীয়তা বা পারিবারিক বংশ পরিচয়ের কারণে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আন্তরিকতার বিচার হবে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার মাপকাঠিতে। যদি কেউ আল্লাহ আযযা ওয়াজালের নিকটবর্তী হয় তাহলে সে-ই উম্মাহর জন্য বেশি আপন। আর যদি কেউ আল্লাহ আযযা ওয়াজালের সাথে বিদ্রোহ করে হয় তাহলে তার সাথে এই উম্মাহর কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ঝগড়া সেখানেই থামিয়ে দিতে চাইলেন। তাই আব্বাসকে পরের দিন সকালে আসতে বললেন। পরদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানকে বললেন,

- আবু সুফিয়ান! এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই?

- আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি কতই না দয়াময়, উদার আর একজন বড় মাপের মানুষ। আত্মীয়দের প্রতি আপনি কতই না সদয়! যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ সত্যিই থেকে থাকতো তাহলে সে নিশ্চয়ই রক্ষা করতো।

- আর আমি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এটা কি বোঝো নি?

- এই বিষয়ে আমার অন্তরে এখনো কিছু দ্বিধা আছে।

আল আব্বাস ؓ গর্জে উঠলেন, 'ধ্বংস হও তুমি! তোমার গর্দান কাটা যাবার আগেই মুসলিম হয়ে যাও!'

প্রাণের মায়া বড় মায়া। এই কথার পর আবু সুফিয়ান মুসলিম হয়ে গেল; সাক্ষ্য দিলো, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' যদিও সেই সাক্ষ্যদানে তেমন দৃঢ়তা ছিল না।

আবু সুফিয়ানের মানসিক অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আবু সুফিয়ানকে ؓ পাহাড়ের গিরিপথে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখার জন্য আব্বাসকে ؓ নির্দেশ দেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ান যেন মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিজ চোখে দেখতে পারে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সেনাবাহিনী গোত্র অনুসারে অনেকগুলো ব্যাটালিয়নে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের নিজস্ব পতাকা ছিল। একের পর এক ব্যাটালিয়ন মার্চ করে এগোচ্ছে আর আবু সুফিয়ান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এককেটি দল সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, আর আবু সুফিয়ান আব্বাসের কাছে জিজ্ঞেস করে, 'এরা কারা?' আব্বাস উত্তর দেন, 'এরা সুলাইম' বা 'এরা গিফার' বা 'এরা হলো মুযাইনা।' এদের কারো সাথেই আবু সুফিয়ানের দ্বন্দ্ব ছিল না। সে বলছিল, 'এদের

সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই।'

একটি ব্যাটালিয়ন আবু সুফিয়ানের মনোযোগ কেড়ে নেয়। তাদের ঈমানী তেজ, তাদের ঋজু ভঙ্গিমা দেখে সে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। সেই ব্যাটালিয়নে আর কেউ নন, ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ আর তাঁর সাথে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই দল -- মুহাজির এবং আনসার। সবুজ পতাকা নিয়ে এগোতে থাকা এই দলটিকে দেখে আবু সুফিয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে জানতে চায়, 'কারা এরা?' আল-আব্বাস বলেন, 'এরাই তো মুহাজির আর আনসার। এদের সাথে আছেন রাসূলুল্লাহ।' আবু সুফিয়ান যেন সম্মোহিতের মতো বলে ওঠে, 'নাহ! এদের সাথে পেরে ওঠার মতো শক্তি কারো নেই। আব্বাস, তোমার ভাতিজার রাজত্ব সত্যিই আজ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।' আব্বাস তাকে শুধরে দিয়ে বলেন, 'এটা রাজত্ব নয়, এটা হলো নবুওয়াত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'হুম, ঠিকই বলেছো।'

## পরবর্তী গন্তব্য: মক্কা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে যী-তুওয়ায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি বাহিনীর কোন অংশে কে নেতৃত্ব দেবে সেটা নির্ধারণ করে দিলেন এবং কীভাবে ও কখন মক্কায় প্রবেশ করা হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ। ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আয-যুবাইর ইবন আল-আওয়্যাম ﷺ। আর পদাতিক সৈনিকদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবায়দা ﷺ।

কুরাইশরা কিছু ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার পরিকল্পনা করেছিল। এদের বলা হতো 'আউবাশ'। আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারদের এই আউবাশদের একেবারে গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাদেরকে আস-সাফায় অবস্থান নিতে বলেন। আয-যুবাইর মুহাজির ঘোড়সওয়ারদের নেতৃত্বে ছিলেন। তাকে মক্কার উপরিভাগে 'কিদা' নামক স্থানে পতাকা গেড়ে অবস্থান নিতে বলা হয়। খালিদের ﷺ নেতৃত্বে ছিল কুদাআহ, সুলাইমসহ বেশ কিছু গোত্র। তারা অবস্থান নেন মক্কার নিচের দিকে। আনসারদের নেতৃত্বে ছিলেন সাদ ইবন উবাদাহ ﷺ।

মক্কার চারদিকে মুসলিমদের চারটি বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নিলো যে, প্রতিরোধ গড়ার মতো কোনো অবস্থাই কুরাইশদের ছিল না। তারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিল। বিনা বাধায় মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে লাগলো। শুধুমাত্র খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ যেদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন সেদিকে বনু বকর এবং হুদাইল বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ তাদের পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেন। অল্পসময়েই তারা কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে। এটাই ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে একমাত্র নামে মাত্র প্রতিরোধ।

কতটা সহজে মুসলিমরা মক্কা জয় করে সেটা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে বুঝা যায়। হিমাস ইবন কাইস নামের এক যোদ্ধা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তলোয়ারে শান দিচ্ছিল। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো,

- এই, এসব কেন করছো তুমি?

- মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ আছে!

- তাই নাকি! কয়েকটাকে ধরে এনো তো, তোমার দাস বানিয়ে রেখো!

হিমাস কিংবা তার স্ত্রী -- কারোই ধারণা ছিল না তারা কীসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে হিমাস দেখলো মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়িমড়ি করে পালাচ্ছে। হিমাস কোনোমতে নিজেকে অক্ষত রেখে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে বাড়ি চলে আসলো। তার স্ত্রী তাকে দেখেই বলে উঠলো,

- কী ব্যাপার, তুমি না বললে ওদের হারানো তোমার জন্য ডালভাত?

- ইয়ে মানে, সাফওয়ান আর ইকরিমার মতো যোদ্ধাই যদি পালিয়ে যায়, আমার কী করার আছে বলো!

এদিকে আবু সুফিয়ান মক্কায় চলে এসেছে, চিৎকার করে বলছে, 'কুরাইশরা শোনো! মুহাম্মাদ ﷺ যে বাহিনী নিয়ে এসেছে তার সাথে মোকাবেলা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কাজেই যে আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে সে নিরাপদ!'

মক্কার পতন হবে -- এটা মুশরিকরা মানতেই পারছিল না। আবু সুফিয়ানের মুখে এ কথা শুনে খোদ তার স্ত্রী হিন্দ ক্ষেপে গিয়ে তার গোঁফ ধরে বললো, 'এই বুড়োর মৃত্যু হোক! মেরে ফেলো একে!' আবু সুফিয়ান স্বপক্ষ নিয়ে বলতে লাগলো, 'এই মহিলার কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। যে বাহিনী তোমাদের সাথে লড়তে এসেছে তাদের সাথে তোমরা পেরে উঠবে না। কাজেই আমার কথা শোনো, আজ আবু সুফিয়ানের ঘরে যে থাকবে সে নিরাপদ!'

লোকেরা এ কথায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'ধ্বংস হও তুমি! তোমার ঐ ছোট্ট ঘরে আমরা এতগুলো মানুষ আঁটবো কী করে?' আবু সুফিয়ান তখন জানিয়ে দিলো, 'কেউ যদি নিজের ঘরে অবস্থান নেয়, সে নিরাপদ। কেউ যদি মসজিদে অবস্থান নেয়, সে নিরাপদ।' এ কথা শুনে লোকেদের ভিড় দ্রুতই হালকা হয়ে গেল। সবার যার যার বাসায় অথবা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিল।

আল্লাহর রাসূল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন যেন কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়। সেটাই হয়েছিল। তবে আনসার নেতা সাদ ইবন উবাদা ﷺ উত্তেজনার বশে আবু সুফিয়ানকে দেখে বলে ওঠেন, 'আজ হলো মহান যুদ্ধের দিন! আজ কাবার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে!'

কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সাদ ভুল বলেছে। এটা তো সেই দিন যেদিন আল্লাহ কাবাকে মহিমান্বিত করবেন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ ইবন উবাদার ؓ কাছ থেকে ব্যানার নিয়ে নেন। পাছে তিনি মক্কায় কোনো রক্তপাত না করে বসেন! কিন্তু এত বড় একজন সাহাবি, যিনি আল্লাহর রাসূলকে নুসরাহ দিয়েছেন, জীবন-মরণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার শপথ করেছেন, তার থেকে ব্যানার ফিরিয়ে নিয়ে তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিলেন না আল্লাহর রাসূল। তাই সে ব্যানার তুলে দেন তাঁরই ছেলে কাইস ইবন সাদের হাতে।

## নিজের দেশে বিজয়ীর বেশে

অবশেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, স্বপ্ন পূরণের মুহূর্ত। যে মানুষটি আজ থেকে আট বছর আগে এই শহর ছেড়ে রাতের আঁধারে চুপিসারে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি আজ ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেছেন সেই আজীবন পরিচিত জন্মভূমির মাটিতে। যে মানুষগুলো তাঁকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা আজ ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে!

আজ থেকে বিশ বছর আগে তিনি আস-সুবহা ডাক দিয়ে মক্কার লোকগুলোকে জড়ো করেছিলেন। তাদের বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নাও। তারা তাঁকে তাচ্ছিল্য করেছে, অবজ্ঞা করেছে, বয়কট করেছে। কিন্তু আজ তারাই তাঁর কথা শুনার জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে। এই মক্কার মাটিতে একদিন তাঁর শরীরের ওপর নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ মজা করার জন্য। আজ তাঁর গায়ে আচঁড় দেওয়ার সাহসটুকুও কারো নেই। হুমকি আর মৃত্যুভয় তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু আজ সেই হুমকিদাতার দল নিজেদের মৃত্যুভয়ে কম্পমান!

তারা বিলালকে ؓ তপ্ত মরুভূমির বুকে পাথর চাপা দিয়েছিল, উসমানকে ؓ কার্পেটে মুড়ে তার গায়ের ওপর লাফিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছিল। তারা খাব্বাবকে ؓ ছুঁড়ে ফেলেছিল জ্বলন্ত পাথরে, আম্মারকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে নিথর ফেলে রেখেছিল। সেই বিলাল, উসমান, খাব্বাব আর আম্মাররা আজ বিজয়ী বাহিনীর একেকজন বীর সৈনিক!

যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বদদুআ করেছিলেন, তাদের কেউ আজ বেঁচে নেই। তাঁর কথার একচুল বিরোধিতা করার মতো কেউ নেই। তারা না পেরেছে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে কিনে নিতে আর না পেরেছে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে হত্যা করতে। বরং মক্কার লোকেরা আজ হার মানতে বাধ্য হয়েছে তাদের চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠা সেই চেনা মুখ 'আল-আমীন' এর কাছে। একদিন তারা বলেছিল এ তো কবি, পাগল, জাদুকর -- আরও কত কী! কিন্তু আজ তারা ঠিকই জানে, ইনিই হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করছেন। তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি। আল্লাহ তাঁকে এক মহাসম্মান দান করেছেন। এই সম্মানের কৃতজ্ঞতায় তিনি মাথা নুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছেন। একমনে পাঠ করছেন আল্লাহর বাণী, সূরা ফাতহের সেই আয়াতগুলো,

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়...'

বিজয়ীর বেশে আজ মক্কার রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। কিন্তু কোথাও কোনো কুচকাওয়াজ নেই, নেই কামানের শব্দের মিথ্যে জৌলুস। জাতীয় সঙ্গীতের বাজনা নেই, উন্মত্ত-উল্লাসধ্বনি নেই, কোনো লাল গালিচাও পাতা নেই। পরাক্রমশালী এই বাহিনীর মাঝে নেই কোনো অহংকারের ছাপ। বুক উঁচু করে, অবনত মস্তকে, আল্লাহর প্রতি বিনম্র চিত্তে বিজয়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করছেন। তিনি উটের পিঠে বসা। শহরে ঢোকার সময় তিনি আল্লাহর কাছে সিজদা দিয়ে আছেন। এতটাই নিচু হয়ে আছেন যে তাঁর দাড়ি উটের সাথে লেগে আছে। তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই, আছে নম্রতা। উত্তেজনা নেই, আছে সাকিনাহ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবার চারিদিকে তাওয়াফ করলেন। তাঁর হাতে একটি বর্শা ছিল। সেই বর্শা দিয়ে কাবাকে ঘিরে রাখা ৩৬০টি মূর্তিকে একে একে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন। মুশরিকদের দেবতারা একে একে ভূপাতিত হতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল তিলাওয়াত করছেন কুরআনের সেই দুটো আয়াত,

"আর বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮১)

"বলুন, সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না।" (সূরা সাবা, ৩৪: ৪৯)

একে একে সমস্ত মূর্তিকে ধ্বংস করা হলো। উসমান ইবন তালহা ﷺ থেকে কাবার চাবি আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার দরজা খুললেন। ঢুকেই সেখানে দেখতে পেলেন কাঠের তৈরি একটা কবুতরের মূর্তি। সেটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেললেন। আল কাবার ভেতরে আরও অনেক ছবি আর মূর্তি ছিল। সমস্ত মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করা হলো। সবগুলো ছবি মুছে ফেলা হলো। কাবার ভেতরে একটা ছবিকে মুশরিকরা নবী ইবরাহীমের ﷺ ছবি বলে দাবি করতো। সেই ছবিতে ইসমাঈলের ﷺ হাতে ছিল আল-আযলাম। আল-আযলাম হলো এক প্রকার লটারি। পৌত্তলিকরা কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই লটারি ব্যবহার করতো। এই ছবি চোখে পড়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। এই মুশরিকরা ঠিকই জানতো ইবরাহীম বা তাঁর পুত্র কেউই আল-আযলাম ব্যবহার করতেন না।'

সবগুলো প্রতিকৃতি ও ছবি সরিয়ে ফেলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার ভেতর প্রবেশ করলেন। কাবা এখন শিরকের কলুষতা ও নোংরামি থেকে পবিত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ

কাবার প্রতিটি কোণে গিয়ে পাঠ করলেন 'আল্লাহু আকবর'। তারপর সেখানেই সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবা থেকে বের হয়ে কাবার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। উৎসুক জনতা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে আছে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছে। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন।

*'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আজ তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। একাই সমগ্র শত্রুকে পরাজিত করেছেন।*

*তোমরা জেনে রাখো, জাহিলিয়াতের সকল আভিজাত্যের অহমিকা আর সম্পদের প্রতিশোধের দাবি আমার পায়ের নিচে। তবে বাইতুল্লাহর সেবা এবং হাজীদের পানি পান করানোর বিষয়টি আগের মতোই থাকবে।*

*জেনে রাখো, যে কোনো রকমের হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব বা ক্ষতিপূরণ একশত উট, এর মধ্যে চল্লিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী।*

*কুরাইশরা! তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের অহংকার এবং বংশগৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।'*

এরপর তিনি পাঠ করলেন সূরা হুজুরাতের একটি আয়াত।

**"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদিকে অসংখ্য মানুষ। মক্কার জনতার চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়, কৌতূহল! তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে একটি মানুষের সিদ্ধান্তের উপর -- সেই মুহাম্মাদ ﷺ, যাকে তারা অপমান করেছে, দিনের পর দিন অভুক্ত রেখেছে, দেশছাড়া করে ছেড়েছে -- আজ তিনিই বীরের বেশে নেতা হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। কুরাইশের লোকেদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসার কথা। তারা আজ তাঁরই তরবারীর নিচে। রাসূলুল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন,

- তোমাদের কী ধারণা? আজ তোমাদের সাথে আমি কেমন ব্যবহার করবো?

- আপনি আমাদের ভাই, আমাদের ভাতিজা। আপনার কাছে থেকে মহৎ আচরণের আশা করি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সেটাই বলব যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন। লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম -- আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।'

মক্কায় শুরু হলো এক নতুন যুগের সূচনা। জাহিলিয়াতের আদর্শ, আইন-কানুন, রীতি-প্রথা সবকিছু প্রতিস্থাপিত হলো ইসলাম দিয়ে। আরবের সে সমাজে গোত্রীয় গর্ব বা বংশমর্যাদাই ছিল গোটা সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ভিত্তিকে বাতিল করে দিলেন। নতুন এই সমাজের ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ। আর এটি পরিচালিত হবে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধে। মক্কার কুরাইশরা তাদের বাপ-দাদার অর্থহীন ঐতিহ্য আর সামাজিক পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখতে সুদীর্ঘ বিশ বছর ইসলামের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। কিন্তু তারপরও এদের মন জয় করার জন্য আল্লাহর রাসূল তাদের কোনো নিয়ম-কানুন বা আচার-প্রথা গ্রহণ করেননি।

## বিলালের ؓ আজান

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে আজান দেওয়ার জন্য ডাকলেন। আজ থেকে আট বছর আগে বিলাল কথা বলতেন চুপিচুপি, কিন্তু আজ বিলাল দাঁড়িয়ে আছেন কাবাঘরের ওপরে উন্মুক্ত কণ্ঠে আজান দেবেন বলে। আজ তিনি মক্কার কাউকে ভয় পান না। বিলাল ছিলেন মুশরিকদের চোখে নীচুশ্রেণি। তাকে দেখে অনেকেরই সহ্য হলো না। তারা কানাঘুষা করতে লাগলো, 'এই কালো কাকটা এখানে কী করছে?'

কাউকে পাত্তা না দিয়ে বিলাল তার সুমধুর কন্ঠে আজান দিলেন। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। আজানের ধ্বনি যেন সবাইকে তন্ময় করে দিলো। এই একই আজানের ধ্বনিতে কারো অন্তরের দরাজ ভেঙে ইসলাম প্রবেশ করলো, আর কারো অন্তরে দাউদাউ করে বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে লাগলো। কাবাঘর হলো আল্লাহর ঘর। শিরকের অত্যাচারে এতদিন এই ঘরটা যেন খা-খা করছিল, দীর্ঘদিন পর বিলালের আযানের মাধ্যমে তাওহীদ ফিরে এল। বিলাল ছিলেন একজন দাস। কাবায় তার আজান ছিল মক্কায় গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীকি সমাপ্তি। বিলালকে দিয়ে আজান দেওয়ানোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, ইসলাম দ্বারা যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তাতে জাহিলিয়াতের শ্রেণীবৈষম্যের আর কোনো স্থান নেই। একজন মানুষের মর্যাদা বা হীনতা নির্ধারিত হবে তাক্বওয়ার মাধ্যমে।

# সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং বাইয়াত গ্রহণ

মক্কায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলো। তাদের বাড়িঘর তাদেরই থাকলো, কোনো করও আরোপ করা হলো না। বলা হলো, কেউ যদি তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ। যদি সে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ। যদি কেউ মসজিদে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ।

বিজিত শত্রুর প্রতি এই অভাবনীয় দয়া, একজন নবী ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারেন? মক্কার লোকেরা উপলব্ধি করলো, যে দেবতাদের তারা এতকাল উপাসনা করে এসেছে, তারা আসলে মিথ্যা মাবূদ। ইসলামের সত্য উপলব্ধি করে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

> "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।" (সূরা নাসর, ১১০)

সাফা পাহাড়ে বসে আল্লাহর রাসূল তাদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। লোকেরা এসে তাঁর কাছে এই মর্মে বাইয়াতবদ্ধ হলো যে, তারা সাধ্যমতো তাঁর কথা শুনবে ও মানবে। মহিলাদের থেকেও আল্লাহর রাসূল সেদিন বাইয়াত নিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও বাইয়াত দিতে হাজির হলো। তবে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইলো পাছে আল্লাহর রাসূল তাকে চিনে ফেলেন। বিশেষ করে আল্লাহর রাসূলের চাচা হামযার সাথে হিন্দ যা করেছিল, তাতে তার নিজেকে আড়াল করতে চাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূল ﷺ বাইয়াতের শর্তগুলো এক এক করে উল্লেখ করছিলেন, আর উমার সেসব মহিলাদের সামনে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। যেমন- শিরক না করা, সন্তান হত্যা না করা, মিথ্যা শপথ না করা ইত্যাদি। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা চুরি করবে না...' তখন হিন্দ নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে বলে ফেলে, 'আচ্ছা আল্লাহর রাসূল, আবু সুফিয়ান তো খুব কৃপণ স্বভাবের। সে যা খরচাপাতি দেয়, তাতে আমার আর আমার সন্তানদের চলে না। এখন যদি আমি তার থেকে কিছু না বলে নিই, সেটা কি গুনাহ হবে?' আল্লাহর রাসূল হেসে বললেন, 'যতটুকু না নিলেই নয়, ততটুকু তুমি তার থেকে নিতে পারো, সমস্যা নেই।'

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকটি শর্ত উল্লেখ করলেন, 'তোমরা যিনা করবে না।' হিন্দ এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললো, 'একজন স্বাধীন নারী কী করে যিনা করতে পারে!' হিন্দের বিস্ময় বলে দেয় তৎকালীন মুশরিক সমাজেও যিনা-ব্যভিচারকে কতটা খারাপভাবে দেখা হতো। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজে শহুরে জীবনে যিনা-ব্যভিচারের প্রতি মুসলিমদের এক ধরনের সহনশীলতা তৈরি হয়েছে।

হিন্দের কণ্ঠ শুনে আল্লাহর রাসূল তাকে চিনে ফেলেন। জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা তুমিই কি হিন্দ?' হিন্দ উত্তর দেয়, 'জ্বী আল্লাহর রাসূল, আমিই হিন্দ। যা কিছু হয়ে গেছে তার জন্য আমাকে মাফ করে দিন।' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিন।' শেষ পর্যন্ত হিন্দ সব শত্রুতা ভুলে একজন আন্তরিক মুসলিমাহ হিসেবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন।

কাবার চাবি রাখা এবং হাজীদের পানি সরবরাহ করা ছিল কুরাইশদের জন্যে বেশ গৌরবের একটি বিষয়। আলী ইবন আবি তালিব ﷺ এই দায়িত্ব পেতে চাইলেন।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ গোত্র বনু হাশিমের অনেকেই এই সম্মান লাভ করতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ এই চাবি দিলেন উসমান ইবন তালহাকে ؓ। এই উসমান ইবন তালহা যখন মুশরিক ছিলেন তখনো তার গোত্র বনু শাইবার কাছেই কাবার চাবি গচ্ছিত থাকতো। মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই নিয়মটি পরিবর্তন করলেন না। উসমান ইবন তালহাকে চাবি রাখার দায়িত্ব দিয়ে বললেন, 'এটা চিরদিনের জন্য রেখে দাও। তোমাদের কাছ থেকে যে এই চাবি কেড়ে নেবে সে জালিম।' বংশ পরম্পরায় এখনো সেই চাবি বনু শাইবার অধিকারে আছে।

## কালো তালিকা

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কিছু জঘন্য অপরাধীর জন্য একটি কালো তালিকা তৈরি করা হয়। এদের ক্ষমা করা হয়নি। এই কালো তালিকায় ছিল নয় থেকে তেরো জন মানুষ। এরা হলো আব্দুল উযযাহ ইবন খাতাল এবং তার দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবন সাদ আবি সারাহ, মাকিস ইবন সাবাবাহ, আল হুয়াইরিস ইবন নাকিস, হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ এবং সারাহ। ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন নামও এসেছে। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাদেরকে হত্যা করো, যদি তারা আল কাবার গিলাফ (পর্দা) ধরে ঝুলে থাকে, তবুও!'

আব্দুল্লাহ ইবন খাতাল ছিল একজন মুহাজির মুসলিম। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কর সংগ্রহ করার কাজে পাঠান, তার দাস তার সাথে ছিল। পথিমধ্যে কোনো কারণে সে তার দাসের ওপর রেগে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে। সে জানতো কাজটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো ছাড় দেবেন না। ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, চাকর হোক, মালিক হোক -- সবার জন্যই ন্যায় বিচার। আবদুল্লাহ ইবন খাতাল শাস্তির ভয়ে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে। হত্যার আদেশ জারি হওয়ার পর সে কাবাঘরের গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে। তাকে সে অবস্থাতেই হত্যা করা হয়।[103]

তার দুজন দাসী ছিল -- ফারতানা এবং আরনাব। আল্লাহর রাসূলের কুৎসামূলক গান গাওয়ার অপরাধে তাদের দুইজনকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজন মুসলিম হয়ে ছাড়া পেয়ে যায়।[104]

আব্দুল্লাহ ইবন আবি সারাহ ছিল একজন মুসলিম এবং কুরআন সংরক্ষণকারী। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে সে মক্কায় পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে গলাবাজি করতে থাকে, 'আমি কুরআন পাল্টে ফেলবো! কুরআন লিখে তার অর্থ বদলে দেবো!' মক্কা বিজয়ের দিন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে সে তার দুধ ভাই উসমান ইবন আফফানের ؓ কাছে নিরাপত্তা চায়। উসমান তাকে নবীজির ﷺ কাছে নিয়ে যান।

---

[103] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫০।

[104] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৭।

আবদুল্লাহ ইবন আবি সারাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে এসেছি।' নবীজি চুপ করে রইলেন, সে আবার বললো, 'আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ এবারও কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বারে নবীজি ﷺ তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

সে চলে যাবার পর নবীজি উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি বুদ্ধিমান কেউ ছিল না? আমি তো এজন্য চুপ করেছিলাম যেন তোমাদের কেউ উঠে এসে তার গর্দানটা উড়িয়ে দেয়।' একজন সাহাবি বললেন, 'ইশ! আপনি যদি আমাদেরকে একটু ইশারা করতেন!' নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, 'ইশারা দিয়ে হত্যা করা কোনো নবীর জন্য শোভা পায় না।'[105]

আব্দুল্লাহ ইবন আবি সারাহ অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেল। তবে সে জীবনের শেষপর্যন্ত ভালো মুসলিম হয়ে বেঁচে ছিল। তার মৃত্যু ঘটে ফজরের নামাযে সিজদারত অবস্থায়। উমার ইবন খাত্তাব এবং উসমানের ﷺ শাসনামলে তিনি বেশ ভালো পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মাকিস ইবন হুবাবার ভাই ছিলেন একজন মুসলিম। বনু মুসতালিকের যুদ্ধে তার ভাই এক আনসারী মুসলিমের হাতে ভুলক্রমে নিহত হন। মাকিস তখন হিজরত করে মদীনায় আসেন শুধুমাত্র তার ভাইয়ের মৃত্যুর ক্ষতি পূরণের টাকার লোভে। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে সে পালিয়ে মক্কায় ফিরে আসে এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

হুয়াইরিস ইবন নাকিসের অপরাধ ছিল সে মক্কায় আল্লাহর রাসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় সে আল্লাহর রাসূলের দুই কন্যা ফাতিমা ﷺ এবং উম্মু কুলসুমকে ﷺ উত্ত্যক্ত করে। একই রকম অপরাধ করেছিল হাব্বাব ইবন আসওয়াদ। সে হিজরতের সময় আল্লাহর রাসূলের কন্যা যাইনাবকে ﷺ বর্শা উঁচিয়ে ভয় দেখায়। তখন যাইনাব ছিলেন গর্ভবতী। এ ঘটনায় যাইনাবের গর্ভপাত হয়ে যায়। হুয়াইরিসকে হত্যা করা হয় কিন্তু হাব্বাব পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে ফিরে আসে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর সারাহ ছিল হাতিব ইবন আবি বালতার পত্রবাহিকা, মাক্কী যুগে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে গান গাইতো। তার জন্য নিরাপত্তা চাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যায়।

কালো তালিকায় আরও কিছু ব্যক্তির নাম ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। এখানে উল্লেখ্য, যাদের নাম কালো তালিকাভুক্ত ছিল এদের প্রায় সবার অপরাধ ছিল হয় *রিদ্দা* নয়তো *আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিন্দা করা*। তীব্রতার মাত্রায় এই দুটো অপরাধ ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। যে কারণে মক্কার সাধারণ কাফিরদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও এ দুটি অপরাধের সাথে যুক্তদের ক্ষমা করা হয়নি। এ দুটি

অপরাধের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। একজন কাফির যুদ্ধবন্দী হলে তাকে হত্যা করা, মুক্ত করে দেয়া, দাস হিসেবে রাখা বা তার থেকে মুক্তিপণ আদায় করা কিংবা তাকে বন্দী বিনিময়ে ব্যবহার করা – এর যেকোনোটির সিদ্ধান্ত ইমাম নিতে পারেন। কিন্তু মুরতাদের ক্ষেত্রে একটিই বিধান। তা হলো মৃত্যুদণ্ড। শুধুমাত্র সে যদি পুনরায় মুসলিম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

উম্ম হানি ﷺ ছিলেন আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ বোন। মক্কা বিজয়ের দিন তার শ্বশুর বাড়ির দুই আত্মীয় তার কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি তাদের আশ্রয় দেন। কিন্তু আলী ﷺ বিষয়টি পছন্দ করলেন না। তিনি তাদের হত্যা করতে চাইলেন। উম্ম হানি তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শরণাপন্ন হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হয়ে তাকে স্বাগত জানালেন, জানতে চাইলেন কী হয়েছে। উম্ম হানি সবকিছু খুলে বলার পর সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সমস্যা নেই, তুমি যাদের নিরাপত্তা দিয়েছো আমিও তাদের নিরাপত্তা দিলাম।'

## বিবিধ শিক্ষা

১) উম্ম হানির ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, একজন মুসলিম চাইলে একজন ব্যক্তি বা ছোট কোনো দলকে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু বড় কোনো দল বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। এ কারণে আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়ন করতে মদীনায় গেলে কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি।

২) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার সময় বলা হয়েছিল কেউ যদি নিজ ঘরে অবস্থান করে, তাহলে সে নিরাপদ। অথবা কেউ যদি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয় তাহলে সে নিরাপদ। এখানে লক্ষণীয়, কেউ যদি নিজ ঘরেই অবস্থান করতে পারে, তাহলে আবু সুফিয়ানের ঘরে তার যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। তবু কেন নাম ধরে আবু সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করা হলো? আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের মানসিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানের কথা মাথায় রাখতেন। আবু সুফিয়ান কিছুকাল আগেও ছিল কুরাইশদের নেতা। মাত্র সে মুসলিম হয়েছে। মুসলিম হয়ে তার মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান হারানোর একটা ভয় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল চাইলেন এই ভয় দূর করে দিতে এবং তার জন্য ইসলামে আসার পথ সহজ করে দিতে। আবু সুফিয়ানের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহর রাসূল তাকে সেটাই দিলেন। তাই তার নাম ধরে বলে দিলেন কেউ যদি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ। তাই, একজন মানুষের মানসিক কিংবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী সত্যকে গ্রহণ করা তাঁর জন্য সহজ করে দেওয়া উচিত।

৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান দেখুক কত বিশাল মুসলিম বাহিনী মক্কা অভিযানে এসেছে। তিনি আবু সুফিয়ানের মন থেকে লড়াই করা বা প্রতিরোধ গড়ার শেষ ইচ্ছেটুকুও মেরে ফেলতে চাচ্ছিলেন। যদিও আবু সুফিয়ান তখন মুসলিম, কিন্তু তখনো তিনি একজন নও মুসলিম এবং কুরাইশদের নেতা। নিজ

গোত্রের কাছে গিয়ে তার মন বদলেও যেতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন আবু সুফিয়ান ﷺ স্বচক্ষে এই বাহিনী দেখে আত্মসমর্পণ করে ফেলুক। কারণ আল্লাহর রাসূল মক্কায় রক্তপাত হোক তা চাননি। এটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল, সীরাতে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে।

# মক্কার পবিত্রতা ঘোষণা

সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিবের ﷬ মতে, মক্কা বিজয়ের দিনটি কোনো উৎসব বা আনন্দ উদযাপনের দিন ছিল না। তাঁর বর্ণনায়, সেদিন মক্কা প্রবেশের সময় মুসলিমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়ছিলেন। তারা সেদিন কাবাঘরও তাওয়াফ করছিলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর কাবায় ফিরে এসে তারা সন্তুষ্ট, আনন্দিত।

তারা সকাল পর্যন্ত কাবাঘর তাওয়াফ করেন। সারা রাত ধরে তাদের ইবাদাত চললো। এই চমৎকার দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ান তার স্ত্রীকে বললো, 'তোমার কি মনে হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে?' হিন্দ জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে!' এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আবু সুফিয়ানের দেখা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হিন্দকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, তোমার কি মনে হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে? আর হিন্দ জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ আমি মনে করি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে?' এ কথা শোনামাত্র আবু সুফিয়ানের অন্তরের ভেতর কী যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। নবুওয়াত নিয়ে তার সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। আর কেউ আমাদের এই কথোপকথন শুনেনি। আমি আর হিন্দ ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না।'

মক্কা বিজয়ের পরদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার উদ্দেশ্যে বললেন,

> *'আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই একই দিন তিনি মক্কাকে পবিত্র স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই পবিত্রতা বলবৎ থাকবে। আল্লাহ এবং শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী কারো জন্য মক্কায় রক্তপাত করা কিংবা গাছ কাটা বৈধ নয়। আমার আগেও এমনটা করা বৈধ ছিল না। আমার পরেও তা কারো জন্য বৈধ হবে না। যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, তাহলে আল্লাহর রাসূল কেন এখানে রক্তপাত করেছেন? তবে তাকে বলবে, আল্লাহ তাঁকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতি তোমাদের দেওয়া হয়নি। আর আমার ক্ষেত্রে এটা কিছু সময়ের জন্যই বৈধ করা হয়েছে। আগে এখানে খুনখারাবি রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে।'*[106]

---

[106] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২২।

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে পশুপাখি হত্যা, গাছ কাটা, গাছপালা উপড়ে ফেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গাছ না কাটার আদেশ শুনে আব্বাস ইবন মুত্তালিব ইযকির নামের একটি গাছ কাটার অনুমতি চাইলেন। এই গাছটিকে মৃতদের জন্য সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এই একটি গাছ কাটার অনুমতি দেন।

## বিশৃঙ্খলা দমন

বনু হুযায়ল গোত্রের সাথে বনু খুযাআর একটি বিরোধ ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে বনু হুযাইলের ইবন আসওয়া বনু খুযাআর এক লোককে হত্যা করে। মক্কা বিজয়ের পর তারা এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়। খুযাআর লোকেরা ইবন আসওয়াকে মেরে ফেলে। বনু খুযাআ ছিল মুসলিম গোত্র। হুদাইবিয়ার চুক্তিতে তারা ছিল মুসলিমদের মিত্র। এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ খুযাআকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> *'খুযাআর লোকেরা, তোমরা হানাহানি থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। যে লোককে তোমরা হত্যা করেছো, আমি তার রক্তপণ আদায় করে দেবো। কিন্তু জেনে রাখো, এরপর থেকে যদি কেউ এমন কাজ করে, তাহলে নিহত ব্যক্তির পরিবার চাইলে এর প্রতিশোধে হত্যা করতে পারে, অথবা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই নিহত লোকের জন্য রক্তপণ আদায় করলেন। এভাবে বিষয়টি বেশি দূর গড়ানোর আগেই নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

## আনসারদের সংশয়: কোথায় থাকবেন আল্লাহর রাসূল

মক্কা বিজয় হলো, চারিদিকে আনন্দ, কিন্তু আনসারদের মনে ভয় কাজ করছিল, প্রিয় মানুষকে হারানোর ভয়। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফা পাহাড়ে উঠে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এই দৃশ্য দেখে আনসাররা ভাবলেন, মক্কা তো বিজয় হয়েই গেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ শহরে ফিরে এসেছেন। তিনি নিশ্চয়ই এখানেই থেকে যাবেন। এই ভাবনাটাই ছিল ভীষণ কষ্টের। মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর গত আট বছর ধরে তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আগলে রাখতে চেয়েছেন। একসাথে থেকে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছেন। আর এখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ছেড়ে মক্কায় থেকে যাবেন? তারা তাদের মনকে মানাতেই পারছিল না।

এই কথাবার্তাগুলো আল্লাহর রাসূলের কানে গেল। তিনি আনসারদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এ কথা বলেছো?' তারা প্রথমে স্বীকার করতে চাইলেন না, পরে

স্বীকার করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আমি আল্লাহর দিকে ও তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের সাথে, আর মৃত্যুও তোমাদের সাথে।'

গভীর আবেগে আনসারদের চোখ ভিজে গেল। এই অশ্রু আনন্দের। তারা কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আপনাকে কাছে পাওয়ার আকুলতা আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমরা এ কথা বলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদের কথায় বিশ্বাস করেন।'

# কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণ

## সুহাইল ইবন আমর ؓ

সুহাইল ইবন আমর ছিলেন ইসলামের একজন গোঁড়া শত্রু। বদর, উহুদ -- প্রতিটি যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে সুহাইলের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি আল্লাহর রাসূলকে অসম্মান করে কিছু আপত্তিকর কথাও বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে মক্কা বিজয়ের পরে সুহাইল নিজের জান বাঁচাতে পালিয়ে যায়। কারণ, মুসলিমদের বিরোধিতায় সে যা করেছে, তাতে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

পালিয়ে গেলেও তার মনে সূক্ষ্ম আশা ছিল হয়তো আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিতেও পারেন। তাই সুহাইল তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন সুহাইলকে ক্ষমার আশায় আল্লাহর রাসূলের কাছে পাঠালেন। আল্লাহর রাসূল এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আল্লাহর শপথ! সে নিরাপদ, তাকে আসতে বলো!'

আল্লাহর রাসূল শুধু সুহাইলকে ক্ষমাই করলেন না, বলা চলে তাকে স্বাগত জানালেন। সাহাবিদের বলে দিলেন, কেউ যেন রাগের দৃষ্টিতেও সুহাইলের দিকে না তাকায়। বললেন, 'সুহাইলের মতো একজন বুদ্ধিমান আর অভিজাত লোক ইসলাম সম্পর্কে জানবে না -- তা কী করে হয়!'

সুহাইল মক্কায় ফিরে এলেন। তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা না করে তিনি পারলেন না। বললেন, 'তারুণ্যে আর বার্ধক্যে, তিনি ছিলেন সবসময়ই বিশ্বস্ত আর ভালো মানুষ।' আসলে আল্লাহর রাসূলের চরিত্র এমন ছিল যে শত্রুরাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না দিয়ে পারতো না। এই ঘটনার পর সুহাইল কিছুদিন মুশরিক অবস্থাতেই থেকে যান। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে অভিযানে বের হন এবং মুসলিম হয়ে যান।

ইসলাম পরবর্তী জীবনে সুহাইল ইবন আমর ؓ কেমন মুসলিম ছিলেন? এ প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক যেহেতু এই সুহাইল বছরের পর বছর ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে

সক্রিয় শত্রু। আয-যুবাইর ইবন বাকর বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর সুহাইল নিয়মিতভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত আদায় করতেন। এমনকি তিনি নিজের দল নিয়ে শামে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি এত বেশি সিয়াম আর কিয়াম পালন করতেন যে, তার মুখ শুকিয়ে যেত। কুরআন শুনলে তিনি কাঁদতেন। আর ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি ছিলেন কিরদূস ব্যাটালিয়নের কমান্ডার।'

## সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ﵁

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার কথা এর আগেও এসেছে। সে ছিল ইসলামের একজন নামকরা শত্রু। বদরের পর আল্লাহর রাসূলকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনাকারী ছিল এই সাফওয়ান। মক্কা বিজয়ের পর সেও সুহাইলের ﵁ মতো মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যায়। জেদ্দার কাছে আশ-শুয়াইবায় আত্মগোপন করে।

তার পিছু নেয় তারই বন্ধু উমায়ের ইবন ওয়াহাব ﵁। এই উমায়ের ইবন ওয়াহাব—ই সাফওয়ানের পরিকল্পনামতো বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূলকে বিষ মাখানো তরবারি নিয়ে হত্যা করতে এসে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, উমায়ের জেদ্দায় সাফওয়ানের দেখা পায়। উমায়েরকে দেখে সাফওয়ান ভাবলো নিশ্চয়ই উমায়ের তাকে হত্যা করতে এসেছে। সাফওয়ানের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আল্লাহর রাসূল নির্ঘাৎ তাকে হত্যা করবেন। কারণ ইসলামের শত্রুতায় সে যা করেছেন তাতে তার ছাড়া পাবার কথা নয়। অবশ্য উমায়েরের সাথে কথা বলে একটু পরেই তার ভুল ভাঙলো। উমায়েরকে সে বললো,

- তুমি কেন এসেছো? তোমার সব ঋণের দায়ভার আমি নিয়েছিলাম। আর এখন সেই তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?

- সাফওয়ান! আমি তো এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছি যিনি সবচেয়ে মহৎ, দয়ালু আর সজ্জন ব্যক্তি।

- না! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না! তোমার কথার প্রমাণ কী?

সাফওয়ানের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আল্লাহর রাসূল তাকে নিরাপত্তা দিতে পারেন! আসলে উমায়ের ইবন ওয়াহাব আগেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে সাফওয়ানকে নিরাপত্তা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। উমায়ের বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল, সাফওয়ান তার গোত্রের নেতা। তাকে আপনি নিরাপত্তা দান করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ঠিক আছে, নিরাপত্তা দিলাম।' উমায়ের তখন নিরাপত্তার চিহ্নস্বরূপ কিছু চাইলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাগড়ী খুলে উমায়েরকে দেন।

সাফওয়ান প্রথমে মক্কায় ফিরে যেতে সাহস করছিল না। উমায়ের তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'আমি এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছি যিনি সবচেয়ে দয়ালু,

সহানুভূতিশীল এবং ক্ষমাশীল। তিনি তোমার চাচা। তাঁর মর্যাদাই তোমার মর্যাদা। তাঁর রাজত্বই তোমার রাজত্ব।' শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ পাগড়ী দেখে সাফওয়ান আশ্বস্ত হয়ে মদীনায় ফিরে যায়। ফিরে এসে সাফওয়ান রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটি বলছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর আমাকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা কি ঠিক?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, সে ঠিকই বলেছে।' সাফওয়ান বললো, 'ঠিক আছে, আমাকে দুই মাস সময় দিন।' মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করতে এই সময়টুকু সে চাইলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চার মাস সময় দিলেন। পরবর্তীতে হাওয়াজিনের যুদ্ধের সময়ে সাফওয়ান ؓ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়। সে সময় আল্লাহর রাসূল তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করে তার মন জয় করেন।

## ইকরিমা ইবন আবু জাহল ؓ

পিতা আবু জাহলের মৃত্যুর পর তার ছেলে ইকরিমা কুরাইশদের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। তার ছিল একটাই চাওয়া। যেকোনোভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের হত্যা করে পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমাও কালো তালিকাভুক্ত ছিল।

আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে ইকরিমা ইয়েমেনে পালিয়ে গেল। তার স্ত্রী উম্ম হাকিম ছুটে গেলেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, ইকরিমা তো ইয়েমেন পালিয়ে গেছে। সে ভয় পাচ্ছে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন। আপনি দয়া করে তাকে নিরাপত্তা দান করুন।'

আল্লাহর রাসূল রাজি হলেন। উম্ম হাকিম এই সুসংবাদ নিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে ছুটে গেল। ইকরিমা তখন তিহামায় এক নৌকায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পরেই যাত্রা শুরু হবে। এ অবস্থায় উম্ম হাকিম ইকরিমাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন,

- আমার সাথে মক্কায় ফিরে চলো। আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়েছেন।

- সত্যি বলছো?

- হ্যাঁ, আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

ইকরিমা তার স্ত্রীর সাথে মক্কায় ফেরত আসলো। ইকরিমা তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইল কিন্তু তার স্ত্রী রাজি হলো না। বললো, 'তুমি একজন কাফির আর আমি একজন মুসলিম!'

ইকরিমা একটা ধাক্কা খেলো। শুধুমাত্র অমুসলিম হওয়ার কারণে তার স্ত্রী তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করবে -- এটা সে ভাবতেই পারেনি। ইসলামের প্রতি কতটা ভক্তি থাকলে

তার স্ত্রী এমনটা করতে পারে? বিষয়টা ইকরিমাকে ইসলাম নিয়ে ভাবতে বাধ্য করল। কিছুক্ষণ পর সে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করতে আসলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইকরিমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু ইকরিমা তখনো সন্দিহান। জানতে চাইলেন,

- আপনি কি সত্যিই আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন?

- হ্যাঁ, দিয়েছি। তুমি নিরাপদ।

- আপনি আমাকে কীসের প্রতি আহবান করেন?

- আমি তোমাকে এই সাক্ষ্য দিতে আহবান করি যে, এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো সত্তা নেই। আমি আহবান করি তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল। আর তুমি সালাত ও যাকাত আদায় করবে।

- আল্লাহর শপথ! আপনি তো কেবল সত্য আর যা কিছু সুন্দর, তার প্রতি আহবান করছেন। সত্যি বলতে, এই আহবান করার আগেও আপনি ছিলেন আমাদের মাঝে সবচাইতে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত আর মহৎ একজন মানুষ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো সত্তা নেই আর আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহর রাসূল খুবই খুশি হলেন। এবার ইকরিমার ﷺ ক্ষমা চাওয়ার পালা। সে বললো,

- আল্লাহর রাসূল! আমি যতবার আপনার সাথে শত্রুতা করেছি, যতবার যুদ্ধে আপনার মোকাবেলা করেছি, আপনার সামনে-পেছনে যতবার আপনার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছি, আমি চাই আপনি প্রতিবারের জন্যই আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

আল্লাহর রাসূল তার অনুরোধ রাখলেন। বললেন,

- হে আল্লাহ! তুমি ইকরিমাকে ক্ষমা করে দাও -- সে যতবার শত্রুতা করেছে, যতবার তোমার দ্বীনের আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছে -- প্রতিবারের জন্যই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে-পেছনে সে যতবার নিন্দা করেছে, তাকে সেসবের জন্য ক্ষমা করে দাও!

- হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব খুশি! আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে আমি যত টাকা খরচ করেছি, কথা দিচ্ছি, আল্লাহর পথে আমি এবার দ্বিগুণ খরচ করবো! আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি যত কষ্ট করেছি, কথা দিচ্ছি, আমি এখন থেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তার দ্বিগুণ কষ্ট করবো!

ইকরিমা তার কথা রেখেছিলেন। তিনি একজন ভালো মুসলিম এবং মুজাহিদ হিসেবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। রিদ্দার যুদ্ধ, শামের যুদ্ধ -- এরকম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

সুহাইল ইবন আমর, ইকরিমা কিংবা সাফওয়ান -- যারা কি না ইসলামের বিরুদ্ধে এতটা সোচ্চার ছিলেন যে মক্কা-বিজয়ের পর ভয়ে-আতঙ্কে আল্লাহর রাসূলের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। তারা যখন শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ তাদের নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়েছেন, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন নি! এত বিরুদ্ধাচার করার পরেও কি ক্ষমা পাওয়া সম্ভব? কিন্তু তারা প্রত্যেকে জানতেন, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন 'আল-আমীন' -- বিশ্বস্ত -- তাঁকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়। তাঁর মুখের প্রতিটা কথা সত্য, তাঁর কাছে সকল আমানত নিরাপদ, তাঁর নিরাপত্তাও তাই বিশ্বাসযোগ্য। ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর রাসূলের কথার ওপর যে পরিমাণ ভরসা করতে পেরেছে, সম্ভবত মানুষ তার বন্ধুর ওপরও এত ভরসা করতে পারে না।

## বনু জাদীমার অভিযানে খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ ভুল ও প্রাপ্ত শিক্ষা

অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালিদকে বনু জাদীমাহ গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা প্রথমে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু খালিদকে দেখে দমে গেল। খালিদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হলো। কিন্তু সরাসরি 'আমরা মুসলিম হয়েছি' না বলে তারা বললো, 'সাবা'আনা।'

যখন কেউ মুসলিম হতো, তখন কুরাইশরা তাচ্ছিল্য করে বলতো, 'সে সাবেঈ হয়ে গেছে।' যেহেতু অন্যেরা এই শব্দটি ব্যবহার করে, তাই তারাও তা ই বললো। কিন্তু আসলে তারা মুসলিমই হতে চাচ্ছিল কিন্তু 'আসলামনা' বলার মতো জ্ঞান তাদের ছিল না।

খালিদ ইবন ওয়ালিদের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হলো না। তিনি তাদের কথা বুঝতে ভুল করে কাফির ভেবে তাদের হত্যা করা শুরু করলেন। কিন্তু কিছু মুসলিম সৈনিকের প্রবল প্রতিবাদের মুখে খালিদ থেমে গেলেন এবং ঐ গোত্রের বাকিদের বন্দী করে প্রত্যেক বন্দীকে একজন করে সৈনিকের হাতে অর্পণ করলেন।

পরদিন সবাইকে নিজেদের বন্দীকে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ এবং আরও কয়েকজন এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। বিষয়টি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উত্থাপন করা হলো। রাসূলুল্লাহ খুবই রেগে গেলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।'[107]

---

[107] সহীহ বুখারি, অধ্যায় বিচার, হাদীস ৫১।

আবদুল্লাহ ইবন উমার ঠিকই বুঝতে পারছিলেন খালিদ ভুল করছেন। এই লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ও বন্দী করা হয়েছে। বিষয়টা এমন নয় যে, আমীরের আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন উমার জানতেন না। তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, আমীরের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্তই করতে হবে যতক্ষণ তিনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন তা হালাল। হারাম কাজের আদেশ দিলে আমীরের আনুগত্য করা যাবে না। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ একটি বিপজ্জনক ব্যাপার। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং তার বন্ধুরা জেনেশুনেই আমীরের নির্দেশ অমান্য করেছেন। আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

এই সারিয়াহর সময় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তারকৃত লোকদের মধ্যে একজন লোক ছিল বহিরাগত। সে জাদীমাহ গোত্রের ছিল না। সে এসেছিল এক মহিলাকে ভালোবেসে। হাত বাঁধা অবস্থায় সে তার পাহারায় থাকা মুসলিম সৈন্যকে অনুরোধ করলো, ‘আমাকে একবার ঐ মহিলার কাছে যেতে দাও। এরপর তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, তা ই করো।’

তাকে যেতে দেওয়া হলো। সে ঐ মহিলার কাছে গিয়ে বললো, ‘হুবাইশ, জীবনের ইতি হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করো!’ মহিলাটি বললো, ‘আমি তো তোমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছি।’ এতটুকুই তাদের মধ্যে কথা হলো। এরপর লোকটিকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হলো। মহিলাটি সেই দৃশ্য দেখে লোকটির কাছে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ নিজেও তার পাশে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

এই ঘটনাটি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব খারাপ লাগলো। তিনি বললেন, ‘তোমাদের কারো মনে কি একটুও দয়া হলো না?’

সেখানে হত্যা করা তো ভুল ছিলই, তার ওপর লোকটিকে এভাবে হত্যা করা ছিল খুবই দুঃখজনক। পুরো ঘটনাটা রাসূলুল্লাহকে ﷺ কষ্ট দেয়। তিনি দিয়্যাহ বা রক্তপণ পরিশোধ করার জন্য আলী ইবন আবি তালিবকে ؓ পাঠালেন। কেননা লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে সমস্ত কিছুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো। রক্তপণ ছাড়াও যা কিছু হারানো গিয়েছিল, যা কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল তার সবকিছুর জন্য আলী ؓ ক্ষতিপূরণ দিলেন। এরপরেও কিছু অর্থ বেঁচে গিয়েছিল। যদি তাদের কোনো কাজে লাগে এই ভেবে আলী ؓ সেটাও তাদেরকে দিয়ে দিলেন।

ইবনে কাসীর এই ঘটনা নিয়ে একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলছেন,

*‘খালিদ ইবন ওয়ালিদ ঐ গোত্রের অনেকজনকে হত্যা করেছিলেন। আর প্রায় সব বন্দীকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু এরপরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বরখাস্ত করেননি। সেনাবাহিনীর আমীর পদে তাকে বহাল রাখেন। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ*

*ঘোষণা করেছেন যে, খালিদ যা করেছে তার দায় থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু খালিদ হত্যা ও সম্পদ কেড়ে নিয়ে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলের মাশুলস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষতিপূরণও দিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আলিমরা মত দিয়েছেন যে, ইমাম যদি কোনো ভুল করেন তখন সেটার ক্ষতিপূরণ ইমামের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে নয়, বরং মুসলিমদের কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।'*

আর এই কারণে আবু বকর আস সিদ্দীকও ﷺ তাকে তার পদে বহাল রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক ﷺ বলেছিলেন, 'আমি সেই তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করতে চাই না, যে তলোয়ারকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল মুশরিকদের উপরে কোষমুক্ত করেছেন।' তবে উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ সময়ে খালিদকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

জিহাদের সময়ে মুসলিমদের দ্বারা ভুলত্রুটিগুলোকে কীভাবে সুন্নাহ অনুসারে সামলানো যায়, সে ব্যাপারে এই ঘটনার মাঝে শিক্ষা রয়েছে। খালিদ ইবন ওয়ালিদ কিছু মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাকে কারাবন্দী করা হয়নি বা তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই কাজের সাথে তিনি একমত নন। তিনি খালিদকে শাস্তি দিলেন না। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিকে দ্রুত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমীর হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিলেন।

একজন মুসলিমকে কখনোই কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। একজন মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুসলিমরা একে অপরের ভাই। সে তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং তার উপর অত্যাচার করে না।' বর্তমান সময়ে বিষয়টিকে ঘিরে বেশ কিছু বিভ্রান্তি আছে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু মুসলিম কাফিরদের রক্তকে মুসলিম রক্তের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। তারা তাদের মুসলিম ভাইদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চায় এবং কাফিরদের সাথে এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও জায়েয মনে করে। এর কারণ মানুষের মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারার জ্ঞানের অভাব। এই বিষয়ের ওপর মুসলিমদের আরও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তাদের জানা দরকার যে, মুসলিমরা কাদের প্রতি অনুগত এবং কাদের ব্যাপারে দায়মুক্ত।

# মূর্তি ভাঙার অভিযান

## উযযা ধ্বংস

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল উযযা ধ্বংস করার জন্য খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ পাঠালেন। আল লাত, আল উযযা, হুবাল -- এগুলো ছিল সে সময়ে মুশরিকদের কিছু জনপ্রিয়

দেবতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার চারপাশের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। এখন তিনি মক্কার বাইরের মূর্তিগুলোকেও ধ্বংস করতে চাইলেন।

আল উযযার মূর্তি ছিল নাখলায়। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ নাখলায় গেলেন। উযযার তত্ত্বাবধায়করা তাঁকে দেখেই পালিয়ে গেল। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﷺ উযযার মূর্তি ভেঙে ফেললেন। এর ভিত্তিপ্রস্তরসহ গুঁড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আর কিছু দেখনি?' খালিদ উত্তর দিলেন 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি আসল কাজটাই করোনি।'

খালিদ ইবন ওয়ালিদ আবার ফিরে গেলেন। দেখতে পেলেন, এলোমেলো চুলের এক নগ্ন নারীকে। সে চিৎকার করছে আর নিজের গায়ে ময়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ভীত হওয়ার পাত্র নন, তলোয়ারের কোপে তাকে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহকে শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই ছিল আল উযযা। তুমি তাকে হত্যা করেছো।' বাহ্যিকভাবে একটা মূর্তি থাকলেও মূলত উযযা ছিল এক ধরনের জ্বীন বা শয়তান। । এর ভিতরে জ্বীন বা শয়তান বাস করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আজকের পর উযযা বলে আর কিছু নেই।'

## মানাত ধ্বংস

মানাত মূর্তিটি ছিল লোহিত সাগরের পাড়ে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি জায়গায়। জাহিলিয়াতের যুগে আওস, খাযরাজ, গাসসান এবং অন্যান্য অনেক গোত্র মূর্তিপূজা করতো। হজ্জের সময়ে তারা এই মূর্তির পূজো দিয়েই হজ্জের সূচনা করতো। সাদ ইবন যাইদ আল-আশহালীকে ﷺ আল্লাহর রাসূল এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠালেন। বিশজন সৈনিক নিয়ে তিনি মানাত ধ্বংস করতে গেলেন। মানাতের রক্ষক তাদের বললো,

- কেন এসেছো?

- মানাত ধ্বংস করতে!

- করো দেখি কী করতে পারো!

সাদ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। বেরিয়ে এল একটি কালো নারী। সে মুখ দিয়ে আজেবাজে বকছিল। সাদ প্রথমে সেই মহিলাকে হত্যা করলেন, এরপর মূর্তি ধ্বংস করে ফিরে এলেন।

## সুওয়া ধ্বংস

এই মূর্তির পূজা করতো বনু হুযাইল গোত্র। মক্কা বিজয়ের পর বনু হুযাইল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমর ইবন আল আসকে ﷺ সুওয়া ধ্বংস

করতে পাঠান। আমর মূর্তি ভাঙতে উদ্যত হলে সুওয়ার রক্ষক তাকে বাধা দিল না। কিন্তু বললো, 'তুমি এর কিছুই করতে পারবে না।'

আমর বললেন, 'তুই এখনো মিথ্যার ওপরে বেঁচে আছিস? শোনে এই মূর্তি? দেখে এই মূর্তি?' এই বলে মূর্তিটি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিলেন। এরপর জানতে চাইলেন, 'এখন কী মনে হয় তোর?'

'আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম' – এই বলে সুওয়ার রক্ষক মুসলিম হয়ে গেল। চোখের সামনে মূর্তির অসারতার প্রমাণ পেয়ে হয়তো তার বোধোদয় ঘটেছিল। এভাবেই বিভিন্ন মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে আরবের বুক থেকে শিরকের প্রতীকগুলোকে একে একে উচ্ছেদ করা হলো।

# মক্কা বিজয় থেকে শিক্ষা

## হুদুদ, ইসলামের সাম্য এবং শারীয়াহ

মক্কায় প্রবেশকালে আল্লাহর রাসূলের ﷺ উটের পেছনে বসা ছিলেন উসামাহ ইবন যাইদ ؓ। তার বাবা যাইদ একসময় ছিলেন দাস। আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবাঘরে আজান দিয়েছিলেন বিলালকে দিয়ে। বিলালও ছিলেন সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণির একজন মানুষ। এগুলো ছিল মক্কার গোত্রীয় ভেদাভেদ ও শ্রেণিবৈষম্যকে ইসলামের সাম্য ও ন্যায় দিয়ে প্রতিস্থাপনের প্রতীকি পদক্ষেপ। তবে সত্যি বলতে, গোত্রীয় বৈষম্য কুরাইশদের মাঝে এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, হাতে-কলমে এই শিক্ষা দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল। এই শিক্ষাটি প্রোথিত করার আরেকটি সুযোগ মেলে একটি চুরির ঘটনার মাধ্যমে।

বনু মাখযুমের এক মহিলার কাহিনী। চুরির অপরাধে তাকে ধরে আনা হয়। বনু মাখযুম ছিল কুরাইশের এক প্রভাবশালী গোত্র। তাদেরই এক সম্মানিত মহিলা চুরি করার মতো অপরাধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মহিলার ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ, অর্থাৎ হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।

এই আদেশের পর সেই গোত্রের লোকেরা সেই মহিলাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে উঠেপড়ে লাগে। সম্ভ্রান্ত একজন মহিলার চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে, বিষয়টা তাদের জন্য যেমন অভিনব, তেমনই কষ্টকর। তারা মানতেই পারছিল না প্রভাবশালী কেউ এ ধরনের শাস্তি পাবে। যে সমাজব্যবস্থায় বরাবর দুর্বল আর দাসশ্রেণির লোকেরাই শাস্তি ভোগ করে এসেছে, যে সমাজে উঁচু শ্রেণির লোকেরা বরাবর কোনো না কোনোভাবে পার পেয়ে এসেছে, সে সমাজের লোকেদের কাছে ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারা উসামাহ ইবন যাইদকে ؓ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে শাস্তি লাঘব বা মাফ করার জন্য অনুরোধ করাতে চাইলো। কারণ, উসামাকে ؓ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোবাসতেন।

পীড়াপীড়িতে উসামা অনিচ্ছার সাথে হলেন। বিষয়টা নিয়ে কথা তোলার সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারাই বদলে গেল। তিনি খুবই রেগে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে একটি খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, 'তোমাদের আগের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল এই কারণে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আমার জানের মালিক আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে নিতাম!'

এরপর হাদ্দ কায়েম করা হলো অর্থাৎ শাস্তিস্বরূপ মহিলার হাত কেটে নেওয়া হলো। পরে অবশ্য সেই মহিলা তাওবা করেছিলেন। তার বিয়েও হয়েছিল। আইশা ﵂ বলেন, 'এ ঘটনার পরে তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। তার কিছু প্রয়োজন থাকলে আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেসব জানাতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক আদর্শের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেখানে আইন মানুষের জীবনকে পরিচালনা করে, ক্ষমতা নয়। যদি কোনো সমাজে কেবল দুর্বলদের শাস্তি দেওয়া হয় আর ক্ষমতাশালীরা পার পেয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল সেই সমাজকে ধ্বংস করে দেন। বর্তমান সমাজে এ ধরনের বৈষম্য তো আছেই, উপরন্তু আল্লাহর আইন বলেও কিছু নেই।

হাদীসে এসেছে যে, 'আল্লাহর হুদুদের একটি হাদ্দ প্রয়োগ করা চল্লিশ দিন টানা বৃষ্টি হওয়া থেকে কল্যাণকর।'[108] শুধু এই হুদুদ প্রয়োগ না করার কারণে সমাজ আজ হাজারো বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জীবনে এত বিশৃঙ্খলা। আজ এই উম্মাহর সম্পদ আছে, বিস্তৃত ভূমি আছে, কিন্তু সেসবে বারাকাহ নেই। কারণ কোথাও হুদুদের প্রয়োগ নেই। মুসলিমদের প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে বা শরীয়াহকে বর্তমানে বর্বর এবং মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি কল্যাণ, শান্তি ও বারাকাহ আছে। মুসলিমদের স্বর্ণযুগ বলে যে যুগটির কথা বলা হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে এই শরীয়াহর যুগ। আর যে যুগে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত, পদদলিত আর পিছিয়ে আছে, সেটি হলো গত দুশো বছর ধরে চলে আসা সাম্রাজ্যবাদের যুগ। এখন মুসলিমরা শরীয়াহকে বাদ দিয়ে কাফিরদের আইন মেনে নিয়েছে আর তাদের জীবনযাত্রার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।

---

108 ইবনু মাজাহ, অধ্যায় হুদুদ, হাদীস নং ২৫৩৭।

## হিজরত এবং জিহাদ

বুখারীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর বলেন, 'আজ থেকে আর কোনো হিজরত নেই। শুধু জিহাদ ও নিয়্যত আছে। আর যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করা হয়, তাহলে তোমরা তাতে সাড়া দেবে।'[109]

মক্কা বিজয়ের আগে হিজরত করা ছিল বাধ্যতামূলক। সেসময়ে যে-ই মুসলিম হতো, তাকেই মক্কা থেকে মদীনা, বা আরবের অন্য যে অংশেই সে থাকুক না কেন, তাকে মদীনায় হিজরত করতে হতো। মক্কা বিজয়ের পরে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, হিজরতের সময় শেষ। যারা যারা হিজরত করেছে, তারা এর আজর (সাওয়াব) পেয়ে গেছে। এখন আর হিজরতের সুযোগ নেই। হিজরতের বদলে এখন আছে জিহাদ। যে ইবাদাতের মাধ্যমে হিজরতের সাওয়াব লাভ করা যাবে, তা হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। তাবেঈ আতা ইবন রাবাহ رحمه الله বলেন,

*'আমি আইশার ﷺ কাছে গিয়ে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আইশা বললেন, 'এখন আর কোনো হিজরত নেই। সে যুগে ফিতনা থেকে বাঁচতে মু'মিনরা তাদের দ্বীন নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে পালিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু এখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল ইসলামকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম যেখানে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে। তবে তোমাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করা উচিত এবং জিহাদের নিয়্যত রাখা উচিত।'*

আজ থেকে আর কোনো হিজরত নেই -- এই কথার অর্থ এই নয় যে হিজরতের আদেশ রহিত হয়ে গেছে। বরং এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মক্কা থেকে মদীনায় আর হিজরত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করা অথবা ভালো নিয়ত, যেমন ভালোভাবে দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে হিজরত করা -- এ দুটো আদেশ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ইবন কাসীর এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন, '(সাধারণভাবে) এখন আর হিজরত নেই, তবে এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যখন হিজরত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন হারবিদের (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কুফফার দেশ বা গোষ্ঠী) কাছাকাছি থাকলে আর তাদের মাঝে প্রকাশ্যে দ্বীন পালনের সুযোগ না থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে আলিমরা একমত।'

অর্থাৎ, হিজরতের হুকুম এখনো আছে। পরিস্থিতিভেদে সেটা আবশ্যক অথবা ঐচ্ছিক হতে পারে। যদি কাফিরদেশে নিজের দ্বীন প্রকাশ করা বা পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে অথবা এমন কোনো দেশে হিজরত করা

---

[109] বুখারী, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস নং ২৬৩১।

উচিত যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে কোনো বাধা নেই। প্রকাশ্যে দ্বীন পালন বলতে ব্যক্তিগত আহকামগুলো নয়, বরং ইসলামের সবগুলো আহকাম পালন করার সুযোগ থাকতে হবে।

বর্তমানে কোনটা কুফরের ভূমি ও কোনটা হারবি ভূমি সেটা স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট ইসলামের ভূমি নেই। তাই বর্তমান সময়ের জন্য হুকুম হলো একজন মুসলিমের সেখানেই হিজরত করা উচিত, যেখানে সবচেয়ে ভালোভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে। বিষয়টা কিছুটা আপেক্ষিক। একজন মুসলিম যদি তার দেশে সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে, তাহলে সে সেখানে থাকতে পারে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে তার এমন কোনো জায়গা খুঁজে বের করা উচিত, যেখানে সে তার দ্বীন নিয়ে সবচেয়ে কম ভীত থাকবে। এখানে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো দ্বীন, দুনিয়া নয়। হতে পারে, কোনো একটি দেশে তার দুনিয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু সেখানে দ্বীন পালনে বাধা আসছে। আবার আরেকটি দেশে দ্বীন পালনে বাধা তুলনামূলক কম, কিন্তু দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের বিবেচনায় সে জায়গাটি আরামদায়ক নয়। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশে হিজরত করাটাই দ্বীনের দাবি।

## বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমরা সমান নয়

আমর ইবন সালামা ﷺ ছিলেন মক্কার বাইরে থেকে আসা একজন সাহাবি। তিনি তার ছোটবেলার কথা বর্ণনা করেন,

*'আমাদের সামনে দিয়ে কোনো মুসাফির গেলেই আমরা তাকে মুহাম্মাদের ﷺ কথা জিজ্ঞেস করতাম। তারা বলতো, তিনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন আর তাঁর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী আসে। আর তিনি মাত্রই অমুক-তমুক ব্যাপারে ওয়াহী লাভ করেছেন। আমি এমনভাবে এই শব্দগুলো (কুরআনের আয়াত) মুখস্থ করতাম যে তা আমার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল।'*

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে গোটা আরব অনেক আগে থেকেই খোঁজ খবর রাখত। যদিও তখনো তাদের বেশিরভাগ মুসলিম হয়নি। ইসলাম ছিল সেই সময়ের পত্রিকার হেডলাইন। আমর ইবন সালামা তখন একজন শিশু। কিন্তু মানুষের কথাবার্তা তার কানে আসতো আর এভাবে তিনি কুরআনের অনেক আয়াত মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অথচ তার গোত্রের লোকেরা তখন কাফির ছিল।

আরবরা দলে দলে মুসলিম হয়েছে মক্কা বিজয়ের পরে। আসলে তারা দেখতে চাইছিল কুরাইশ বনাম মুহাম্মাদের ﷺ এই দ্বন্দ্বে কে জয়ী হয়। গণমানুষ এভাবেই চিন্তা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা সত্যের সন্ধান করে না, বরং তারা জয়ী দলের সন্ধান করে। তারা দেখে কারা বিজয়ী হচ্ছে আর তারপর বিজয়ী দলের অনুসরণ করে। তাই সে যুগের আরবরা বলতো, 'মুহাম্মাদ যদি তাঁর নিজ গোত্রের বিপক্ষে হেরে যান তাহলে

তাঁকে আর তাঁর গোত্রকে ছেড়ে দাও। আর যদি তিনি বিজয়ী হন, তাহলে তিনি একজন নবী ও তিনি সত্যবাদী।'

এই মানসিকতা ক্রটিপূর্ণ। বিজয় সত্যের মানদণ্ড নয়। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস থেকে জানি এমন কিছু নবী এই দুনিয়ায় ছিলেন, যাদের অনুসারী ছিল খুবই কম। দশ, পাঁচ, দুই বা একজন। এমন নবীও ছিলেন, যাদের কোনো অনুসারীই ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা ভুলের ওপরে ছিলেন বা তারা ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, হিদায়াত আল্লাহর হাতে, নবীর দায়িত্ব কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। একজন নবী যদি সঠিকভাবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি সফল। ইসলাম এভাবেই সফলতাকে সংজ্ঞায়িত করে, জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবজনতার বিপরীতে স্বল্পসংখ্যক মানুষই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা জানতো, আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন সত্য নবী। তাই তারা বিজয়ের অপেক্ষা করেনি। ইসলামকে সত্য জেনে মুসলিম হয়ে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> "তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় বেশি যারা (মক্কা) বিজয়ের পর (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। (অবশ্য) আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।" (সূরা হাদীদ, ৫৭: ১০)

সুতরাং বিজয়ের আগে মুসলিম হওয়া আর পরে মুসলিম হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা মক্কা বিজয়ের আগে মুসলিম হয়েছে, হিজরত ও জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা মক্কা বিজয়ের পরের মুসলিমদের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। কারণ, বর্তমানে ইসলাম শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় নেই। কাজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে এই প্রতিকূল পরিবেশে যারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে, তাদের মর্যাদা ও পুরস্কার নিঃসন্দেহে সেসব লোকের চাইতে বেশি যারা ইসলামের বিজয় দেখার পর ইসলামের বাহিনীতে যোগ দেবে।

# হুনাইনের যুদ্ধ

## প্রেক্ষাপট

মক্কা বিজয় হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি ছিল কুরাইশরা। মক্কা বিজয়ের সাথে তাদের পতন ঘটে। কিন্তু আরও একটি শক্তি তখনও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করছিল। তাদের কথা কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

> "আর তারা বলে, এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩১)

এই দুই জনপদ হলো মক্কা আর তাইফ। আর অবশিষ্ট এই বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল হাওয়াযিন, সাকিফ এবং আরও কিছু গোত্র। এরা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সাকিফ গোত্র তাইফে বসবাস করতো। এটি ছিল হাওয়াযিনের একটি শাখা। হাওয়াযিন ছিল কুরাইশের মতোই অন্য অনেকগুলো উপগোত্রের মূল গোত্র। হাওয়াযিনরা কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেই জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই। এই দ্বন্দ্ব ছিল পুরোপুরি গোত্রীয় চেতনা থেকে উদ্ভূত। আল্লাহর রাসূলের ﷺ মক্কা বিজয়ে হাওয়াযিনরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা তাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। কুরাইশ বংশের কেউ এসে তাদের ওপর ক্ষমতাবান হয়ে যাবে, এটা তারা মানতে পারছিল না। তারা স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূলের পরবর্তী লক্ষ্য তাইফ। ভূ-রাজনৈতিক বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তাইফ ছিল মক্কার নিকটবর্তী সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাইফে এর আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাজেভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের আচরণ তৎকালীন জাহিলিয়াতের মানদণ্ডেও প্রচণ্ড আপত্তিকর ছিল। আরবদের মধ্যে সহজাত যে ঔদার্য আর মেহমানদারিতার প্রচলন ছিল, তার ছিটেফোঁটাও তারা দেখায়নি। যখন মানুষকে মিথ্যা মাবূদদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দিকে আহবান করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, স্বজাত্যবোধ গৌণ হয়ে যায়। তাওহীদ আর শিরকের দ্বন্দ্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই চিরন্তন বাস্তবতা।

তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলিমরা আক্রমণ করার আগে তারাই মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবে। মালিক ইবন আউফ আল-নাসরির নেতৃত্বে হাওয়াযিন, সাক্বিফ, বনু হিলাল, বনু সাদ ইবন আবি বকরসহ বেশ কিছু গোত্র এক হলো। তবে কা'ব এবং কিলাব গোত্র তার ডাকে সাড়া দেয়নি। মালিক ইবন আউফ প্রায় বিশ হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই সৈন্যসমাবেশের

খবর শুনতে পেয়ে বারো হাজার সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে মক্কার বাইরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই বারো হাজারের মধ্যে দশ হাজার সৈনিক মক্কা বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। আর এরপর আত-তুলাকা থেকে আরও দুই হাজার সৈন্য যোগদান করে। মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও মুক্তিপ্রাপ্তদের আত-তুলাকা বলা হতো। অর্থাৎ, যেসব মক্কাবাসী মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম হয়ে যায় তারা হলো আত-তুলাকা। এই অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন আত্তাব ইবন উসাইদ ﵁।

# দুই শিবিরে যুদ্ধের প্রস্তুতি

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল আগের চাইতে বেশি। তাই কিছু সাহাবি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলতে লাগলেন,

*'সৈন্য সংখ্যার কমতির জন্য আজ আমরা পরাজিত হবো না, আমাদের সেনাসংখ্যা আজ অনেক!'*

শত্রুপক্ষে একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ লোক ছিল। তার নাম দুরাইদ ইবন আস-সিম্মাহ। হাওয়াযিনদের মাঝে সে অনেক বিখ্যাত ছিল। বলা চলে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। তার খ্যাতির কারণ বহুবিধ। সে ছিল সাহসী, নির্ভীক যোদ্ধা, দক্ষ রণকুশলী এবং বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই এ যুদ্ধে সে ছিল একজন উপদেষ্টা। মালিক ইবন আউফ ছিল এই যুদ্ধের কমান্ডার।

উট থেকে নেমে দুরাইদ জিজ্ঞেস করলো,

- আমরা কোথায় আছি এখন?

- এটা হলো আওতাস, কেউ একজন জবাব দিল।

- বাহ! অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য বেশ ভালো জায়গা। পাথুরেও নয়, আবার নরম মাটিও নয়। আচ্ছা, এতসব হট্টগোল কীসের? মনে হচ্ছে যেন উটের চলার আওয়াজ! গাধার বিকট চিৎকার! শিশুদের কান্না! ছাগলের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ! ঘটনা কী বলো তো?

- মালিক ইবন আউফ তার বাহিনীর সাথে তাদের ধন-সম্পদ আর পরিবার-পরিজনকেও সাথে এনেছে। এগুলো পেছনের সেই কাফেলারই আওয়াজ।

- কোথায় সে?

মালিক ইবন আউফকে ডেকে আনা হলো। দুরাইদ তাকে প্রশ্ন করলো,

- মালিক ইবন আউফ! তুমি আজ তোমার গোত্রের নেতা। আজকের দিনে তুমি যা

সিদ্ধান্ত নেবে, অনাগত ভবিষ্যতের ওপরে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। এই যে আমি উটের শব্দ, গাধার বিকট চিৎকার, শিশুদের কান্না আর ছাগলের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কাহিনীটা কী বলতো?

- আমি আমার লোকজনের ধন-সম্পদ আর স্ত্রী-পুত্রকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।

- এই কাজটা তুমি কেন করলে?

- তাহলে প্রত্যেক সৈনিকের পেছনে তাদের পরিবার আর ধনসম্পদ থাকবে। তাদের মায়ায়, তাদের বাঁচাবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করবে।

- ভেড়ার রাখাল কোথাকার! যদি যোদ্ধারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে আটকাবার সাধ্য কার আছে! যুদ্ধ যদি তোমার অনুকূলে যায় তাহলে তো ঐ তলোয়ার আর বল্লমধারী লোকগুলোই তোমার কাজে আসবে। আর যদি প্রতিকূলে যায়, তাহলে তোমার স্ত্রী-পুত্র আর ধন-সম্পদ তোমার বাড়তি ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দুরাইদ এরপর জিজ্ঞেস করলো,

- আচ্ছা, ভালো কথা, কা'ব আর কিলাব -- এ গোত্র দুটো কোথায়? ওদের দেখছি না যে?

- তারা যুদ্ধে আসেনি, লোকেরা উত্তর দিল।

- তাহলে ক্ষীপ্রতা আর বীরত্ব দেখাবে কারা! এই যুদ্ধ যদি মর্যাদার কিছু হতো, তাহলে ওরা এই যুদ্ধে অবশ্যই আসতো। তোমরাও যদি ওদের মতো আজ বিরত থাকতে, কতই না ভালো হতো! ওরা যদি না এসে থাকে, তাহলে এই যুদ্ধে এসেছে কারা?

- এসেছে আমর ইবন আমীর আর আওফ ইবন আমীর।

- এরা আসলেও কী আর না-আসলেও কী! না পারবে উপকার করতে, না পারবে ক্ষতি করতে!

মালিক ইবন আউফের যুদ্ধের প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা দেখে দুরাইদ যারপরনাই হতাশ। তার কাছে মনে হচ্ছিল এই যুদ্ধে যাওয়াটা একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তবু সে মালিককে উপদেশ দিল,

- শোনো মালিক, হাওয়াযিনের দলকে অশ্বারোহীদের সামনে রেখো না। এদের পেছনে পাঠিয়ে দাও। শুধু অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে সাবিঈদের (মুসলিমদের) মোকাবেলা করো। যদি যুদ্ধ তোমার অনুকূলে যায়, তাহলে পেছনের লোকেরা তোমাদের সাথে মিলিত হবে। আর যদি প্রতিকূলে যায়, তাহলে অন্তত তোমার পরিবার আর ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে।

মালিক ইবন আউফ এই উপদেশ কানেই তুললো না, উল্টো বললো, 'আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন করবো না। তুমি বুড়িয়ে গেছো, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনাও বুড়িয়ে গেছে। হাওয়াযিনদের উদ্দেশ্যে বলছি, হয় তোমরা আমার আনুগত্য করবে অথবা আমি এই তরবারির ওপর ভরসা করবো। যোদ্ধারা, যখন তোমরা শত্রুদের দেখবে, তরবারি কোষমুক্ত করে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

মালিক ইবন আউফ আসলে চাচ্ছিল না এই যুদ্ধে দুরাইদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকুক। কারণ সে এই যুদ্ধের কৃতিত্ব পুরোটাই নিজের ঘাড়ে নিতে চাচ্ছিল। দুরাইদ মন খারাপ করে বললো, 'না পারলাম এই যুদ্ধে শামিল হতে, না পারলাম এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে।' এই আলোচনা থেকে নবীন আর প্রবীণের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। দুরাইদের মতো অভিজ্ঞতা আর বিচক্ষণতা মালিক ইবন আউফের ছিল না। সে ছিল কিছুটা হুজুগে প্রকৃতির। নিজের নাম কামানোর জন্য বিশাল এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে সে দ্বিধা করছে না। যুদ্ধের ময়দানে অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শুধু উৎসাহ-উদ্দীপনা আর আবেগ যথেষ্ট নয়।

## তথ্য ও অস্ত্র সংগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রু পক্ষের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আবদুল্লাহ ইবন আবি হাদরাদকে ؓ পাঠালেন। আবদুল্লাহ ইবন আবি হাদরাদ ؓ সফলভাবে শত্রুসেনার সংখ্যা এবং তাদের পরিবার ও সম্পদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। কিন্তু উমার ইবন খাত্তাব তার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তার দেওয়া তথ্যকে নাকচ করে দিলেন। আবদুল্লাহ পাল্টা জবাব দিলেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আপনি নিজেই একসময় সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করেছেন। আমার চাইতেও শতগুণ পবিত্র সত্তা আল্লাহর রাসূলকে আপনি অস্বীকার করেছিলেন!' উমার ؓ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুনেছেন সে কী বলছে!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হেসে উমারকে ؓ বললেন, 'তুমি যে পথহারা ছিলে তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই উমার। এরপর আল্লাহ তোমাকে সত্য পথে পরিচালিত করেছেন।'

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অতিরিক্ত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন মেটাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে কথা বলেন। সাফওয়ান তখনো মুশরিক। কুরাইশ নেতা হিসেবে তার ভালোই সম্পদ ছিল। অনেক অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে বর্শা আর ঢাল ধার হিসেবে চাইলেন। সাফওয়ান রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেই জোর করে অস্ত্রগুলো নিতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি করেননি। অস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হলে দেখা গেল কিছু অস্ত্র হারিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সে সবের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সাফওয়ান রাজি হলো না। ততদিনে তার মন পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সামনে আসবে।

# ময়দানে মুখোমুখি দুই দল

সেদিনের আবহাওয়া ছিল খুবই উত্তপ্ত আর শুষ্ক। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হলো। তারা হুনাইনের উপত্যকা ধরে এগোতে লাগলেন। পাহাড় দিয়ে সোজা সামনে এগোনোর সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে চারদিক থেকে শুরু হলো তীরবৃষ্টি। এরপর হাওয়াযিনের অশ্বারোহীরা মুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। উপর্যুপরি অতর্কিত হামলায় মুসলিম সেনারা পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দিশেহারা মুসলিম সেনারা হতভম্ব হয়ে চারপাশে পালাতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মালিক ইবন আউফের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

তার পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি গিরিপথ, গোপন আর সংকীর্ণ স্থানে ওঁৎ পেতে থাকা আর মুসলিম বাহিনী সেই গিরিপথে এলেই তাদের ওপর আচমকা আক্রমণ করা। আক্রমণ পরিচালিত হবে দুটি ফ্রন্টে -- পাহাড়ের দুই পাশ থেকে তীর ছোঁড়া হবে আর এরপর মূল সেনাবাহিনী মুসলিমদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানবে। মুসলিমদের ধারণাই ছিল না হাওয়াযিনের সৈনিকরা এভাবে লুকিয়ে আছে। হাওয়াযিনের বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল। প্রথমে ছিল সওয়ারীদের সারি, তারপর পদাতিক সৈনিকদের সারি, তারপর মহিলাদের সারি, তার পেছনে ছিল পশুপাল। তাদের দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। তার ওপর অশ্বারোহী হাওয়াযিন সেনারা মুসলিমদের ওপর কঠিন হামলা চালায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর সামনের দিকে ছিল বনু সুলাইম গোত্রের সেনাদল। আকস্মিক হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা সামাল দিতে না পেরে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো শুরু করল। তাদের পেছনে ছিল আত-তুলাকা। তারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারাও যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছু হটতে লাগলো। উটগুলো পালাতে গিয়ে একটার পর আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই হামলা এতটাই আচমকা আর তীব্র ছিল যে মুসলিমদের সেরা পদাতিক সৈন্য সালামা ইবন আল-আকওয়াও ﵁ ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় সবাই উধাও হয়ে গেল। ময়দানে টিকে থাকলেন অল্প কিছু মানুষ। আল্লাহর রাসূল ﷺ, কিছু মুহাজির, আনসার এবং আহলে বাইতের লোকেরা।

> "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

মুসলিম বাহিনীর এই বিপর্যয়ে দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা যেন প্রায় ঈমানহারা হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান ﵁ এই অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, 'এরা তো পালাতে পালাতে সমুদ্রের পাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে!' সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার ভাই বলে ওঠে, 'জাদুর কেরামতি আজ শেষ! মুহাম্মদের জাদু আর কাজ করছে না!' এ কথা শুনে সাফওয়ান

ইবন উমাইয়্যা ক্ষেপে গেল, 'থাম তুই! আল্লাহ তোর মুখ ভেঙে দিক! আল্লাহর কসম, আমি একজন কুরাইশের কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু কোনো হাওয়াযিনের কর্তৃত্ব মানতে রাজি নই!'

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিচলভাবে ময়দানে দাঁড়িয়ে। তিনি সবাইকে ডাকছেন আর বলছেন, 'লোকেরা তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো, আমি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল!'

কিন্তু কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। সবাই শত্রুদের আক্রমণের ধাক্কায় পড়িমড়ি করে ছুটছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তবু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে 'আমি আল্লাহর নবী! আমি মিথ্যাবাদী নই! আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!' এ সময়টাতে তাঁর সাথে ছিলেন চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিস ﷺ এবং অল্প কিছু মুহাজির ও কুরাইশ। আল্লাহর রাসূল আব্বাসকে বললেন, 'আব্বাস, সামূরার লোকদের ডাক দাও!' সামূরাহ হচ্ছে বাইয়াতুর রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবিদের দল । আব্বাস চিৎকার করে বাইয়াতুর রিদওয়ানের সাহাবিদের ডাকলেন - সেরা সব সাহাবি। তার আহবানের সাথে সাথে তারা যেন তীরের বেগে ময়দানে ফিরে এল। আর বলতে লাগলেন, 'আমরা এসেছি! আমরা এসেছি!'

এরপর বিশেষভাবে আনসারদের আহবান করা হলো। এরপর বিশেষভাবে ডাকা হলো খাযরাজদের। ডাকা হলো হলো একে একে সবগুলো গোত্রকে। মুসলিমদের অনেকেই প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ময়দানে ফিরে এল। রাসূলুল্লাহর চারপাশে জড়ো হলেন প্রায় একশো সাহাবি। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবার ময়দানের দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'এবার ঠিকই জ্বলেছে যুদ্ধের অগ্নিশিখা!'

আল্লাহর রাসূল এক মুঠো ধুলো তুলে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের শপথ! তোরা ধ্বংস হ!' এই ধুলো শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকের চোখে গিয়ে পড়ে। এর পর তীরন্দাজরা আর মুসলিমদের ওপর তীর ছুঁড়তেই পারেনি। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা। এরপরই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে লাগলো।

> "তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল।"
> (সূরা তাওবা, ৯: ২৬)

আল্লাহর এই সৈন্য ছিল ফেরেশতা। জুবাইর ইবন মুতইম বলেন, 'আমরা আকাশে কালো মেঘ দেখতে পেলাম। এরপর যখন তা মাটিতে নেমে এল, আমরা দেখলাম অগণিত পিপড়া! এ যেন পিপড়ার গালিচা! আর আমরা মনে করলাম এটাই হলো আল্লাহর সৈন্য।' আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মুশরিকদের ওপর ধুলো নিক্ষেপ

করেছিলেন, তা তাদের অন্তরে প্রবল ত্রাস আর আতঙ্কের জন্ম দেয়। আর মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ঢেলে দিলেন প্রশান্তি বা সাকিনাহ্। বদরের যুদ্ধেও এমনটা হয়েছিল। আল্লাহ্ যদি চান, যুদ্ধক্ষেত্রের অস্থির পরিস্থিতিতেও তাঁর বান্দাদের মনে প্রশান্তি ঢেলে দিতে পারেন। এই প্রশান্তি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সাহায্য।

এই সাহায্য আসার পরেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যায়। মুসলিমরা ময়দানে ফিরে আসলে হাওয়াযিনরা আর কোনো পাল্টা আক্রমণ করা দূরে থাক, কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। বরং তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সম্ভবত এর কারণ হলো অনভিজ্ঞ মালিক ইবন আউফের আর কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। একটিমাত্র কৌশলকে পুঁজি করে তার বাহিনী এই যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রাথমিকভাবে তাদের এই কৌশল কাজে লাগলেও যখন মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়ালো, তখন তাদের কৌশলগত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে তারা হেরে যেতে থাকে।

যে অল্প কয়েকজন সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উমার ইবন খাত্তাব, আলী ইবন আবি তালিব, আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ﵃, তাঁর ছেলে ফাযল ইবন আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ﵁, রাবিয়া ইবন হারিস, উম্ম আয়মানের ছেলে আয়মান ইবন আবদুল্লাহ ﵃ প্রমুখ।

## হুনাইনের যুদ্ধে কিছু ঘটনা

### ১) আবু কাতাদার ﵁ ঘটনা

ঘটনাটি আবু কাতাদা ﵁ নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'হুনাইনের দিনে আমি দেখলাম দুই সৈনিক লড়াই করছে। একজন মুসলিম, একজন মুশরিক। সেই লড়াইয়ে আরেক মুশরিক তার মুশরিক বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য যোগ দিল। এই দৃশ্য দেখে আমি ছুটে গিয়ে তার হাত কেটে ফেললাম। তখন সে তার আরেক হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরে। আল্লাহর কসম! সে এত জোরে আমার গলা চেপে ধরে যে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবার মতো অবস্থা! কিন্তু সে একসময় (রক্তক্ষরণের কারণে) সে ধপ করে পড়ে গেল। তখন আমি তাকে আরেকবার আঘাত করে হত্যা করলাম। আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমার জন্য সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় মক্কার কেউ এসে তার জিনিসপত্র তুলে নিল। যুদ্ধ যখন পুরোপুরি শেষ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে যে যাকে হত্যা করবে, সে-ই হবে তার জিনিসপত্রের মালিক।

তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এক লোককে হত্যা করেছি। তার অনেক জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু আমি তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই কে তার জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়েছে তা বলতে পারবো না। তখন মক্কার সেই লোক এসে বললো, সে সত্য বলেছে রাসূলুল্লাহ। আমি-ই সেই জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি। আপনি জিনিসগুলো

আমাকে দিয়ে দিন। এ কথা শুনে আবু বকর ﷺ গর্জে উঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না! আল্লাহর পথে লড়াই করা সিংহের সম্পদে তুমি ভাগ বসাতে চাও! কক্ষণো না! তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। ওর প্রাপ্য জিনিস ওকে ফিরিয়ে দাও।

এরপর আমি সাথে সাথে তার কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নিলাম। এরপর সেটা বিক্রি করে খেজুর বাগান কিনলাম। সেটাই ছিল আমার মালিকানাধীন প্রথম সম্পত্তি।'

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে, তবে ঐ কাফিরের সাথে যা কিছু (ময়দানে) ছিল, সেগুলো সেই মুসলিম লাভ করবে।

## ২) উম্ম সুলাইমের সাহসিকতা ﷺ

উম্ম সুলাইম ﷺ ছিলেন আনসারী সাহাবি আবু তালহার ﷺ স্ত্রী। যুদ্ধের ময়দানে উম্মু সুলাইমকে দেখা গেল একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী আবু তালহা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' উম্ম সুলাইম উত্তর দিলেন, 'কোনো কাফির আমার কাছ দিয়ে গেলে আমি তার পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলব!' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন। উম্ম সুলাইম এরপর বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া তুলাকাদের আমি হত্যা করবো!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে শান্ত করে বললেন, 'মহান আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অর্থাৎ, তুমি চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন, তাদের হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হুনাইনের এই যুদ্ধের সময় উম্ম সুলাইম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তালহা তখন তার গর্ভে। দুঃখজনক বিষয় হলো, উম্মাহর স্বর্ণযুগে মুসলিম নারীরা যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, বর্তমান সময়ের মুসলিমরা পুরুষরাও সে ধরনের সাহস রাখে না।

## ৩) এক নারী হত্যার ঘটনা

যুদ্ধের পর দেখা গেল এক দল লোক জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হচ্ছে এখানে?' জবাব এল, 'এই মহিলাকে খালিদ ইবন ওয়ালিদ হত্যা করেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'এই মহিলা যোদ্ধাদের কেউ নয়। সে তো যুদ্ধ করেনি।' এরপর তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদকে নির্দেশনা দিয়ে পাঠালেন, যেন নারী এবং শিশুদের হত্যা করা না হয়। এই নির্দেশনা ইচ্ছাকৃত হামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## ৪) দুরাইদ ইবন আস-সিমার মৃত্যু

রাবিয়া ইবন রুফাই নামে একজন মুসলিম দুরাইদকে পালাবার সময় ধরে ফেললেন।

একটা উটের ওপর পালকির ভেতরে তাকে পাওয়া যায়। এসব পালকিতে সাধারণত মহিলারা থাকতো। তিনি দুরাইদকে টেনে বের করে আনেন। দুরাইদ জিজ্ঞেস করলো,

- কী চাস তুই?

- আমি তোকে হত্যা করবো, রাবিয়া উত্তর দিলেন।

- কে তুই?

- আমি রাবিয়া ।

এই বলে তিনি তরবারি দিয়ে দুরাইদকে আঘাত করলেন। আঘাতটা তেমন মারাত্মক ছিল না। তাই দেখে দুরাইদ বললো,

- তোর মা মনে হয় তোকে শেখায়নি কীভাবে তলোয়ার চালাতে হয়! তুই যা, ঐ জিন থেকে আমার তরবারি নিয়ে এসে আমাকে আঘাত কর। ঠিক এখানে, এই আমার শিরদাঁড়ার ওপর খুলির নিচে মারবি। আমি এভাবেই মানুষ মারতাম। এরপর যখন তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যাবি, বলবি, আমি দুরাইদ ইবন আস-সিমাহকে হত্যা করেছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোদের মায়েদেরকে আমি বহুবার যুদ্ধে বাঁচিয়েছি।

দুরাইদ রাবিয়াকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলার কারণ হলো, রাবিয়া নিজেও হাওয়াযিন গোত্রের সন্তান ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো তিনি ছিলেন মুসলিম আর দুরাইদ কাফির। যা-ই হোক, রাবিয়া এরপর তাকে দুরাইদের কথামতোই আঘাত করলেন। দুরাইদ মারা গেল।

দুরাইদ কেন এমন আচরণ করলো? এ ধরনের আচরণ আমাদের কিছুটা অবাক করতে পারে। তবে এটা ছিল সেই গোত্রীয় যুগের বাস্তবতা। দুরাইদের এ আচরণ এক প্রকারের ঔদ্ধত্য, গোত্রীয় ঔদ্ধত্য। দুরাইদের মতো লোকদের কাছে গোত্রের সম্মান আর গৌরবই ছিল সব। গোত্রের জন্য জীবন, গোত্রের জন্য মরণ। তাই মৃত্যুর আগেও সে বলছিল, আমার মতো লোককে মারতে পারাটা তোমার জন্য এক বিশাল ব্যাপার।

কার তাক্বদীরে কী আছে তা একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল ছাড়া কেউই জানে না। কাজেই মুসলিমদের উচিত নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে তুষ্ট না হয়ে পড়া, আল্লাহর কাছে সবসময় দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য সাহায্য চাওয়া। যে আবু তালিব সারা জীবন আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আগলে রেখেছেন, সে-ই আবু তালিব কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবু সুফিয়ান শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে। হুনাইনের যুদ্ধে, হাওয়াযিন গোত্রের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল মালিক ইবন আউফ একাই। সে অভিজ্ঞ দুরাইদের মতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজের অপরিণত সিদ্ধান্তের উপর অটল ছিল। কিন্তু এই মালিক ইবন আউফ শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে যায় আর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা দুরাইদ ইবন আস-সিমাহ কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

### ৫) আনাস ইবন আবি মারসাদের ﷺ কাহিনী

হুনাইনের যুদ্ধের আগের রাতের কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা পাহারা দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজছিলেন। আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাহারা দেওয়ার জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'তোমার অংশ থেকে যেন কোনো আক্রমণ না আসে, সেটা দেখার দায়িত্ব তোমার।' আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ তার বাহনে করে পাহাড়ের পাশ ধরে পাহারার স্থানে চলে গেলেন। পরদিন ভোরবেলা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তোমাদের সওয়ারীকে দেখেছো?' সাহাবিরা বললেন আনাস ইবন আবি মারসাদ এখনো ফিরে আসেননি। ফজরের সালাত শেষ হওয়ার পর দেখা গেল আনাস পাহাড় থেকে নেমে আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সালাত আদায় আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমার জায়গা থেকে নড়িনি।' আল্লাহর রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন। তাকে বললেন, 'তুমি তো জান্নাতকে নিজের জন্য অবধারিত করে ফেলেছো! আজকের পর আর কোনো (অতিরিক্ত) ভালো কাজ না করলেও তোমরা চলবে।'[110]

এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে "মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধক্ষেত্রে পাহারা দেওয়ার ফযিলত" শিরোনামে। আনাস ইবন আবি মারসাদ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এজন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটা বলে দেয় যে, আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া কত বড় একটি ইবাদাত। এই ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষা হলো, প্রত্যেক সাহাবিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ আলাদা আলাদাভাবে কদর করতেন। ফজরের সালাতের সময়ে তিনি আনাসের ﷺ খোঁজ নিয়েছেন। ফিরে এসেছেন কি না জানতে চেয়েছেন এবং সবশেষে তার গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য তাকে আখিরাতে পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন।

### ৬) রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ বোন শায়মার ﷺ কাহিনী

আশ-শায়মা বিনত আল-হারিস ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ মা হালিমা আস-সাদিয়্যার কন্যা। সে হিসেবে শায়মা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের দুধ বোন। বনু সাদ ইবন বকর হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। শায়মা ছিলেন সেই গোত্রের। যুদ্ধের পর তিনি বন্দী হলেন। তাকে বাজারে নেওয়ার পথে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জানো না আমি তোমাদের সাথীর (আল্লাহর রাসূলের) দুধবোন?' সাহাবিরা ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না শায়মা সত্য বলছেন কি না। তাই তারা শায়মাকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে গেলেন ।

স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর রাসূল নিজেও শায়মাকে ﷺ চিনতে পারছিলেন না। কারণ শায়মার সাথে তিনি একসাথে বড় হয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি শায়মাকে তার দাবি প্রমাণ করতে বললেন। শায়মা বললেন, 'তুমি যখন ছোট ছিলে, একবার

---

[110] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫।

আমি তোমাকে কোলে নিয়েছিলাম আর তুমি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলে। সেই দাগ এখনো আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নিশ্চিত হলেন এটা আসলেই তার বোন। তিনি দুধবোনের সম্মানে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন, শায়মাকে সেখানে বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'তুমি চাইলে ইসলাম গ্রহণ করে এখানে থেকে যেতে পারো। তাহলে অনেক আদর আর ভালোবাসা পাবে। অথবা তুমি চাইলে তোমরা গোত্রের কাছেও ফিরে যেতে পারো।' শায়মা নিজ গোত্রের কাছেই ফিরে যেতে চাইলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দুধবোনকে একজন দাসী, তিনজন দাস এবং বেশকিছু উট আর ভেড়া উপহার দিলেন। শায়মা ؓ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি তার গোত্রের সাথেই থেকে যান।

# তাইফের অবরোধ

যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে হাওয়াযিনের সৈন্যরা তাইফে পালিয়ে যায়। তাদের কেউ চলে যায় নাখলায়, কেউ চলে যায় আওতাসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এদের ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিকে পাঠান। মূল অংশ রওনা হয় তাইফের উদ্দেশ্যে। মালিক ইবন আউফ আন নাসরি তার সৈনিকদেরসহ সেখানে আশ্রয় নিয়ে তাইফের দুর্গগুলোর প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। আরেকটি দল অগ্রসর হয় আওতাসের দিকে। সে দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু মূসা আল আশআরীর চাচা আবু আমীর আল আশআরী ؓ। এগুলো ছিল একেকটি সারিয়াহ।

আওতাসে অভিযানের এক পর্যায়ে আবু আমীর হাঁটুতে আঘাত পান। ভাতিজা আবু মূসা আল আশআরী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাচাজান! কে আপনার ওপর তীর ছুঁড়েছে?' আবু আমীর ইশারার মাধ্যমে এক লোককে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ লোকটা আমার দিকে তীর মেরেছে।' আবু মূসা তার পিছু নিলেন। আবু মূসাকে দেখে সে লোকটা পালাতে লাগলো। আবু মূসা তাকে বলছিলেন, 'লজ্জা হয় না তোর? তুই কি লড়বি না? পালাবি নাকি? তোর মধ্যে কি পুরুষত্ব নেই?' কথাগুলো তার খুব গায়ে লাগলো। সে লড়াই করার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। আবু মূসা লড়াইয়ে তাকে হারিয়ে দিলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এরপর আবু মূসা ؓ তার চাচার দিকে ফিরে বললেন, 'চাচাজান! আমি আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছি।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে তীরটা বের করে দাও।'

তীরটি বের করা হলো কিন্তু রক্তক্ষরণ বেড়ে গেল। আবু আমীরের মনে হলো তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না। আবু মূসাকে বললেন, 'ভাতিজা, তুমি নবীজিকে আমার সালাম জানাবে আর আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে বলবে।' আবু মূসা আল আশআরী ؓ রাসূলুল্লাহর কাছে পুরো ঘটনাটি বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন। তারপর দু'হাত উঁচু করে দুআ করলেন,

*'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমীরকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমীরের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। ক্বিয়ামত দিবসে তোমার মাখলুকের মধ্যে অনেক মানুষের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করো।'*

এটা ছিল একজন শহীদ মুজাহিদের জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ। এই দুআ শুনে আবু মূসা আল-আশআরী ؓ অভিভূত হয়ে যান। তিনি আল্লাহর রাসূলকে তার নিজের জন্যও দুআ করার অনুরোধ করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন আবু মূসার জন্য দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের (আবু মূসা) গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও।'

আবু আমীরের জন্য আল্লাহর রাসূল যে দুআটি করেছিলেন সেই দুআ একজন মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তা হলো ক্বিয়ামত দিবসে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা। বেশিরভাগ মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিচার দিবসের কথা ভুলে যায় আর দুনিয়ায় নিজের অবস্থান পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সেই বেদুইনের দুআটি উল্লেখ না করলেই না নয়। এই দুআটি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ খুব পছন্দ করেছিলেন। দুআটি হলো,

*'ইয়া আল্লাহ! আমার জীবনের উত্তম অংশটি যেন জীবনের শেষ অংশ হয়। আমার শেষ আমলটি যেন আমার জীবনের সর্বোত্তম আমল হয়। আর আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন যেন আপনার সাথে আমার দেখা হওয়ার দিনটি হয়।'*

মূল বাহিনী অগ্রসর হয় তাইফের দিকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাইফ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই অবরোধে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'মিনযানিক' নিক্ষেপ করা হয়। এই মিনযানিক ছিল এক প্রকারের গুলতি। এটি দিয়ে তাইফের দেওয়ালে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। এই গুলতি যখন আঘাত হানতো, তখন সেটা দুর্গের ভেতর ঠিক কোথায় আঘাত হানছে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। তখনকার দুর্গগুলো ছিল বিশাল। দুর্গের দেওয়ালের ভেতরে পুরো একটা শহর। কাজেই এই গুলতিগুলো শহরের ভেতরে বাজার, রাস্তা কিংবা ঘর-বাড়ি যে কোনো স্থানে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল।

এই ধরনের হামলার কারণে 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' বা অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন, এই ধরনের হামলায় নিক্ষিপ্ত গোলা নারী ও শিশুদের ওপর আঘাত হানতে পারে। যদিও তাদের হত্যা করা নিক্ষেপকারীর লক্ষ্য ছিল না। কারণ এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ঠিক কোথায় গিয়ে আঘাত হানবে এটা জানা সম্ভব হয় না। এটা ঠিক তীরের মতো নয় যেখানে তীর কোন লক্ষ্যে আঘাত হানবে সেটা তীরন্দাজ জানে। নির্বিচারে গোলা নিক্ষেপের এই পদ্ধতি বায়াত নামে পরিচিত। তাইফে যখন রাতের অন্ধকারে বায়াত হামলা করা হচ্ছিল, তখন মুশরিকদের নারী ও

শিশুরা মারা পড়ছিল।[111] তখন আল্লাহর রাসূলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, 'তারা তাদের মধ্য থেকেই।'[112] অর্থাৎ, এই ব্যাপারে মুশরিক নারী ও শিশুদের ব্যাপারে হুকুম পুরুষদের মতোই প্রযোজ্য হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করে জিহাদে কাফির নারী ও শিশু হত্যা করা যাবে না, এটাই সাধারণ হুকুম।

## অবরোধ প্রত্যাহার

এই ধরনের হামলা চালানো সত্ত্বেও তাইফবাসী হাল ছেড়ে দেয়নি। তাদের তীরন্দাজরা দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল আর তাদের তীরের আঘাতে অনেক মুসলিম আহত হচ্ছিলেন। তাই মুসলিম বাহিনীকে তীরের সীমা থেকে বের হয়ে পেছনে চলে আসতে হয়। সাহাবিরা ﷺ এই অবরোধে 'দাব্বাবাহ' ব্যবহার করলেন। এটা ছিল একটা কাঠের তৈরি কাঠামো। এর ভিতরে কয়েকজন সাহাবি ﷺ প্রবেশ করতেন। এটা তীরের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিত। এটাকে ব্যবহার করে তারা দেওয়ালের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাইফবাসী দাব্বাবার বিরুদ্ধে অপর একটি অস্ত্র ব্যবহার করল। তারা আগুনে উত্তপ্ত করা কাঁটাযুক্ত লোহার টুকরা দাব্বাবার দিকে ছুঁড়ে দেয় ফলে দাব্বাবার ভেতর থেকে সাহাবিরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হন। দাব্বাবাহ অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাইফবাসীর ওপর আরও চাপ প্রয়োগ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুরের গাছগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। এই কৌশলে কাজ হয়। তাইফের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই গাছগুলো ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। তখন তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করে যেন তিনি তাদের গাছ পোড়ানো বন্ধ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের অনুরোধ রাখেন।

শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য নবীজি ﷺ আরও একটি কাজ করেন। তিনি তাইফের দাসদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন, যদি তারা দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে, তাহলে তাদের স্বাধীন করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা শুনে তেইশ জন দাস বের হয়ে আসে। তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অবরোধ পনেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো। কিন্তু তাইফের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নাওফাল ইবন মুওয়াবিয়াহ আদ-দাইলির সাথে পরামর্শ করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অবরোধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তোমার মতামত কী?' নাওফাল বললেন, 'এদের অবস্থা এখন গর্তে লুকিয়ে থাকা শিয়ালের মতো। আপনি যদি অবরোধ চালিয়ে যান, আজ হোক, কাল হোক, আপনি জয়ী হবেন। তবে তাদের ছেড়ে দিলেও তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' কারণ, তাইফের চারপাশে প্রায় সবগোত্র ততদিনে ইসলাম

---

[111] ইবন মাজাহ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৯৪৭ (আরবি রেফারেন্স)।

[112] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস, ৩০,৩১।

গ্রহণ করে ফেলেছে। তাই তাইফ মুসলিমদের জন্য আর কোনো হুমকি নয়। নবীজি তার উপদেশ গ্রহণ করলেন। উমারকে ﷺ বললেন যেন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা ফিরে যাবেন।

এই ঘোষণা সাহাবিদের অনেকের মনঃপূত হলো না। তারা তাইফ জয় না করে ফিরে যাবেন এটা মানতে পারছিলেন না। তারা বললো, 'রাসূলুল্লাহ! আমরা বিজয় ছাড়াই ফিরে যাবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' পরদিন তারা লড়াইয়ের জন্য বের হলেন। বেশ কিছু সাহাবি আহত হলেন। তারা বুঝতে পারলেন এই দুর্গ ভেদ করা সহজ হবে না, যেমনটা তারা ভেবেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন আবার বললেন, 'ইনশা আল্লাহ, আগামীকাল আমরা এখান থেকে ফিরে যাবো।' এবার আর সাহাবিরা প্রতিবাদ করলেন না, বরং তারা সেটাই চাচ্ছিলেন। তাদের নীরবতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই বললেন না, হাসলেন শুধু। তাইফ থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা বলো: আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং রবের প্রশংসাকারী।' সাহাবিদের কেউ বললেন, 'আপনি সাক্বিফদের বিরুদ্ধে দুআ করুন।' আল্লাহর রাসূল সাক্বিফদের বিরুদ্ধে বদদুআ না করে তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ! সাক্বিফকে পথ দেখাও, তাদের সত্যের পথে চালিত করো।' আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই দুআ কবুল হয়েছিল। হিজরী ৯ম বর্ষে তারা নিজ থেকে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাইফ ছিল আরবদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ গাযওয়া। এই যুদ্ধের পর মুসলিমদের সামনে নতুন এক প্রতিপক্ষ দাঁড়ায়। রোমান সাম্রাজ্য। রোমানদের বিরুদ্ধে এর পর তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

# হুনাইনের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা

## ১) যাত-আনওয়াতের ঘটনা

অভিযানে যাওয়ার পথে মুসলিমরা একটা বিশাল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে মুশরিকরা এই গাছের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করতো এবং বরকত ও মঙ্গল লাভের আশায় তাদের তরবারি এই গাছে ঝুলিয়ে রাখত। এই অভিযানে মুসলিম সেনাবাহিনীতে অনেক নতুন মুসলিম ছিল। সবার তাওহীদের সঠিক বুঝ ছিল না। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদেরকেও এরকম একটি গাছ নির্ধারণ করে দিন যেমনটা মুশরিকদের আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'আল্লাহু আকবার! তোমরা এমন এক কথা বলেছো যা মূসার জাতি মূসাকে বলেছিল! তারা বলেছিল, হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। সে বলেছিল, তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই তোমরাও আগের জাতিগুলোকে একে একে অনুসরণ করবে।'*

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মতো এই উম্মতের মধ্যেও কিছু লোক কাফিরদের অনুসরণ করবে। তবে পার্থক্য হলো বনী ইসরাঈল জাতির পথভ্রষ্টতা ছিল ব্যাপক। তাদের ভালোর চাইতে খারাপটাই ছিল প্রকট। একারণে তাদের পুরো দ্বীনই একসময় বিকৃত হয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু নবী মুহাম্মাদের ﷺ উম্মতে সবসময় কিছু হক্বপন্থী বান্দা থাকবে। তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং দ্বীনের ওপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অটল ও অবিচল থাকবে।

এই ঘটনা থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ আক্বীদাহ জিহাদে অংশ নেওয়ার পূর্বশর্ত নয়। এখানে নও মুসলিমরা খুবই অদ্ভুত এবং অগ্রহণযোগ্য একটা আবদার করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সেজন্য বের করে দেননি, বরং তিনি তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তারা ছিল নওমুসলিম, তাদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ছিল। কিন্তু একারণে তাদের জিহাদে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়নি। কারণ জিহাদ একটা ইবাদাত, এর জন্য পুরস্কার আছে। আর জিহাদ শুধু যুদ্ধ করাই নয়, বরং তারবিয়াহ চর্চার জন্য একটি উপযুক্ত স্থানও হলো জিহাদ। এর মাধ্যমেও ইলম অর্জন, আত্মশুদ্ধির চর্চা হয়।

### ২) সংখ্যা বা শক্তি নয়, ভরসা কেবল আল্লাহর ওপর

> "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

যদি মুসলিমরা মনে করে যে, সংখ্যাধিক্য তাদের বিজয় এনে দেবে, সামরিক শক্তি আর প্রযুক্তি তাদের বিজয় এনে দেবে, যদি তারা ভাবে যে, শুধু অস্ত্রের জোরে উম্মাহ বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে, তাহলে মুসলিমরা ভুলের রাজ্যে আছে। এটাই হুনাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। বিজয় আসে আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে। আর বাকি সবকিছুই উপকরণমাত্র। উপকরণ কখনো আমাদের বিজয় এনে দেয় না। এটাই হলো আল্লাহ আযযা ওয়াজালের ওপর আমাদের ঈমান, আমাদের ভরসা, আমাদের নির্ভরশীলতা।

### ৩) আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ার পুরস্কার

আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ার ফযিলতের ব্যাপারে একটি হাদীস আছে। এটি বর্ণনা করেছেন আবু নাজিহ আস-সুলামি ﷺ। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় তীর ছোঁড়ে আর সেই তীর লক্ষ্যভেদ করে, তাহলে জান্নাতে তার মর্যাদা এক স্তরে উঁচুতে উন্নীত হবে। সেদিন আমি ষোলোটা তীর ছুঁড়েছি। এর প্রত্যেকটা লক্ষ্যভেদ করেছিল। আল্লাহর রাসূলকে আমি এও বলতে

শুনেছি, যে আল্লাহর রাস্তায় একটা তীর ছোঁড়ে, সে একটি দাস আযাদ করার পুরস্কার লাভ করবে।'[113] তীরের হাদীসটি তাইফের অবরোধের সাথে সম্পর্কিত হলেও আধুনিক যুগের জিহাদে তীরের সমতুল্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## হুনাইনের গনিমত: সম্পদ নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়েছিলেন কুরাইশ আর আরব গোত্রগুলোকে। হুনাইনের গনিমতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। কেননা এই যুদ্ধে হাওয়াযিনের নেতা মালিক ইবন আউফ ও তার সৈনিকরা স্ত্রী-সন্তান, পশুপাল সবকিছু নিয়েই যুদ্ধে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ, গাতফান এবং তামিম গোত্রের নেতাদের বিপুল পরিমাণ গনিমতের সম্পদ দেন। প্রত্যেক নেতা একশোটি করে উট পায়। কুরাইশদের মধ্য থেকে আবু সুফিয়ান, সুহাইল ইবন আমর, হাকিম ইবন হিযাম, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং আল-আকরা ইবন হাবিস, উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিজারী, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান, ইয়াযিদ ইবন আবু সুফিয়ান, ক্বাস ইবন আদী প্রমুখ অনেক গনিমত পান। কেউ কেউ একশো, দুইশো এমনকি তিনশো উটও পান! বনু সুলাইম গোত্রের প্রধান আব্বাস ইবন মিরদাসকেও অনেক সম্পদ দেওয়া হয়। শুধু বাকি রইলেন আনসার সাহাবিগণ। তাঁদের রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই দিলেন না।

বিপদের সময় যে লোকগুলো পালিয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দুহাত ভরে দিলেন, অথচ যারা সামনে থেকে যুদ্ধ করেছে, তাদের হাত খালি পড়ে রইলো। স্বাভাবিকভাবেই আনসারদের কেউ কেউ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন, বিশেষ করে তরুণ আনসাররা বিষয়টা সহজভাবে নিতে পারলো না। কেউ কেউ বললো,

*'আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ ক্ষমা করুন! আমাদের তলোয়ার এখনো রক্তে ভেজা, অথচ তিনি কুরাইশদের এত কিছু দিলেন, আর আমাদের কিছুই দিলেন না!'*

আনসারদের নেতা সাদ ইবন উবাদা رضي الله عنه রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বিষয়টা খুলে বললেন। বললেন,

- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসাররা আপনার গনিমত বণ্টনে দুঃখ পেয়েছে। আপনি নিজের ক্বওম আর আরব গোত্রপ্রধানদের অনেক বেশি পরিমাণে গনিমত দিয়েছেন। কিন্তু আনসাররা তো কিছুই পেল না।

- সাদ, এই বণ্টনের ব্যাপারে তোমার কী মত?

- রাসূলুল্লাহ! আমিও তো আনসারদেরই একজন।

সাদ ইবন উবাদা رضي الله عنه এভাবে খুব আদবের সাথে নিজের অনুভূতির কথাও ব্যক্ত

---

[113] সুনান আন-নাসাঈ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৫।

করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সব আনসারদের ডাকলেন। সেই বৈঠকে অল্প কিছু মুহাজির সাহাবিও ছিলেন। বাকিদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আনসারদের একান্ত কথোপকথন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহর রাসূল তাঁর কথা শুরু করলেন,

- আনসার ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদের কাছে এমন এক অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের পথ দেখান? তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদ দিয়েছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন। বলো, এসব কি সত্য নয়?

- হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, এসবই সত্য। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনেক মেহেরবানি।

- হ্যাঁ, তোমরা আমাকে এ কথা বলতেই পারো যে, যখন সবাই আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তখন আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। যখন সবাই আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল, আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি। যখন আপনি ছিলেন আশ্রয়হারা, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃস্ব, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর বললেন,

> *'আনসাররা শোনো! তোমরা দুনিয়ায় তুচ্ছ কিছু সম্পদের জন্য মনে মনে নাখোশ হয়েছো। অথচ এই সম্পদগুলোর মাধ্যমে আমি কিছু লোকের মন জয় করতে চেয়েছি যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর তোমাদের ইসলামের ওপর আমার তো আস্থা আছেই। বলো, তোমরা কি এতে খুশি নও যে অন্যরা যখন উট, ভেড়া নিয়ে বাড়ি ফিরবে, তখন তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে? সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ওরা যা কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, তার চাইতে উত্তম কিছু নিয়ে তোমরা আজ বাড়ি ফিরবে। যদি হিজরত বলে কিছু না হতো, তাহলে আমিও হতাম আনসারদেরই একজন। যদি সব লোক এক পথে চলে আর আনসাররা অন্য পথে চলে, আমি তো আনসারদের পথেই চলবো। হে আল্লাহ, তুমি আনসারদের ওপর রহম করো, তাদের সন্তানদের ওপর রহম করো এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের ওপরও রহম করো।'*

এ কথাগুলো শুনে আনসাররা কাঁদতেই থাকলেন, কাঁদতেই থাকলেন। আর বললেন, 'আমরা আমাদের অংশে আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

আনসাররা ছিলেন বাকিদের চাইতে আলাদা। অন্যদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আল্লাহর রাসূল এই অর্থসম্পদ তাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু আনসারদের বেলায় এমনটা করা প্রয়োজন ছিল না। কারণ তারা এতদিন ধরে সুখে-দুঃখে আল্লাহর রাসূলের পাশে ছিলেন, তারা টাকা-পয়সার জন্য জিহাদ করেননি। প্রথম দিন থেকেই আখিরাত ছিল তাদের লক্ষ্য।

তারা ছিলেন পথহারা, তারা ছিলেন কাফির। একজন মানুষের জন্য কাফির হওয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদকে ﷺ তাদের কাছে পাঠানোর মাধ্যমে তাদের পথ দেখালেন। এটা ছিল আনসারদের সবচাইতে বড় অর্জন, সবচাইতে বড় পাওয়া। হিদায়াতের সাথে পৃথিবীর কোনো সম্পদের তুলনা চলে না। এজন্যই আমরা যে দুআটি সবচেয়ে বেশি করি তা হলো হিদায়াতের দুআ -- ইহ্‌দিনাস সিরাত্বল মুস্তাক্বীম -- সূরা ফাতিহার সেই আয়াত -- আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

আল্লাহ শুধু আনসারদের হিদায়াত দিয়েছেন তা নয়, বরং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তাদের সম্পদশালী বানিয়েছেন। মদীনার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের পর একের পর এক যুদ্ধে এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাধ্যমে আনসাররা ধনী হয়েছিলেন।

আনসারদের প্রতি আল্লাহ তাআলার আরেকটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে তাদের ঐক্য। আনসারদের আওস ও খাযরাজ গোত্র চিরশত্রু ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ মাধ্যমে আল্লাহ এই দুটি গোত্রের অন্তরকে এক করেন। আনসাররা তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাসূলের কঠিন সময়ে তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সেসব নিয়ে তারা কখনোই গর্ব করেননি, বরং এসবকিছুকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবেই মেনেছিলেন আর আল্লাহর প্রশংসাই করেছেন। তবু কেন তারা আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তে প্রথমে কিছুটা দুঃখ পেয়েছিলেন? সত্যি বলতে আনসারদের সবাই নয়, বরং কিছু সাহাবি দুঃখ পেয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল চেয়েছেন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের নেতাদের মন থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দিতে, যেন তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার رضي الله عنه একটি কথায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ আমাকে গনিমত থেকে দিতেই থাকলেন, দিতেই থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি আমার চোখে পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ থেকে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হলেন।' এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল-গাযযালি একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন,

*'কিছু লোক সত্যের দিক ধাবিত হয় পেটের চাহিদায়, সত্যান্বেষী মন দিয়ে নয়। গবাদিপশুদের যেমন করে একগুচ্ছ পাতা দেখিয়ে গোলাঘরের দিকে টেনে আনা হয়, তেমনি কিছু লোককে সত্যের দিকে ধাবিত করতে চাইলে কিছু প্রলোভন দেখানোর প্রয়োজন পড়ে।'*

আল্লাহর রাসূল জানতেন কাকে কতটুকু দিতে হয়, অথবা কাকে না দিলেও চলে। যেমন তিনি আল-আকরা ও উয়াইনাকে প্রথমে ১০০টা করে উট দিলেন কিন্তু আব্বাস ইবন মিরদাসকে দেন ৫০টি উট। আব্বাসও ছিল অন্যদের মতো গোত্রপ্রধান। স্বভাবতই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে সে একটি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার ভাষায় সে বলছিল যে, সে কম পেয়েছে অথচ তাঁর পূর্বপুরুষেরাও অন্য গোত্রগুলোর মতোই লড়াই করে এসেছে।

কবিতার কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের কানে আসে। কবিতা শুনে তিনি বললেন, 'ওর জিহবা কেটে ফেলো।' নবীজির কথা শুনে কিছু লোক ভাবলো তিনি আক্ষরিক অর্থেই আব্বাসের জিহবা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন! আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাসকে আরও ৫০টা উট দেওয়ার কথা বলেছিলেন যাতে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে তিন দফায় একশো করে দেওয়া হয়েছিল তিনশো উট। হাকিম ইবন হিজামকে দেওয়া হয়েছিল দুইশো উট। আবু সুফিয়ান, তার দুই ছেলে মুআবিয়া এবং ইয়াযিদ ‎رضي الله عنهم -- তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল একশো উট আর ছয় কেজি রুপা।

কিন্তু কিছু মানুষকে আল্লাহর রাসূল কিছুই দিলেন না। এমন একজন হলেন আমর ইবন তাঘলিব ‎رضي الله عنه । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসায় বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি যাদেরকে দিচ্ছি না -- তারা আমার কাছে বেশি প্রিয়। কিছু লোককে আমি দিচ্ছি কারণ তাদের অন্তরে আমি সম্পদের লোভ দেখতে পাচ্ছি, আর যাদেরকে দিচ্ছি না তাদের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে যে আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। আমর ইবন তাঘলিব তাদেরই একজন।'

এই কথা আমর ইবন তাঘলিবের মন ভরিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলোকে আমি লাল উটের চেয়ে বেশি পছন্দ করলাম।'

সে যুগে আরবে লাল উট মানে হলো বর্তমানের মার্সিডিজ বেঞ্জ! আমর বোঝালেন, যদি সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ করে লাল উট তাঁকে দেওয়া হয়, তবু তার চাইতে মহানবী ﷺ তাঁকে যেভাবে সম্মানিত করলেন, সেটাই তাঁর কাছে অনেক বেশি দামি!

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ানকে গনিমত দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা আদায় করলেন আর অন্যদিকে আমরা ইবন তাঘলিবকে না দেওয়ার মাধ্যমে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা পেলেন। সাফওয়ানের কাছে গনিমতটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু আমরের জন্য রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে ঈমানের স্বীকৃতিটাই বড়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাতের দিকে তাকালে দেখা যায় কাকে কী বলতে হবে, কার সাথে কেমন আচরণ করলে লাভ হবে -- এসবের ব্যবস্থাপনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে মানুষের মন জয় করার এই বিশেষ

ক্ষমতাটি দান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের একটা অভিন্ন উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন।

> "যদি আপনি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও ব্যয় করতে, তবু এ মানুষদের অন্তরগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতেন না। বরং আল্লাহ তাআলাই এদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করেছেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন, এর মানে এই নয় যে মুসলিমরা কাফিরদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের দ্বীন আর পরিচয় বিকিয়ে দেবে, যেটা এখন হচ্ছে। আজকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ও মুসলিমদের ওপর সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানো কাফির নেতৃবৃন্দদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করছে একদল মুসলিম। এটা হচ্ছে মূলত পশ্চিমা দেশগুলোতে। সেখানে কিছু মুসলিম ক্রমাগত তাদের ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে চলেছে। সমাজে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য তারা পশ্চিমা কুফরি আদর্শ ও অনৈতিক মূল্যবোধগুলোকেও স্বীকৃতি দিচ্ছে। কাফিরদের খুশি করার জন্যই তাদের এত পরিশ্রম, তবে এর সবই পণ্ডশ্রম। কারণ, আল্লাহ বলছেন,

> "আর ইহুদি ও নাসারারা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের পথ অনুসরণ করেন।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২০)

আল্লাহর রাসূল যে লোকগুলোর মন জয় করার চেষ্টা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আগে তিনি প্রায় বিশ বছর মতাদর্শিক ও সামরিক যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেছেন, কোণঠাসা করেছেন, সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছেন। তিনি যতদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, ততদিন তাদেরকে টাকা দিয়ে বা ছাড় দিয়ে খুশি করার কোনো চেষ্টাই করেননি। কিন্তু যখন তিনি তাদের ওপর ক্ষমতা অর্জন করেছেন আর তারা ক্ষমা চেয়েছে বা পালিয়ে গেছে, তখন তিনি তাদের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তারা যেন ইসলামের ছায়াতলে আন্তরিকভাবে চলে আসে। ক্ষমতাসীন কাফিরদের হাতে টাকা-পয়সা তুলে দিয়ে বা তাদের পক্ষে ক্যাম্পেইন করে তাদের মন জয় করা যায় না। কারণ যতদিন তাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাদের ইসলামের কোনো প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় বরং তাদের সাথে দৃঢ়তা দেখানো ও অনমনীয় হওয়াটাই নবীজির পথ।

## খারিজীদের শেকড়

কিছু লোকের সম্পদের লোভ তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ বণ্টনের প্রতি অন্যায্যতার অভিযোগ তোলার দিকে ঠেলে দেয়। বনু তামীম গোত্রের যুলখুয়াইসিরাহ নামের এক লোক এসে বললো, 'এই মুহাম্মাদ, তুমি আল্লাহকে ভয় করো।' রাসূলুল্লাহ কাউকে

কম, কাউকে বেশি দিচ্ছিলেন এটা তার পছন্দ হয়নি, সে তাই আল্লাহর রাসূলকে ন্যায়বিচার শিক্ষা দিতে চলে এসেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'জমিনের সমস্ত মানুষের ওপরে আল্লাহ আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে আর কে করবে?' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ স্বভাবতই খুব ক্ষেপে গেলেন, বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন, আমি এর গর্দানটা উড়িয়ে দিই'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'ওকে ছেড়ে দাও। এমন আরও অনেক লোক তুমি দেখবে। তাদের সালাতের তুলনায় তোমার সালাত কিছুই না। তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমার সিয়াম কিছুই না। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচ দিয়ে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়।'*

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই জাতীয় চরমপন্থী লোকদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তুলনাটা এমন যে, একজন শক্তিশালী তীরন্দাজ যখন খুব জোরে তীর নিক্ষেপ করে তখন তা লক্ষ্যে আঘাত করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তীরন্দাজ বুঝতেই পারে না আদৌ লক্ষ্যভেদ হয়েছে কি না। এই লোকগুলোর অবস্থা সেই তীরের মতো, তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেভাবে করে তীরন্দাজের তীর লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়।

এই লোকগুলো সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে, এবং এদের এসব ইবাদাত ও আমল বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব নজরকাড়া হবে। এমনকি সাহাবিদের আমল তাদের ধারেকাছে যাবে না। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না অর্থাৎ কুরআন তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। কুরআনের আয়াতগুলো তারা কেবল উচ্চারণ করবে মাত্র, জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে না।

ইসলামী পরিভাষায় এদের বলা হয় খারিজী। এরা চরমপন্থা অবলম্বন করে এবং বাড়াবাড়ি করে। আল্লাহর রাসূল অন্য একটি হাদীসে বলেছেন, খারিজীরা হবে মু'মিনদের প্রতি কঠোর আর কাফিরদের প্রতি নমনীয়। এটি খারিজী চিহ্নিত করার মূল সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি যুগের খারিজীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ঘুরেফিরে থাকবে। মুসলিমদের জান-মালের কোনো মূল্য তাদের নেই। বরং মুসলিমদের ওপর তারা কুফরির অপবাদ দিয়ে তাদের দেদারসে হত্যা করে। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা আর বর্তমান সেকুলার দৃষ্টিতে চরমপন্থা -- দুটোর সংজ্ঞা এক নয়। চরমপন্থার সংজ্ঞা আসলে কী -- সেটা মুসলিম আলিমদের থেকে শিখতে হবে, পশ্চিমা বা সেকুলার মিডিয়া থেকে নয়। কারণ ইসলামের যা কিছুতে সেকুলারদের আপত্তি, তার সবকিছুকেই তারা চরমপন্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

আলীর ﷺ খিলাফতের যুগে খারিজীদের উত্থানের সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে। খাব্বাব ইবন আরাতের ﷺ ছেলে ইবন খাব্বাব তার স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে খারিজীরা তার পথরোধ করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। তার উত্তর তাদের পছন্দ না হওয়ায় তারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার গর্ভবতী স্ত্রীকে মেরে পেট কেটে বাচ্চা বের করে ফেলে। তার কিছু পরেই তারা কিছু খ্রিস্টানদের সম্পদ লুট করলো। কিন্তু যখনই শুনলো সেগুলো খ্রিস্টানদের, সেগুলো তারা সাথে সাথে ফেরত দিয়ে দিলো। ইবন খাব্বাবকে হত্যার পরই আলী ইবন আবি তালিব ﷺ খারিজীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। যেহেতু মুসলিমদের জান-মাল খারিজীদের হাতে নিরাপদ থাকে না, তাই খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাফিরদের সাথে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থেকেও প্রাধান্য পায়। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে মূলধন রক্ষা করার মতো। আর কাফিরদের ভূমিতে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। নিশ্চিতভাবেই মুনাফা অর্জনের চেয়ে মূলধন রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই একই নীতি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদেও প্রযোজ্য, কেননা তারা উম্মাহর অভ্যন্তরীণ শত্রু। কাফিরদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা, মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও খারিজীদের দমন করা -- এদের প্রতিটিই জরুরি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

খারিজীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য তারা ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে অত্যাচারী মুসলিম শাসকের যুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ইসলামী শরীয়াতে খুরুজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। জিহাদ ও খুরুজ -- এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা জরুরি। বর্তমানে যেকোনো প্রকার জিহাদকে খুরুজ তকমা দেওয়ার একটি রেওয়াজ চালু হয়েছে যা নিঃসন্দেহে উম্মাহর জন্য বিভ্রান্তিকর।

## হাওয়াযিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র নারী, শিশু, সম্পদ--সবকিছু হারায়। এসব নিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল তাই এগুলোকে গনিমত হিসেবে মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তারা যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, ততক্ষণে যাবতীয় গনিমত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ফলে তাদের গোত্রে শুধু কিছু পুরুষ ছাড়া কিছুই রইলো না। বিষয়টা কষ্টকর, তারা মুসলিম হয়ে এসেছে কিন্তু তাদের পরিবার তাদের সাথে নেই। তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ খুব সম্মান করলো, তাঁর প্রশংসা করলো এবং অনুরোধ করলো যেন তাদের সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই সবকিছু বণ্টন করে দিয়েছেন, তাই সেগুলো মুসলিমদের থেকে ফেরত নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল চাচ্ছিলেন তাদেরকে যতটুকু সম্ভব ফিরিয়ে দিতে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোনটা চাও আমাকে বলো, তোমাদের পরিবার নাকি সম্পদ? কোনটা ফিরে পেতে তোমরা আগ্রহী?'

তারা বললো, 'আমরা অবশ্যই আমাদের পরিবারকে ফিরে পেতে চাই। ওরাই তো আমাদের সম্মান।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'ঠিক আছে, আমার আর বনু মুত্তালিবের হাতে যা আছে, আমি তোমাদের সেগুলো ফিরিয়ে দেবো। তোমরা একটা কাজ করবে, আমি যখন সালাতে ইমামতি করবো, তোমরা উঠে দাঁড়াবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাদের হয়ে মুসলিমদের এবং মুসলিমদের অনুরোধ করি তারা যেন আমাদের হয়ে আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করে আমাদের পরিবার-পরিজনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন এ অনুরোধ করবে, তখন আমি আমার ও বনু মুত্তালিবের হাতে যা আছে তা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো আর বাকিদেরকেও তা-ই করতে বলবো।'

যুহরের ওয়াক্তে আল্লাহ রাসূল মসজিদে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর হাওয়াযিনের নও মুসলিমরা উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের কথামতো ওপরের কথাগুলো বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের ভাইয়েরা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এখন আমি তাদের পরিবার-পরিজনকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই।' এরপর আল্লাহর রাসূল তাঁর ও তাঁর পরিবার বনু মুত্তালিবের হাতে গনিমত হিসাবে যেসকল নারী শিশু ছিল, তাদের হাওয়াযিন গোত্রের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর উদারতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহাজিররা বললেন, 'আমাদের যা আছে, আমরাও সেসব সবই ফিরিয়ে দেবো।' আনসাররাও একই কথা বললেন।

কিন্তু এই উৎসাহে ভাটা পড়ে যখন আকরা ইবন হাবিস বললো, 'আমাদের গনিমত ফেরত দেবো না।' উয়াইনাও একই কথা বললো, একই কথা বললো বনু সুলাইমের নেতা আব্বাস ইবন মিরদাস। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, 'কিন্তু আমরা আল্লাহর রাসূলকে আমাদের সব গনিমত ফিরিয়ে দিতে চাই!' আব্বাস রেগে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমাকে অপমান করলে!'

আল্লাহর রাসূল খুব করে চাচ্ছিলেন হাওয়াযিনের নারী-শিশুরা যেন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু যখন দেখলেন কিছু লোক স্বেচ্ছায় তাদের গনিমত ফিরিয়ে দিতে চাইছে না, তখন তিনি তাদের প্রস্তাব দিলেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যারা গনিমত ছেড়ে দিতে চাইছো না, তোমাদের বলছি, তোমরা যদি এবার এই গনিমত ছেড়ে দাও, তাহলে পরবর্তী জিহাদে তোমাদের ছয়গুণ করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে, আল্লাহর রাসূল তাদেরকে এর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা দেন। এই কথা শুনে সবাই তাদের গনিমত ছেড়ে দিল। এভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ চমৎকার ব্যবস্থাপনায় হাওয়াযিন গোত্রের নারী-শিশুরা তাদের গোত্রে ফিরে গেল, আর অর্থসম্পদ মুসলিমদের কাছে থেকে গেল। মুসলিমদের প্রত্যেকে পেয়েছিল ৪০টি করে ভেড়া।

মালিক ইবন আউফকে বলা হলো, 'তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমার সম্পত্তি আর পরিবার তো ফিরিয়ে দেওয়া হবেই, তার সাথে আরও ১০০ উট তোমাকে দেওয়া হবে।' এ খবর শুনে মালিক ইবন আউফ তাইফ থেকে চলে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। আল্লাহর রাসূল তাঁর কথামতো সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন এবং মালিককে সেই এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন। মালিক ইবন আউফ মহাখুশি হয়ে আল্লাহর রাসূলের প্রশংসায় কবিতাও লিখে ফেললো! শুধু তা-ই নয়, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই একটি বাহিনী গঠন করে তাইফ অবরোধ করলো। যে লোকটি কিছুদিন আগেও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে এখন রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ হয়ে জিহাদ শুরু করল। যাদের সে কিছুদিন আগে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল, এখন সে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ শুরু করলো । এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের ঘোরশত্রুদেরও মন জয় করেন।

## কাব ইবন যুহাইরের ؓ ইসলাম গ্রহণ

কাব ইবন যুহাইর নবীজির ﷺ বিরুদ্ধে কবিতা লিখতো। তার ভাই তাকে জানালো রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যারা কবিতা লিখেছে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে কা'ব খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে সিদ্ধান্ত নিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতেন না। সে রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললো, 'কাব ইবন যুহাইর আপনার কাছে এসেছে। সে মুসলিম হতে চায়। আপনি কি তার ইসলাম গ্রহণ করবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আসতে দাও।' তখন কা'ব বললেন, 'আমিই কা'ব ইবন যুহাইর।' এরপর সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বায়াত দিলো এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রশংসা করে চমৎকার একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবিতা শুনে খুব খুশি হলেন এবং তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে কাবকে দিয়ে দিলেন।

## উরওয়া ইবন মাসউদের ؓ ইসলাম গ্রহণ

উরওয়া ইবন মাসউদ আস-সাক্বাফীর কথা হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাপ্রবাহে এসেছিল। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিক। উরওয়া ছিলেন তাইফের অধিবাসী। মালিক ইবন আউফ যখন তাইফ অবরোধ করলেন, তখন উরওয়া ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তাইফ ছেড়ে চলে এলেন । আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করে মুসলিম হয়ে উরওয়া তাইফে ফিরে যান। সাকিফ গোত্রের কাছে উরওয়া ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তাইফবাসীর কাছে তার সম্মানের স্থান হারান। উরওয়া তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান করেন। নিজ বাড়ি থেকে আজান দেন। এসব সহ্য করতে না পেরে তার গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। মারা যাওয়ার আগে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাইফের সাথে যুদ্ধে শহীদ মুসলিমদের কবরে যেন তাকে কবরস্থ করা হয়। উরওয়া মুসলিম হিসেবে বেঁচে ছিলেন অল্প কিছুদিন, কিন্তু সে কয়টা

দিনই ছিল তার জীবনের অর্থপূর্ণ দিন। মৃত্যুমুখে উপনীত হয়ে তিনি বলেছিলেন,

*‘নিশ্চয়ই এই শাহাদাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহর পথে মরতে পারার মর্যাদা! আমার অবস্থা তো সেই শহীদদের মতো, যারা এই শহরের দরজায় শহীদ হয়েছিলেন, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ এই শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন।’*

# তাবুকের যুদ্ধ

## পটভূমি

> “হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের কাছে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (আত-তাওবাহ, ৯: ২৮)

শত বছর ধরে হজ্জ ও উমরাকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। এটিই ছিল কুরাইশদের জীবিকার মাধ্যম। সারাবছরই হজ্জ আর উমরা উপলক্ষে অসংখ্য মানুষ মক্কায় প্রবেশ করতো। এর ওপরেই কুরাইশদের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। কুরাইশদের কাছে তাই হজ্জ বা উমরা কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না, বরং তারা ভালো করেই জানতো তাদের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে হজ্জ বা উমরাকে ঘিরে। কিন্তু ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন যে, এই বছরের পর কোনো মুশরিক মাসজিদ আল হারাম অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। সেসময় হিজাযের বাইরে আরবের তেমন কোনো গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরকম অবস্থায় তাদের মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া মানে কুরাইশদের ব্যবসায় বিশাল ধ্বস। স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত সহজভাবে নিতে পারছিল না।

এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। মুশরিকদের মাসজিদ আল হারামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তাদের অপবিত্রতার কারণে। আর্থিক ক্ষতির ব্যাপারে কুরাইশদের মনে চাপা যে আশঙ্কার জন্ম নিয়েছিল সে ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করতে আল্লাহ বলছেন,

> ‘আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’

এটাই তাওয়াক্কুল। আয়ের কোনো উপায় যদি হারাম হয়, তাহলে মানুষের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি হালাল হয়, তবেই কেবল তা গ্রহণ করা উচিত। কোনটায় লাভ বেশি আর কোনটায় কম -- সেটা দেখার আগে দেখতে হবে উপায়টি আদৌ হালাল কি না, কেননা লাভ-ক্ষতির ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে। এভাবেই ইসলাম আমাদের চিন্তাধারা বদলে দিতে এসেছিল। সাধারণত মানুষ প্রথমেই লাভ-ক্ষতিকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইসলাম কুরাইশদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে শেখালো। কুরাইশদের জন্য বিষয়টা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। কারণ ব্যবসা ছাড়া আর কোনো কিছুতে তারা অভ্যস্ত ছিল না, না ছিল তাদের অন্যকিছুতে দক্ষতা বা

জ্ঞান। আর মক্কাও এমন কোনো উর্বর ভূমি ছিল না যে, সেখানে কৃষিকাজ করে খাওয়া যাবে। পাথুরে ভূমি আর খুবই অল্প বৃষ্টিপাতের এই অঞ্চলের লোকগুলোকে যখন বলা হলো যে তাদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আল্লাহ তখন তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহই তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।

আল্লাহর আদেশ পালন করলে আল্লাহ আমাদের বঞ্চিত করবেন না। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই আছে যারা সুদ বা অন্যান্য হারাম পন্থায় জীবিকা অর্জন করে এবং ঐ হারাম পথ থেকে সরে আসতে চায় না। কারণ সেটা ছাড়া তাদের আর কোনো উপার্জনের উৎস নেই। হয়তো কেউ একজন হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করছে। তাকে গিয়ে যদি বলা হয় এটা হারাম, আপনি এই কাজ ছেড়ে দিন। সে জবাব দেবে, 'তাহলে আমি কী খেয়ে বাঁচবো?' বাড়ি গাড়ি করতে ব্যাঙ্ক থেকে সুদে লোন নেওয়া কিংবা বেশি লাভের আশায় ফিক্সড ডিপোজিট রেখে উচ্চহারে সুদ নেওয়া এখন সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করতে গেলে সবাই সমস্বরে বলে উঠে, "লোন না নিলে কীভাবে বাড়ি করবো? ফিক্সড ডিপোজিট না রাখলে খরচ চালাব কী দিয়ে?" তাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ বলেন,

> "যার তাকওয়া আছে তার জন্য আল্লাহ উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন সব উৎস থেকে তাদের (রিযক্ব) দিবেন যা তারা কখনো কল্পনা করেনি।" (সূরা তালাক, ৬৫: ২-৩)

এটা আল্লাহর ওয়াদা। কারো যদি তাকওয়া থাকে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে, তাহলে রিযক্ব নিয়ে তার ভাবতে হবে না, রিযক্ব আল্লাহই যোগাবেন। সূরা তাওবার পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

> "আহলে কিতাবের মধ্যে যারা যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ২৯)

ইবন কাসীর (রহ) এই দুই আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের মাধ্যমে ৯ম হিজরি ও এতে তাবুক যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে বর্ণনা শুরু করেন।

> "হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ৯: ১২৩)

আশেপাশের কাফির বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে রোমানদের। কারণ পুরো হিজায তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর সংলগ্ন অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। ইবন কাসিরের মতে, তাবুকের জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের

সম্প্রসারণ। ইসলামকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো জিহাদ। তাবুকের যুদ্ধ এই কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ আরবের পরেই ছিল রোমান সাম্রাজ্য আর রোমান সাম্রাজ্য ছিল ইসলামের প্রসারের পথে বড় বাধা।

এছাড়া তখন মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের তখনকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করা শুরু করেছেন। সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে সেটি গোপন রাখতেন যেন শত্রুবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে চমকে দেওয়া যায়। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ বিষয়টি গোপন না রেখে প্রথম দিন থেকেই পুরো বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। এর কিছু কারণ ছিল:

প্রথমত, মুসলিমরা নতুন এক ধরনের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপক্ষ কোনো আরব গোত্র বা চেনাজানা কেউ নয়। প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরবের মুসলিমদের তেমন ধারণাই ছিল না। তারা এমন এক সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল, যারা তাদের ক্ষমতা ও সামরিক শক্তিমত্তার জন্য কয়েক শতাব্দী জুড়ে বিখ্যাত ছিল।

দ্বিতীয়ত, রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থ হলো অনেক বড় একটা দূরত্ব অতিক্রম করে ময়দানে যেতে হবে। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন সবাই যেন এটা মাথায় রেখে আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত, সময়টা ছিল ভ্রমণের জন্য খুবই প্রতিকূল -- গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, প্রচণ্ড গরম আর শুষ্ক। অন্যদিকে এটা হলো খেজুর পাকার সময়। আরববাসীর জন্য এটা খুব লোভনীয় সময়, কেননা মদীনার অর্থনীতি কৃষিপ্রধান আর তাদের ফসল হচ্ছে মূলত খেজুর। এই সময়ের জন্য তারা সারা বছর অপেক্ষা করে। কিন্তু এই লোভনীয় সময়ে এল জিহাদের ডাক!

চতুর্থত, এই যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এর আগে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা ছেড়ে চলে গেলে আশেপাশের শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু আশেপাশের বেশিরভাগ গোত্রই মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তির সামনে বশ্যতা স্বীকার করায় তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই ভয় আর ছিল না।

পঞ্চমত, এই যুদ্ধ ছিল সে পর্যন্ত সবচাইতে বড় অভিযান। এর জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন ছিল প্রচুর। তাই এই জিহাদ অর্থায়ন করার জন্য প্রকাশ্যে আহবান করা হয়। এটি আরেকটি কারণ।

এসব কারণে রাসূল ﷺ আগে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখলেন যে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে যাওয়া হবে।

# কুরআনের চোখে তাবুকের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর আগে তাবুকের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। তাবুকের জিহাদ ছিল ইসলামের স্বর্ণশিখর, রাসূলের ﷺ জীবনের জিহাদের অধ্যায়টি এর দ্বারা সমাপ্ত হয়। জিহাদ সম্পর্কিত চূড়ান্ত বিধানগুলো তাবুকের সময় নাযিল হয়। এই জিহাদ মু'মিন ও মুনাফিক্বদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনায় নিফাকের উৎপাত দেখা যায়। তাবুকের সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় তা মুনাফিক্বদের পুরোপুরি উন্মোচিত করে দেয়। নিফাক্ব সম্পর্কিত বেশিরভাগ আয়াত এসেছে সূরা আত-তাওবায়। এই সূরাটি নাযিল হয়েছিল ৯ম হিজরিতে। এর অধিকাংশ আয়াতই তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কিত।

## জিহাদের প্রতি অনীহা অন্তরের একটি রোগ

তাবুকে যদিও কোনো লড়াই হয়নি, তবুও শরীয়াহ, ঈমান ও সিয়াসাহ -- সবক্ষেত্রেই তাবুক থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। তাই তাবুক যুদ্ধের ব্যবচ্ছেদের আগে এই যুদ্ধসংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর উপর আলোকপাত করা জরুরি।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ৯: ১২৩)

তাবুকের জিহাদ ছিল একটি পরীক্ষা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত আসা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। তাই এই যুদ্ধের বাহিনীকে বলা হয় যাইশ আল 'উসরাহ বা 'প্রতিকূলতার বাহিনী'। উসরাহ অর্থ কঠিন, প্রতিকূল। এই বাহিনীর জন্য অর্থ যোগানো ছিল কষ্টকর, সৈন্যদের একত্র করা ছিল কষ্টসাধ্য, আবহাওয়া ছিল রূঢ়, পানি ছিল দুষ্প্রাপ্য। যে পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধে যেতে হতো, তা ছিল প্রতিকূল। প্রতিপক্ষ হিসেবে রোমানরাও ছিল সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে এই সময়কে বলেছেন সা'আতুল উসরাহ বা 'প্রতিকূল সময়'।

নবীজি ﷺ এই যুদ্ধের জন্য মক্কা, মদীনা ও এর আশেপাশের গোত্রগুলো থেকে যে যেখানে আছে তাদের সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন। এর আগে কখনো এমনটা হয়নি। নবীজি ﷺ চেয়েছেন প্রত্যেক সবল মুসলিম এই যুদ্ধে অংশ নিক।

কুরআন আমাদের অন্তরের রোগগুলোর কথা বলে। কুরআন নাযিল হয়েছে সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের ভেতরের ও বাইরের সব খবর জানেন। কুরআন আমাদের এমন কিছু দুর্বলতার কথা বলে দিতে পারে, যেগুলো অনেক সময় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না বা বুঝলেও স্বীকার করি না। এজন্যই কুরআন অনন্য। তাবুকের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল

না। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন কেন যুদ্ধে যেতে কিছু মানুষের এত অনীহা আর অনাগ্রহ ছিল।

এখনকার সময়েও জিহাদে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। কেউ বলে যে ফিকহ অনুসারে এটা ঠিক নয়, কেউ বলে যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ বলে যে এটা করা হিকমাহর পরিচয় নয়, কেউ বলে এসবের কোনো মানেই হয় না! কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন এমন কথা যা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো? যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগবিলাস তো অতি অল্প।" (আত-তাওবাহ ৯: ৩৮)

এই আয়াত আমাদের অন্তরের রোগ ও রোগের চিকিৎসাও বলে দিয়েছে। এই রোগ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মায়া, ভালোবাসা। আমরা আমাদের জীবনকে অনেক বেশি ভালোবাসি, তাই সবকিছু ছেড়েছুড়ে জিহাদে যেতে চাই না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন -- দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় কিছুই না। সুতরাং রোগের চিকিৎসা হচ্ছে বাস্তবতা উপলব্ধি করে আখিরাতের জন্য বাঁচা।

## জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি

> "তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।" (আল-বাকারাহ ২: ২১৬)

জিহাদ আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, কিন্তু তবুও আমরা তা অপছন্দ করি। আমরা কেবল অপছন্দ করি তা-ই না, এটা নিয়ে কথা বলাও আমরা অপছন্দ করি! জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত, কুরআনে এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত আছে, অগণিত হাদীস রয়েছে, তবুও মানুষের মধ্যে জিহাদের আলোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করে। এই রোগ এবং রোগের চিকিৎসা দুটোই আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আরও বলে দিয়েছেন যদি আমরা এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাই তবে আমাদের পরিণাম কী হবে।

> "যদি (জিহাদের জন্য) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (আত-তাওবাহ ৯: ৩৯)

আল্লাহ বলছেন জিহাদ পরিত্যাগ করার পরিণাম হলো কঠিন শাস্তি, আযাব। আমাদের বর্তমান অবস্থাই এর সবচাইতে বড় প্রমাণ। আজকে আমরা বঞ্চিত, অপমানিত ও

নির্যাতিত হচ্ছি! আমাদের অঢেল সম্পদ থাকার পরেও সবচেয়ে দরিদ্র। যমীনের উপরে ও নিচে আমাদের যা কিছু আছে তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও দামি হওয়ার পরও সেগুলো আজ অন্যদের হাতে। আমাদের একতাবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরাই আজ সবচেয়ে বেশি বিভক্ত। আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী উম্মাহ হওয়ার কথা, কিন্তু আমরাই আজ সবচেয়ে দুর্বল। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, কারণ আমরা তাঁর দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছি।

> "যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, গুহার মধ্যে তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফিরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আত-তাওবাহ ৯: ৪০)

পরের আয়াতে আল্লাহ সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করছিলেন আর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সবসময় সাহায্য করেছেন, যখন কেউ সাহায্যের জন্য ছিল না, তখনও করেছেন। অর্থাৎ, আমরা যদি দ্বীনের স্বার্থে এগিয়ে না আসি তবে তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহর আদেশগুলো আমাদের নিজেদের স্বার্থেই মানতে হবে, কেননা এর মাঝে আমাদেরই কল্যাণ।

## সাহাবিদের উপলব্ধি

> "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৪১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিররা বলেন, কমবয়সী বা বেশি বয়সী, ব্যস্ত কিংবা বেকার, ধনী বা দরিদ্র সবাইকে জিহাদে যেতে হবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবিরা এটাকে একটা অনেক বড় দায়িত্ব হিসেবে দেখেছিলেন। কারণ এতে করে কারো জন্য কোনো অজুহাত বাকি থাকেনি, সবাইকেই যেতে হবে। এরপরই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন,

> "দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যদি এই সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ লোকের প্রতি

বলেন যেন তারা কবরগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে সরিয়ে নিতে পারে। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ সে ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

*'এক লোক আমাকে জানালো, জাবির, মুআবিয়ার লোকেরা পরিখা খোঁড়ার সময় তোমার বাবার কবরও খুলে ফেলেছে। উনার কিছু অংশ কবরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এ কথা শুনে জাবির বাবার কবর খুঁড়তে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁদের কবরগুলো খনন করতে গিয়ে দেখি আমার বাবার শরীরটা অবিকল আগের মতোই আছে, একটুও বদলায়নি। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি ঘুমোচ্ছেন। কবর খুড়তে গিয়ে তাঁর আরেক সাথী আমর ইবন জামুহকেও দেখতে পেলাম। তাঁর হাত দিয়ে শরীরের একটি ক্ষতস্থান ঢাকা ছিল। হাতখানি সরিয়ে দেখলাম, ক্ষত থেকে গলগল করে তাজা রক্ত বেরোতে লাগলো! গর্ত খুড়তে গিয়ে হামযার ﷺ পায়ে শাবলের আঘাত লাগে, সেখান থেকেও টাটকা রক্ত ঝরতে শুরু হয়। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি গতকালই তাঁদেরকে কবর দেওয়া হয়েছে!'*

ইবন কাসির বলেন, 'তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! বলা হয়ে থাকে উহুদের শহীদদের প্রত্যেকের কবর থেকে মেশকের সুবাস ভেসে আসছিল।' এই মানুষগুলো শাহাদাহ লাভ করেছেন ৪৬ বছর আগে! অথচ তাঁদের দেহগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে।

### ৪) শহীদদের গোসল বা জানাযার প্রয়োজন নেই

বান্দা যেখানে শাহাদাহ লাভ করে, সেখানেই তাকে কবর দেওয়া সুন্নাহ। ক'জন সাহাবি উহুদের শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে মদীনায় যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে বললেন, 'তাদের নিয়ে ফিরে যাও আর উহুদের ময়দানেই কবর দাও।' ময়দানই শহীদদের গোরস্থান। মদীনা উহুদের ময়দান থেকে বেশ কাছেই ছিল। দেহগুলোকে মদীনায় নেওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের ময়দানেই শুহাদাদের কবর দিতে বলেন।

দাফন করার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের দুইজন শহীদের ওপর এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'এ দুজনের মাঝে কার কুরআনের জ্ঞান বেশি ছিল?' যার কুরআনের জ্ঞান বেশি, তাকে তিনি আগে কবরে নামাতেন। শহীদদের কবরে রেখে দুআ করতেন, 'আমি ক্বিয়ামতের দিনে ওদের জন্য সাক্ষ্য দিবো।' দু'জন শহীদের জন্য একটি কাপড় বরাদ্দ ছিল কারণ দাফনের যথেষ্ট কাপড় পর্যন্ত ছিল না।

অবশ্য আরেকটি কারণ হতে পারে, যুদ্ধ করে সবাই এত বেশি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কবর খোঁড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আর তাই দুজনের জন্য একটি করে কবর খুঁড়ে, যার কুরআনের জ্ঞান বেশি আছে তাকে প্রথমে, এরপরে দ্বিতীয়জনকে এভাবে করে কবর দেওয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দেন যেন শুহাদাদেরকে গোসল না দিয়ে শরীরের রক্ত সহ কবর দেওয়া হয়। শহীদদের জন্য জানাযার নামাজও আদায়

দুনিয়া ও আখিরাতের বাস্তবতা, তারা বোঝে না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের গুরুত্ব, তারা বোঝে না আত্মত্যাগের মর্যাদা। বর্তমান যুগেও এরকম অনেক মানুষ আছে যারা যথার্থভাবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জগতটাকে দেখে না, যারা দ্বীনের পথে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা বোঝে না।

আসলে আয়াত মুখস্থ করা আর বুঝতে পারা এক নয়, বরং বুঝতে পারা বা অনুধাবন করতে পারাটা অন্তরের বিষয়। কুরআন-হাদীস অনেকেই পড়তে পারে, একজন অমুসলিমও পারে। পাশ্চাত্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজে অনেক অমুসলিম শিক্ষার্থী আছে, তারা ভালো ফলাফলও করে। কিন্তু এগুলো ইসলাম বোঝার মাপকাঠি হতে পারে না। কতগুলো কিতাব পড়া হয়েছে সেটা প্রকৃত জ্ঞান নয়, প্রকৃত জ্ঞান হলো কতটুকু অনুধাবন করা হয়েছে ও সে অনুসারে আমল করা হচ্ছে। কেউ যদি কুরআনের অসংখ্য আয়াত আর হাদীস মুখস্থ করে, কিন্তু সেগুলো মেনে না চলে তাহলে কিয়ামতের দিন এই জ্ঞান তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাই ইলমের সাথে আমল সমভাবে জরুরি। কেউ যদি অনেক আয়াত ও হাদীস জানে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল না করে, তবে তার জ্ঞানের বাহার বা মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

এরপর আল্লাহ বলছেন তাদের কথা, যারা সঠিক পথে আছে। এরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ ডাকে জিহাদে অংশ নিয়েছে।

> "...রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তারা সবাই নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। (কাজেই) এদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহাসফলতা।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৮৮-৮৯)

তাবুকের যুদ্ধে এমন কিছু লোক ছিল যাদের জিহাদে অংশ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। এদের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন কেবল তাদের আন্তরিকতার কারণে। কিছু লোক এসে জিহাদে যাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে আর্থিক সাহায্য চান। তাদের কোনো সহায়-সম্পত্তি ছিল না, ঘোড়া বা উট না থাকায় তাদের যাতায়াতের খরচ নবীজিকে ﷺ বহন করার অনুরোধ করেন। এই সাহাবিরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু জিহাদে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল অদম্য। কিন্তু তাদের অর্থায়ন করার মতো যথেষ্ট অর্থ রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। জিহাদে যোগদান করতে না পারার কষ্ট নিয়ে সেই সাহাবিরা رضي الله عنهم অশ্রুসিক্ত হয়ে কষ্ট পেয়ে ফিরে গেলেন।

> "আর তাদের উপরও কোনো দোষ নেই, যারা আপনার কাছে আসে, যাতে আপনি তাদের বাহন জোগাতে পারেন। আপনি বললেন, আমি তোমাদেরকে

> বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল। তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল এ দুঃখে যে, তারা ব্যয় করার মতো কিছু পাচ্ছে না।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৯২)

অদ্ভুত এক দৃশ্য কুরআন আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিছু লোকের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকলো। এমন নয় যে তারা জিহাদে যেতে ভয় করছিল, বরং জিহাদে মহিলা আর শিশুদের মতো ঘরে বসে থেকেই আনন্দ পাচ্ছিল! অন্যদিকে কিছু গরিব সাহাবি ﷺ মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন জিহাদে যেতে, কিন্তু অপারগতার দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

ওয়াসিলা ইবন কাইস ﷺ ছিলেন জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর! তার নিজের কোনো বাহন ছিল না। মুসলিম বাহিনী যখন অভিযানে যেতে প্রস্তুত, তিনি তখন রাস্তায় গিয়ে বললেন, ‘কেউ কি আছে যে আমাকে তার বাহনে চড়তে দেবে? বিনিময়ে আমি তাকে আমার ভাগের গনিমাহ দিয়ে দেবো!’ আনসারদের মধ্যে এক বৃদ্ধ মুজাহিদ রাজি হলো, বললো, ‘আমি তোমার ভাগ নিব, তবে তোমাকে পালা করে বাহন চড়তে হবে। আমি তোমাকে খাবারও দিব।’ ওয়াসিলা রাজি হলেন। এই ঘটনার পরে ওয়াসিলা একটি অভিযানে গনিমাহ হিসেবে কিছু উট পান। চুক্তিমতে, সেগুলো তিনি বৃদ্ধ আনসারকে দিয়ে আসতে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধ আনসার সেগুলো নিতে রাজি হলেন না, বললেন, ‘ভাতিজা, ওগুলো তোমার। আমি ওগুলো চাই না।’

এটা হলো ভ্রাতৃত্ব। এমন ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন আর কোনো যুগে কোনো কালে পাওয়া যাবে না। ওয়াসিলা তার নিজের গনিমতের ভাগ ছেড়ে দিয়ে হলেও জিহাদে যেতে উন্মুখ হয়ে ছিলেন! আর সেই বৃদ্ধ নিজের আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে ওয়াসিলাকে সাথে নিতে রাজি হয়েছেন সাওয়াবের আশায়, গনিমতের আশায় নয়। এমনই ছিল সাহাবিদের মানসিকতা, আখিরাতের পুরস্কারকেই তারা জীবনের সাফল্য হিসেবে দেখতেন।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলছেন,

> “যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪২)

যদি যাত্রাপথ ছোট হতো এবং যুদ্ধে গনিমত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে মুনাফিকরা ঠিকই দুনিয়াবী লাভের আশায় জিহাদে যোগ দিত। কিন্তু তাবুকের পথ ছিল অনেক দুর্গম, তাই তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যোগ দিলো না। কিন্তু

তাদের অজুহাতগুলো ছিল মিথ্যা অজুহাত।

> "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।" (আত-তাওবাহ ৯: ৪৩)

তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটা ছিল একটা পরীক্ষা এবং আল্লাহ তাআলা রাসূলকে ﷺ উদ্দেশ্য করে বলছেন যে মুনাফিক্বদের কোনোরকম ছাড় দেওয়াটা তাঁর উচিত হয়নি।

> "আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৪, ৪৫)

অর্থাৎ, যারা সত্যিকারের মু'মিন তারা কোনো অজুহাত না খুঁজে স্বেচ্ছায় জিহাদে যোগ দিতে আসবে। অন্যদিকে ঈমানের দুর্বলতার কারণে যারা জিহাদের প্রকৃত ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে চায় তারা সবসময়ই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অস্বচ্ছতা এবং স্ব-বিরোধিতার মাঝে ঘুরপাক খায়। একদিকে তারা দাবি করে যে তারা দ্বীনের খেদমত করতে চায়, অন্যদিকে তারা তাদের দায়িত্বগুলো অস্বীকার করে তা থেকে দূরে থাকতে চায়, নানা অজুহাতে গা বাঁচানোর চেষ্টা করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলছেন, আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর আসলে এদের ঈমান নেই। যার আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে, সে আল্লাহকে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভয় করে তার দায়িত্বগুলো পালনে সচেষ্ট হবে। অন্যদিকে কিয়ামতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে দুনিয়ার প্রতি তার বিশেষ আসক্তি থাকবে না।

> "আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিতো, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হলো বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৬)

কোনো কাজের সংকল্প থাকলে এর জন্য প্রস্তুতিও থাকা চাই। কেউ ডাক্তার হতে চাইলে তাকে সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে, বছরের পর বছর এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। দুনিয়ার যেকোনো কাজ বা পেশার জন্য যেমন প্রস্তুতি নিতে হয় ইসলামেও ঠিক তেমন। কেউ যদি বলে যে সে হিজরত করবে কিংবা যদি বলে সে জিহাদে যোগ দেবে,

তবে তার সেইভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুতি শব্দটা এখানে মুখ্য। যেকোনো ইবাদাতের জন্য যা যা দরকার, তার সবই এতে অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ মন্তব্য করছেন, এই লোকগুলো জিহাদে না যাওয়ায় বরং ভালোই হয়েছে! এর কারণ হলো,

> "যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর ঘোড়া ছোটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে (উন্মুখ হয়ে) তাদের কথা শুনবার লোক রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ জালিমদের ভালোভাবেই জানেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৪৭)

অর্থাৎ তারা যুদ্ধে গেলে কোনো উপকার তো হতোই না, বরং অন্যদের মনে সন্দেহ আর অনৈক্যের বীজ বপন করার মাধ্যমে আরও ক্ষতি করতো। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতো। এরপর আল্লাহ বলছেন -- তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তাদের কথা উন্মুখ হয়ে শোনে! এখানে বলা হচ্ছে সাহাবিদের কথা, কিছু সাহাবি মুনাফিক্বদের প্রোপাগান্ডায় কান দিতেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের সতর্ক করে দিচ্ছেন, কারণ কে মুনাফিক্ব আর কে নয় -- এটা বোঝা সহজ নয়। হতে পারে তারা অনেক মিষ্টভাষী, জ্ঞানী, বাকপটু কিংবা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কেউ তাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর রাসূলের যুগেই এই সমস্যা ছিল। সে তুলনায় এখনকার পরিস্থিতি আরও জটিল। এ কারণে জিহাদের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে বিভ্রান্তি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেক বেশি। সে কারণে সূরা তাওবাহ পাঠ করা আমাদের সময়ে গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ হলো, প্রথমত, আমরা নিজেরা যেন মুনাফিক্ব না হয়ে পড়ি আর দ্বিতীয়ত, মুনাফিক্বদের প্রোপাগান্ডায় যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ি। নিফাক এমনই একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যা যে কাউকে স্পর্শ করতে পারে। একজন আলিম বা একজন মুজাহিদের মাঝেও নিফাক্বী থাকতে পারে। উমারের ﷛ মতো সাহাবি নিজের ঈমানে নিফাক্বের আশঙ্কা করতেন। হুযায়ফার ﷛ কাছে রাসূল ﷺ মুনাফিক্বদের পরিচয় প্রকাশ করতেন এবং তিনি সেই তথ্যগুলো গোপন রাখতেন। উমার হুযায়ফার ﷛ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রাসূল ﷺ মুনাফিক্ব হিসেবে উমারের ﷛ নাম উল্লেখ করেছেন কিনা। হুযায়ফা ﷛ তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'না। আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি এই প্রশ্নের উত্তরও দিতাম না।'

আল্লাহ তাআলা চান মুনাফিক্বরা জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থাকুক। কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য যুদ্ধে যেত না, তারা যেত নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য, মু'মিনদের মাঝে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফিতনা তৈরি করার জন্য।

"তারা এর আগেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করার চক্রান্ত করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ তাদের কাছে হাজির হলো এবং আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলো, যদিও তারা হচ্ছে (এ বিজয়ের) অপছন্দকারী। আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো আগে থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৪৮, ৪৯)

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল মুনাফিক্বদের নেতা। তাকে বলা হতো সায়্যিদুল খাযরাজ -- খাযরাজদের নেতা। জুমুআর দিনে সে উঠে দাঁড়াতো, সবার উদ্দেশ্যে বলতো, 'ইনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তোমরা তাঁর কথা শোনো, তাঁকে মানো।' অথচ এই লোকটাই ছিল মুনাফিক্বদের নেতা, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। উমার ﷺ একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ইবন উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেননি। কারণ হিসেবে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ইবন উবাইকে হত্যা করা হলে তার অনুসারীরা তার পক্ষে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই লোকটির আসল চেহারা আল্লাহ তাআলা এমনভাবে উন্মোচন করে দিলেন যে, তার অনুসারীরাই তাকে পরিত্যাগ করতে লাগলো।

মুনাফিক্বদের এক নেতা, নাম তার যাদ ইবন কাইস। তাবুকের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?' যাদ ইবন কাইস জবাব দিলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার ভয় হয় জিহাদে গেলে রোমান নারীদের ফিতনায় পড়ে যাবো।'

এটা ছিল মুনাফিক্বদের জিহাদে না যাওয়ার অজুহাতের নমুনা! তারা হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার দোহাই দিয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করতো। এই যুগেও যারা জিহাদকে পরিত্যাগ করে, তারা শরীয়াহর কোনো যুক্তি দেখিয়েই তা পরিত্যাগ করে। ফিতনার দোহাই দিয়ে অনেকে জিহাদে যেতে চাইছিলো না, কিন্তু আল্লাহ বলছেন, জিহাদে না যাওয়াটাই তাদের জন্য আসল ফিতনাহ। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে অংশ নিলেই বরং ফিতনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই যারা বলে যে, আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না, আত্মিকভাবে প্রস্তুত না -- দেখা যায় কখনোই তাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে ওঠে না। তারা সর্বদা দুনিয়ার ফিতনায় পড়ে থাকে। কিন্তু সাহস করে যুদ্ধে যোগ দিলেই তারা সঠিক পথ পেত। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলছেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আল্লাহ তাদের পথের দিকনির্দেশনা দিবেন।'

"আপনার কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা আগে থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৫০)

এটা মুনাফিকদের আরেকটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের ভালো কিছু দেখলে তাদের গা জ্বলে, মুসলিমদের বিপদে তারা আনন্দিত হয়। মুসলিমদের বিপদে তারা বলে, 'বলেছিলাম না তোমাদেরকে? কেন তোমরা বের হয়েছিলে?' তারা মনে করে 'ঝামেলা' থেকে দূরে থেকে তারা খুব বিচক্ষণের মতো কাজ করেছে, কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা উল্টো, তারা নিজেদের আরও ফিতনার মাঝে ফেলে দেয়।

> "আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করো; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।" (আত-তাওবাহ ৯: ৫২)

দুটি কল্যাণ বলতে বোঝানো হচ্ছে হয় শাহাদাত কিংবা বিজয়লাভ। মুসলিমরা মুনাফিকদের যেন এরকম বলে দেয় যে -- যদি আমরা হেরে যাই, আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় আর জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থেকেছো বলে আপাতদৃষ্টিতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি বলে ভেবো না তোমরা বিচক্ষণের মতো কাজ করেছো। আমাদের কপালে আছে দুটো জিনিস, হয়তো বিজয়লাভ কিংবা শাহাদাত -- কোনোটাতেই আমাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদের কপালে কী আছে? তোমাদের কপালেও আছে দুটো জিনিস -- হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি কিংবা আমাদের হাতেই তোমাদের কঠিন শাস্তি। কাজেই তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও করছি।

তাবুক যুদ্ধে অংশ না নিয়ে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল।

## তাবুকের যুদ্ধের অর্থায়ন

কুরআনে একটি আয়াত বাদে বাকি সবখানেই আগে সম্পদ এবং তারপর জানের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ জিহাদে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দরকার হয়। অতীত কিংবা বর্তমান, জিহাদ সবসময়ই অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে ফেলে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সব সাদাকার সাওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আল্লাহর পথে সাওয়াব বৃদ্ধি পায় সাতশোগুণ, কারণ সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে।' ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, 'ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তা কথাটি সাধারণত জিহাদের ক্ষেত্রেই বলা হয়।' এজন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

তাবুক যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্থ যোগাড় শুরু করলেন। কাজটা ছিল অনেক কঠিন, কেননা ফসল তোলার আগ মুহূর্তের ঐ সময়টায় মুসলিমদের হাতে তেমন কিছু ছিল না। তারপরও সাহাবিরা যার যা সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী সম্পদ ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবু বকর ও উমার ﷺ তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল তা দিয়ে দিলেন। সেটা যথেষ্ট হলো না, তাই উসমান ﷺ লাগাম ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত একশোটি উট এনে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও অর্থায়ন চাইলেন। উসমান ﷺ আরও একশোটি উট এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও চাইলেন। উসমান এবারও একশো উট দান করলেন! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও জিহাদের জন্য অর্থায়ন করার আহবান করলেন। এবারও এগিয়ে এলেন উসমান। কিছু স্বর্ণমুদ্রা এনে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোলে ফেলে দিলেন। নবীজির ﷺ আঙুলগুলো তখন স্বর্ণমুদ্রার মাঝে ডুবে ছিল। তিনি বললেন, 'উসমান ভবিষ্যতে যা-ই করুক না কেন, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না!' তাবুকের সেই দিনে উসমান এত বেশি দান করেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে তিনি যা-ই কিছু করুন না কেন, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়! এতেই বোঝা যায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাহাত্ম্য কত বেশি। আর উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ঘটনা তাঁর মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেন,

*'তাবুক অভিযানের একদিন আগের কথা। আল্লাহর রাসূল আমাদের আদেশ করলেন আমরা যেন জিহাদে সাদাকা করি। ভাগ্যক্রমে সে সময়ে আমার কাছে ভালোই টাকা-পয়সা ছিল। আমি ভাবলাম, আবু বকরকে যদি কোনোদিন হারাতে পারি, তবে সেটা আজই! এরপর আমার যত অর্থ-সম্পদ তার অর্ধেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো? আমি বললাম, যা এনেছি, তার সমপরিমাণ তাদের জন্য রেখে এসেছি। এরপর দেখলাম আবু বকর তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছে! আল্লাহর রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী রেখে এসেছো তোমার পরিবারের জন্য? আবু বকর উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ রেখে এসেছি। আবু বকরকে আমি বললাম, নাহ, তোমার সাথে আমি কখনোই পেরে উঠবো না!'*

ভালো কাজে সাহাবিরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাবুকের অর্থায়নে ভূমিকা রেখেছেন আবদুর রাহমান ইবন আউফ ﷺ। তিনি এই জিহাদে দুই হাজার দিরহাম দান করেন। এটা ছিল তার সম্পদের অর্ধেক। এছাড়াও নিজেদের সম্পদ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আব্বাস ইবন আবু মুত্তালিব, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ এবং আসীম ইবন আদী।

কিছু মানুষের কিছুই ছিল না, তবু তাদের যা আছে তা দিতে চেষ্টা করেছেন। এমন একজন ছিলেন আবু উকাইল ﷺ, তিনি হাজির হয়েছিলেন কেবল চারমুঠো খেজুর নিয়ে। মুনাফিকরা তাকে নিয়ে বললো, 'আরে! এই ক'টা খেজুর দিয়ে হবেটা কী! এই লোকের দান আল্লাহর কোনো দরকার নেই!' আর অন্যদিকে আবদুর রাহমান ইবন আউফকে নিয়ে তারা বললো, 'আরে সে তো লোক দেখানোর জন্য এত দান করে

বেড়াচ্ছে।' অন্যদিকে কিছু মানুষ ছিল যারা জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হলো, আর তারা অপছন্দ করলো তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বললো, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। বলুন, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝতো! অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনেক বেশি কাঁদবে।" (সূরা তাওবা, ৯: ৮১, ৮২)

## দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা: মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাকি কুফরি করার স্বাধীনতা?

জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার দায়িত্বভার কারো কাছে অর্পণ করে যেতেন। তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার আমীর হিসেবে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহকে ﷺ নিয়োগ করে যান । আর আলী ইবন আবু তালিবকে ﷺ তাঁর নিজ পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। মুনাফিকরা সবসময়ই সবকিছুর মাঝে দোষ খুঁজে বেড়াত। এবার তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'মুহাম্মাদ আলীকে রেখে গেছে কারণ জিহাদের ময়দানে সে একটা বোঝা।' অথচ আলী ﷺ ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা। স্বাভাবিকভাবেই এই কথাগুলো তাঁর খুব গায়ে লাগলো। আলী ﷺ তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য নবীজির কাছে চলে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ইতিমধ্যে তাঁর বাহিনী নিয়ে আল-জুরফ ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন।

আলী ﷺ নবীজিকে ﷺ মুনাফিকদের মিথ্যাচারের কথা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীর ﷺ মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন,

> *'তারা তো মিথ্যে বলছে, আলী! আমিই তো তোমাকে আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে এসেছি। কাজেই তুমি ফিরে যাও, আমার এবং তোমার পরিবারের দেখাশোনা করো। তুমি কি এটা ভেবে খুশি হও না যে, মূসার ﷺ কাছে হারূন ﷺ যেমন, আমার কাছে তুমি তেমন? পার্থক্য তো শুধু এতটুকুই যে আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না।'*

যখন মূসা ﷺ আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন তখন বনী ইসরায়েলের তত্ত্বাবধান করার জন্য হারূনকে ﷺ রেখে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহও ﷺ ঠিক সেভাবেই আলীকে ﷺ দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই কথা ছিল সাহাবি হিসেবে আলীর ﷺ জন্য এক বিশাল সম্মাননা। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ও আলীর সম্পর্ককে মূসা ও হারুনের ﷺ সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে

শিয়ারা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে টেনে নেয়। তারা বলতে চায়, এই হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল তাঁর মৃত্যুর পর আলীকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। স্পষ্টতই এমন কিছুর ইঙ্গিত এই হাদীসে নেই। আলীকে ﷺ নবীজি ﷺ একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তা হলো তাঁর পরিবারকে দেখাশোনা করা। মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা। শিয়াদের যুক্তি অনুসারে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাই নবীজির পরে খলিফা হওয়ার কথা! কিন্তু সে কথা কখনোই ওঠে না। শিয়ারা এই হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয় তাদের ভুল বিশ্বাসকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য। আহলুস সুন্নাহ এই ঘটনা থেকে সাহাবি হিসেবে আলী ইবন আবূ তালিবের ﷺ বিশেষ মর্যাদার ব্যাপারে শিক্ষা নেয়।

পুরো সীরাত জুড়েই জিহাদের ব্যাপারে মনোবল ভেঙে দেওয়া কথাবার্তা বলার অভ্যাস মুনাফিক্বদের মধ্যে দেখা যায়। তাবুকের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু মুনাফিক্ব বলাবলি করতে লাগলো, 'তোমাদের কি মনে হয় রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা আর আরবদের সাথে যুদ্ধ করা একই কথা? ওদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমরা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ফিরে আসবে।'

জিহাদে রওনা হওয়া সেনাবাহিনী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা কখনোই ভালো অভ্যাস নয়। এ ধরনের কথা সৈনিকদের হৃদয়ে শত্রুদের ব্যাপারে আতঙ্ক জন্ম দেয়। তাদের এই গোপন কথাবার্তাগুলো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল নবীজিকে ﷺ জানিয়ে দেন। নবীজি তখন সেই লোকগুলোর ব্যাপারে আম্মার ইবন ইয়াসিরকে, বললেন, 'থামাও ওদের। ওরা যে কথা বলেছে, সেটা নিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করো। তারা তো নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে বলবে, তোমরা এই-এই কথা বলেছো।' আমর তাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা অমুক-তমুক কথা বলেছো, যাও আল্লাহর রাসূলের কাছে মাফ চেয়ে আসো।' তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললো, 'আমরা তো ঠাট্টা মশকরা করছিলাম মাত্র।' আল্লাহ তখন কুরআনের একটি আয়াত নাযিল করলেন,

> "আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা তো কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।" (সূরা তাওবা, ৯: ৬৫-৬৬)

এই আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কেননা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেছেন, "ছলনা কোরো না, ঈমান আনার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছো।" এই মুনাফিক্বরা বলাবলি করছিল

যে, মুসলিমরা রোমানদের সাথে লজ্জাজনকভাবে হেরে যাবে। তারা মুসলিমদের সামর্থ্য নিয়ে তামাশা করছিল। কুরআনের আয়াত বা হাদীস, আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবি অথবা ইসলামের কোনো নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা খুবই বিপজ্জনক এবং তা কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটা নিফাকের চিহ্ন।

কাজেই কথার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরি। কিছু কৌতুক আছে যেগুলো কুরআনের আয়াত বা সূরা নিয়ে মজা করে, এগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ কৌতুক মনে হলেও এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা এগুলো অনেকসময় ধর্মদ্রোহিতার দিকে ধাবিত করতে পারে। দ্বীন ইসলাম একটি পবিত্র বিষয়। এই দ্বীনকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখা এবং এর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া মুসলিমদের দায়িত্ব। নিজেরা যেমন নিজেদের দ্বীনকে হেয় করা যাবে না, তেমনি অন্য কাউকেও সেই সুযোগ দেওয়া যাবে না।

এই আয়াতের শিক্ষা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। মুসলিমদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এমন কিছু বলা বা প্রচার করা উচিত নয়। হতে পারে মুসলিমরা আসলেই দুর্বল, তাদের মাঝে অনৈক্য আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনভাবে কোনো কথা বলা বা রটানো উচিত নয় যা মুসলিমদের মনোবল ভেঙে দেয়। মুসলিমদের অন্তরে এই ধারণা প্রবেশ করানো উচিত নয় যে, তোমাদের শত্রুরা অজেয়, ওদের সাথে তোমরা কখনো পেরে উঠবে না, তোমাদের কোনো শক্তি নেই, তোমরা দুর্বল, তোমাদের কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই, ইত্যাদি। দায়িত্ব হচ্ছে আশার বাণী সঞ্চার করা, উম্মাহকে উৎসাহ দেওয়া। উম্মাহকে মনে করিয়ে দিতে হবে তারা হলো মানবজাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি। উম্মাহকে তাদের গৌরবময় অতীত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কুফফারের সামর্থ্য, শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে এবং মুসলিমদের মধ্যকার অনৈক্য নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা উচিত নয় যা মুসলিমদের মনোবলকে নষ্ট করে দেয়, তাদের হতোদ্যম করে দেয় এবং তাদের দুরবস্থাকে তাদের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করিয়ে অলস বসিয়ে রাখে। কৌশলগত কারণে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, তবে তা কখনোই যেন মুসলিমদের উদ্যমকে নষ্ট না করে।

## যুদ্ধের ময়দানে

তাবুকের যুদ্ধ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো রোমান ব্যাটালিয়ন বা স্থানীয় আরব খ্রিস্টান কোনো বাহিনীর চিহ্নই দেখা গেল না। কোনো যুদ্ধই হলো না। কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের খবর রোমানদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তাই তাদের আধুনিক সমরাস্ত্র আর বিরাট সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি। সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হতে তারা ভয় পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবস্থান করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই এল না। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি শহর দখল করে তাদের সাথে চুক্তি করেন ও জিযিয়া গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাউমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদকে বন্দী করে আনার জন্য খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ۞ পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বলেই দিয়েছিলেন, 'তুমি দেখবে উকাইদ গাভী শিকারে ব্যস্ত।' হলোও তাই। সেদিন ছিল এক পূর্ণিমার রাত। উকাইদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গাভী শিকারের জন্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ۞ তাকে আক্রমণ করে বন্দী করলেন। উকাইদ জিযিয়া দিতে রাজি হলো। জারবা, আযরা, মাক্না -- এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা জিযিয়া দিতে রাজি হয় এবং ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলো ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা সুরক্ষিত হয় এবং এই অঞ্চলটি রোমান ও মুসলিমদের মাঝে 'বাফার জোন' হিসেবে কাজ করে। এই রাজ্যগুলো যদিও ইতিপূর্বে রোমানদের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু রোমানদের প্রতি তারা খুশি ছিল না। যে কারণে তারা বেশ সহজেই ইসলামের অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে এই অঞ্চলগুলো থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর সামরিক হামলাগুলো পরিচালনা করা হয়।

তাবুকের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনের সর্বশেষ বড় অভিযান। এই যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা।

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন নবীর ওপর, অনুগ্রহ করেছেন মুহাজির ও আনসারদের ওপর, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (এমনকি) যখন তাদের একটি দলের অন্তর বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এদের সবার ওপর দয়া করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।" (সূরা তাওবা, ৯: ১১৭)

এই আয়াত আল্লাহর রাসূলের জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। কেননা ক্ষমা হলো এমন একটি ব্যাপার, যা সমাপ্তির দিকেই আসে। ইবাদাতের শেষ দিকেই আমরা সাধারণত ইস্তিগফার করি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আরও ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই সব আনসার ও মুহাজিরদের যারা কঠিন সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন।

## ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফির জাতিগুলোর প্রতি মুগ্ধতা নয়, করুণা

তাবুকের অভিযানে যাওয়ার পথে মুসলিমরা সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। সামূদ জাতি ছিল স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী এক জাতি। পাথর কেটে তারা বাসা বানাতো। নবী সালিহকে ۞ প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। তাদের রেখে যাওয়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে মুসলিমরা সে দিকে ছুটে যায়। সেখানের কূপগুলো থেকে পানি পান করতে থাকে। বিষয়টা জানতে পেরে আল্লাহর রাসূল ﷺ মোটেই পছন্দ করলেন না, বললেন,

*'তোমরা এ সকল আযাবগ্রস্ত জাতির বাসস্থান থেকে পানি পান করো না এবং এখানকার রুটি নিজেরা খেয়ো না, বরং তা উটদের খাওয়াও কারণ এগুলো অভিশপ্ত। তোমরা এ সকল স্থানে যদি প্রবেশ করতেই চাও তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করো। যদি না কাঁদতে পার, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মতো তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।'[114]*

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই এলাকার পানি ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। ঐ পানি দিয়ে প্রস্তুত করা রুটির মণ্ড উটদের খাইয়ে দিতে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাননি যে সামূদ বা তাদের ভূমি বা তাদের পানির সাথে সাহাবিদের কোনো সম্পৃক্ততা হোক।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদার কথা বলছেন। এর কারণ, এককালের প্রবল পরাক্রমশালী জাতিগুলোর নির্মম পরিণতি দেখে একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় জেগে ওঠা উচিত। আল্লাহর গযবের ভয় এবং নিজের অসহায়ত্বের উপলব্ধি তাকে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে যদি কেউ বিমোহিত হয়, তাহলে সেসব স্থানে যাওয়াই উচিত নয়। কাফির সভ্যতাগুলোর এত প্রাচুর্য আর শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের কী পরিণতি হয়েছে -- শুধু সেই শিক্ষা আর উপলব্ধি নেওয়ার জন্যই এসব স্থানে যাওয়া যেতে পারে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবার জন্য নয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির সভ্যতার ব্যাপারে আমাদের সে রীতিই অবলম্বন করা উচিত যা রাসূল ﷺ শিখিয়ে দিয়েছেন, সেটি হলো তাদেরকে মুগ্ধতা নয়, করুণার চোখে দেখা।

আদিকালের মুশরিকদের ও আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত লোকদের এসব তথাকথিত সভ্যতার ব্যাপারে আমাদের গর্বিত হবার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাবিলন, ফিরআউন কিংবা অন্যান্য কাফির সভ্যতাগুলো ছিল আল্লাহর শত্রু। মুসলিমরা এসব নিয়ে গর্ব করতে পারে না। ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের ইতিহাস ও সভ্যতা নিয়ে মুসলিমদের গর্ব করাটা খুবই দুঃখজনক একটি ব্যাপার। ইসলাম তাদের পরিচয়কে বদলে দিয়েছে এবং সম্মানিত করেছে। কাফিররা এটা অনেকক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করেছে যে, তারা চায় মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস পুনর্জীবিত হোক। এর ফলে ইসলামী ইতিহাসের সাথে তাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে আর সেটাই হচ্ছে। এখন মুসলিমরা মমি বা ফিরআউনের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ছবি তুলছে, পিকনিক করছে এবং পুরো বিষয়টা উপভোগ করছে। কিন্তু বিষয়টা মোটেও হালকাভাবে দেখার মতো নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ধ্বংসাবশেষগুলোকে রেখে দিয়েছেন, যেন মুসলিমরা সতর্ক হতে পারে। এই বাস্তবিক উপস্থাপনা এজন্যই যেন পবিত্র কুরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সচিত্র রূপ চাক্ষুষ সচেতন চোখ খুঁজে পায়।

---

[114] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ২৩। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় যুহদ এবং অন্তর কোমলকারী বিষয়, হাদীস ৪৭।

# তাবুকের যুদ্ধে কিছু টুকরো ঘটনা

## ১) আবদুর রাহমান ইবন আউফের ﷺ ইমামতি

এই অভিযানে কোনো একটি ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দেরি করে ফেলেন। মুসলিমরা তাই সালাতের জন্য ইক্বামাত দেন। আবদুর রহমান ইবন আউফের ইমামতিতে সালাত আদায় শুরু হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে যোগ দিলেন, আবদুর রহমান চাইলেন সালাত থামিয়ে দিতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আবদুর রহমান ইবন আওফের ﷺ পেছনেই সালাত আদায় শেষ করলেন। এর ফলে আব্দুর রহমান ইবন আউফ হলেন একমাত্র সাহাবি যার পিছে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এটি আব্দুর রহমান ইবন আউফের ﷺ একটি বিরাট মর্যাদা।

## ২) আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইনের ﷺ মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সম্মাননা

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তাবুকের যুদ্ধের সময় মাঝরাতে আমি একটি মশাল দেখতে পেলাম। তাই আমি সেটার পিছু নিলাম। কাছে গিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﷺ ও উমারকে ﷺ দেখতে পেলাম। দেখলাম আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন আল মুজানী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমারকে বলছিলেন, তোমাদের ভাইকে কাছে নিয়ে আসো। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে কবরে শায়িত করে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, এই রাতে আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'

আবদুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, সহজ সরল ও অপরিচিত একজন সাহাবি। কিন্তু তার জানাযায় ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ, আবু বকর এবং উমার। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ এই দৃশ্য দেখে বলেন, 'ইশ! এটা যদি আমার কবর হতো!' আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন শহীদকে এতটাই সম্মান দিয়েছিলেন যে অন্য সাহাবিরাও ঈর্ষান্বিত হতেন।

## ৩) 'সে একা এসেছে, একাই চলে যাবে, আর একাই উত্থিত হবে।'

মুসলিম সেনাবাহিনী সুনায়াতুল-ওয়াদা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর আল্লাহর রাসূল ﷺ পুরো বাহিনীর বিভিন্ন ভাগের জন্য কমান্ডার নিযুক্ত করে তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন। এই অভিযানে গাইড ছিলেন ইলক্বিমাহ ইবন আল-ফাঘওয়াহ। আব্বাস ইবন বিশর ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে।

তাবুকের যুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদের দিকে গণ-আহবান করা হয়েছিল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাস করে এমন প্রত্যেক মুসলিম এই আহবানে সাড়া দেয়। তবে অল্প কিছু লোক বাদে। সবার জন্য অপেক্ষা করাও যৌক্তিক ছিল না। যখনই রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলা হতো, 'অমুক যুদ্ধে আসেনি', তখন রাসূলুল্লাহ বলতেন, 'তার কথা বাদ দাও।

তার মধ্যে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে তোমাদের পথ অনুসরণ করাবেন। আর যদি ভালো কিছু না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার হাত থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ যখন বলা হলো, 'আবু যার আমাদের সাথে আসেননি,' তখনও তিনি একই কথা বললেন।

আবু যার ﷺ হচ্ছেন আবু যার আল-গিফারী। তাঁর কথা এর আগেও আলোচনা হয়েছে। তিনি বেশ প্রথমদিকের একজন মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি গিফার গোত্রে ফিরে যান এবং তাঁর দাওয়াহর বদৌলতে গিফার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরতের পর তিনি আর তাঁর গোত্র মদীনায় চলে আসেন।

অগ্রগামী মুসলিম হিসেবে আবু যার তাবুকে অংশ নেবেন, এটাই ছিল কাম্য। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। আসলে আবু যার মূল বাহিনীর পেছনেই ছিলেন, কিন্ত তাঁর উটটি ছিল ধীরগতির। তাই তিনি পিছিয়ে পড়েন। অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে উট থেকে নেমে গিয়ে তপ্ত মরুভূমির বুকে হেঁটেই রওনা দেন। মুসলিমরা দেখতে পেল, দূর দিগন্তে একজন মানুষ, একা হেঁটে আসছে! তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটা যেন আবু যার হয়!' আসলেই তা-ই! সে মানুষটি কাছে এলে দেখা গেল তিনি আর কেউ নন, আবু যার ﷺ। আবু যারের ﷺ আগমনের কথা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আবু যারের ﷺ উপর রহমত বর্ষণ করুন। সে একা এসেছে, একাই চলে যাবে, আর ক্বিয়ামতের দিনে তাঁকে একাই উত্থিত করা হবে।'

আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই ভবিষ্যতবাণী আক্ষরিক অর্থেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল বেশ কিছু বছর পর। তখন উসমান ইবন আফফানের ﷺ খিলাফতকাল। মুসলিম সাম্রাজ্য অঢেল বিত্ত-বৈভব অর্জন করেছে। আবু যার ছিলেন খুব সাদাসিধে একজন মানুষ। বড় হয়েছিলেন কঠিন মরু এলাকায়। স্বভাবে তিনি ছিলেন কিছুটা রাগী এবং কঠোর প্রকৃতির। তিনি ছিলেন একজন যাহিদ-দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি, কঠোরভাবে যুহদ করতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মুসলিমদের প্রয়োজনের বেশি সম্পদ জমা করা হালাল নয়। তিনি মনে করতেন যা কিছু প্রয়োজনের চাইতে বেশি তা দরিদ্রদের দান করা ও অন্যান্য ভালো কাজ ব্যয় করতে হবে। যদিও শক্তিশালী অভিমত হলো, একজন ব্যক্তি তার সম্পদের উপর যাকাত দেওয়ার পর বাকি সম্পদ তার জন্য হালাল হবে এবং সে চাইলে এটা জমা করতে ও রেখে যেতে পারে -- এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। সম্পদ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার অনুমোদন যদি ইসলামে না-ই থাকতো, তাহলে মীরাস বা উত্তরাধিকারের বিধানগুলো থাকার কোনো অর্থই নেই।

যা-ই হোক, আবু যারের ﷺ যুহদ ছিল এতটাই কঠোর যে জনগণ ও শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে তার ঠিকমতো বনিবনা হচ্ছিলো না। উসমানের ﷺ খিলাফতকালে আবু যার শামে ছিলেন। তখন মুআবিয়া ﷺ ছিলেন শামের গভর্নর। রোমানদের সাথে তখন জিহাদ চলছিল, তাই শাম হয়ে উঠে গনিমতের আধার। আর শাম এমনিও বেশ

বরকতময় একটি জায়গা। প্রবল বিত্ত-বৈভবের প্রবাহে আবু যার ﷺ খুশি ছিলেন না। তিনি জনগণকে বকাঝকা করতেন। তারা সম্পদ জমা করতো, সে কারণে তাদের তিরস্কার করতেন। বিষয়টা জনমনে অসন্তোষের জন্ম দেয়। তাই গভর্নর মুআবিয়া ﷺ খলিফা উসমানকে চিঠি দিয়ে আবু যারের ﷺ ব্যাপারে অভিযোগ করে জানালেন তার জন্য শামের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটছে।

উসমান তখন আবু যারকে ﷺ মদীনায় ফিরে আসতে বলেন। কেননা শাম আসলে আবু যারের জন্য উপযুক্ত জায়গা ছিল না। আবু যার শাম ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে এলেন। উসমান ইবন আফফান বললেন তিনি চাইলে মদীনায় থাকতে পারেন। কিন্তু আবু যার বললেন, 'আপনাদের দুনিয়ার সাথে আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। আমাকে আর-রাবদাতে যেতে দিন।'

আর-রাবদাহ মদীনার কাছেই মরুভূমিতে ছোট্ট একটি গ্রামের মতো। উসমান আবু যারকে ছেড়ে দিলেন, জোরাজুরি করলেন না। তিনি এতটাই দুনিয়াবিমুখ ছিলেন যে মুসলিমদের দুনিয়াবী সমৃদ্ধি হবে -- এই দৃশ্য তার একেবারেই ভালো লাগছিল না। উসমান তাকে বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু উট দিতে চাই।' আবু যার বললেন, 'না আমি এসব চাই না। আমি নিজে নিজের মতো চলতে পারবো।' আবু যার ﷺ আর-রাবদায় চলে গেলেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

আবু যার একা একা জীবন কাটাতে লাগলেন, আল্লাহর ইবাদাতে ডুবে থাকলেন। একসময় তার মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। মৃত্যুশয্যায় তখন মরুভূমির মাঝখানে তাঁর সাথে ছিলেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী এবং সেবক। কোনো প্রতিবেশি বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। যে মহান সাহাবি একসময়ে ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ সঙ্গী, আবু বাকর, উমার ও উসমানের ﷺ সময়ে তিনি ছিলেন একজন আলিম, একজন মুফতি -- অথচ দুনিয়া ত্যাগ করার সময় তিনি আজ সম্পূর্ণ একা। কোনো ছাত্র বা বন্ধু -- কেউই নেই। তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। আবু যার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'তুমি কীভাবে আশা করো আমি কাঁদবো না? তুমি মারা যাচ্ছো আর তোমাকে দাফন করার মতো কিছুই আমার নেই। তোমাকে একা দাফন করার মতো শক্তিও আমার নেই।'

আবু যার তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কেঁদো না, আমি এক জমায়েতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে একজন এক শূন্য ভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তাঁর দাফন প্রত্যক্ষ করবে মু'মিনদের একটি দল। সেই জমায়েতের আমি ছাড়া সবাই মারা গেছে। তারা সকলেই দলবদ্ধ ছিলেন। কাজেই আমিই সেই ব্যক্তি যে একা একা মৃত্যুবরণ করে হাদীসটিকে সত্য প্রমাণ করবো। তুমি বরং বাইরে যাও আর গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রাখো। যখন আমি মারা যাবো, আমাকে গোসল দিও, কাফনে ঢেকে দিও। আর আমাকে রাস্তার ওপাশে রেখে এসো। যে মুসাফির দলের সাক্ষাৎ তুমি পাবে, তাদেরকে বলবে, এ হচ্ছে আবু যার...'

আবু যার ﷺ একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তার স্ত্রী এবং সেবক তার কথামতো সবকিছু করলেন। তার স্ত্রী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন একটি কাফেলা আসবে এবং তার স্বামীকে দাফন করবে। অবশেষে একটি কাফেলা এল। সেই কাফেলাটি আসছিল কুফা থেকে, সেখানে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ যখন জানলেন, এটা আবু যারের ﷺ লাশ, তখনি তার মনে পড়ে গেল আল্লাহর রাসূলের ﷺ সেই হাদীস। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সত্যই বলেছিলেন: আবু যার ﷺ একা এসেছে, একাই যাবে আর একাই পুনরুত্থিত হবে।' এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আবু যারের ﷺ জানাযায় ইমামতি করলেন। আবু যারের ﷺ দাফন সম্পন্ন হলো।

আবু যার ﷺ ক্ষমতা আর নেতৃত্বকে তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। একবার আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আবু যার ﷺ তখন ঘরের কাজ করছিলেন। ভাই হিসেবে তাকে সাহায্য করতে গেলে আবু যার ﷺ তাকে বলেন, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।' আবু মূসা ﷺ বললেন, 'আমি তো তোমার ভাই!' আবু যার ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন, 'না! নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত তুমি আমার ভাই ছিলে!' আমীর হিসেবে নিযুক্ত বা সরকারি কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি থেকে আবু যার ﷺ দূরত্ব বজায় রাখতেন।

আবু যারের ﷺ মতো জীবনযাপন করা হয়তো এখন সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের অবস্থাকে আবু যারের জীবনের সাথে অন্তত তুলনা করে দেখা সম্ভব। এখন মুসলিমদের জীবনে প্রাচুর্য আছে, জীবনের নিরাপত্তা আছে, আছে সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্য। আবু যারের সেসব কিছুই ছিল না। কাফনের জন্য একটুকরো ভালো কাপড়ও ছিল না। কিন্তু ছিল তাকওয়া, যা এখন দুর্লভ। তাই মুসলিমদের আজ সব থেকেও নেই।

### ৪) আবু খাইসামার ﷺ কাহিনী

পিছিয়ে থাকা সাহাবিদের মধ্যে আরও একজন ছিলেন আবু খাইসামা আল-আনসারী ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্য মুসলিমরা যখন অভিযানে, আবু খাইসামা তখন বসে আছেন *'আরিশে।'* আরিশ গাছের ডাল দিয়ে বানানো একধরনের বিশেষ কুঁড়েঘর। গরমকালে সেই ঘরের উপরে পানি ঢালা হলে তা শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যেত। বলা যেতে পারে আরিশ ছিল প্রাকৃতিক এয়ারকন্ডিশনার। তাঁর দুই ঘরে ছিল দুইজন স্ত্রী। আবু খাইসামা ﷺ ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর স্ত্রীরা তাঁর জন্য খাবার পানীয় প্রস্তুত করে রেখেছেন।

হঠাৎ তার মনে হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তপ্ত সূর্য আর গরম বাতাসে বসে আছেন আর আবু খাইসামা বসে আছে সুশীতল ছায়ায়, সুস্বাদু খাবার আর সুন্দরী স্ত্রীদের সাথে! এ হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমি এই দুই ঘরের একটিতেও প্রবেশ করবো না যতক্ষণ না আমি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করি। কাজেই তোমার আমার জন্য আমার রসদ প্রস্তুত করো।'

তার স্ত্রীরা তার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে দিলেন। আবু খাইসামা ﷺ উটের পিঠে চড়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান । যাত্রাপথে উমায়ের ইবন ওয়াহাবকে ﷺ সঙ্গী হিসাবে পেয়ে যান । উমায়ের ﷺ সম্ভবত মক্কা থেকে আসছিলেন বা অন্য কোনো কারণে তার দেরি হয়। তাবুক গিয়েই তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাফেলার দেখা পান। আবু খাইসামা উমায়েরকে ﷺ অনুরোধ করলেন যেন তিনি একা গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলতে পারেন। উমায়ের ﷺ তার অনুরোধ রাখলেন।

দূর থেকে সাহাবিরা দেখলেন, কেউ একজন আসছে! আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা যেন আবু খাইসামাই হয়!' আবু খাইসামা ﷺ কাছে এলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি তো নিজেকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলে, আবু খাইসামা!' আবু খাইসামা ﷺ এরপর রাসূলুল্লাহকে ﷺ পুরো ঘটনা খুলে বলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। একজন আদর্শ নেতা হিসেবে তাঁকে সাবধান করলেন এবং তাঁর প্রতি দয়াও করলেন।

আবু খাইসামার ﷺ কাহিনী থেকে শিক্ষা হলো, একজন মুসলিম হোঁচট খায়, কিন্তু হোঁচট খেয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। একজন মুসলিম ভুল করে, কিন্তু তার বিবেক তাকে শোধরাতে বাধ্য করে। একজন মুসলিম দ্বীনের মধ্যে পিছিয়ে পড়ে, কিন্তু সে অনুশোচনা করে আর সেই অনুশোচনা তাকে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়।

> "আল্লাহ তাআলাকে যারা ভয় করে, যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা কখনো তাদের স্পর্শ করে, তবে সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের চোখ খুলে যায়।" (সূরা আরাফ, ৭: ২০১)

# মাসজিদ আদ-দ্বিরার

## মুনাফিকদের মাসজিদ

মদীনা থেকে রওনা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ একটি নবনির্মিত মসজিদে সালাত পড়ার জন্য আহবান করা হয়েছিল। মদীনার পাশের কিছু লোক মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। তারা নবীজিকে ﷺ বললো, 'আমরা চাই এই মসজিদে সালাত আদায় করে আপনি একে বরকতময় করে তুলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'এখন তো আমরা সফরে আছি। যখন আমি ফিরে আসবো, ইনশাআল্লাহ তখন সালাত আদায় করবো।'

এই মসজিদের কাহিনী সম্পর্কে জানার আগে আবু আমীর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সে ছিল খাযরাজ গোত্রের এক বিশিষ্ট নেতা। জাহিলিয়াতের সময়ে তার নাম ছিল আবু আমীর আর-রাহীব। রাহীব মানে পাদ্রী, কারণ সে ছিল আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক। সে

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। খাযরাজের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও সে তার ধর্মেই অটল থাকে। শুরু থেকেই তার ছিল প্রবল ইসলামবিদ্বেষ। উহুদের যুদ্ধে সে ছিল কুরাইশ পক্ষের শক্তি। তার খনন করা গর্তে পড়েই আল্লাহর রাসূলের ﷺ দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ থেকে কিছু লোহার টুকরা উনার গালের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিল না। এই অবস্থায় সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হিরাক্লিয়াসের সাথে দেখা করতে যায় এবং মদীনা দখল করার জন্য তাকে সেনাবাহিনী পাঠাতে আহবান করে। হিরাক্লিয়াস তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে কথা দেয়।

আবু আমীর প্রায়ই মদীনায় তার বন্ধু মুনাফিক্বদের চিঠি লিখে আশ্বাস দিতো যে ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সে সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হবে। সে তাদেরকে অনুরোধ করলো তারা যেন নিজস্ব একটি ঘাঁটি তৈরি করে যেখানে বসে তারা নিজেদের এজেন্ডা ছড়িয়ে দিতে পারবে, ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি করবে, নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও যোগাযোগ রক্ষা করবে। তার চিঠির সূত্র ধরে মুনাফিক্বরা মসজিদে কুবার পাশে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদে সালাত আদায় করতেই নবীজিকে ﷺ আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের যুক্তি ছিল শীতের দিনে দুর্বল ও অসুস্থ লোকেরা যেন ঘরের কাছে সালাত আদায় করতে পারে সেজন্য তারা মসজিদটি নির্মাণ করেছে। এ মসজিদ নিয়ে যেন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয় এজন্য তারা আল্লাহর রাসূলকে সেখানে সালাত আদায় করতে অনুরোধ করে। কারণ আল্লাহর রাসূলের সালাত আদায় করার অর্থ সেই মসজিদকে বৈধতা দেওয়া। নতুন নির্মাণকৃত মসজিদটি ছিল মুনাফিক্বদের একটি ঘাঁটি।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সেখানে কখনোই সালাত আদায় করেননি। তাবুক থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ওয়াহীর মাধ্যমে মুনাফিক্বদের এই পরিকল্পনা প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

> “(মুনাফিক্বদের মধ্যে) যারা (তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য) মাসজিদ দ্বিরার নির্মাণ করেছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা, মু’মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আগে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, তাদের জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করা। তারা তোমাদের কাছে কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (এটা) করিনি। আল্লাহ তাআলা নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
>
> তুমি (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) কখনো সেখানে দাঁড়াবে না। তোমার তো দাঁড়ানো উচিত সেখানে, যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে রয়েছে এমন কিছু লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।” (সূরা তাওবা, ৯: ১০৭-১০৮)

আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বরং এমন মসজিদে সালাত আদায় করতে বলেছেন যেটা প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে মু'মিনরা থাকে, যারা পবিত্র হতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর এই মসজিদকে আগুনে পুড়িয়ে মাটির সাথে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন ।

> “যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির ওপর -- সে ব্যক্তি উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত্তি দাঁড়া করিয়েছে কোনো গহবরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম এবং যা তাকে সহ অচিরেই জাহান্নামের গিয়ে পড়বে? আর আল্লাহ্ জালিমদের পথ দেখান না। তাদের নির্মিত ঘরটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা তাওবা, ৯: ১০৯-১১০)

## মসজিদ আল-দ্বিরারের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) মসজিদ আদ-দ্বিরার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুনাফিক্বরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই মসজিদের মাধ্যমে তাদের ইসলামবিদ্বেষী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ দিয়ে সেখানে সালাত আদায় করিয়ে তাদের এই কার্যক্রমের বৈধতা আদায় করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা এই মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন -- দুররান ওয়া কুফরান ওয়া তাফরিক্বান। অর্থাৎ এটা এমন এক মসজিদ যা ক্ষতিসাধন করে, কুফরি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

খোদ আল্লাহর রাসূলের ﷺ যুগেই যদি মুনাফিক্বরা এমন কাজ করার সাহস করে, তাহলে বর্তমান যুগে এই ফিতনার স্বরূপ কী হতে পারে তা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সরকার ও রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রভাব খাটানোর জন্য মসজিদগুলোকে ব্যবহার করছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য আলিমদের ব্যবহার করে ফতোয়া প্রদান করাচ্ছে। কাজেই, বর্তমান সময়ের কোনো মসজিদ যদি কাফিরদের এজেন্ডা প্রচার করে, তাহলে সেটিও মসজিদ আল-দ্বিরারের সমতুল্য। দ্বীনের শত্রুদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক হতে হবে।

২) *আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা* -- অর্থাৎ, কাফিররা এক মিল্লাত বা এক জাতি। আবু আমীর ছিল একজন খ্রিস্টান। আক্বীদার বিচারে খ্রিস্টধর্ম ইসলামের কাছাকাছি, কারণ খ্রিস্টধর্ম মূলত তাওহীদবাদী একটি ধর্ম। যদিও খ্রিস্টানরা তাওহীদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখেনি। সে তুলনায় মুশরিকদের আক্বীদা মৌলিকভাবে শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একজন খ্রিস্টান হয়েও আবু আমীর মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেছে এবং মুশরিকদের আপন করে নিয়েছে। আল্লাহর রাসূল তার নাম বদলে রেখেছিলেন আবু আমীর আল-ফাসিক্ব, কারণ সে ছিল নীতিহীন, পথভ্রষ্ট একটি লোক।

# তাবুকের অভিযান থেকে শিক্ষা

যাদ আল মাআদ কিতাবে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাবুকের অভিযান থেকে কিছু কল্যাণকর শিক্ষার কথা তুলে ধরেন।

১) যদি ইমাম (খলিফা) যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন তাহলে তাতে সাড়া দেওয়া প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম অনুমতি দিলেই পেছনে বসে থাকার অনুমতি আছে। যে তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ করা ফরয হয়, এর মধ্যে এটি একটি। বাকি দুটো ক্ষেত্র হলো যখন শত্রুরা মুসলিম ভূমি দখল করে আর যখন দুটি সৈন্যদল ময়দানে মুখোমুখি হয়।

২) জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে জান ও মাল দুটো দিয়েই সমর্থন করা বাধ্যতামূলক। কারণ, কুরআনে যখনই জিহাদের কথা এসেছে, জান ও মাল দুটোর কথাই এসেছে এবং শুধুমাত্র একটি আয়াত ছাড়া প্রতিবারই মালের কথা জানের আগে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন যোদ্ধাকে অর্থায়ন করে, সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো।' যাদেরই আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তাদেরই জিহাদের পেছনে অর্থায়ন করা বাধ্যতামূলক, যেভাবে জান দিয়ে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক। কারণ জিহাদ তখনই সফল হয়, যখন যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্যবাহিনী ও অর্থায়ন মজুদ থাকে। কেউ যদি যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়, তার জন্য সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। তার কোনো অজুহাতই প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রমাণ করেছে সে সম্পদ দিয়ে জিহাদ করতে অসমর্থ।

৩) সামূদের কূপের পানি পান করা, সে পানি ব্যবহার করে রান্না করা, রুটির মণ্ড তৈরি করা বা তাতে অযু করা জায়েজ নয়। কারণ হলো এদের ওপর আল্লাহ তাআলার গজব আপতিত হয়েছে। কেউ যখন আল্লাহর শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদের স্থান বা বাসস্থানের পাশ দিয়ে যায় তখন তাতে প্রবেশ করা উচিৎ নয় বা সেখানে অবস্থান করা উচিৎ নয়। যত দ্রুত সম্ভব সেটা পার হয়ে যেতে হবে এবং যতক্ষণ না সেই স্থান পার হচ্ছে ততক্ষণ মুখ ঢেকে রাখা উচিৎ। মূল কথা হলো, এরকম স্থান যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিৎ, অথবা কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করা উচিত। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া এ ধরনের স্থানে প্রবেশ করা উচিৎ নয়।

# পেছনে থেকে একজন যাওয়া মু'মিন: কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ঘটনা

একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে তাবুকের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ঘটনাটি ইতিহাসে কা'ব ইবন মালিকের হাদীস ﷺ নামে পরিচিত। কাহিনীটি সহীহ বুখারী এবং সীরাহর অন্যান্য কিতাবে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এই কাহিনী বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা এখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন

সম্মানিত সাহাবির জীবনের এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও রয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে একজন নিবেদিত সাহাবির ঘটনা। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় সদা প্রস্তুত এক অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু মানবিক ভুলের কারণে, নফসের ধোঁকায় পড়ে কেবল একবারই তিনি আল্লাহর রাস্তায় পিছিয়ে পড়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর সৎকর্ম, তারবিয়্যাহ আর ঈমানের জোরে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পান। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ এই কাহিনী সবচেয়ে চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে তাঁর নিজের ভাষ্যেই। তাঁর উদ্ধৃতিতেই ঘটনাটি জেনে নেওয়া যাক।

*'আল্লাহর রাসূল ﷺ যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছেন, তার মধ্যে তাবুক ছাড়া আর কোনো অভিযানে আমি পেছনে পড়ে থাকিনি। তবে হ্যাঁ, বদরে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি সত্যি, তবে বদরে যারা অংশ নেয়নি, তাদের কাউকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সমালোচনা বা নিন্দা করেননি। কারণ বদরের অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক যুদ্ধের নিয়তে বের হননি, উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণ করা। কিন্তু আল্লাহ দুই বাহিনীকে মুখোমুখি করেন। যদিও তাদের কারোরই যুদ্ধের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তবে আমি আকাবার রাতে উপস্থিত ছিলাম। সে রাতে আমরা আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইয়াত দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে, আমাকে যদি আকাবার বিনিময়ে বদরে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, আমি রাজি হতাম না, যদিও আকাবার রাত থেকে বদর যুদ্ধ মানুষের কাছে অনেক বেশি বিখ্যাত।*

*তাবুকের অভিযানে আমার সামর্থ্যের কোনো কমতি ছিল না। অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে সেবারের অবস্থা ছিল ভালো। সেবার আমার মালিকানায় দু-দুটো সাওয়ারী উট ছিল। এর আগে কখনো এমন ছিল না।*

*আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন কোনো অভিযানে যেতেন, সাধারণত তিনি তাঁর আসল গন্তব্য প্রকাশ করতেন না। ভান করতেন অন্য কোথাও যাচ্ছেন। কিন্তু তাবুকের অভিযানে ঘটনা ছিল ভিন্ন। সেটা ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে আর মুখোমুখি হতে হবে এক বিশাল সেনাবাহিনীর। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ সে অভিযানের গন্তব্য সম্পর্কে আগেভাগেই মুসলিমদের জানিয়ে দেন যেন তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি অভিযানের গন্তব্য পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন ।*

*আল্লাহর রাসূলের সাথে সেইবার ছিল অনেক, অনেক মুসলিম। তখন কোনো দিওয়ান (রেজিস্ট্রি ব্যবস্থা) ছিল না। তাই কেউ যদি অভিযানে না গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইত, সেটা জানাজানি হওয়ার মতো কোনো ভয় ছিল না। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী এসে বিষয়টা প্রকাশ করে দিলে সেটি ভিন্ন কথা।*

*তখন ফল পেকে এসেছে। গাছের মনোরম ছায়ার নিচে বসে উপভোগ করার উপযুক্ত সময়। এমন সময়েই মুসলিমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। আমিও তাদের সাথে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্যত হলাম। কিন্তু কেন যেন কাজ এগোচ্ছিল*

না। আজ না কাল করতে করতে প্রতিদিনই নিজেকে বলতাম, আরে, আমি তো পারবো, এটা কোনো ব্যাপার না।

এভাবে দিন যেতে থাকে আর আমি দেরি করতে থাকি। ওদিকে বাকিরা নিজেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর মুসলিম বাহিনী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তখনো প্রস্তুতির কিছুই করিনি। নিজেকে প্রবোধ দিলাম, দুই-একদিনের মধ্যেই সবকিছু গোছগাছ করে রওনা হয়ে যাবো আর মাঝপথে তাদের সাথে যোগ দেবো। তারা বেরিয়ে পড়লো। আমি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বের হলাম, কিন্তু আগের মতোই কাজের কাজ কিছু না করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমি পরদিন সকালে আবার বের হলাম। আবারও তেমন কোনো কাজ না এগিয়েই বাড়ি ফিরে আসলাম, কিছুই করা হলো না। এভাবে গড়িমসি করে দিন যেতে থাকলো। ততদিনে তারা বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। আমি তখনও ভাবছিলাম আমি বের হয়ে পড়ব আর তাদের ধরে ফেলব। ইশ! আমি যদি তা-ই করতাম!

কিন্তু সেটা আমার তাক্বদীরে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাওয়ার পর তখন মদীনায় ছিল শুধু দুর্বল আর অক্ষম পুরুষেরা। এদেরকে আল্লাহ আগেই অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আর ছিল মুনাফিক্বের দল। রাস্তায় বের হলে এদের দেখে আমি দুঃখে শেষ হয়ে যেতাম।

তাবুকে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবুকে পৌঁছার পর হঠাৎ এক মজলিসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'বের কী হয়েছে? বনু সালামার (কা'বের رضي الله عنه গোত্র) এক লোক উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়ার মায়া তাকে আটকে দিয়েছে। সে বসে থেকে ডানে-বাঁয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। (অর্থাৎ, সে মুগ্ধ নয়নে তার সম্পদের দিকে চেয়ে বসে আছে, ধনসম্পদ আর আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি)

মুআয ইবন জাবাল رضي الله عنه বললেন, কী বাজে কথা বলছো! ইয়া আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তো কা'ব সম্পর্কে ভালো কথাই জানি। আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন।

পরে যখন জানতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দিকে ফিরে আসছেন, তখন আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, কোনো একটা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে পার পেয়ে যাবো। নিজেকে বললাম, কীভাবে আল্লাহর রাসূলের রাগ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। পরিবারের জ্ঞানীগুণী সদস্যদের সাথে পরামর্শ করলাম। কিন্তু যখনই শুনলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রায় চলে এসেছেন, আমার মাথা থেকে মিথ্যা বলার চিন্তা দূর হয়ে গেল। ভাবলাম, মিথ্যা বলে এই অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য কথাই বলব।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ এসে পৌঁছলেন। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি সবসময় আগে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন। তারপর সেখানে মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। যারা পেছনে পড়ে ছিল, তারা সবাই আসলো। আল্লাহর রাসূলের কাছে জিহাদে না যাওয়ার অজুহাত পেশ করলো আর আল্লাহর নামে কসম করা শুরু করলো। সব মিলিয়ে এমন অজুহাতকারীর সংখ্যা ছিল ৮৩ থেকে ৮৯ জন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বাহ্যিক অজুহাত গ্রহণ করে নিয়ে তাদের জন্য মাফ চেয়ে আল্লাহর দুআ করলেন। আর তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ দিকে এগিয়ে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে শুষ্ক হাসি হাসলেন। কিন্তু সে হাসির মধ্যে রাগ ছিল। বললেন, এদিকে আসো। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি থেকে গিয়েছিলে কেন? তুমি কি সাওয়ারী কেনোনি?

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ যদি আপনার বদলে দুনিয়ার অন্য কারো সামনে বসতাম, আমি জানি তাকে যেকোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যেতাম। সত্যি বলতে, আমি কথাবার্তায় বেশ পারদর্শী আর ভালো তর্ক করতে জানি। আমি যদি আজ আপনাকে মিথ্যা বলি, হয়তো সাময়িকভাবে আপনি আমার ওপর খুশি হবেন, কিন্তু সেইদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আপনাকে সত্যটা বলি, তাহলে আপনি হয়তো আমার ওপর নাখোশ হবেন। কিন্তু আমি আশা করি আল্লাহ আমার সত্যবাদিতার জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। নাহ, এই জিহাদে না যাওয়ার পেছনে আমার গ্রহণযোগ্য কোনো অজুহাত ছিল না। শক্তি আর সামর্থ্যের কথা যদি বলি, এই অভিযানের সময়টায় আমি যতটা শক্তিশালী আর সামর্থ্যবান ছিলাম, তা আর কখনোই ছিলাম না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছো। কাজেই তুমি উঠে দাঁড়াও এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। বনু সালামার কিছু লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে গেল। তারা আমাকে বললো, তোমাকে তো এর আগে কখনো আমরা গুনাহ করতে দেখিনি। তুমি তো চাইলেই অন্যদের মতো একটা অজুহাত পেশ করতে পারতে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার জন্য জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে দুআ করলে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যেত। তারা আমার সমালোচনা করতেই থাকলো। এক পর্যায়ে আমি ভাবলাম -- আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে ফিরে গিয়ে কোনো একটা অজুহাত পেশ করি আর আগের স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিই।

কিন্তু আমি তার আগে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমার মতো আর কেউ আছে যারা একই কাজ করেছে? তারা বললো, হ্যাঁ, আরও দু'জন আছে তোমার মতো। তাঁরাও রাসূলুল্লাহকে একই কথা বলেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই দু'জনকেও একই

উত্তর দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই দু'জন কারা? তারা বললো, মুরারাহ ইবন আর-রাবী ও হিলাল ইবন উমাইয়্যা।

এই দুইজন ছিল আল্লাহর নেককার বান্দা। তারা বদরে অংশ নিয়েছিল। আমি তাদেরকে নিজের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করলাম। আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে ফিরে গিয়ে মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা বাদ দিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সব মুসলিমদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল আমাদের তিনজনের ওপরই আরোপ করা হয়। বাকি যারা জিহাদে না গিয়ে পেছনে পড়ে ছিল, তাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আমরা মানুষজন থেকে দূরে দূরে থাকলাম আর আমাদের প্রতি তাদের আচরণ কেমন যেন হয়ে গেল। নিজ ভূমে হয়ে গেলাম পরবাসী। সবকিছুকে কেমন যেন অপরিচিত ঠেকত, এই দেশ যেন আর আমার নয়!

আমার অন্য দুই সাথী হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে কান্নাকাটি করতো। আমি ছিলাম তিন জনের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট আর শক্তমনের। আমি ঠিকই বের হতাম, মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করতাম, বাজারে ঘুরাঘুরি করতাম। কিন্তু কেউই আমার সাথে কথা বলতো না। এমনকি আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছেও যেতাম। সালাতের পর যখন তিনি অন্যদের সাথে বসতেন, আমি তাঁকে সালাম দিতাম। তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতাম তিনি আমার সালামের জবাব দিচ্ছেন কি না। সালাতের সময় তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতাম আর তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাতাম। আমি সালাতে দাঁড়ালে তিনি আমার দিকে তাকাতেন। কিন্তু চোখে চোখ পড়ামাত্র তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

মানুষের কঠোরতা আর এড়িয়ে চলা -- এই অবস্থা চললো দীর্ঘদিন ধরে। এভাবে আর থাকতে না পেরে আমি একদিন মরিয়া হয়ে আবু কাতাদাহর বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকে পড়লাম। সে ছিল আমার ভাই আর খুব কাছের একজন মানুষ। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সে জবাব দিল না। বললাম, আবু কাতাদাহ, আল্লাহর কসম করে বলো তো -- আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি না? সে কোনো উত্তরই দিল না। আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে তবু চুপ করে রইল। আমি আবার মিনতি করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে শুধু এতটুকুই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি মুখ ফিরিয়ে দেওয়াল টপকে ফিরে এলাম।

আরেকদিনের ঘটনা, আমি মদীনার বাজারে হাঁটছি। শামের এক কৃষক মদীনার বাজারে খাবার বিক্রি করতে আসত। সে বললো, কে আমাকে কা'ব ইবন মালিকের কাছে নিয়ে যাবে? মানুষজন আমাকে দেখিয়ে দিল। সে আমার জন্যএকটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। চিঠিটি পাঠিয়েছিল গাসসানের রাজা। আমি পড়তে ও লিখতে জানতাম। তখনই চিঠিটা খুলে পড়লাম। সেখানে লেখা ছিল:

আমি জেনেছি যে আপনার সঙ্গী আপনাকে পরিত্যাগ করেছে। এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেননি। আপনি বরং আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা মুহাম্মাদের চেয়েও ভালোভাবে আপনার দেখভাল করবো।

চিঠিটি পড়ে নিজেকে বললাম, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। আমি চিঠিটি পুড়িয়ে ফেললাম।

চল্লিশ রাত পার হয়ে গেল। এরপর আল্লাহর রাসূলের ﷺ পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক এল। সে এসে আমাকে বললো, আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হতে আদেশ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দেবো? সে উত্তর দিলো, না, শুধু তার থেকে দূরে থাকবে, তার কাছে যাবে না। আমার অন্য দুই সাথীকেও একই আদেশ করা হলো।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে একটি ফায়সালা করা পর্যন্ত তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকো। হিলাল ইবন উমাইয়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুরোধ করলো, আল্লাহর রাসূল, হিলাল একজন গরীব, বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর সেবা করার মতো কেউ নেই। আমি যদি তার সেবা-শুশ্রূষা করি, তাতে কি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, ঠিক আছে, সেটা করতে পারো। কিন্তু তার কাছে যেও না (অর্থাৎ তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক থেকে দূরে থেকো)। হিলালের স্ত্রী তখন বললো, আল্লাহর কসম, এই ঘটনার পর থেকে সে সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে কেবল কেঁদেই যাচ্ছে।

আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বললো, তুমিও কেন আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করছো না? হয়তো তিনি তোমাকেও স্ত্রীকে কাছে রাখার অনুমতি দিবেন। আমি বললাম, না আমি এমনটা করবো না। আমি জানি না তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন কি না, আমি তো একজন যুবক ।

এরপর কেটে গেল আরও দশটি রাত। আমাদের সাথে লোকেদের কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মোট পঞ্চাশটি রাত পার হলো। পঞ্চাশ দিন পর আমি সকালে বাড়ির ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল বিধ্বস্ত। বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল সংকীর্ণ -- যেমনটা কুরআনে আল্লাহ বলেছেন। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনলাম। সালা পাহাড়ের উপরে উঠে কেউ আমাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললো, কা'ব ইবন মালিক, খুশি হও! আমি সাথে সাথেই সিজদায় পড়ে গেলাম। অনুভব করলাম মুক্তি এসে গেছে! আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে ঘোষণা করলেন আমাদের তাওবা কবুল হয়েছে। মানুষজন আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটে আসলো। কেউ কেউ আমার বাকী দুই সাথীর কাছে সুসংবাদ নিয়ে ছুটে গেল।

যে আমাকে চিৎকার করে সুসংবাদ দিয়েছিল, আমি পুরস্কারস্বরূপ আমার শরীর থেকে দুটো জামা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আমার কাছে ছিলই এই দুটো জামা। তাই আমি আরেকজনের কাছ থেকে দুটো জামা ধার করে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ছুটে গেলাম। মানুষজন আমার সাথে দলে দলে সাক্ষাত করতে এগিয়ে আসলো। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো এই বলে, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন। তাই তোমায় অভিনন্দন! মসজিদে ঢুকে দেখি ভেতরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসে আছেন আর বাকিরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ﵁ আমাকে দেখে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসলো। আমার সাথে হাত মিলিয়ে অভিনন্দন জানালো। মুহাজিরদের মধ্যে কেবল তালহাই এগিয়ে এসেছিল। তালহার এই স্মৃতি আমি জীবনেও ভুলবো না। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সালাম দিতে গিয়ে দেখতে পেলাম তাঁর চেহারা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। তিনি আমাকে বললেন, আনন্দিত হও, কাব। তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজকের দিনই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন! কা'ব ইবন মালিক ﵁ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল, এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে! রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুব খুশি হতেন তখন তাঁর মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করতো, দেখে মনে হতো এক টুকরো চাঁদ!

আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললাম, তাওবার অংশ হিসেবে আমি চাই আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় সাদাকাহ করে দিতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিজের জন্যেও কিছু রাখো, সেটাই বরং তোমার জন্য বেশি ভালো। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে খাইবারের অংশ আমি আমার নিজের জন্য রাখলাম। হে আল্লাহর রাসূল, আমার সততা আর সত্যবাদিতার জন্য আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। কাজেই তাওবা কবুলের নিদর্শনস্বরূপ আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, কেবল সত্য কথাই বলবো। আল্লাহর কসম, সেদিনের পর আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোনো মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এমন নিয়ামত আল্লাহ দান করেছেন বলে জানি না, যেমনটা তিনি আমাকে দান করেছেন। যেদিন রাসূলুল্লাহর সামনে বসে সত্য কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা রাখি, বাকী জীবনও আল্লাহ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন।

> “অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মুহাজিরদের উপর, আনসারদের উপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল তাঁদের সবার উপর, এমনকি তাঁদের একটি (ছোট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এঁদের সবার উপর দয়া করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন তাঁদের সবার প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। সেই তিন ব্যক্তির উপরও (আল্লাহ তাআলা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত স্থগিত করে রাখা হয়েছিল, (তাঁদের অবস্থা) এমন এক পর্যায়ে (এসে পৌঁছুল) যে, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও,

তাঁদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল, (এমনকি) তাঁদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে গেল, তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে, অতঃপর আল্লাহ তাঁদের উপর অনুগ্রহ করলেন যাতে তাঁরা পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ১১৭-১১৯)

আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সৎ হতে পারাটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিআমত। সত্যি বলতে, হিদায়াত লাভের পর এটাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিআমত। আমি যদি তাঁর সাথে মিথ্যা বলতাম, তাহলে মিথ্যাবাদীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে যখন ওয়াহী এল, তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যতটা রূঢ়ভাবে কথা বলেছেন, সেভাবে আর কারো ব্যাপারে বলেননি।

"যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন অচিরেই তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই তারা অপবিত্র এবং জাহান্নাম হলো তাদের আশ্রয়স্থল। তারা যা অর্জন করতো, তার প্রতিফলস্বরূপ। তারা শপথ করবে তোমাদের নিকট, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতএব তোমরা যদিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক কওমের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।" (সূরা তাওবা, ৯: ৯৫-৯৬)'

## কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

### ১) আল্লাহর সাথে সততা

কাব ইবন মালিকের বর্ণনাই বলে দেয় যে, তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। এক কথায় তার বর্ণনাটা চমৎকার, কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেও জানতেন আল্লাহ তাকে সুন্দর করে কথা বলার গুণ দিয়েছেন। তিনি চাইলে এই গুণকে কাজে লাগিয়ে তার জিহাদে না যাওয়ার পেছনে সুন্দর একটা অজুহাত তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর এই নিআমতকে তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি।

কাব ইবন মালিক ﷺ ছিলেন একজন কবি। ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের ﷺ খেদমতে যারা নিজেদের কাব্যপ্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, কা'ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। মদীনার তিন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন হাসসান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﷺ। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, আমাকে তর্ক-বিতর্ক করার গুণ দেওয়া হয়েছে। মানে তিনি চাইলেই মানুষকে কিছু একটা বুঝ দিতে পারতেন। অন্য কথায়, তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব সহজেই এমন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারতাম, যা শুনতে যৌক্তিক আর সঠিক

মনে হবে। কিন্তু আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে এমন করে আমি বেশি দূর যেতে পারবো না। আপনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াহীর মাধ্যমে আমার কুকর্ম ফাঁস করে দিবেন। এজন্য আমি সত্যটাই বলবো।

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিমরা কুফরি শক্তির ভয়াবহ আগ্রাসনের শিকার। এই আগ্রাসন সর্বাত্মক -- সামরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো মোটেও সহজ নয়। যারাই এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাদের বিরুদ্ধেই কুফরি শক্তি উঠে পড়ে লাগে। সত্য কথা বলার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, মূল্য দিতে হয়। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা সবার থাকে না। সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন অনেক আলিম ও দাঈ এই অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে চায় না। উল্টো তারা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অজুহাত পেশ করে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই দলিল পেশ করে নিজেদের কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তা ও বসে-থাকাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তাদের যুক্তি আকর্ষণীয়, তাদের উপস্থাপনা চমৎকার, তাদের অজুহাতগুলোও আপাতদৃষ্টিতে বেশ যৌক্তিক শোনায়।

মুসলিমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উত্তরণের কোনো চেষ্টাই তারা করতে চায় না। নিজেদের এই দুর্বল ও লাঞ্ছিত অবস্থাকে তারা তাদের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। একটি অজুহাত তাই মুসলিমদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় -- আমরা এখন মাক্কী যুগে আছি, তাই কিছুই করার নেই। মুসলিমরা লাখে লাখে মরুক, মুসলিম নারীদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হোক, আমাদের দ্বীনকে নিয়ে ইসলামের শত্রুরা হাসি-ঠাট্টা করুক, আমাদের কিছুই করার নেই।

তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা ত্যাগ-স্বীকার করতে চায় না। আর এই অনিচ্ছা ও অযোগ্যতাকে সরাসরি স্বীকার না করে তারা ইসলামের মোড়ক দিয়ে ঢেকে দেয়। হ্যাঁ, এটা সত্য যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মক্কার মুসলিমরা ইসলামের প্রথম দিকে দুর্বল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য সমর্থনের আশায় সব গোত্রের দুয়ারে কড়া নেড়েছেন । প্রত্যেক হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সাথে বারবার সাক্ষাৎ করেছেন। সাধ্যে যতটুকু কুলায় তার সবটুকু দিয়েই মুসলিমরা চেষ্টা করেছিল। তাই যারা মনে করে যে, তারা মাক্কী জীবনের মতো দুর্বল অবস্থায় আছে, তাদের উচিত এ অপমানজনক জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। এটাই আল্লাহর রাসূলের ﷺ শিক্ষা।

কাজেই কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা থেকে প্রথম শিক্ষা হলো, কথার পারদর্শিতা বা উপস্থাপনার ভেলকিবাজিতে প্রলুব্ধ না হওয়া, কথার চাকচিক্যে নিজেদের অন্তরের রোগ আড়াল করার চেষ্টা না করা বরং আল্লাহর প্রতি সৎ থাকা এবং নিজেদের অবস্থার উত্তরণে চেষ্টা করে যাওয়া।

### ২) সত্তার শত্রু: নফস

এমন নয় যে, কা'ব ইবন মালিক ﷺ জিহাদে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রস্তুতি নেওয়ার নিয়ত তাঁর মনে ছিল। কিন্তু আলসেমির কারণে কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। দৃঢ়তার অভাবেই মানুষকে ঢিলেমি পেয়ে বসে। এটা চিরাচরিত মানব বৈশিষ্ট্য। করছি, করবো -- এই করতে করতে সেই কাজটি আর করা হয়ে উঠে না। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল।

মানুষের নফস ধোঁকা দেয়। লাগাম পরিয়ে না রাখলে নফস মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে আনতে পারে। নিজের খেয়াল-খুশিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা খুবই জরুরি। নিজের 'মুড' এর উপর সব কাজকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কা'ব ইবন মালিক ﷺ নফসের সাথে পেরে উঠেননি। যাচ্ছি-যাবো বলে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। নফস হলো অলস, ভীতু, দুর্বল। সে দুনিয়াকেই ভালোবাসে। তাই নফসকে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি।

কাব ইবন মালিক তাবুকের আগের বড় বড় প্রায় সব জিহাদে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু সামান্য ঢিলেমি দেওয়ার কারণে তিনি তাবুকের অভিযানে যোগ দিতে পারেননি। কাজেই নিজের ঈমানের ব্যাপারে কখনোই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের আমল-ইবাদাতে ঢিলেমি দেওয়া উচিত নয়। অতীতের আমল যতই ভালো আর ঈর্ষণীয় হোক না কেন। রাসূল ﷺ বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ার পরও কা'ব ইবন মালিক ﷺ ভাবছিলেন, আমি ঠিকই কাফেলা ধরে ফেলতে পারবো। অথচ, তখনো তার প্রস্তুতির কিছুই হয়নি।

কালকের জন্য কাজ ফেলে রাখলে জমতে জমতে তা এত বিশাল আকার ধারণ করে যে শেষ পর্যন্ত কাজ করার উৎসাহই হারিয়ে যায়। এটা আসলে নফসের একটা ধোঁকা। প্রথমে সে বোঝায় -- কাজটা তো একেবারেই সহজ, তুড়ি মেরে করে ফেলা যাবে! আর পরে যখন সব কাজ একসাথে জমে বিশাল আকার ধারণ করে, তখন সে বোঝায়, এতো কাজ করা কী করে সম্ভব! আর এভাবেই সে ভালো কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। যদি কা'ব ইবন মালিকের ﷺ মতো একজন সাহাবি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে এত বড় ভুল করতে পারেন, তাহলে এখনকার মুসলিমরা কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারে? জিহাদ এমন একটি ইবাদাত যেটা সবসময় চলতে থাকে। যতই দেরি করা হয়, জিহাদে অংশ নেওয়া ততই কঠিন হয়ে পড়ে।

### ৩) ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা: জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ

তাবুকে পৌঁছার পর কা'ব ইবন মালিকের ﷺ খোঁজ করা হলে সাহাবিরা অনেকে বলে বসেন, কা'ব ﷺ দুনিয়ার মোহে জিহাদ পরিত্যাগ করেছে। নিঃসন্দেহে এটা খুবই অপমানজনক কথা। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনেই এমন কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। একজন মুসলিমের মর্যাদা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক দামি। কিন্তু সম্মানিত সাহাবি কা'ব ইবন মালিকের ﷺ ব্যাপারে এমন অসম্মানজনক এবং

তীর্যক মন্তব্য করার পরেও আল্লাহর রাসূল চুপ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদে অংশ না নেওয়া কত বড় অপরাধ হতে পারে। শুধুমাত্র জিহাদে অংশ না নেওয়ার কারণে তিনজন সাহাবিকে পঞ্চাশ দিনের জন্য পুরো সমাজ বয়কট করেছিল। তাহলে তাদের অপরাধ কতটা ভয়াবহ যারা আজকে জিহাদে অংশ নেওয়া দূরে থাক, উল্টো জিহাদের বিরোধিতা করে?

## ৪) কুনু মা'আস সাদিক্বীন: সত্যবাদীদের সাথে থাকো

সৎসঙ্গে থাকা খুবই জরুরি। ভালো কাজে সাথী পেলে মানুষের মাঝে সাহস সঞ্চার হয়, উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মানুষের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কা'ব ﷺ একটা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাবার জন্য প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু যখনই জানলেন তার মতো আরও দু'জন আছে, তখন তিনি এ থেকে সরে আসেন। সৎ ও জ্ঞানী মুসলিমদের সাথে উঠাবসা করা দ্বীনের পথে উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এতে করে ভালো কাজে অংশ নেওয়া সহজ হয়, বন্ধুর পথে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভর করেছে ফিতনা আর অবিশ্বাস। তাই এই পঁচে যাওয়া এই সমাজ ব্যবস্থায় সৎসঙ্গের গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। সুতরাং নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। স্বভাবগতভাবেই মানুষ দুর্বল। আল্লাহ বলেছেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল অবস্থায়।"

ফিতনার মোকাবেলায় মানুষ বরাবরই দুর্বল। তাই মুসলিমদের উচিত জামাতবদ্ধ থাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দ্বীন হলো নাসীহা।' অর্থাৎ চারপাশে এমন মানুষ থাকা জরুরি, যারা সবসময় ভালো কাজের উপদেশ দিবে। খারাপ পরিবেশ ত্যাগ করে দ্রুত ভালো পরিবেশে চলে যাওয়া ঈমানের হেফাজতের জন্য খুবই জরুরি। আজকে ঈমান তেজোদ্দীপ্ত হলেও আগামীকাল অন্তরের অবস্থা একরকম না-ও থাকতে পারে। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবকে কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়।

## ৫) আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না

কেউ যদি সত্যবাদিতা অবলম্বন করে, তাহলে সে একদিন না একদিন এর উপযুক্ত পুরস্কার পাবেই -- এটাই কা'ব ইবন মালিকের ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, কা'ব ইবন মালিক আর বাকি দুইজন যদি মুনাফিক্বদের মতো মিথ্যা অজুহাত দিতেন তাহলে তাদের বয়কট করা হতো না, কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের খবর জানেন, তিনি ভালোকে মন্দের কাতার থেকে পৃথক করে দেন।

যারা কোনো অজুহাত না দিয়ে অকপটে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছিল, তাদেরকে বর্জন করা হয়েছিল। আর যারা মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু এই অব্যাহতি ছিল সাময়িক। মিথ্যা বলে ক্ষণিকের জন্য পার পাওয়া বা কিছু অর্জন করা গেলেও সেটা চিরস্থায়ী হয় না। অপরদিকে আপাতদৃষ্টিতে সত্যকে অপ্রিয় বা কঠিন মনে হলেও, দিনশেষে সত্যের অর্জনটাই চিরস্থায়ী। আল্লাহ কা'ব ও

তার দুই সাথীকে ﷺ সরল পথে কায়েম রেখেছেন তাদের সততা ও সত্যবাদিতার কারণে।

## ৬) আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য

কাব ﷺ ছিলেন মদীনার অধিবাসী। এই মদীনায় তার জন্ম, তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু মুসলিমদের বয়কটে এই চিরচেনা মদীনা তার কাছে হয়ে গেছিল অচেনা, পর। একান্ত আপন লোকেরাই তাঁকে বয়কট করেছিল। যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশে সাহাবিরা কা'বকে ﷺ বয়কট করেছিল, সেই আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্মভূমি কিন্তু মদীনা ছিল না। এটা দেখিয়ে দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিই ছিল সাহাবিদের একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেনি। এটাই বলে দেয় যে, সে সময়ের সমাজব্যবস্থা কতটা মজবুত ছিল। বয়কটকারী সাহাবিরাই কেবল আনুগত্য করেননি, বরং যে তিনজনকে বয়কট করা হয়েছিল, তারাও আল্লাহর রাসূলের ﷺ আনুগত্য ত্যাগ করেনি! এই পঞ্চাশটি দিন তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশ মেনে চলেছেন।

## ৭) ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা

গাসসানের রাজা ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমদের ঘৃণা করতো। সীরাহর বইগুলোতে এমন ঘটনা উল্লেখ আছে যে, সে সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করতে চেয়েছিল আর এ কাজে সে হিরাক্লিয়াসের সহায়তা চেয়েছিল। কিন্তু হিরাক্লিয়াস তাকে থামিয়ে দেয়। রাজা হলেও সে ছিল মূলত হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি। গাসসানের রাজার মতো শাসকদের নামের সাথে অনেক লম্বা লম্বা উপাধি থাকলেও বাস্তবে তারা অন্যের হুকুমের দাস, বলা যেতে পারে দালাল শাসক। সে বোকা হলেও হিরাক্লিয়াস ছিল দূরদর্শী। সে জানতো রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সত্য নবী। এজন্য সে তখন মুসলিমদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, গাসসানের রাজা ছিল একজন আরব। সে হিসেবে আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশি সহমর্মী হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অনারব হিরাক্লিয়াসের থেকেও সে নিজেই ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ প্রতি বেশি আক্রমণাত্মক। মনিবের চেয়ে ভৃত্যের রাগ সাধারণত বেশি হয়। কথায় আছে, সূর্যের চেয়ে বালি গরম।

কুফফাররা সবসময় মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করতে চায়। এটি কুফফারদের অতি প্রাচীন কৌশল। তারা মুসলিমদের মধ্যে থেকে এমন কাউকে টার্গেট করে যারা কিছুটা বিপদে আছে, পরিস্থিতির চাপে হয়তো তারা শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে। তারা এ ধরনের নড়বড়ে মুসলিমদের 'কিনে' নিতে চায়। গাসসানের রাজা কা'ব ইবন মালিককে ﷺ ভালোবাসত -- বিষয়টা মোটেও এমন নয়। বরং কা'বকে ﷺ ব্যবহার করে তারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল।

আজকের দিনেও এই স্ট্র্যাটেজি কার্যকর। অনেক মুসলিম সংস্থা বা মুসলিম দাঈদের

সাথে কাফিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বেশ দহরম-মহরম। এই মুসলিমরা কাফির সরকারের মন জুগিয়ে চলে, ইসলামের যে বিষয়গুলো কাফিররা পছন্দ করে না, সে-সব কথা বলা থেকে বিরত থাকে অথবা সেসব বিষয়ে চিনি মিশিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। মূলত, তারা দাওয়াহর নামে কাফিরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তারা ততটুকুই বলে, যতটুকু কাফিররা অনুমোদন দেয়।

কাফিররা আজকে সরাসরি ইসলামকে পরিবর্তন, সংস্করণ ও কাটছাঁট করার কথা বলছে। এজন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। তারা এমন সব আলিম ও দাঈদের জন্ম দিতে কাজ করছে, যারা এই নতুন ভার্সনের ইসলাম মানুষের কাছে প্রচার করবে। এই বিষয়গুলো তারা খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড কর্পোরেশন এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। র‍্যান্ড সমর্থিত এই আলিম ও দাঈদের শয়তান এই বলে ধোঁকা দেয় -- আমরা তো দাওয়াহ করছি, মসজিদ আর স্কুল নির্মাণ করছি, ইসলামকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আসলে কাফিরদের অর্থায়ন আর প্রযোজনায় কখনো ইসলামের দাওয়াহ হয় না। এটা দাওয়াহর নামে অন্য কিছু। কাফিররা যদি ইসলামী দাওয়াতের পেছনে অর্থ খরচ করে, সেটা নিজেদের স্বার্থে। মূলত তারা এভাবে ইসলামকে বদলে দিতে চায়।

কাব ইবন মালিক ﷺ গাসসানের রাজার চিঠি ছিঁড়ে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। গাসসানের রাজা বেশ সহানুভূতি আর দরদ নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু কা'ব ﷺ জানতেন, এই সহানুভূতির ভাষা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। কা'ব ইবন মালিকের ﷺ মতো একজন মুসলিমকে নিজেদের পক্ষে টেনে বিভেদ তৈরি করাই ছিল তার লক্ষ্য। দরদ দেখানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কা'ব ﷺ চাইলে সেই চিঠিকে স্মারক হিসেবে রাখতে পারতেন, রাজার চিঠি বলে কথা! কিন্তু তিনি সেটা করেননি। বরং একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন, যেন এই প্রলোভন দ্বিতীয়বার তার মাথায় উঁকি দিতে না পারে। মুসলিমদের বয়কট সত্ত্বেও কা'ব ﷺ ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। অন্যদিকে কাফিরদের থেকে পাওয়া নাগরিকত্বের অফার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার নাম হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। বিষয়টি পৃথকভাবে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে শেখা ও অনুশীলন করা।

## ৮) অপরাধবোধ ও অনুশোচনা

তিনজন মুসলিম তাবুকের অভিযানে অংশ নেননি। কিন্তু এটা নিয়ে তাদের তীব্র অপরাধবোধ কাজ করেছে। কিন্তু মুনাফিকদের মনে এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয়নি, কোনো ভাবান্তরও হয়নি। তারা একদম গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু মু'মিনদের মনে তীব্র মনস্তাপের জন্ম হয়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একজন ঈমানদার যদি কোনো গুনাহ বা অপরাধ করে ফেলে, তার অন্তর আফসোসে ভরে ওঠে, অনুশোচনা হয়। এটা এমন একটা গুণ যা মুনাফিকদের থেকে মু'মিনদের আলাদা করে দেয়।

## ৯) ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহর কিছু মন্তব্য

পরিশেষে ইমাম ইবনুল কায়্যিমের রাহিমাহুল্লাহ *যাদুল মাআদ গ্রন্থ থেকে তাবুকের* অভিযান বিষয়ক কিছু শিক্ষা জেনে নেওয়া যাক।

১) নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা সাধারণত প্রকাশ করা জায়েয, যদি তাতে কোনো উপকার থাকে। সাধারণভাবে, নিজের গুনাহের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি এর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা প্রকাশ করার বাধা নেই। যেমন এই ঘটনায় কা'ব ইবন মালিক ﷺ নিজেই নিজের অপরাধের কথা বর্ণনা করছেন যেটা মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা।

২) নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা ও নিজের কিছু ভালো কাজের কথা প্রকাশ করা ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক আছে। তবে নিঃশর্তভাবে নিজের প্রশংসায় মেতে ওঠা ঠিক নয়। এই ঘটনায় কা'ব ইবন মালিক ﷺ বলেছেন তিনি বদর ছাড়া বাকি সব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলেন আর আকাবার ঘটনার সময়ও উপস্থিত ছিলেন। অহংকারের বশে কিংবা মানুষের চোখে নিজের মর্যাদা বাড়ানো যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে নিজের ব্যাপারে ভালো কথা বলা বৈধ।

৩) আল্লাহ কোনো ভালো কাজের সুযোগ করে দিলে সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। জীবনের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো কাজের দরজা খুলে দেন। এই সুযোগগুলো হয়তো জীবনে একবারই আসে। একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা চিরতরে হাতছাড়া হয়। তাই ভালো কাজের সুযোগ 'পরে করবো' ভেবে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কা'ব ইবন মালিক ﷺ তাবুকের অভিযানে অংশ নিতে না পেরে আফসোস করে বলেছেন, 'হায়! আমি যদি যেতে পারতাম!' সুযোগ অবহেলা করার পরিণাম কখনো খুব ভয়াবহ হতে পারে।

> **"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সেই ডাকে সাড়া দাও যা তোমাদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে। জেনে রেখো আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তার অন্তরের মাঝখানে অবস্থান করেন, তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।" (সূরা আনফাল, ৮: ২৪)**

মহান আল্লাহই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। ক্ষণিকের অবহেলা আর নিফাকের কারণে তিনি মানুষের অন্তরকে অভিশপ্ত করে দিতে পারেন, পরবর্তীতে ভালো কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুযোগের কোনো দরজা খোলা হলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রথমবারেই মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ অন্তর ও দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ফলে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ আর না-ও পাওয়া যেতে পারে।

> **"আমি (শীঘ্রই) তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে (অন্যদিকে) ঘুরিয়ে দিবো, যেমন তারা প্রথমবারেই এর (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি**

তাদেরকে অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেবো।" (সূরা আনআম, ৬: ১১০)

৪) আল্লাহর রাস্তায় না গিয়ে ঘরে বসে থাকা নিফাকের লক্ষণ। কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় আবশ্যিক জিহাদে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সমালোচনা করা বৈধ, এটা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন হাদীসের আলিমরা হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করেন, যেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা ও শিক্ষাকে বিশুদ্ধ রাখা যায়। এ কারণে বনু সালামার সেই ব্যক্তি যখন কা'ব ইবন মালিকের সমালোচনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চুপ ছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি কাউকে ভালো হিসেবে জানি, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, যেমনটা করেছিলেন মুআয ইবন ইবন জাবাল ﷺ।

যদি কেউ অনেক বড় অপরাধ করে, তাহলে তার সালামের উত্তর না দেওয়া বৈধ, যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে, কারো সাথে মতপার্থক্য হলেই খুঁজে খুঁজে তার ভুল বের করে তার সাথে সালাম বিনিময় ও কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে হবে। এটা ইসলামের আদবের মধ্যে পড়ে না। কোনো ব্যক্তিকে বয়কট করা জায়েয হতে পারে, যদি এই বয়কটের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে কোনো গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে নাসীহা দেওয়া সম্ভব হয়। বয়কটের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সংশোধন।

৫) বন্ধুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। তবে যদি সে কিছু মনে না করে, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন কা'ব ﷺ তাঁর ভাই ও বন্ধু আবু কাতাদাহর বাড়িতে দেয়াল টপকে প্রবেশ করেছিলেন। তবে যদি হারাম কিছু চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, বা মহিলাদের পর্দা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেটা কোনোভাবেই জায়েয নয়।

৬) সাহাবিরা ﷺ কোনো সুসংবাদ শুনলে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন। এটা ভালো একটি অভ্যাস।

৭) কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি এমন আশঙ্কা হয় যে, নিজের দ্বীনের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাহলে সেটা ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। যেমন কা'ব ﷺ গাসসানের রাজার চিঠি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৮) তাওবাহ করার সাথে সাথে আমাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় কিছু সাদাকাহ করা। কোনো ভুল করে ফেললে, তাওবাহ করার সাথে কিছু সাদাকাহও করা উত্তম। কা'ব ইবন মালিকও ﷺ এমনটা করেছিলেন।

# হিজরী ৯ম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ

## মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু

হিজরী ৯ম বর্ষ। সারাজীবন নিফাক্ব, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, গোপন বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণের পর আবদুল্লাহ ইবন উবাই তখন মৃত্যুমুখে। উসামাহ ইবন যাইদকে কে সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সাথে দেখা করতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে সবসময় সতর্ক করতাম, ইহুদিদের ভালোবেসো না।' ইবন উবাই বললো, 'সাদ ইবন যুরায়রা তো তাদের ঘৃণা করতো। কিন্তু কী লাভ হয়েছে? সে তো মারা গেছে।'

ইবন উবাইয়ের চোখে মৃত্যুই ছিল পরাজয়। মৃত্যুর পরের জীবনই যে আসল জীবন- এই সত্য সে তার কুফরি আর একগুয়েঁমির কারণে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। মুসলিমদের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য দেখালেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততা ছিল কাফিরদের প্রতি। এটা মুনাফিক্বদের চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা কুফফারদের প্রতি অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, অর্থাৎ, তারা তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুখী হয়।

> "বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" (৫: ৫২)

মুনাফিক্বরা কাফিরদের নিজেদের আপন ভাবে, তাদের পক্ষ নেয়। তারা কখনোই মন থেকে মুসলিমদের মেনে নিতে পারে না, তাদের সাথে থেকে স্বস্তি পায় না।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাজার সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলেন। সামনে এসে দাঁড়ালেন উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে যাদেরকে সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই মুষ্টিমেয়দের একজন ছিলেন তিনি। মুনাফিক্ব আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের জানাজা পড়বেন আল্লাহর রাসূল -- এটা তিনি কোনোভাবেই মানতে পারলেন না। আবদুল্লাহ ইবন উবাই অতীতে যত কুকর্ম করেছে, তার সমস্ত ইতিহাস এক এক করে বলতে বলতে উমার رضي الله عنه প্রশ্ন করলেন, 'এমন এমন কাজ করার পরও আপনি কীভাবে তার জানাজার সালাত পড়াতে পারেন?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পথ ছেড়ে দাও, উমার। আমি যদি জানতে পারি, আল্লাহর কাছে তার নাজাতের জন্য সত্তর বারের বেশি দুআ করলে আমার দুআ কবুল হবে, তবে আমি তা-ই করবো।'

> "(হে নবী) এমন লোকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না-করেন (দুটোই সমান), যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তারপরেও তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। কেননা এরা

# হিজরী ৯ম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ

## মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু

হিজরী ৯ম বর্ষ। সারাজীবন নিফাক্ব, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, গোপন বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণের পর আবদুল্লাহ ইবন উবাই তখন মৃত্যুমুখে। উসামাহ ইবন যাইদকে ﷺ সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সাথে দেখা করতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে সবসময় সতর্ক করতাম, ইহুদিদের ভালোবেসো না।' ইবন উবাই বললো, 'সাদ ইবন যুরায়রা তো তাদের ঘৃণা করতো। কিন্ত কী লাভ হয়েছে? সে তো মারা গেছে।'

ইবন উবাইয়ের চোখে মৃত্যুই ছিল পরাজয়। মৃত্যুর পরের জীবনই যে আসল জীবন- এই সত্য সে তার কুফরি আর একগুয়েঁমির কারণে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। মুসলিমদের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য দেখালেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততা ছিল কাফিরদের প্রতি। এটা মুনাফিক্বদের চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা কুফফারদের প্রতি অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, অর্থাৎ, তারা তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুখী হয়।

> "বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" (৫: ৫২)

মুনাফিক্বরা কাফিরদের নিজেদের আপন ভাবে, তাদের পক্ষ নেয়। তারা কখনোই মন থেকে মুসলিমদের মেনে নিতে পারে না, তাদের সাথে থেকে স্বস্তি পায় না।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাজার সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলেন। সামনে এসে দাঁড়ালেন উমার ইবন খাত্তাব ﷺ। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে যাদেরকে সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই মুষ্টিমেয়দের একজন ছিলেন তিনি। মুনাফিক্ব আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের জানাজা পড়বেন আল্লাহর রাসূল -- এটা তিনি কোনোভাবেই মানতে পারলেন না। আবদুল্লাহ ইবন উবাই অতীতে যত কুকর্ম করেছে, তার সমস্ত ইতিহাস এক এক করে বলতে বলতে উমার ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'এমন এমন কাজ করার পরও আপনি কীভাবে তার জানাজার সালাত পড়াতে পারেন?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পথ ছেড়ে দাও, উমার। আমি যদি জানতে পারি, আল্লাহর কাছে তার নাজাতের জন্য সত্তর বারের বেশি দুআ করলে আমার দুআ কবুল হবে, তবে আমি তা-ই করবো।'

> "(হে নবী) এমন লোকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না-করেন (দুটোই সমান), যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তারপরেও তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। কেননা এরা

আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ নাফরমানদেরকে হিদায়াত করেননা।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ৮০)

কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ৭০ বারের কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বলছেন যে, ৭০ বারের বেশি ইস্তিগফারে যদি কাজ হতো তবে তিনি তা-ই করতেন। এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর ﷺ চরিত্রের একটা অসাধারণ দিক তুলে ধরে। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের শত্রুতা দেখতে দেখতে উমার رضي الله عنه পর্যন্ত প্রশ্ন করছিলেন, 'আপনি কীভাবে তার জন্য ক্ষমা চাইতে পারেন?' কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মনটা ছিল বিশাল। যে আবদুল্লাহ ইবন উবাই জীবনভর তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, শত্রুতা, মিথ্যাচার, ছলচাতুরী কিছুই বাদ রাখেনি, তাকেও তিনি শেষ সুযোগ দিতে চেয়েছেন। তার জানাযা পড়িয়ে তার নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জাহান্নামের আগুনের যে সীমাহীন কষ্ট, সে কষ্ট তিনি তাঁর শত্রুর জন্যেও চাননি। এই জানাযা পড়ার আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে ইবন উবাইয়ের অনুসারীদের মন জয় করার চেষ্টা করা। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ হয়তো আশা করেছিলেন তাদের প্রতি নমনীয়তা দেখানো হলে তারা তাদের নিফাক্ব ছেড়ে তওবা করে ফিরে আসবে। এই সিদ্ধান্তটি তখনো শরীয়াহগতভাবে বৈধ এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুকূল। কিন্তু এই জানাজা পড়ার পরেই মুনাফিক্বদের ওপর জানাজার সালাত আদায়ের বৈধতা তুলে নেওয়া হয়।

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।" (সূরা তাওবাহ ৯: ৮৪)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করে দিলেন যে, মুনাফিক্বদের ওপর আর কোনো জানাজার সালাত পড়া হবে না। এটিই ছিল চূড়ান্ত হুকুম। কুরআনে বেশ কিছু আয়াত আছে যেগুলো উমারের رضي الله عنه মতের সমর্থনে নাযিল হয়েছিল, এটি তেমনই একটি আয়াত।

আল্লাহর রাসূলের আগে আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হিকমাহ। ইবন উবাইয়ের মনে আশা ছিল, আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পরে সে পুনরায় মদীনার নেতৃত্ব ফিরে পাবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, যখন ইবন উবাইয়ের হাতে মদীনার শাসনভার আসার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসেন এবং আওস ও খাযরাজদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। রাসূলুল্লাহর অধীনে পুরো সময়টাতে সে এবং তার দলবল জিহাদে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, নিফাকের পথ অবলম্বন করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে ষড়যন্ত্র করে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছিল, ইসলামের রাজত্ব সাময়িক, হঠাৎ করে এসেছে, আবার হঠাৎ করে চলেও

যাবে, মদীনা আগে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি, বরং মুনাফিক্বদের প্রভাব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। ইবন উবাইয়ের মৃত্যুর মাধ্যমে মদীনার মুনাফিক্বদের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে না গেলেও জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে তাদের সাথে লড়াই করে। চিহ্নিত মুনাফিক্বদের ওপর জানাজা পড়তে মুসলিমরা অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর রাসূল হুযাইফাকে জানিয়ে যান কারা কারা মুনাফিক্ব। এভাবে মুনাফিক্বরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর মদীনায় ইসলাম আরও সুসংহত হয়।

## আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একটি ঘটনা

আর দশজন সহজ স্বাভাবিক দম্পতির মতই আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনেও ছিল আনন্দ-বেদনার গল্প, ছিল বাদানুবাদ আর মান-অভিমানের উত্থান-পতন। একবার এমন হয়েছিল, স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে আল্লাহর রাসূল ﷺ দীর্ঘ এক মাস বাড়ির বাইরে কাটান। পুরো সময়ে তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছেই যান-নি। ঘটনাটা নবম হিজরির।

একদিন আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন আরও অনেকেই রাসূলের ঘরের দরজায় অপেক্ষমান। কাউকেই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আবু বকর ﷺ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। এরপর উমার ﷺ এলেন, তাকেও অনুমতি দেওয়া হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিচে বসে আছেন আর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে উনার স্ত্রীরা। সবার মধ্যে বিষাদের ছাপ। পুরো পরিবেশ থমথমে হয়ে আছে। গুমোট ভাবটাকে হালকা করার জন্য উমার ﷺ মজা করে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার টাকা-পয়সা নেই জেনেও যদি আমার বউ তার পেছনে খরচ করার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতো, তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিতাম!’ উমারের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন, বললেন, ‘এখানেও তা-ই হয়েছে! আমার চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছো তারাও আমার কাছে ধন-সম্পদ চাইতে শুরু করেছে!’

এ কথা শুনেই আবু বকর ﷺ নিজ কন্যা আইশার ﷺ দিকে এগিয়ে গেলেন আর উমার ﷺ এগিয়ে গেলেন নিজ কন্যা হাফসার ﷺ দিকে। দুজনেই আল্লাহর রাসূলের দুই স্ত্রীর বাবা! উমার ﷺ বললেন, ‘তোমরা নবীজির কাছে এমন কিছু দাবি করছো, যা তাঁর কাছে নেই!’ তারা উত্তর দিলেন, ‘আমরা কখনো এমন কিছু দাবি করবো না যা আল্লাহর রাসূলের কাছে নেই।’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ স্ত্রীদের থেকে এক মাস আলাদা ছিলেন। আর সেই সময়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন।

> “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-

**বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২৮-২৯)**

আল্লাহর রাসূলের লাইফস্টাইল ﷺ আর দশজনের মতো সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না, আরাম কী জিনিস তিনি জানতেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা - - নেতৃত্ব, খ্যাতি, ধন-সম্পদ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু সেই ডাককে তিনি কোনো পাত্তাই দেননি, এমনভাবে জীবন কাটিয়েছেন যেন দুনিয়ার চেয়ে সস্তা আর অর্থহীন বস্তু আর দ্বিতীয়টি নেই। মদীনায় আসার পর মসজিদে নববীর পাশে আল্লাহর রাসূল ﷺ আর উম্মুল মুমিনীনদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়। সে ঘর ছিল নিতান্তই সাধারণ। রাজা-বাদশাদের প্রাসাদের মতো প্রকাণ্ড কিছু তো ছিলই না, বরং কাদামাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি ছোট কয়েকটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেগুলোকে বড়জোর কুঁড়েঘর বলা চলে। আরবের মরুভূমিতে সবচেয়ে সহজলভ্য খেজুরের ডাল ছিল সেই ঘরের চালা। ঘরের ছাদগুলো এত নিচু ছিল যে ছোটখাট লোকও নিমিষে হাত দিয়ে ছুঁতে পারতো। ইমাম হাসান আল বসরী বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘর দেখেছি। হাত বাড়ালেই এর ছাদ ধরা যায়।'

আল্লাহর রাসূলের সেই ঘরে আলো জ্বালানোর মতো কুপিও ছিল না। মা আইশা ﷺ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাতের স্থানের সামনে ঘুমাতাম। রাতে যখন তিনি তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, ঘরে আলো না থাকায় সিজদার সময় তাঁর কপাল আমার মাথায় এসে লাগতো। সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল আমার পায়ে খোঁচা দিতেন। তখন আমি পা ভাঁজ করে নিতাম, যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন আমি আবারো পা বিছিয়ে দিতাম।'

ঘরে কার্পেট বলে কিছু ছিল না। মেঝে বলতে ছিল বালি আর খেজুরের ছোবলা। আল্লাহর রাসূল সেখানেই ঘুমোতেন। তাঁর গায়ে এবড়ো-খেবড়ো ছোবলার দাগ পড়ে যেত। রকমারি আসবাবও ছিল না। মাথার নিচে দেওয়ার মতো একটা চামড়ার গদি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়তো না ঘরে। তাঁর জীবন দেখলে মনে হতো প্রাচুর্য বলে এই পৃথিবীতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। এই দৃশ্য দেখে একদিন উমার ﷺ নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, কেঁদেই ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি এই উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারস্য আর রোমের সম্রাটদের দেখুন, তারা তো আল্লাহর ইবাদত করে না অথচ তারাই আজ ভোগবিলাসে আছে।' তিনি বললেন, 'উমার! এটাই কি উত্তম নয় যে তারা দুনিয়ার ভোগবিলাস পেলো আর আমরা আখিরাতের অনন্ত জীবন পেলাম!'

আমরা জীবনের প্রাচুর্য দেখে দেখে আক্ষেপ করি কেন অন্য অনেকের সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ নিআমত আমার হলো না, কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে ﷺ যেন

এসব কিছু স্পর্শই করত না। দুনিয়ার ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ আর প্রাচুর্য ছিল তার কাছে একটা মশা কিংবা মাছির চেয়েও তুচ্ছ, কাছে আসলেই হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার মতোই তিনি বরাবর একে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

দারিদ্র্য ছিল আল্লাহর রাসূলের নিত্যসঙ্গী। মা আইশা ﷺ বলেন, 'এমনও হয়েছে পরপর তিন চন্দ্রমাস অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ঘরে চুলায় আগুন জ্বলেনি।' এ কথা শুনে তার ভাগ্নে উরওয়া ইবনে আয যুবাইর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে সে সময় আপনারা কী খেতেন?' আইশা ﷺ জবাব দিলেন, 'আমরা শুধু পানি আর খেজুর খেয়ে থাকতাম!' আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, 'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলকে কোনোদিন ভুনা গোশত দিয়ে পেট ভরে এক টুকরো রুটি খেতে দেখি-নি।'

এমন নয় যে, উম্মুল মুমিনীনরা আল্লাহর রাসূলের এই কঠোর আর অনাড়ম্বর জীবনের সাথে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু হিজরি ৯ম বর্ষে এসে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল উম্মাহকে খায়বার, মক্কা বিজয়ের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় দান করেন। কুরআনের কিছু আয়াতও নাযিল হয়, যা সীমার মধ্যে থেকে দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি প্রদান করে। আল্লাহ বলেন,

> "আপনি বলুন, আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নিআমত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বোঝে।" (সূরা আরাফ, ৭: ৩২)

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর উম্মুল মুমিনীনরা মনে করলেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ দুনিয়ায় মু'মিনদের জন্য যা হালাল করেছেন, সেই নিয়ামত ভোগ করায় দোষের কিছু নেই। আদতে এই আয়াতগুলো ছিল মূলত সাধারণ মানুষদের জন্য। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তাঁর রাসূল ﷺ দুনিয়ার উপকরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন, বাকিদের মতো তিনি দুনিয়া উপভোগ করবেন না।

> "আপনি (কাফিরদের) মাঝে কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি চোখ তুলে তাকাবেন না। তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হবেন না, বরং মু'মিনদের প্রতিই ঝুঁকে থাকবেন।" (সূরা আল হিজর, ১৫: ৮৮)

অনন্ত আখিরাত জীবনের উল্টো পিঠে অতি তুচ্ছ এই নশ্বর পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে যাওয়া আল্লাহর রাসূলের জন্য কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। সূরা আহযাবের উপরোল্লিখিত আয়াত নাযিল হবার পর আল্লাহর রাসূল স্ত্রীদের দুটো রাস্তা খুলে দিলেন

-- হয় তারা দুনিয়ার ভোগবিলাস উপভোগ করবেন, অথবা তারা আল্লাহর রাসূলের জীবনসঙ্গী হিসেবে থাকবেন। তারা যদি আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার করেন, তবে বিনিময়ে কষ্ট হলেও লাভ করবেন সবচেয়ে মহান প্রাপ্তি -- আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অসামান্য পুরস্কার। যে নারীরা এতদিন ভরণ-পোষণ বাড়ানোর জন্য চাপাচাপি করতে করতে নবীজিকে প্রায় বিরক্ত করে তুলেছিলেন, এই আয়াত শোনার পর, সেই তারাই প্রত্যেকে একবাক্যে বললেন, 'আমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং আখিরাতের আবাসকেই বেছে নিলাম।' আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের ওপর সন্তুষ্ট হোন।

খুলাফায়ে রাশেদীনরাও এই ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের ভার যার কাঁধে, তার জন্য দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হওয়া কী করে শোভনীয় হয়? তাদের ভোগবিলাসের জায়গা হলো আখিরাহ। নিজের অধীনস্থ মানুষের দেখভালের জন্য তারা রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে যাবে, দুনিয়াকে পিষে ফেলবে পায়ের তলায়। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। আমরা দেখেছি, উম্মাহর সোনালী যুগের খলিফারা আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া সেই সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন। দুনিয়ার ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণকে পায়ে ঠেলে এই উম্মাহকে আগলে রেখেছেন নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে। আল্লাহ তাদের ওপরও সন্তুষ্ট হোন।

## মুশরিকদের সাথে বারাহ ঘোষণা এবং জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরী ৯ম সনে আবু বকর সিদ্দীককে ﷺ হাজের আমীর হিসেবে মনোনীত করলেন। সে সময় মক্কার কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে ছিল। কিন্তু তখনও মূর্তিপূজারীরা তাওয়াফ করার জন্য কাবাঘরে আসতো। নগ্ন হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করার ঐতিহ্য তারা তখনো বজায় রেখেছে। তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের অপবিত্রতা ও পাপের কারণে তাদের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করাটা অনুচিত। তাই তারা কুরাইশদের পোশাক ধার করে তাওয়াফ করতো। কুরাইশদের ব্যবহার্য পোশাককে পবিত্র মনে করা হতো। কিন্তু কাপড় ধার করার মতো সচ্ছলতাও সবার ছিল না, তারা তাই নগ্ন হয়েই তাওয়াফ করতো। শিরক ও নগ্নতার এই পরিবেশে আল্লাহর রাসূল ﷺ হাজ্জ করতে চাইলেন না।

আবু বকর আস-সিদ্দীক ﷺ কয়েকশো সাহাবিকে নিয়ে হজ্জ করতে গেলেন। তখন নাযিল হলো সূরা বারাহ অর্থাৎ তাওবার প্রথম দিকের কিছু আয়াত। কিন্তু ততক্ষণে আবু বকরের নেতৃত্বে সাহাবিরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই আয়াতগুলোকে আবু বকরের ﷺ কাছে পৌছে দিতে আলী ইবন আবি তালিবকে ﷺ পাঠান। তিনি আলীকে ﷺ বললেন, 'সূরা তাওবার এই আয়াতগুলি

নিয়ে যাও। সবাই মীনায় জড়ো হওয়ার পর এই আয়াতগুলো পড়ে শুনাবে। তাদের বলে দাও, কোনো কাফির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কোনো মুশরিক এই বছরের পর হজ্জ পালন করতে পারবে না। আর কোনো নগ্ন ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের চারপাশে তাওয়াফ করতে পারবে না। তবে যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ চুক্তিবদ্ধ আছে, তাদের চুক্তি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্তই বহাল থাকবে।

"সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না।

আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি-বদ্ধ, তারা চুক্তিরক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবাহ ৯: ১-৫)

এটা একমাত্র সূরা যেটা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু হয় না। কারণ এই সূরাটি শুরু হয় সরাসরি কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের ঘোষণার মাধ্যমে। অবশ্য এর অন্যান্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। এই সূরার প্রথম শব্দ বারাআ, এর অর্থ সম্পর্কছেদ। এই আয়াতগুলি সহ আরও কিছু আয়াত আলী ইবন আবি তালিব ﷺ হিজরি ৯ম শতকের হাজ্জে বর্ণনা করেন। মক্কায় মুশরিকদের বিভিন্ন আচার-প্রথা ও উপাসনা দেখা যাওয়ার এটাই ছিল শেষ বছর। এরপর মক্কায় সবরকম শিরক নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এই ঘোষণার মাধ্যমে আরব উপদ্বীপের ইতিহাসে তাওহীদের অধ্যায় সূচিত হয়। এই ঘোষণা ছিল কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের ঘোষণা। এর ফলে, আরবের মুশরিকদের জন্য দুটো পথ খোলা থাকলো -- হয় তারা মুসলিম হবে, ইসলামের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেবে, অথবা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যারা ইতিমধ্যেই আল্লাহর রাসূলের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, তারা নিরাপদ থাকবে চুক্তির

সময়সীমা পর্যন্ত, এরপরে আর চুক্তি নবায়ন করা হবে না। আর যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না, তাদের চারমাসের সময় দেওয়া হলো। এরপর হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না হয় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। এভাবে আরবে শিরকের সমাপ্তি হলো এবং মুশরিকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো।

## আরব গোত্রগুলোর প্রতিনিধি প্রেরণ

> "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরা নাসর ১১০: ১-৩)

এই আয়াতটি বলছে, যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে। ইসলাম বনাম শিরকের এই দ্বন্দ্বে অনেকগুলো আরবগোত্র ছিল দর্শকের ভূমিকায়। তারা অপেক্ষা করছিল কখন তারা কুরাইশ ও মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে চলমান এই সংঘাতের শেষ দেখতে পাবে ও একটি দলকে বিজয়ী হিসেবে দেখবে। যখন সংঘাত শেষ হলো এবং ইসলামের বিজয় হলো, তখন তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ভিড় জমালো ।

আরবরা কুরাইশদের বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতো কারণ ধর্মীয় বিষয়ে তারাই ছিল কর্তৃত্বের অধিকারী। এতদিন পর্যন্ত তারাই ছিল আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী, হজ্জ ও উমরার নির্দেশনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ যখন নিজেকে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন তখন আরবদের অনেকেই এই সংঘর্ষের শেষ না দেখে কোনো দলে যোগ না দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করলো। মক্কা বিজয়ের একদম পরপরই বেশ কিছু আরবগোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো; যেমন: সাক্বীফ গোত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন, পরে তাদের ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তারাই আবার এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে আরবের সবচেয়ে বড় দুটি গোত্র – কুরাইশ ও সাক্বীফ ইসলাম গ্রহণ করার পর অন্য সব গোত্রও দলে দলে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের জন্য। এজন্য ৯ম হিজরি সালকে বলা হয় 'আম-আল উফুদ' অর্থাৎ প্রতিনিধিদলদের বছর।

সূরা তাওবার এই আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই গোত্রগুলো তাদের প্রতিনিধিদল পাঠানো শুরু করলো। তারা ইসলাম সম্পর্কে জানলো ও ইসলাম গ্রহণ করলো, রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত দিত। এই বাইয়াত শুধু ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত ছিল না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ছিল। তারা কেবল দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতো তা নয়; বরং তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সদস্য হয়ে যেতো, বা এখনকার পরিভাষায় বলা যেতে পারে নাগরিক হিসেবে শপথ করতো। তাদের বাইয়াত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি। এই

বাইয়াতের মাধ্যমে তারা তাঁর শাসন ও হুকুম-আহকাম মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকার করতো। এই গোত্রগুলো মদীনা থেকে ইসলামের বেশ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ গোত্রে ফিরে যায়।

সীরাতের কিতাবগুলোতে ইবন কাসীর, ইবন ইসহাক, আল ওয়াকিদী প্রায় ষাটটি প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু দল নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামে গ্রহণ করা এই মুসলিমদেরকে সাহাবির মর্যাদা দেওয়া হলেও, মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করা সাহাবিদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি। কারণ মক্কা বিজয়ের পর এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিমরা দুনিয়াতেও সফল হতে যাচ্ছে। এই গোত্রগুলো রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বলা যেতে পারে, ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তের পেছনে তাদের দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর আগে যারা প্রতিকূল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা জানতো যে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনেক বড় ত্যাগ করতে হতে পারে। তাই যে যত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা তত বেশি।

> "...তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে।..." (সূরা হাদীদ ৫৭: ১০)

## সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল

সাক্বীফ গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা চেয়েছিল সমঝোতায় পৌঁছতে। তারা চাচ্ছিলো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে ঠিকই কিন্তু তাদের প্রধান দেবতার মূর্তিকে যেন এক বছরের জন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের ধারণা ছিল হঠাৎ করে এত বছরের পুরোনো দেবতাকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখলে গোত্রের সাধারণ জনগণ একটা বড় রকমের ধাক্কা খাবে, বিষয়টা মেনে নিতে পারবে না। তারা এও চাচ্ছিলো তাদের ওপর যেন ব্যভিচার, মদপান, সুদ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া না হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একটি দাবিও মানলেন না। এরপর তারা চাইলো অন্তত এক মাসের জন্য হলেও যেন ছাড় দেওয়া হয়। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হলেন না। যখন তারা বুঝলো আল্লাহর রাসূল এরকম কিছুর অনুমতি দেবেনই না, তখন তারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তবে আমরা আমাদের মূর্তি ভাঙবো না। আপনাদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে এ কাজটি করতে হবে।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ান ও মুগীরাহ ইবন শু'বাহকে ﵄ পাঠালেন। মুগীরাহ নিজেই ছিলেন সাক্বীফ গোত্রের। তারা যখন মূর্তি ভাঙতে গেলেন, তখন সাক্বীফরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো এই বলে যে তাদের ওপর কুষ্ঠরোগসহ অন্যান্য

রোগব্যাধি, বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা আপতিত হবে। তারা আসলেই বিশ্বাস করতো মূর্তি ভেঙে ফেললে তাদের ওপর গজব নেমে আসবে। তাদের এই কুসংস্কার ভুল প্রমাণ করার জন্য মুগীরাহ একটি ফন্দি আঁটলেন। তিনি মূর্তিতে আঘাত করার পর ভান করলেন তিনি জোরে একটা ধাক্কা খেয়েছেন আর সেই ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেলেন। সবাই এটা দেখে খুশি হয়ে গেল, ভাবলো, নিশ্চয়ই মুগীরাহর কর্মকাণ্ডে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছে। তারপর মুগীরাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আরে বোকার দল! এটা এক টুকরো পাথর ছাড়া কিছুই না।' এরপর তিনি সেটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন।

## বনু তামীম থেকে আগত প্রতিনিধিদল

বনু তামীম থেকেও প্রতিনিধিদল আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, বনু তামীম!' তারা বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুসংবাদ তো দিয়েছেন, এখন আমাদের কিছু দিন।' বনু তামীম আসলে রাসূলুল্লাহর সুসংবাদের চেয়েও হাতেনাতে দুনিয়াবী ফল পেতে বেশি আগ্রহী ছিল। তাদের এই মনোভাব রাসূলুল্লাহর ﷺ পছন্দ হলো না। এরপর ইয়েমেন থেকে একটা প্রতিনিধিদল এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, কেননা বনু তামীম তা গ্রহণ করেনি।' তারা জবাব দিলো, 'আমরা গ্রহণ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ।'

যখন কোনো প্রতিনিধিদল আসতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একজনের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করতেন। বনু তামীমের ছিল দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি -- আকরা ইবন হাবিস ও কাকা ইবন মাবদ ইবন যুরারা। আবু বকর ﷺ আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বললেন যেন কাকা ইবন মাবদকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বললেন যেন আকরা ইবন হাবিসকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আবু বকর শুনে রেগে গেলেন, বললেন, 'আমার বিপরীতে তোমাকে কিছু একটা বলতেই হবে, তাই তুমি এমনটা করেছো!' উমার এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং তারা দু'জন তর্কে লিপ্ত হলেন। তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হতে লাগলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন আয়াত নাযিল করলেন,

> "মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সূরা হুজুরাত ৪৯: ১)

## আব্দ-কাইসের প্রতিনিধিদল

আরবের একদম পূর্ব দিকের গোত্র বনু আব্দিল কাইস থেকে প্রতিনিধিদল আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের চারটি জিনিসের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি জিনিস হতে সতর্ক করছি। আমি তোমাদের আদেশ করছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করতে। তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন বলতে বোঝায় এটা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানে সাওম পালন করা এবং গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা।' জিহাদের ময়দানে যে গনিমত পাওয়া যায়, তার এক পঞ্চমাংশ আমীর অর্থাৎ নেতাকে দান করে দেওয়াটা ছিল নিয়ম। এরপর তিনি চারটি জিনিস থেকে দূরে থাকতে বললেন। সেগুলি ছিল চার রকমের পাত্র, যেগুলি দ্বারা মদ পান করা হতো। অর্থাৎ তিনি তাদের মদপান থেকেই শুধু নয়, বরং মদপানের জন্য ব্যবহৃত পাত্রগুলি ব্যবহার করা থেকেও দূরে থাকতে বললেন।

## বনু হানীফার প্রতিনিধিদল

বনু হানীফা গোত্র থেকে একটা প্রতিনিধিদল এসেছিল। বনু হানীফা গোত্রের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ছিল আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে সবচাইতে শত্রুভাবাপন্ন এবং রূঢ়। সেই গোত্রে ছিল মুসাইলামা। মুসাইলামা ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত মুসাইলামা আল-কাযযাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামা নামে। কারণ আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশাতেই সে নবুওয়াতের মিথ্যে দাবি করেছিল।

মুসাইলামা আল কাযযাব এসে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে দাবি করলো যদি তাঁর মৃত্যুর পর মুসাইলামাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তবে সে রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক টুকরো খেজুরের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'তুই যদি আমার কাছে এই খেজুরের ডালটাও চাস, সেটাও পাবি না। আল্লাহ তোর জন্য যা রেখেছেন তার চাইতে এক বিন্দু বেশিও তুই পাবি না। তুই যদি ফিরে যাস, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করবেন। আর আমার বিশ্বাস তুই-ই সে-ই, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমার পক্ষ হয়ে সাবিত ইবন কাইস তোর সাথে কথা বলবে।' এই বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ চলে গেলেন।

যে স্বপ্নের কথা তিনি বলছিলেন সেটা অন্য বর্ণনায় এসেছে। স্বপ্নটা ছিল এমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে তাঁর দুই হাতে দুটো বালা দেখেছেন। তাঁকে বলা হলো যেন তিনি সেগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ফুঁ দিলেন আর সেগুলো উড়ে গেল। এই দুটো বালা হলো দুই মিথ্যা নবী আসওয়াদ আল আনসি এবং মুসাইলামা আল-কাযযাব।

এই মুসাইলামা পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল হিজরি দশ বা এগারো সালে। সে লিখেছিল, 'আল্লাহর রাসূল মুসাইলামা থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিলাম। যাই হোক, গোটা রাজ্যের অর্ধেক ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর বাকিটা কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

সে আল্লাহর রাসূলের সাথে সমান-সমান ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিঠির জবাবে লিখলেন,

> *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি, শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি, যারা পথনির্দেশ অনুসরণ করে। এই জমিন আল্লাহর এবং তিনি এটা যাকে ইচ্ছা দান করেন। চূড়ান্ত সফলতা তাদের জন্য যারা ন্যায়নিষ্ঠ।'*

যে দু'জন মুসাইলামার এই চিঠি বহন করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমিই আল্লাহর রাসূল?' তারা বললো, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করি। যদি আমি কখনো কোনো বার্তাবাহককে হত্যা করতাম, তবে আমি তোমাদের হত্যা করতাম।' অর্থাৎ, পত্রবাহককে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ, যদিও তারা কাফির বা মুরতাদ বাহিনীর হয়। আল্লাহর রাসূল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মুসাইলামা অনেক বাগাড়ম্বর করলেও সরাসরি বিদ্রোহ করার সাহস দেখায়নি। তাকে দমন করা হয় আবু বকরের ﵁ খিলাফতকালে।

## নাজরান থেকে প্রতিনিধিদল

এরপর আসে নাজরানের প্রতিনিধিদল। এই দলটি ছিল খ্রিস্টান। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটি চিঠির জবাবে তারা দেখা করতে আসে। সে চিঠিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। সেখানে বলা ছিল, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের হাতে দুটো রাস্তা খোলা থাকবে -- হয় তারা জিযিয়া দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, অথবা মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। এই চিঠি পেয়ে নাজরানের রাজা ১৪ জন সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান নেতাকে মদীনায় পাঠালো।

তারা মদীনায় এল খুব জমকালো পোশাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের এই সাজপোশাক দেখে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরদিন তারা সাধারণ বেশে এল। এরপর আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে দেখা করলেন, তাদের ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। তারা প্রত্যাখ্যান করলো এবং দাবি করলো তারাই হকের ওপরে আছে। বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। ঈসাকে ﵇ তারা আল্লাহর পুত্র বলে সাব্যস্ত করতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল বললেন ঈসা ﵇ আল্লাহর পুত্র নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন রাসূল। তারা ঈসাকে ﵇ আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বললো, 'ঠিক আছে তাহলে এমন একজনের উদাহরণ দিন যাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ভুল প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত, তিনি তাকে মাটি দ্বারা

> সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, হও, ফলে সে হয়ে গেল। সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৫৯-৬০)

এই আয়াতটিই তাদের থেমে যাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এরপরেও তারা তর্ক চালিয়ে গেল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মুবাহালার আমন্ত্রণ জানালেন। মুবাহালা হলো দুই বিবাদমান পক্ষ কামনা করবে তাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর যেন আল্লাহ তাআলার গজব নেমে আসে। কুরআনে এই মুবাহালার কথা এসেছে।

> "অতঃপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে তুমি তাকে বলো, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত করি।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৬১)

সূরা আলে ইমরানের প্রায় আশিটি আয়াত নাযিল হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটে। মুবাহালার শর্ত অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল পরের দিন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ, হাসান ﷺ, হুসাইন ﷺ এবং ফাতিমাকে ﷺ নিয়ে হাজির হলেন মুবাহালায় মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু খ্রিস্টানরা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হলো না। যদিও তারা অনেক তর্ক করছিল, কিন্তু তারা মুবাহালায় গেল না এই ভেবে যে যদি সত্যিই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হন তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা তর্কে না গিয়ে রাসূলুল্লাহর বিচার ﷺ মেনে নিতে রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে কিছু সম্পদের বিনিময়ে শান্তিচুক্তি করলেন। চলে যাওয়ার সময় তারা বললো, 'আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ''আমি তোমাদের সাথে এমন একজনকে প্রেরণ করবো যে, পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত।' তারপর তিনি পাঠালেন আবু উবাইদা ইবন আল-যাররাহকে ﷺ। এই কারণেই আবু উবাইদা আমর ইবন আল-যাররাহকে বলা হয় এই উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

## বনু সাদ ইবন বাকর গোত্র থেকে প্রতিনিধি

বনু সা'দ ইবন বাকর গোত্র থেকে একজনই প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন, তার নাম দিমাম ইবন সালাবা ﷺ। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায়, দিমাম আসলেন, উটকে বাইরে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাহাবিদের সাথে বসা। সে এসেই জিজ্ঞেস করলো,

- তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে?

- আমিই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, রাসূলুল্লাহ উত্তর দিলেন।

যদিও রাসূলুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের নাতি। কিন্তু আবদুল্লাহ মুত্তালিব ছিলেন অনেক বিখ্যাত, তাই তার নামেই তার পরিবারকে সবাই চিনতো। আর পূর্বপুরুষদেরকে আরবরা পিতৃতুল্য মনে করতো।

- আচ্ছা, আপনিই কি মুহাম্মাদ?

- হ্যাঁ।

- আমি আপনাকে সোজাসাপ্টা কিছু প্রশ্ন করবো, আশা করি আপনি রেগে যাবেন না।

- না, আমি রাগবো না। তোমার যা বলার আছে বলতে পারো।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, তিনি কি আপনাকে একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আপনার কাছে জানতে চাই, তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন আমরা যেন শুধু তারই ইবাদাত করি এবং এই দেবতাদের উপাসনা করা ছেড়ে দেই?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি বলেছেন।

- আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে প্রশ্ন করছি, তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন যেন আমরা এই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি?

- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, তিনি তাই আদেশ করেছেন।

এভাবে দিমাম তাঁকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিয়েই একই প্রশ্ন করলেন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই উত্তর দিলেন। তারপর সে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউই নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আমি সেসবের অনুসরণ করবো যা আপনি আদেশ করেছেন এবং সেসব থেকে বিরত থাকবো যেসব থেকে আপনি বিরত থাকতে বলেছেন। এর সাথে কিছুই যোগ করবো না বাদ দেবো না।'

দিমাম তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার বরকতময় দাওয়াতে সেই দিনেই তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন আব্বাস ﷺ তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা আর কোনো প্রতিনিধিদলের কথা জানি না যেটা কিনা দিমাম ইবন সালাবার চাইতে চেয়ে বেশি বরকতময় ছিল।'

## আদী ইবন হাতিমের ﷺ কাহিনী

আদী ইবন হাতিম ছিলেন বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈয়ের সন্তান। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। আরবের ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার বদৌলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তার

তেমন মোটেও উচ্চ ধারণা ছিল না। আদী ইবন হাতিমের মূল বর্ণনাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও অনুলিখিত আকারে জানা যাক,

*'আমি রাসূলুল্লাহকে যতটা ঘৃণা করতাম, আরবের কেউ তাকে এতটা ঘৃণা করতো না। আমি নিজে ছিলাম অভিজাত বংশের লোক, খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী। গনিমতের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম। নিজ গোত্রে রাজার হালে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যখন শুনলাম, প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। এক আরবি গোলামকে বললাম, কিছু বেগবান আর হৃষ্টপুষ্ট উটকে কাছাকাছি বেঁধে রাখিস তো। মুহাম্মাদের বাহিনী যদি আক্রমণ করে, আমাকে খবর দিস। একদিন সকালে সে এসে আমাকে জানালো, মুহাম্মাদের বাহিনী এসে পড়েছে, কী করতে চান করে ফেলুন। বললাম, উটগুলো নিয়ে আয়।*

*আমি আমার পরিবার আর সন্তানদের নিয়ে শামে খ্রিস্টানদের কাছে চলে এলাম, ফেলে আসলাম আমার বোনকে। রাসূলুল্লাহর বাহিনীর হাতে অনেকের সাথে আমার বোনও বন্দী হলো। তাকে রাখা হলো মসজিদের সামনে খোঁয়াড়ের মতো একটি স্থানে। বন্দীদের সেখানেই রাখা হতো। আমার বোন বেশ বুদ্ধিমতী, স্পষ্টভাষী ছিল। সে আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা মারা গেছেন। আর আমাকে যিনি দেখাশোনা করতেন, তিনি আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।*

*এভাবে তিন দিন সে অনুরোধ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার প্রতি সদয় হয়েছি। তুমি তাড়াহুড়া কোরো না। যদি তোমার গোত্রের নির্ভরযোগ্য এমন কাউকে পাও যে তোমাকে দেশে পৌঁছে দেবে, আমাকে জানিও।*

*এরপরে আমার বোন একটি কাফেলার সন্ধান পেল। রাসূলুল্লাহ তখন তাকে কাপড়চোপড়, বাহন আর পথখরচ দিলেন। আমার বোন সেই কাফেলার সাথে করে শামে চলে এল। আমি আমার পরিবারের সাথে বসে আছি, এমন মুহূর্তে আমার বোন কাফেলা থেকে নামলো। আমাকে দেখেই তিরস্কার করতে লাগলো, জালিম! সম্পর্কচ্ছেদকারী! কীভাবে পারলে তুমি নিজের বৌ-বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আর নিজের বাবার মেয়েকে ফেলে আসতে?*

*আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইলাম। আমার বোনের কাছে জানতে চাইলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে। সে বললো, তোমার উচিত তার সাথে দেখা করা। তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তার সাথে যারা আগে দেখা করবে, তাদের প্রতি তিনি সদয় হবেন। আর যদি রাজা হয়ে থাকেন, তবে তার মহত্ত্বের সামনে তোমার ছোট হবার কিছু নেই, তুমি তুমিই থাকবে।*

*আমি মদীনায় চলে গেলাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি কে। আমি বললাম, আমি আদী ইবন হাতিম। তিনি তখন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক*

*জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তাঁর দেখা। বৃদ্ধা তাঁকে দাঁড়াতে বললো, দীর্ঘক্ষণ ধরে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললো। এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, এই মানুষটা কিছুতেই রাজা হতে পারে না।*

*এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সামনের দিকে এগোলেন। ঘরে ঢুকে আমাকে একটা বালিশ দিয়ে বললেন, এর উপরে বসো। সেই বালিশের বাহিরে চামড়া, ভেতরে খেজুরের বাকল। তিনি নিজে বসলেন মাটিতে। আমি মনে মনে ভাবলাম, নাহ, আল্লাহর কসম, কোনো রাজা এমন আচরণ করে না।*

*এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি কি রাকূসি উপদলের? আমি বললাম, জ্বী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার গোত্রের গনিমতের চার ভাগের এক ভাগ ভোগ করো, তাই না? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, কিন্তু তোমার ধর্ম অনুযায়ী এটা তো তোমার জন্য বৈধ না, তাই না? আমি স্বীকার করলাম, হ্যাঁ।*

*এতক্ষণে আমার আর বুঝতে বাকি থাকলো না, তিনি আল্লাহর নবী। যা বলা হয় না, তাও তিনি জানেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, শোনো আদী, চারপাশের অভাব-পীড়িত মানুষদের দেখে হয়তো তুমি এই দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছো, কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয়, যেদিন ধন দৌলত এসে উপচে পড়বে আর সেগুলো নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো শত্রুর সংখ্যাধিক্য আর এই মানুষগুলোর দুর্বলতা তোমাকে এই দ্বীন গ্রহণ থেকে পিছপা করে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয় যেদিন দেখবে একজন নারী সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করবে। আদী, হয়তো এই জিনিস দেখে তোমাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে যে তুমি দেখছো রাজত্ব আর বাদশাহী অন্যদের মাঝে। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই দিন খুব দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে বাবেলের শ্বেত পাথরগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছে।*

*আল্লাহর রাসূলের এ কথাগুলো শোনার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।'*

আদী ইবন হাতিমের ﵁ ঘটনা থেকে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রথমত, জনপ্রিয় মিডিয়া বা লোকের কথায় কান না দিয়ে নিজে যাচাই করা। আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে অনেক মিথ্যা গুজব শুনে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো। কিন্তু তাদেরই পরিচিত ও বিশ্বস্ত কারো থেকে যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে জানতো, তখন তাঁর সাথে দেখা করার সাহস ও আগ্রহ পেত। আদী ইবন হাতিমের ক্ষেত্রেও আমরা তা দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রাসূল ﷺ আর দশটা রাজা-বাদশার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন মদীনার শাসক, এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী মানুষটি

দীর্ঘক্ষণ ধরে জীর্ণ-শীর্ণ, দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন, মন দিয়ে তাদের কষ্ট আর অভিযোগের কথা শুনতেন। অতিথিকে ভালো বালিশ দিয়ে নিজে মাটিতে বসে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। এ দুটো দৃশ্য আদী ইবন হাতিমের মনে দাগ কাটে। তিনি বুঝাতে পারেন, একজন রাজা কখনো এতটা মাটির মানুষ হতে পারেন না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের মনের কথা পড়তে পারতেন। তিনি আদী সম্পর্কে জানতেন। মদীনার সাদামাটা পরিস্থিতি দেখে রাজার হালে বড় হওয়া আদী ইবন হাতিম যে কিছুটা অস্বস্তি আর সংকোচবোধ করছিলেন সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাকে অভয় দিয়েই বললেন, এই অবস্থা সাময়িক, শীঘ্রই পরিস্থিতি বদলে যাবে। একজন দাঈর মধ্যে এই গুণ থাকা খুব জরুরি। মানুষের মন-মানসিকতা ভেদে দাওয়াহর ভাষা ও ধরন উপযোগী হওয়া জরুরি।

চতুর্থত, আদী ইবন হাতিমের গলায় ক্রুশ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'তারা তাদের যাজকদের আল্লাহর পাশে শরীক করেছে।' আদী তখন বললেন, 'আমরা আমাদের যাজকদের আল্লাহর পাশে উপাস্য হিসেবে শরীক করি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? তারা কি হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেনি?' আদী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'এটাই তাদের উপাসনা করার শামিল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে শিরকের একটি প্রকার নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। যখন কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ হালালকে হারাম ঘোষণা করে বা হারামকে হালাল করে, তখন সেই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করাটা শিরক হয়ে যায়, কারণ এর এখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহর। আইন প্রণয়ন বা বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহর। আর কারো এই অধিকার নেই।

পঞ্চমত, বাহ্যিক চাকচিক্য আর বস্তুগত সাফল্যের ভিত্তিতে কোনো আদর্শ বা ধর্মকে বিচার করা উচিত নয়। আদী দেখতে পাচ্ছিলেন মুসলিমরা দরিদ্র। তাদের তেমন সহায়-সম্বল নেই, ভালো ঘরবাড়ি, উন্নত রাস্তাঘাট বা যাতায়াতব্যবস্থা নেই, জীবনযাত্রার উন্নত মান নেই, যেটা রোমানদের ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে ইসলাম ভুল আর রোমানরাই সঠিক! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, মুসলিমদের অবস্থাও একসময় বদলে যাবে, উন্নত হয়ে যাবে। আর সেটাই হয়েছিল। আদী ইবন হাতিম নিজের চোখে মুসলিমদের অবস্থা বদলে যেতে দেখেছিলেন।

## ইয়েমেনের আজদ থেকে আগত প্রতিনিধিদল

আরবের দক্ষিণে ইয়েমেনের আজদ থেকে সাতজনের একটি প্রতিনিধিদল আসে। তাদের সাথে মদীনার আনসারদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চরিত্র, আচার-ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো, 'আমরা বিশ্বাসী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে

বললেন, 'সব কথার পেছনে একটা বাস্তবতা থাকে। তোমাদের এই কথার পেছনে বাস্তবতা কী?' তারা বললো, 'আমাদের পনেরটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের পাঁচটি আপনার দূতদের মাধ্যমে আমরা আদিষ্ট হয়েছি, পাঁচটি আপনি আমাদের পালন করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাঁচটি আমরা জাহেলিয়াত থেকে আমরা পালন করে আসছি, যদি না সেগুলিকে আপনি ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার দূতরা যে আদেশ দিয়েছেন সেগুলি কী কী?' তারা জবাব দিলো, 'আমরা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, তাঁর নবী-রাসূলগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে আদেশগুলো দিয়েছি সেগুলো কী কী?' তারা বললো, 'আপনি আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এই সাক্ষ্য দিতে, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, রামাদানে সাওম পালন করতে ও যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের হজ্জ সম্পাদন করতে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর জাহিলিয়াতের যে পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমরা ধরে রেখেছ সেগুলো কী?' তারা বললো, 'স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞ থাকা, কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকা, ভাগ্যে যা আছে তা মেনে নেয়া, যখন পরস্পর প্রতিপক্ষরা একত্র হয় তখন সত্যবাদী থাকা এবং প্রতিপক্ষের বিপদে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ উদযাপন না করা।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ এবং তোমাদের জ্ঞানের বদৌলতে তোমরা প্রায় নবীদের সমকক্ষতা অর্জন করেছো!' তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা যা কিছু বললে তা যদি পছন্দ করে থাকো, তবে আমি তোমাদের আরও পাঁচটি দেবো যার কারণে তোমরা বিশটি বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। সেগুলো হলো -- যা তোমরা খাবে না তা জমা কোরো না, যেখানে তোমরা বাস করবে না সেখানে কিছু নির্মাণ করবে না, এমন কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না যা তোমরা আগামীকাল পরিত্যাগ করবে, আল্লাহকে ভয় করবে যার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে ও যার সামনে তোমাদের প্রকাশিত হতে হবে এবং তোমাদের সামনে যা আছে যেখানে তোমাদের চিরকাল বাস করতে হবে (অর্থাৎ আখিরাত) তার জন্য সংগ্রাম করো।' এ শুনে তারা ফিরে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশ মেনে চলল।

এগুলো ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসা প্রতিনিধিদলগুলির মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা। এটা তাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত একটা বছর ছিল। তাঁর জীবনসায়াহ্নের এই দিনগুলোতে আরবের সব প্রান্ত থেকে দলে দলে লোকেরা এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। মূলত তাঁর দাওয়াতী জীবনে যা কিছু তিনি করেছিলেন, তার ফসল এই সময়ে পাচ্ছিলেন ।

## ইয়েমেনের অধিবাসীদের প্রতি দাওয়াহ

আরবের গোত্রগুলো এক এক করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতে লাগলো। নতুন এই গোত্রগুলোকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিজ্ঞ এবং

আলিম সাহাবিদেরকে তাদের কাছে পাঠালেন। মুআয ইবন জাবাল ﷺ এবং আবু মূসা আল আশআরী ﷺ ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে বিশেষভাবে তাদের ইলম এবং দাওয়ার জন্য পরিচিত। তাদেরকে পাঠানো হলো ইয়েমেনের দুটো ভিন্ন প্রদেশে।

মুআয ইবন জাবালকে ﷺ পাঠানো হয়েছিল ইয়েমেনের উত্তরভাগে। তিনি ছিলেন একাধারে তাদের শাসক, বিচারক, শিক্ষক এবং যাকাত সংগ্রাহক। মুআযকে ﷺ যখন ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। মুআয ﷺ বসে আছেন সওয়ারীর পিঠে, আর আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাথে হেঁটে হেঁটে কথা বলছেন। মুআযকে তিনি বললেন,

> *'তুমি আহলে কিতাবদের একটি ক্বওমের কাছে যাচ্ছো। তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহবান হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয়। তারা তা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ বার সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। তারা সালাত আদায় করা শুরু করলে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তাদের প্রতি যাকাত ফরজ করেছেন। এই যাকাত গ্রহণ করা হবে তাদের ধনী লোকদের থেকে, আর এই যাকাত বণ্টন করা হবে তাদেরই গরীবদের মধ্যে। তারা যদি সেটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করো। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। সাবধান! মযলুমের দুআকে ভয় করবে। কারণ তার দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।'*[115]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআযকে আরও বললেন, 'মুআয, এর পর হয়তো তোমার সাথে আর দেখা হবে না। তুমি হয়তো কেবল আমার মসজিদ এবং কবরটাই দেখবে।' এ কথা শুনে মুআয কেঁদে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা ছিল আল্লাহর রাসূলের সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু মূসা আল-আশআরীকে ﷺ পাঠালেন ইয়েমেনের দক্ষিণে। তার ভূমিকা ছিল মুআয ইবন জাবালের ﷺ মতোই -- শাসক, বিচারক, শিক্ষক এবং যাকাত সংগ্রাহক। তাদের দু'জনকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ উপদেশ দিলেন,

> *'(লোকেদের কাছে দ্বীনকে) সহজ করে দাও, কঠিন কোরো না। সুসংবাদ দাও, মানুষকে তাড়িয়ে দিও না।'*

আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ এবং মুয়ায় ইবন জাবালের ﷺ প্রতি আল্লাহর রাসূলের দেওয়া উপদেশ থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

---

115 সহীহ বুখারি, অধ্যায় তাওহীদ, হাদীস ২। সুনান ইবন মাজাহ, অধ্যায় যাকাত, হাদীস ১।

১) সাধারণভাবে যে অঞ্চল থেকে যাকাত আদায় করা হয়, সেটা সেই অঞ্চলেই খরচ করা হবে। তবে যদি অন্য কোনো অঞ্চলে প্রয়োজন থাকে, সেক্ষেত্রে সেই অঞ্চলে যাকাত খরচ করা যাবে।

২) যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করার সময় ভালো বা খারাপ মানের সম্পদ না নিয়ে মাঝারি বা গড়পড়তা মানের সম্পদ যাকাত হিসেবে নেওয়া উচিত।

৩) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুআযকে সাবধান করছেন যেন তার দ্বারা মানুষের ওপর জুলুম না হয়। শাসকের হাতে ক্ষমতা থাকে, আর তার দ্বারা জুলুম সংঘটিত হওয়া সবচেয়ে সহজ। কিন্তু মানুষের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কারণ মজলুমের দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

৪) জিহাদে প্রয়োজন কঠোরতা, আর দাওয়াতে প্রয়োজন বিনয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুআয এবং আবু মূসাকে ﷺ উপদেশ দিচ্ছেন, তারা যেন মানুষের সাথে বিনয়ী হন, দ্বীনকে সহজভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন। অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন থেকে দূরে থাকেন এবং মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ না করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুত্তাক্বী ব্যক্তিরাই আমার আপনজন, তারা যে-ই হোক, তারা যেখানেই থাকুক।' এর মানে হলো, রাসূলুল্লাহর ﷺ আপন মানুষ হলো তাকওয়ায় অগ্রগামী মানুষেরা। তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের পরিচয় কী সেটা মুখ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবালকে ﷺ আরও বলেন, 'বিলাসিতা সম্পর্কে সাবধান হও, কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসিতায় লিপ্ত হয় না।'

## হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ﷺ ইয়েমেনের হামদান গোত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছয় মাসের মতো সেখানে অবস্থান করার পরও সেখানকার মানুষজন তার দাওয়াতে তেমন সাড়া দিলো না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তার বদলে আলীকে ﷺ পাঠালেন। আলীকে বলে দিলেন, সৈনিকদের মধ্যে কেউ চাইলে খালিদের সাথে ফেরত আসতে পারে অথবা আলীর সাথেও থেকে যেতে পারে। সেখানে পৌঁছে আলী ﷺ তার অধীনস্থ সব মুসলিমদের কাতারবন্দী করে জামাতে সলাত আদায় করলেন।

এরপর তিনি হামদান গোত্রকে একত্র করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠি পড়ে শুনালেন। সেই চিঠি পড়ে পুরো হামদান গোত্র মুসলিম হয়ে গেল। আলী ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই সুসংবাদ চিঠি লিখে জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হলেন, সিজদায় পড়ে গেলেন আর বললেন, 'হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!'

আলী ﷺ এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না সেটা নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে এমন লোকদের উপর আসীন করে পাঠাচ্ছেন যারা আমার চেয়ে বড়। আমার বয়স কম এবং বিচারক হিসেবে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আলীর বুকে হাতে রেখে বললেন,

> *'হে আল্লাহ, তার জবানকে সুদৃঢ় করে দিন, তার অন্তরকে হিদায়েতের উপর রাখুন। আলী, যখন দুই ব্যক্তি বিবাদ করবে এবং তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে তখন তাদের উভয়ের সাক্ষ্য আগে শুনবে। তারপর রায় দেবে। যদি তুমি এভাবে চল, তাহলে বিচার ফায়সালা করা তোমার জন্য সহজ হবে।'*

আলী ﷺ বলেন, 'এরপর থেকে আমি আর কখনোই বিচার করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।'

বিচারক হিসেবে আলী ﷺ কতটা বিচক্ষণ ছিলেন ইতিহাসই সেটার সাক্ষী। তিনি উমার ﷺ এবং উসমানের ﷺ সময় বিচারক ছিলেন। তারা দু'জনেই আলীর ﷺ বিচারের ওপর খুব আস্থাশীল ছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়ের ফায়সালার ভার তার উপর অর্পণ করতেন।

## আরবে স্থিতিশীলতা অর্জন

যে মিশন নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পাঠানো হয়েছিল, সেই মিশন এখন সফলতা প্রাপ্তির পথে। সমগ্র আরবে ইসলামকে তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গোত্রভিত্তিক ঐক্য ছেড়ে আরবরা গ্রহণ করলো আদর্শভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলাম আরবদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে সক্ষম হলো। যে লোকগুলো বিশ বছর আগেও মূর্তিপূজা করতো, তারাই এখন মূর্তি ভেঙে ফেলছে, এক আল্লাহর ইবাদাত করছে এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবান করছে। আরবের বুক থেকে নৈরাজ্য, গোত্রীয় বৈষম্য, অত্যাচার আর অরাজকতার অবসান ঘটলো। সূচনা হলো এমন এক সভ্যতার যারা নিজেরা ক্ষমা, মহত্ত্ব, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, আইনের শাসন, সমতা আর ঐক্যের চর্চা করেছে এবং গোটা বিশ্বকে সেই শিক্ষা দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো বিচারে সপ্তম শতাব্দীর এই প্রজন্ম ছিল শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

এটা সত্য যে সবগুলো গোত্র তাওহীদের আক্বীদাকে আলিঙ্গন করে ইসলাম গ্রহণ করেনি। অনেকেই রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের অন্তরের দরজা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত হয়। প্রতিটি মানুষ ইসলামকে ভালোবেসে ইসলাম গ্রহণ করে না। কেউ দুনিয়াবী কারণে, কেউ রাজনৈতিক স্বার্থেও ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তবে এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে

কাছ থেকে দেখতে পায়। জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হলে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ইসলাম গ্রহণে কোনো বাধা বা চাপ থাকে না। আর এ কারণেই ইসলাম মানুষকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে।

আরবের এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য আল্লাহর রাসুল ﷺ অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সাহাবিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন। মক্কার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো আত্তাব ইবন উসাইদকে رضي الله عنه, আর তাইফের গভর্নর ছিলেন উসমান ইবন আল-আস رضي الله عنه। বাযানকে رضي الله عنه ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ইয়েমেনকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। সানার গভর্নর হয় বাযানের ছেলে শামার, মা'রিব শহরের গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আল-আশআরী رضي الله عنه, আল-জুনদে ইয়ালা ইবন উমাইয়্যা, হামদানে আমীর ইবন শামর আল-হামদানী। নাজরান, যামাআ এবং যাবীদ অঞ্চলে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় খালিদ ইবন সাইদ, আমীর ইবন হিযাম (নাজরান), যিয়াদ ইবন লাবীদ (হাদরামাউত), উকাশ ইবন সাউর رضي الله عنه (আস-সাকাসিক এবং আস-সুকুন)।

# বিদায় হজ্জ

**“নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা মক্কায়, বরকতময় ও বিশ্ববাসীর হিদায়াতের দিশারী বানানো হয়েছিল (এ ঘরকে) । এখানে রয়েছে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, (আরও রয়েছে) মাকামে ইবরাহীম। আর এ ঘরে যে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। মানবজাতির ওপর আল্লাহর জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তির এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে...”** (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৬-৯৭)

## রাসূলুল্লাহর ﷺ হজ্জ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হাজ্জেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখার ও শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে চড়ে হজ্জ করেছিলেন। তাঁর এই হাজ্জে কোনো বিলাসিতা ছিল না, নিতান্তই সাদাসিধেভাবে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই হজ্জ এখনকার মতো ভিআইপি হজ্জ ছিল না। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের হজ্জের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করলেন, এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে رضي الله عنه জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, ‘যখন কোনো কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।’ উমার বলতে চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, সাহাবিদের যুগ ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, সেই স্বর্ণযুগ আর কখনো ফিরে আসবে না।

মাসজিদ আল-হারামে এসেই আল্লাহর রাসূল ﷺ কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবারের তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির তাওয়াফ,

আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

"আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৫)

এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার কালো পাথর স্পর্শ করলেন, চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন সূরা বাকারাহ অন্য একটি আয়াত।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারাহ, ২, ১৫৮)

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সাঈ' করলেন সাতবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বললেন,

*'লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না।*

*আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।*

*জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।*

*জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের*

বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব [illegible]

হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।

জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।

*আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।*

*নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।*

*মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের ﷺ সুন্নাহ।*

*প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'*

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

*'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?'*

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

*'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!'*

# বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে শিক্ষা

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল জাহিলিয়াতের শেকড় আনুষ্ঠানিকভাবে উপড়ে ফেলছেন। এটা ছিল নতুন যুগের শুরু এবং আগের যুগের সমাপ্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম নিজের ও নিজের পরিবারের হাতে জাহিলিয়াতের নিয়মগুলো বাতিল করছেন। এ কারণে জাহিলিয়াতের যুগে ঘটা রবিয়া ইবন হারিসের হত্যাকাণ্ডের জন্য রক্তপণের দাবি ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন, তখন সর্বপ্রথমে আব্বাস ইবন মুত্তালিবের ؓ সুদ বাতিল করছেন। আব্বাস ؓ জাহিলিয়াতের যুগে লোকজনকে ধার দিতেন এবং এর ওপর সুদ ধার্য করছিলেন। নিজ চাচার সুদের দাবি বাতিল করে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুধু মূলধন ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। যে কোনো ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো নিজের বা নিজের পরিবারের মাধ্যমে বিষয়টি শুরু করা।

২) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের সতর্ক করছেন নিজেদের মধ্যকার অনৈক্যের ব্যাপারে। শয়তান কুফফারদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ বাঁধানোর ব্যাপারে তেমন পরোয়া করো না। কারণ তারা ইতিমধ্যেই কাফির হয়ে গেছে এবং তারা জাহান্নামের আগুনে যাবেই। কিন্তু সে মুসলিমদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, কারণ মুসলিমদের সে কাফির বানাতে পারে না, তাই সে তাদের মধ্যে বিভেদ আর অনৈক্য তৈরি করে, মুসলিমদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাদের প্ররোচিত করে এবং ফিতনা বাঁধায়।

৩) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন, কোনো বিকলাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দাস যদি আমাদের ওপর নেতা নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে তাহলে তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। এ কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শাসক যে-ই হোক, যেমনই হোক, তাদের চরিত্র যা-ই হোক, তাদের বংশপরিচয় যা-ই হোক, সে যদি আল্লাহর কিতাব দিয়ে শাসন করে, তাহলে তাকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ দিয়ে শাসন করা একজন শাসকের বৈধ শাসক হবার মূল শর্ত।

৪) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের বুক থেকে বর্ণ বা গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। ইসলাম একটি সর্বজনীন দ্বীন, কোনো জাতি বা গোত্র বিশেষের দ্বীন নয়। এই দ্বীন যারা পালন করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে তাকওয়ার মাধ্যমে, জাতি, বর্ণ অথবা গোত্রের মাধ্যমে নয়।

৫) আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, শয়তান হয়তো মুসলিমদের দ্বারা কুফরি করাতে পারবে না, কিন্তু মুসলিমদের গুনাহে লিপ্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাবে। আজকে আমরা মুসলিমদের মধ্যে এটাই দেখছি, তারা ইসলাম হয়তো ত্যাগ করছে না, কিন্তু গুনাহ এবং পাপ কাজের কারণে তারা নিজেদের ধ্বংস এবং অবমাননা ডেকে এনেছে।

৬) এই খুতবায় আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলে গেছেন, তা হলো, মুসলিমরা যদি দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে, তা হলে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। এই আদেশ শুধু সেই যুগের মানুষদের ওপর প্রযোজ্য নয়, বরং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সভ্যতার গতিবিধি যেদিকেই গড়াক, প্রযুক্তি যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, বিশ্বব্যবস্থা যা-ই হোক, মুসলিমদের জন্য চিরন্তন জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম, যার উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আর কিয়ামত পর্যন্ত এর কোনো পরিবর্তন হবে না। পৃথিবীর সকল যুগের, সকল স্থানের যেকোনো সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ এর নির্দেশিত পথেই হবে, এর কোনো নড়চড় হবে না।

## আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসাবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর *আস-সীরাহ আন-নববী* গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

> *'হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!'*

## 'আমি যার মাওলা, আলী ﷺ তার মাওলা'

আলী ইবন আবি তালিব ﷺ তখন ইয়েমেনের আমীর। সে সময় তার কর্তৃত্ব নিয়ে কিছু গুঞ্জন ওঠে। আলীর ﷺ সাথে সাদাকার কিছু উট ছিল, তার সৈন্যরা উটগুলোকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আলী ﷺ রাজি হলেন না। তার অবর্তমানে সৈনিকরা সেই উটগুলো ব্যবহার করা শুরু করে। বিষয়টা জানতে পেরে আলী ﷺ খুব রেগে গেলেন।

কিছু লোকের কাছে আলীর ﷺ এই আচরণ পছন্দ হলো না। ফলে তার বিরুদ্ধে গুজব রটে গেল। অভিযোগগুলো একসময় আল্লাহর রাসূলের ﷺ কান পর্যন্ত পৌঁছলো। একজন সাহাবি এই অভিযোগগুলোকে সমর্থন দিচ্ছিলেন। তার হাঁটুতে হাত রেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বলো তো, তুমি কি আলীকে অপছন্দ করো?' সাহাবির সোজাসাপ্টা উত্তর, 'হ্যাঁ, করি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার উচিত তাকে ভালোবাসা।' সেই সাহাবি বলেন, 'এরপর থেকে আলী ইবন আবি তালিব হয়ে গেলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন।'

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ গাদিরখুম নামক এক জায়গায় এসে মানুষদের জড়ো করেন। আলীর ﷺ ব্যাপারে সেই বিখ্যাত উক্তিটি তিনি সেখানেই করেন। কথাটা ছিল, 'মান কুনতু মাওলা, ফা 'আলীউ মাওলা -- আমি যদি কারো মাওলা হই, তবে আলীও তার মাওলা। মাওলা মানে বন্ধু। রক্ষাকারী। ঘনিষ্ঠ সহচর।

এই সবগুলো অর্থই আলীর ﷺ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শিয়ারা এই ঘটনা আর এই উক্তিকে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করে। তারা এই উক্তিটি দেখিয়ে দাবি করে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কথার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর পর আলীকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন গাদিরখুমে এই কথাটি বলেছিলেন? আলীর ﷺ বিরুদ্ধে মানুষের ভুল ধারণা আর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য। আলীর ﷺ নামে গুজব সৃষ্টি হয়েছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার সামনে আলীকে ﷺ সম্মানিত করলেন যেন সবাই বুঝতে পারে আলীর ﷺ মর্যাদা কত ওপরে। আলী ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই, তাঁর মেয়ে ফাতিমার ﷺ স্বামী, তাঁর রেখে যাওয়া একমাত্র বংশধরদের বাবা। আমরা জানি, নাতি হাসান ﷺ এবং হুসাইন ﷺ ছাড়া রাসূলুল্লাহর ﷺ আর কোনো বংশধর ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে বলছিলেন, আমি যদি তোমাদের বন্ধু হই তবে আলীও তোমাদের বন্ধু। তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে আলীকেও ভালোবাসতে হবে। এ কথা থেকে সাহাবি হিসেবে আলীর ﷺ উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে প্রথম খলিফা হওয়ার কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত এখানে নেই।

## উসামা ইবন যায়িদের ﷺ নেতৃত্বে অভিযান

হিজরতের একাদশ বছর। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ শেষে মদীনায় ফিরে এসেছেন। মুহাররম মাস সেখানেই থাকলেন। সফর মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিসাকে একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এই সেনাবাহিনী যাবে আশ শামে, রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এর আগে রোমানদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল, তখন আমীর ছিলেন উসামার ﷺ বাবা--আল্লাহর রাসূলের ইসলাম পূর্বযুগের

পালকপুত্র-- যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। সে যুদ্ধেই তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে অংশ নেন কিন্তু রোমানরা সেবার যুদ্ধ করতে আসেনি।

সেই একই রোমানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বারের মতো বাহিনী পাঠানো হচ্ছে, মুসলিমদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারই আমীর নির্ধারিত হলেন তরুণ সাহাবি উসামা ﷺ। এই অভিযানে উসামাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বাবার শহীদ হওয়ার স্থানে যেতে নির্দেশ দেন।

উসামার ﷺ বয়স তখন মোটে আঠারো কি বিশ। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে তখন প্রবীণ অনেক সাহাবিই ছিলেন, যারা কেবল বয়সেই বড় নন, বরং, জিহাদ, নেতৃত্ব আর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিষয় ব্যবস্থাপনায়ও অভিজ্ঞ। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি না এমন একজন তরুণ সাহাবিকে আমীর হিসেবে নিয়োগ দিলেন, যার অধীনে আবু বকর ﷺ ও উমারের ﷺ মতো সাহাবিরা যুদ্ধ করবেন!

ফলে এটা নিয়ে কিছুটা কানাঘুষা শুরু হয়। মুসলিম সমাজের আকার তখন আগের চাইতে অনেক বড়, তাই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আর কানাঘুষার মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। আর মুনাফিকরা তো ছিলই, যারা ছিদ্রান্বেষণ আর সমালোচনার সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

কানাঘুষা হলো দুটো বিষয়কে ঘিরে। প্রথম অভিযোগ ছিল, উসামার ﷺ বয়স কম, আর দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি দাস শ্রেণির। উসামার বাবা যাইদ ﷺ এক সময় দাস ছিলেন, তার মা উম্ম আয়মানও দাসী ছিলেন, দাসের সন্তান হয়ে উসামা কীভাবে স্বাধীন মানুষের ওপর নেতৃত্ব পেতে পারে -- কেউ কেউ এটা মানতেই পারছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কানে সে সব কথা এলে তিনি বললেন, 'তোমরা উসামার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক করছো? এর আগে তোমরা তার বাবার নিয়োগ পাওয়া নিয়েও বিতর্ক করেছিলে! আল্লাহর কসম করে বলছি, তার বাবা নেতা হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি ছিল, সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। আর তার ছেলে তার পরে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের সফলতম সময় চলছিল। আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে মিশনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে তেইশ বছর আগে যে তাওহীদের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই বার্তাকে লোকেরা এখন সাদরে গ্রহণ করেছে। আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক বিতাড়িত হয়েছে, আল্লাহর ঘর কাবায় তাওহীদ প্রত্যাবর্তন করেছে। সমগ্র আরব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, আরবের চারপাশে ইসলাম কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল ﷺ এমন এক প্রজন্মকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যারা ইসলামের এই বিজয় মশাল পুরো বিশ্বে বহন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার বাস্তব উদাহরণ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ওপর আরোপিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তাঁর বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই ঘনিয়ে এসেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আগে থেকেই বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> "আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।" (সূরা আদ দুহা, ৯৩: ৪-৫)

> "নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।" (সূরা যুমার, ৩৯: ৩০-৩১)

> "আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৪-৩৫)

> "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

> "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমণ্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" (সূরা আর-রাহমান ৫৫: ২৬, ২৭)

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা, ৫: ৩)

এখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর সরাসরি কোনো ইঙ্গিত না থাকলেও রাসূলুল্লাহর ﷺ মিশনের পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আরও বলেন,

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরা আন-নাসর, ১১০)

সূরা নাসরে আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনাবসানের ইঙ্গিত থাকার প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ؓ ছিলেন একজন তরুণ সাহাবি, কিন্তু তিনি বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের সাথে উমার ইবন খাত্তাবের ؓ দরবারে বসতেন। এত কমবয়স্ক একজন সাহাবির উপস্থিতিতে প্রবীণ মুহাজির এবং আনসাররা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন, তারা একদিন বললেন, 'এই যুবক আমাদের সাথে কেন বসছে?'

উমার ؓ তাদের প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, সূরা নাসর থেকে আপনারা কে কী বোঝেন?' সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিল। উমার ؓ এরপর ইবন আব্বাসকে ؓ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সূরা থেকে কী বোঝো?' ইবন আব্বাস ؓ বললেন, 'আমি এই সূরা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই।' উমার ؓ বললেন, 'আর আমিও তা-ই বুঝি।' এর মাধ্যমে উমার ؓ উপস্থিত সাহাবিদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ইবন আব্বাসের ؓ বয়স কম হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি উমারের দরবারে অন্য প্রবীণ সাহাবিদের সাথে স্থান পেয়েছেন। সাধারণত কোনো কাজ শেষ করার পর আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে ইসতিগফার করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ বলছেন, যখন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আসবে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর রাসূল যেন ইসতিগফার করেন। এই ইসতিগফার তাঁর দাওয়াহ মিশনের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবালকে ؓ ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, 'তোমার সাথে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।' এ কথা শুনে মুআয কাঁদতে থাকেন। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম শিখে নিও, কেননা এই বারের পর হয়ত আমি আর কখনো হজ্জ করতে পারবো না।' আরও একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারিতে, সেটি বর্ণনা করেছেন আইশা ؓ। তিনি বলেন,

*'একবার আমরা নবীজির ﷺ সব স্ত্রী একসাথে বসে আছি, এমন সময় ফাতিমা পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা যেন অবিকল রাসূলুল্লাহর ﷺ হাঁটার মতো ছিল! মেয়েকে দেখে নবীজি স্বাগত জানালেন, বললেন, 'আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক!' তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। এরপর ফাতিমাকে কানে-কানে কিছু একটা বললেন, আর ফাতিমা খুব করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর কানে-কানে কিছু একটা বললেন। তখন ফাতিমা হাসতে লাগলেন।*

*নবীজির ﷺ স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম, আমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার মাঝে আলাদা করে তোমাকে গোপনে একটা কথা বলেছেন, আর তুমি কাঁদছো! এরপর যখন নবীজি ﷺ উঠে চলে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, উনি তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? ফাতিমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ গোপন কথা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু হলো, আমি তাঁকে বললাম, তোমার ওপর আমার দাবি থেকে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে তাঁর গোপন কথাটি বলবে না? ফাতিমা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমাকে জানাবো। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন, জিবরীল ﵇ প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় চলে এসেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদতে থাকি, যা তুমি নিজেই দেখেছো। আর এরপর অস্থিরতা দেখে আমাকে দ্বিতীয়বার কানে-কানে বললেন, ফাতিমা, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে তুমি মু'মিন নারীদের সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে? তখন আমি হেসে দিলাম, সেটাও তুমি দেখেছো।'*[116]

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ﵁ ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাক্বী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ আযাদকৃত দাস। আল বাক্বী' হলো মদীনার কবরস্থান। সেখানে সমাহিত করা হয়েছে সেইসব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক্বীতে গেলেন,

> *'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ -- একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'*

---

116 সহীহ বুখারি, অধ্যায় অনুমতি প্রার্থনা, হাদীস ৫৮।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'

আবু মুওয়াইহিবা ﷺ বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত -- এই সুযোগটাই বেছে নিন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'*

বিশাল এক নেতা অথচ কত নির্মোহ। দুনিয়া, সম্পদ, বাড়িগাড়ি এসবের প্রতি রাসূলুল্লাহর কখনোই ﷺ কোনো আকর্ষণ ছিল না, লোভ তো দূরেরই কথা। তাঁর উদ্বেগ ছিল উম্মাহকে ঘিরে। ইবন কাসিরের رحمه الله ভাষায়, 'দুনিয়া ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখে তুচ্ছ, আর আল্লাহর কাছেও অতি তুচ্ছ, এতটাই তুচ্ছ যে দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উম্মাহর জন্য জীবনভর কষ্ট করেছেন। আজকে সমগ্র আরব তাঁর পদানত, কিন্তু এই বিশাল অর্জন কোনো নিরাপদ, ঝুঁকিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট পথে হয়নি। আরাম-আয়েশ বলে কোনো বস্তু আল্লাহর রাসূলের জীবনে ছিল না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকতো। নবুওয়াতের সেই প্রথম দিন থেকেই বিরোধিতার সমুখীন হতে হয়েছে, প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। দারিদ্র্য, কষ্ট আর দুর্দশা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর তাঁর এই ত্যাগ-তিতিক্ষার সুফল ভোগ করে আজ আমরা মুসলিম। তাঁর এই কষ্ট, তাঁর এই ত্যাগ ছিল আমাদের জন্য, আমার-আপনার কাছে দ্বীন ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে ঋণী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী'বাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখান থেকে চলে এলেন। এর পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

## বিদায়বেলা

আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা ﷺ পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ! ব্যথায় মারা যাচ্ছি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা ﷺ তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আমারই বরং বলা উচিত -- ব্যথায় মারা যাচ্ছি!'[117]

---

[117] সহীহ বুখারি, অধ্যায় রোগী, হাদীস ২৭।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।

শেষ দিনগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ কাটিয়েছেন স্ত্রী আইশার ঘরে। অন্য স্ত্রীরা তাতে সায় দিয়েছিলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রত্যেকের ঘরে যাওয়া তাঁর জন্য খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আইশার ঘরে আসতে হয়। শেষ দিনগুলোতে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে যেতে চাইলেন। তিনি চাইলেন মানুষদের কিছু নাসীহা দেবেন। বললেন, 'আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও, আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো যেন শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে আর তিনি মসজিদে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর মাথা কালো কাপড়ে জড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর পা মাটিতে ঘষা খাচ্ছিল, তাই অন্যের ওপর ভর করে তাঁকে মসজিদে যেতে হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমেই আল্লাহ আযযা ওয়াজালের প্রশংসা করলেন। এরপর উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ করলেন, তাদের জন্য সালাত পাঠ করলেন এবং মাগফিরাতের দুআ করলেন। এরপর মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

> *'মুহাজিররা শোনো, তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে আসছে। শুরুর দিকে তারাই আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে। কাজেই, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তাদের সাথে ভালো আচরণ কোরো, আর যারা ভুল-ত্রুটি করে, তাদের ক্ষমা করে দিও।'*

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাকে দুনিয়ার শান-শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে -- এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'*

আল্লাহর রাসূল ﷺ আসলে নিজের কথাই বলছিলেন, কিন্তু কে এই বান্দা সেটা আবু বকর ﷺ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারলো না। আবু বকর ﷺ কাঁদতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হঠাৎ করে আসে। কিন্তু নবীদের কাছে জান কবজের আগে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। আবু বকর ﷺ কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমরা আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ﷺ থামিয়ে দিয়ে বললেন,

*'বন্ধুত্ব আর অর্থ-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে যে মানুষটি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই নিজের খলিল বানাতাম। কিন্তু আমার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক হলো ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার। তোমরা মসজিদের খোলা দরজাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো তোমরা বন্ধ করে দেবে, শুধু আবু বকরের দরজা ছাড়া।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সবার সামনে আবু বকরের ﷺ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। খলিল হলো বন্ধুত্বেরও ওপরে একটি স্থান, যা অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। যদি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতেন, তাহলে সে স্থানটি আবু বকরের হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর খলিল, তাই আবু বকর ﷺ হলেন তাঁর দ্বীনের ভাই, বন্ধু, সবচেয়ে আপনজন।

মসজিদে নববীর সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘর ছাড়াও আরও কিছু সাহাবিদের ঘর লাগোয়া ছিল আর সেই ঘর দিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা যেত। সেগুলো ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত দরজার মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, কেবলমাত্র আবু বকরের দরজাই খোলা থাকবে আর বাকিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক আলিম মনে করেন এই আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পরে আবু বকরের খলিফা হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন, তবে এটা তাঁর আদেশ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অনুসরণ করা শুরু করতে পারে। মৃত্যুর চার দিন আগে তাই তিনি এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন,

*'জাযিরাতুল আরব থেকে তোমরা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বের করে দেবে। আর প্রতিনিধিদলের সাথে আমি যেমন ব্যবহার করতাম, তেমন ব্যবহার করবে।'*

আল্লাহর রাসূল ﷺ দ্বীন ইসলামের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সেখানে স্থান দিতে চাননি। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আরও বললেন,

*'আল্লাহর লানত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি! তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ বানাচ্ছে। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে।'*

অর্থাৎ, তিনি মুসলিমদের নিষেধ করে দেন যেন তারা তাঁর কবরস্থানকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে না নেয়, যে ভুলটা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা করেছে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, সেটি হলো সালাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। তিনি মুসলিমদের দাসদের প্রতি যত্নশীল হওয়ারও উপদেশ দেন। উপদেশ দেন নারীদের ব্যাপারে, যেন তাদের ওপর অবিচার করা না হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

*'মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই অপদস্থ হবে।'*

মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর ﷺ যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা ﷺ চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর ﷺ সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, 'আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা ﷺ আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

ইউসুফের নারীর সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো, আযীযের স্ত্রী যখন অন্য নারীদের দাওয়াত দিয়েছিল, বাহ্যত মনে হবে, সেটা স্রেফ নারীদের জন্য একটা আসর বা আড্ডার আয়োজন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন ইউসুফকে দেখতে পায়। অর্থাৎ, তার মুখের কথা ছিল এক, আর মনের কথা ছিল আরেক। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরকে দিয়ে ইমামতি করানোর আদেশ করেছেন, তখন আইশা কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তার বাবা খুব নরম মনের মানুষ, তাই তিনি ইমামতি করতে গিয়ে হয়তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, কাজেই তিনি ইমামতি না করলেই ভালো। তবে আসল কারণ সেটা ছিল না। আসল কারণ কী ছিল সেটা আইশা পরবর্তীতে নিজেই বলেছেন, 'আমি চাইনি আমার বাবা সালাত পড়ান তার কারণ হলো, মানুষ হয়তো আল্লাহর রাসূলের স্থানে দাঁড়ানোর জন্য তাকে অপছন্দ করতে পারে।' আল্লাহর রাসূলের ﷺ স্থানে অন্য কাউকে দেখতে উম্মাহ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরকেই ইমামতির জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন।

আইশা ﷺ বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ বোধ করতেন, তখন মুআউয়িয়াত (সূরা নাস, সূরা ফালাক) পরে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নিতেন। কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে নিজ হাতে সেটা করতে পারছিলেন না, তাই আইশা ﷺ সূরাগুলো পড়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ফুঁ দিতেন এবং তাঁর হাত

দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতেন, কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাত আইশার ﷺ হাতের চেয়ে বেশি বরকতময়।[118]

উসামা ইবন যাইদের ﷺ সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল মদীনার বাইরে জুরফে। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে উসামা ইবন যাইদ ﷺ তাঁকে ﷺ দেখতে মদীনায় আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এতটাই অসুস্থ যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। উসামা ইবন যাইদ ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উঠিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দুআ করছেন।' কী যন্ত্রণা আর কষ্টের মাঝেও রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যাইদের ﷺ জন্য দুআ করছিলেন। এতে বোঝা যায় উসামার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসা কত প্রবল ছিল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সালাতে ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বকর ﷺ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের ﷺ পাশে গিয়ে বসলেন। আবু বকর ﷺ তখন সালাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করলেন আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলো।[119]

## উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন

দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর ﷺ মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি ﷺ মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম! আনাস ইবন মালিকের ﷺ বর্ণনায়,

*'আল্লাহর রাসূলের ﷺ মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'*

---

[118] সহীহ বুখারি, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস ৫০।

[119] সহীহ বুখারি, অধ্যায় আজান, হাদীস ৭৭।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

*'তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ!'*

আবু বকর ﵁ রাসূলুল্লাহকে ﷺ ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা ভাবলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ শারীরিক অবস্থার হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর ﵁ অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ শেষ সালাহ। আইশার ﵂ ভাই আবদুর রহমান ﵁ তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা ﵂ তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি ﵂ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই। আইশা ﵂ তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ এগিয়ে দিলেন। আইশা ﵂ বলেন, তিনি ﷺ এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে!' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুয়ে ছিলেন আইশার ﵂ কোলে মাথা রেখে। পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল।

শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

*'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের*

*সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।*

*হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমার ওপর রহম করো! আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো!'*

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

*ফীর-রফিকুল আ'লা!*
*ফীর-রফিকুল আ'লা!*
*ফীর-রফিকুল আ'লা!*

রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা -- ওয়ালহিকনী বির- রফিকিল আ'লা – আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

সাহাবিরা এই খবর মেনে নিতে পারলেন না। সবাই খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। কারো মাথা আর কাজ করছে না। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ নির্বাক হয়ে বসে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তিটুকুও যেন আর নেই। কেউ কেউ তো রীতিমতো অবিশ্বাস করলেন। উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه কোনোভাবেই মানতে পারলেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মসজিদের দিকে ছুটে গেলেন, উমারের পিছু পিছু সবাই মসজিদের দিকে ছুটলো। চারদিকে হাহাকার, হৃদয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত, আজ মদীনার বাতাস ভারী হয়ে আছে কান্নায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর সংবাদ মেনে নেওয়া সাহাবিদের জন্য কতটা কঠিন ছিল সেটা আমরা কখনো অনুভব করতে পারবো না, কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি আমাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসাই নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বছরের পর বছর থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন ﷺ তাদের সব, সবকিছু। তাদের নেতা, তাদের পরামর্শদাতা, তাদের শিক্ষক, তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু, তাদের রাসূল!

উমার বলে উঠলেন,

*'না! না! আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা যাননি! তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ*

*করতে গেছেন, মূসা ﷺ যেমন তাঁর রবের সাথে দেখা করতে চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এরপর আবার ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রাসূলও তেমনি ফিরে আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আর ফিরে এসে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন যারা বলছে তিনি মারা গেছেন।'*

উমার ﷺ ভাবতেই পারছেন না রাসূলুল্লাহ আর নেই। তিনি ভাবছেন, সব মুনাফিক্বকে হত্যা করার আগে রাসূলুল্লাহ মারা যেতেই পারেন না। তরবারি কোষমুক্ত করে অবুঝের মতো উমার ﷺ হুমকি দিয়ে বললেন, 'যে এ কথা বলবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছে, আমি তার মাথা এই তরবারি দিয়ে আলাদা করে দেবো।'

যে উমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অসম্ভব দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, শক্তি-সাহস আর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাকে সবাই চেনে, যাকে দেখে শয়তানও ভয়ে অন্য পথ ধরতো, সেই উমার আজ মুষড়ে পড়লেন। এমন কি হওয়ার কথা ছিল? হ্যাঁ, সাহাবিরাও মানুষ। রক্ত-মাংসের জলজ্যান্ত মানুষ। যাদের শরীরে লাল রক্ত আছে আছে, যাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, দুর্বলতাও আছে। তাই উমারের মতো শক্ত-সমর্থ মানুষটাও ﷺ সেদিন অবুঝ শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিলেন।

কিন্তু একজন ভেঙে পড়েননি। সেই সংকটময় মুহূর্তে যখন কেউ নির্বাক, কেউ হতবিহ্বল, তখন একটা মানুষ বটবৃক্ষের মতো সব ঝড় সামলে নিলেন। কে সেই মানুষটি? আল্লাহর রাসূলের ﷺ সবচেয়ে কাছের মানুষ, আল্লাহর রাসূলের বন্ধু, ভাই, সাহাবি আবু বকর ﷺ। নবুওয়াতের প্রথম থেকে যেই মানুষটা পায়ে পায়ে রাসূলের ﷺ সাথে লেগে ছিলেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের ﷺ সমস্ত সুন্নাহ, সমস্ত শিক্ষা যিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত, আবু বকর ﷺ।

সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়েও তিনি ঈমানী শক্তিতে নিজেকে সামলে নিলেন। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেভাবে শক্ত হাতে জাহাজের হাল ধরতে হয়, তেমনি করেই পুরো উম্মাহর হাল ধরলেন তিনি। রাসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তেকালের সময়ে আবু বকর ﷺ মদীনায় ছিলেন না, ছিলেন মদীনার কাছাকাছি আস-সুনহে। খবর পেয়ে তিনি সোজা আইশার ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখ অনাবৃত করে আবু বকর ﷺ কেঁদে উঠলেন, রাসূলুল্লাহকে ﷺ চুমু দিলেন আর বললেন, 'আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন, মৃত্যুর পরও আপনি পবিত্র। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে।' এরপর আবু বকর ﷺ আইশার ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গেলেন। সেখানে তখন উমার ﷺ চিৎকার করছিলেন। উমারকে থামিয়ে আবু বকর ﷺ বললেন, 'বসো, উমার, বসো!'

উমার ﷺ আবু বকরের ﷺ কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আবু বকর ﷺ আবার

বললেন, 'উমার, বসো বলছি, বসো।' তবুও উমার ﷺ থামলেন না। আসলে উমার ﷺ মানসিকভাবে এতটাই বিধ্বস্ত ছিলেন যে, কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আবু বকর ﷺ উমারকে উপেক্ষা করেই সামনে এগিয়ে গেলেন। লোকেরা উমারকে ﷺ ছেড়ে তখন আবু বকরের ﷺ কাছে ভিড় জমালো। তখন আবু বকরের ﷺ সেই দিনের কথাগুলো উম্মাহ এত বছর পরেও স্মরণ করে। তিনি বলেছিলেন,

*'যে মুহাম্মাদের ﷺ ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক -- মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।'*

এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

> 'মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তাঁরও মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যায়, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৪)

কথাগুলো শুনে উমার বসে পড়লেন, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তার ভাষায়, 'আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ আসলেই আর নেই।' এমন নয় উমার কুরআনের এই আয়াত জানতেন না, কিন্তু অদ্ভুত শূন্যতার সেই মুহূর্তে আবু বকরের ﷺ মুখে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সবার মাঝে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মৃত্যু সংবাদে উমার ছিলেন দিশেহারা। উসমান হয়ে যান নির্বাক। আলী ﷺ সবার থেকে লুকিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর ﷺ সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াতটির অর্থ জানতেন যে, মুসলিমরা আল্লাহর জন্য বাঁচে, ব্যক্তি মুহাম্মাদের ﷺ জন্য নয়। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর আনীত দ্বীন চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। সেদিন মদীনায় কত হাফেজ ছিল, কত আলেম ছিল, কিন্তু কেউ এই আয়াতকে কাজে লাগাতে পারলো না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছিলেন মাত্র একজন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ ছায়া যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই আবু বকর ﷺ। ইমাম কুরতুবি মন্তব্য করেন,

*'সাহসিকতার মানে যদি হয় বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতিতে দৃঢ় আর অবিচল থাকা, তবে আবু বকরের সাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো কুরআনের এই আয়াত ও এই ঘটনা। কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর চাইতে বড় ফিতনা উম্মাহর জীবনে আর ছিল না ... চারদিকে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম, তখন যিনি হাল ধরেছিলেন তিনি হলেন আবু বকর।'*

আবু বকর ﵁ আল্লাহর রাসূলের ﷺ শিক্ষার সবটা আমল করেছিলেন, এজন্যই তিনি হলেন নবী-রাসূলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

## রাসূলুল্লাহর ﷺ দাফন

রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারের সদস্যরা রাসূলুল্লাহর ﷺ গোসল ও দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন আল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়েদ এবং রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান ﵁। আনসারী সাহাবি আওস ইবন খাওলি ﵁ আলীকে বললেন, 'আল্লাহর কসম এবং রাসূলুল্লাহর ওপর আমাদের হকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ভেতরে আসতে দিন।' তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হলো এবং তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন।

আইশা বলেন, 'গোসলের সময় তারা বললো, আমরা তো বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিই, নাকি কাপড় রেখেই যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন, সেই তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পড়লো। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল -- রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও। কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহর জামার ওপর দিয়েই পানি ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার ওপর দিয়ে তাঁর শরীর ঘষে দেয়।'

গোসল শেষে রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে তিন টুকরো কাপড় জড়ানো হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ জানাযার সালাত এক জামাতে আদায় করা হয়নি। আইশার ﵂ ঘরে যতটুকু জায়গা হতো তত মানুষ আসতো, জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতো। এক দলের সালাত আদায় শেষ হলে আরেক দল -- এভাবে সালাত আদায় করা হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর শিশুরা আর সবশেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাতে কোনো ইমাম ছিল না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীর ছিল আইশার ﵂ ঘরে। উম্ম সালামা ﵂ বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীরা খুব কাঁদছিলাম, কিন্তু তখন অতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে যখন কবরের মাটি খোঁড়ার শব্দ পেলাম, তখন আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, চিৎকার করে উঠি। মসজিদ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারাও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, পুরো মদীনাই যেন একটা বিরাট আর্তনাদে পরিণত হয়।'

ফজরের সময় হলে প্রতিদিনের মতোই বিলাল ﵁ আজান দিতে গেলেন। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ।' এরপর আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না, গলার কাছে আওয়াজগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাল, আজান শেষ করতে পারলেন না। বিলাল ছিলেন আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিন, রাসূলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আজান দেননি।

আইশার ﷺ ঘরে খনন করা হলো রাসূলুল্লাহর কবর। নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়, এটাই নবীদের সুন্নাহ। আইশা ﷺ একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার কোলে পতিত হয়েছে। আবু বকর ﷺ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির কবর তোমার ঘরে হবে।' যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাফনের সময় এল তখন আবু বকর ﷺ বলেন, 'তোমার চাঁদগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান ﷺ। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা ﷺ ইচ্ছে করে তার একটি আংটি কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন।

দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা ﷺ আনাসকে ﷺ বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের ﷺ শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে!' আসলে রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন -- সবই তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়। আনাস ইবন মালিক ﷺ ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে বড় হওয়া সাহাবি। তিনি বলেন,

*'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন দুইটা -- একটা সবচেয়ে আনন্দের, আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের। আনন্দের দিনটি হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনায় আসার দিন। সেদিন সবকিছু ছিল আলোকিত! আর সবচেয়ে কষ্টের দিন হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর দিন। সেদিন সবকিছু যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ কবর দেওয়ার পর যখন আমরা হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো আর আগের মতো নেই।'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থাকা সাহাবিদের জন্য একটা অন্যরকম অনুভূতি। যখন তিনি

চলে গেলেন, তখন তাদের মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু বদলে গেছে। একদিন আবু বকর আর উমার ﷺ উম্ম আইমানের ﷺ সাথে দেখা করতে যান। উম্ম আইমান ﷺ তাদের দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তারা জানতে চাইলেন, 'আপনি কেন কাঁদছেন?' উম্ম আইমান ﷺ বললেন,

*'আমি জানতাম আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন না একদিন চলেই যাবেন। আমি কাঁদছি এ কারণে যে আর কখনো ওয়াহী নাযিল হবে না।'*

তারা শুধু রাসূলুল্লাহর ﷺ অভাব বোধ করছিলেন তা নয়, তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ মাধ্যমে যে ওয়াহী পেতেন সেটার অভাবও অনুভব করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা যান হিজরী একাদশ বছরের বারো রবিউল আউয়াল। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র আরবের অবিসংবাদিত শাসক। তিনি এমন একটা সময়ে চলে যান যখন অনারবের রাজা-বাদশাহরা তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতাপ আর প্রতিপত্তি থাকা মানুষটি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল, সেগুলোও সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু যব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদাকাহ করে দিয়ে গেছেন। না ছিল সম্পদের বাহার, না ছিল সোনা-রুপার বহর, কিছুই না।

তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম জাতির আগে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মনোনিত জাতি ছিল বনী ইসরাঈল। তাদেরকে সৎপথে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একের পর এক নবী পাঠাতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ যে উম্মাহকে রেখে গেছেন, সে উম্মাহর জন্য আর কোনো নবী পাঠানোর প্রয়োজন নেই, শেষ নবীই তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় সম্মাননা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবিরা সেখান থেকে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। সে যুগ গৌরবের, সে যুগ সমীহ জাগানিয়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ চলে যাওয়ার অল্প ক'বছরের মাথায় পৃথিবীর তৎকালীন দুই পরাশক্তি রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারী সাহাবিদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। সে আরেক ইতিহাস। আপাতত, এতটুকুই।

# শেষ কথা

প্রিয় পাঠক, আমরা আযযা ওয়া জালের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনী শুরু থেকে শেষ করার জন্য আমাদের তাওফীক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিই রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ক্বিয়ামতের দিন মিলিত হবেন এবং তাঁর হাতে হাউযে কাউসারের পানি পান করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক্ব প্রাপ্ত হবে।

প্রিয় পাঠক, রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ নিছক সাহিত্যিক রস আস্বাদনের জন্য নয়। মজা পাওয়া বা উপভোগের জন্য উম্মাহর আলিমরা সীরাহ লেখেননি। এই সীরাহ নিজেকে বদলে দেওয়ার জন্য, নিজেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আদলে গড়ে তোলার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসতেন, উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন, আমরাও সেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি আর সম্পদ তিনি ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র এই দ্বীন ইসলামকে আমার-আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেজন্য আমাদের উচিত অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকা।

যে মানুষ আল্লাহর বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না, আর পৃথিবীতে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যা-কিছু-জানি তার সবটাই তো তাঁর ﷺ কাছ থেকে জানি! এই ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারবো না, তবে ন্যূনতম আমরা যেটা করতে পারি তা হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ অবদান স্বীকার করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা, তাঁর আনীত দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর তাঁর মর্যাদাকে রক্ষার জন্য নিজের জান দিয়ে দেওয়া।

সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি।

## রেইনড্রপস এর অন্যান্য প্রজেক্ট

### প্রকাশিত অন্যান্য বই:

- ❖ প্রাচীর
- ❖ সীরাহ ১ম খণ্ড

### অডিও লেকচার সিরিজ:

- ❖ পরকালের পথে যাত্রা
- ❖ পথিকৃৎদের পদচিহ্ন: নবীদের জীবন
- ❖ ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান
- ❖ সীরাহ অডিও

অন্ধকার অরণ্যে এক ছটা আলোর দিশা কিংবা ঘোর অমানিশায়
উজ্জ্বল তারকার মত জন্ম যার। সততার অটল আদর্শে সদা হাস্যোজ্জ্বল তরুণ
আল আমীন একদিন ওহীর পরশে সমগ্র মানবজাতির কাছে হলেন
রহমাতুল্লিল আলামিন। কখনও স্বজাতির প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর, কখনও
বদর-উহুদের রক্তে ভেজা জমিন মাড়িয়ে দ্বীনের ঝান্ডা বয়ে নিয়ে চলা।
সন্তানের মৃত্যুতে ক্রন্দনরত পিতার হৃদয়, কখনও বা কিশোরী স্ত্রীর খেলার
সাথী। যুগের পর যুগ ধরে লেখা হয়েছে হাজারো পৃষ্ঠা, কত শত ঘন্টা পেরিয়ে
গেছে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছুঁয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসা।

হাজার বছর পরও লেখকদের কলমের কালি আজও ফুরিয়ে যায়নি,
মিটে যায়নি নবীপ্রেমিকের হৃদয়ের তৃষ্ণা, অশ্রুসজল হৃদয়ের আবেগে একটুও
ভাটা পড়েনি। তাঁর সম্পর্কে আরো একটু জানার আকাঙ্ক্ষায়, আরো
একটু হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়ার আশায় আজও আমরা খুঁজে ফিরি
নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি।

তিনি আমাদের নবীজী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

RAINDROPS
MEDIA

# সীরাহ

## মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

শেষ খণ্ড